পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ইসলামী নীতিদর্শন: তত্ত্ব ও প্রয়োগ

(Islamic Moral Philosophy: Theory and Application)

গবেষক

আবদুল কুদ্দুস

রেজি. নং: ১৪৫/২০১৬-২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. গবেষক আবদুল কুদ্দুস, আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় **"ইসলামী নীতিদর্শন: তত্ত্ব ও প্রয়োগ"** (Islamic Moral Philosophy: Theory and Application) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। আমি এর পাণ্ডুলিপির আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে উক্ত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য অথবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং গবেষককে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি প্রদানের বিষয় বিবেচনার্থে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেওয়ার সুপারিশ করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোনো প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

তারিখ, ঢাকা
১৬ মার্চ ২০২২ খ্রি.

ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"ইসলামী নীতিদর্শন: তত্ত্ব ও প্রয়োগ"** (Islamic Moral Philosophy: Theory and Application) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডক্টর **শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী-এর** প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একটি একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য অথবা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভ (থিসিস)টির সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোনো প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা আমার নিজের বলে চালানো) নেই।

তারিখ, ঢাকা
১৬ মার্চ ২০২২ খ্রি.

(আবদুল কুদ্দুস)
পিএইচ. ডি. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়: ভূমিকা **৯**

১. নীতিদর্শনের পরিচয় ১১

২. ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ১৪

৩. নীতিদর্শনের সূচনা বিন্দু: শুভ কাজের আদেশ ও অশুভ কাজে নিষেধ ১৬

৪. শুভ ও অশুভের ধারণা ১৯

৫. ইসলামী নৈতিকতার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি ২১

৬. স্বীকার্য সত্যসমূহ ২৪

ক. তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ২৪

খ. রিসালাতে বিশ্বাস ২৭

গ. আখিরাত বা পরকালীন জীবনে বিশ্বাস ২৯

ঘ. ইচ্ছার স্বাধীনতা, তাকদীর ও আল্লাহর সুবিচার নীতিতে বিশ্বাস ৩১

৭. মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ৩৬

৮. মানুষের মৌলিক পরিচয় ও দায়িত্ব ৪০

৯. ইসলামী নীতিদর্শনে বাধ্যবাধকতার ধারণা ৪৩

১০. নৈতিক অনুমোদন ৪৪

১১. সুখী ও উত্তম জীবন: চরম লক্ষ্য ৪৬

১২. ইসলামী নীতিদর্শনে প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের অবস্থান ৫০

২য় অধ্যায়: সত্যবাদিতা ও সততা **৫৯**

১. সত্যের স্বরূপ ৬০

২. সত্যবাদিতার অর্থ ৬১

৩. আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়া ৬৫

৩. ১ নিষ্ঠার সাথে ইবাদত ৬৮

৩.১.১. সালাত ৬৯

৩.১. ২. সিয়াম ৭১

৩.১.৩. হজ্জ ৭২

৩.১.৪. যাকাত ৭৪

৩.১.৫. কুরবানী ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৬. পোশাক ৭৭
৩.২. আল্লাহর প্রতিনিধিত্বে সততা ৮০
৪. মানুষের সাথে সত্যবাদী হওয়া ৮৫
৪.১. সম্পদ উপার্জনে সততা ৮৮
৪.১.১. ব্যবসায় ও লেনদেনে সততা ৮৯
৪.১.২. কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্বপালনে সততা ৯৬
৪.২. সম্পদ ব্যয়ে সততা ৯৯
৪.৩ সামরিক ক্ষেত্রে সততা ১০০
৪.৪. তথ্য ও প্রযুক্তিতে সততা ১০২
৪.৫ চিকিৎসা ক্ষেত্রে সততা ১০৪
৫. সত্যের সাক্ষী হওয়া ১০৫
৬. মন্তব্য ১০৭
৩য় অধ্যায়: সুবিচার ১১২
১. সুবিচারের জন্য বিশ্বজনীন স্বীকার্য বিষয় ১১৩
২. সুবিচারের ইতিহাস ১১৪
৩. সুবিচারের বিভাজন ১১৬
৩.১. আল্লাহর সাথে সুবিচার: তাওহীদ, কৃতজ্ঞতা, শিরক না করা ১১৬
৩.২. মানুষের সাথে সুবিচার ১২০
৩.২.১. নিজের সাথে সুবিচার ১২০
৩.২.২. শিশুর প্রতি সুবিচার ১২২
৩.২.৩ পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সুবিচার ১২৪
৩.২.৪. অমুসলিমদের প্রতি সুবিচার ১২৭
৩.৩. সামাজিক সুবিচার ১২৮
৩.৪. বিচার কার্যক্রমে সুবিচার ১৩০
৩.৪.১. ইসলামী আইনের বিশ্বজনীনতা ১৩১
৩.৪.২. সুবিচার বাস্তবায়ন ১৩৮
৩.৫. অর্থনৈতিক সুবিচার ১৪০
৩.৬. রাজনৈতিক সুবিচার ১৪৩
৩.৬.১. পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত ১৪৭
৩.৬.২. কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতিতে সুবিচার ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬.৩. রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণ ১৪৮
৪. প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি সুবিচার ১৪৯
৪.১. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ১৫১
৪.২. উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজির প্রতি সুবিচার ১৫১
৪.৩. পাহাড় ও বনাঞ্চল রক্ষা ১৫২
৫. সুবিচার ও অবিচার: ১৫২
৫.১. হত্যা ১৫৩
৫.২. সন্ত্রাস ও ফেতনা ১৫৪
৬. মন্তব্য ১৫৪
৪র্থ অধ্যায়: পরার্থপরতা ১৫৮
১. পরার্থপরতার ধারণা ১৫৯
২. পরার্থপরতার মৌলিক ভিত্তি ১৬০
৩. পরার্থপরতার গৌণ ভিত্তি ১৬২
ক. পারস্পরিক বন্ধন: পারিবারিক, সামাজিক ও কৃত্রিম ১৬২
খ. ভ্রাতৃত্ব ১৬৬
গ. বন্ধুত্ব ১৬৮
৪. পরার্থপরতার ধরন ১৭০
ক. সাহায্য ও দান ১৭০
খ. রোগীর সেবা ও চিকিৎসা ১৭৩
গ. উত্তম আচরণ ১৭৭
ঘ. করযে হাসানা ১৭৯
ঙ. জীবন রক্ষা ১৮০
চ. সৎকাজের পথ দেখানো ১৮১
ছ. মানবকল্যাণমূলক জ্ঞানের প্রসার ১৮৩
জ. মানবতাবাদী সাহিত্য রচনা ১৮৪
ঝ. দারিদ্র্য বিমোচন ১৮৭
ঞ. ইয়াতীম, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধীদের প্রতি আচরণ ১৮৯
৫. পরোপকারের উদ্দেশ্য ১৯১
৬. মন্তব্য ১৯২
৫ম অধ্যায়: ইসলামী নীতিদর্শনের পূর্ণাঙ্গতা ১৯৬
১. পূর্ণতার ধারণা ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

২. ইসলামী নীতিদর্শনের পূর্ণতার প্রমাণ ১৯৮
৩. আত্মশুদ্ধি: নৈতিক পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তর ২০৩
ক. শরীয়ত ২০৪
খ. তরীকত ২০৫
গ. মারিফত ২০৬
ঘ. হাকীকত ২০৬
ঙ. বাইয়াত ২০৭
চ. ফানা ২০৯
৪. নফসের মন্দ প্রবণতাসমূহ ২০৯
ক. জিহ্বার অনিষ্ট ২০৯
খ. রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা ২১২
গ. আত্মপ্রীতি ২১৩
ঘ. গর্ব-অহংকার-লোভ ২১৩
ঙ. ক্রোধ ২১৫
চ. হতাশা ও ভীতি ২১৬
ছ. 'হাওয়া' বা মনের খেয়ালের অনুসরণ ২১৬
জ. ইন্দ্রিয় লালসা ১১৭
ঝ. ভ্রান্তি বা ধোঁকায় পড়া ২১৮
৫. আত্মার পূর্ণতার জন্য সদগুণাবলি অর্জন ২১৮
ক. তাকওয়া ২২০
খ. অনুশোচনা বা তাওবা ২২১
গ. আল্লাহর স্মরণ ও প্রার্থনা ২২২
ঘ. ধৈর্য ২২৪
ঙ. আল্লাহ-নির্ভরতা বা তাওয়াক্কুল ২২৬
চ. কৃতজ্ঞতা ২২৮
ছ. সংঘবদ্ধ জীবন ২২৯
৬. আত্মার প্রশান্তি ও সুস্থ বিনোদন ২৩০
ক. শেখার জন্য ভ্রমণ ২৩১
খ. সুস্থতার জন্য খেলাধূলা ২৩২
গ. কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী গান ২৩২

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. নৈতিক শিক্ষার জন্য অভিনয় শিল্প ২৩৩

৭. মন্তব্য ২৩৪

৬ষ্ঠ অধ্যায়: ইসলামী নীতিদর্শনের বাস্তব প্রয়োগ: সমস্যা ও সম্ভাবনা ২৩৯

১. বর্তমান মুসলিম জাতির নৈতিক অবস্থান: আত্মসমালোচনা ২৪০

ক. দুর্নীতি ২৪১

খ. বিলাসিতা-অপব্যায় ২৪৪

গ. অনৈক্য ও রক্তপাত ২৪৫

ঘ. নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা ২৪৬

২. নৈতিক অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ ২৪৬

ক. অভ্যন্তরীণ কারণ ২৪৭

i. মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক দৃষ্টিকোণ ২৪৯

ii. ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ২৫০

iii. ক্ষমতা ও নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা ২৫৩

iv. হতাশা ও দুর্বলতা ২৫৬

v. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ হ্রাস পাওয়া ২৫৭

vi. ইতিহাস দর্শনের দিক থেকে বিশ্লেষণ ২৫৮

খ. প্রত্যক্ষ কারণ ২৫৯

i. প্রত্যক্ষ আঘাত ২৫৯

ii. উপনিবেশবাদ ২৬০

iii. বর্তমান আক্রমণসমূহ ২৬২

৩. পাশ্চাত্যের নৈতিক সততার কারণ ২৬৩

৪. ইসলামী নৈতিকতার বিরুদ্ধে আপত্তি ও জবাব ২৬৫

৫. অধঃপতন থেকে উত্তরণ ২৬৮

ক. যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি ও একতা ২৭০

খ. পারিবারিক ভিত্তি ২৭২

গ. সংলাপ ও সম্প্রীতির আহ্বান ২৭২

৬. মন্তব্য ২৭৩

৭ম অধ্যায়: উপসংহার ২৭৮

গ্রন্থপঞ্জি ২৯৩

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায়

ভূমিকা

এই গবেষণার উদ্দেশ্য বর্তমান বহুত্ববাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী নীতিদর্শনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা। এজন্য আমরা প্রধানত দেখাতে চেয়েছি, এই নীতিদর্শন একজন মানুষের, বিশেষত একজন মুসলিমের চিন্তাধারা ও চরিত্রকে এমন উন্নত পর্যায়ে উপনীত করতে চায় যার মাধ্যমে সে সহজে অন্যদের সাথে সততা, সুবিচার ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং একইভাবে মানবেতর প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক জগতের সাথেও তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। দ্বিতীয়ত যে প্রাণশক্তির অভাবে মুসলিম জাতি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে সেটির পুনরুদ্ধারে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ঐতিহ্য ভিত্তিক দিকনির্দেশনার অনুসন্ধান করা। স্পষ্টতই সেই প্রাণশক্তি হচ্ছে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি। প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে এটি কীভাবে সৃষ্টি করা যায় এবং সেই অনুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজকে শুভ কাজে নিয়োগ ও অশুভ কাজ থেকে ক্রমাগত সংশোধন করা যায় তার একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে। কুরআনের যে বাণী এক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে অনুপ্রেরণা জোগায় তা হচ্ছে, "যে ঈমান অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করবে, পুরুষ হোক বা নারী, তাকে আমি অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব আর তাদের সেসব উত্তম কর্মের বিনিময়ে অবশ্যই আমি প্রতিদান দেব"।[১] অর্থাৎ আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখার মাধ্যমে ভালো কাজ সম্পন্ন করতে পারলে পার্থিব ও পরকালীন উভয় জগতে সফল হওয়া যাবে। সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের ইতিহাস পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসের সাথে জড়িত। ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটলেও খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরের আগের কোনো লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতার বিখ্যাত নৃপতি ব্যবিলনের হাম্মুরাবি (রাজত্বকাল: খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৯০-১৭৫০) এর আইনে ছিল কেউ কাউকে হত্যা করলে কিংবা আহত করলে ঠিক সে পরিমাণ প্রতিশোধ ক্ষতিগ্রস্তের উত্তরাধিকারী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারত। তাঁর রাজ্যে সবাই এই নীতি মেনে নিয়েছিল। পাশ্চাত্যের অনুসারীদের অনেকে এ সব রীতিনীতিকে সভ্যতার প্রাচীনতম নৈতিকতার ভিত্তি মনে করেন। প্রাচীন গ্রিসে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত নীতিবিদ্যার ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনের জনক থেলিসের (খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৪-৫৫০) সমসাময়িক পিথাগোরাস (জন্ম: খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩২), হিরাক্লিটাস (জন্ম: খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০)

প্রমুখের রচনায় একদিকে যেমন দর্শনের বিষয় আলোচিত হয়েছে তেমনি নৈতিকতার কথাও উচ্চারিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় সক্রেটিসের (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭০-৩৯৯) ভূমিকা ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য; এ কারণে অনেকেই তাঁকে পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের জনক বলে মন্তব্য করেন। তাঁর ছাত্র প্লেটোর (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৮-৩৪৮) বিভিন্ন গ্রন্থে ন্যায়পরতা ও ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, যদিও তিনি মনে করতেন কোনো কাজ ভালো হওয়ার কারণেই যদি ঈশ্বর তা অনুমোদন করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের অনুমোদনের জন্য কাজগুলো ভালো হতে পারে না। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) তাঁর পিতার স্মরণে *নিকোমেকিয়ান এথিকস* নামে নীতিদর্শনের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। এরিস্টটলের নীতিবিদ্যার মূল কথা ছিল *ইউডাইমোনিয়া* বা উত্তম জীবনযাপন পদ্ধতি। প্রাচীনকালের অধিকাংশ নীতিদর্শনের মূল কথাই ছিল উত্তম ও সৎ জীবনযাপন কীভাবে করা যায় তা নিয়ে।

প্রচলিত নীতিবিদ্যা সাধারণত তিনটি ভাগে বিভক্ত: পরানীতিবিদ্যা, আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা। নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের শাব্দিক, ব্যুৎপত্তিগত ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে পরানীতিবিদ্যা। আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা কোনো একটি আদর্শকে ভিত্তি করে মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে আর প্রায়োগিক নীতিবিদ্যায় সমকালীন প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট নতুন নতুন নৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ থাকে। আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার তিনটি শাখা রয়েছে: সদগুণাবলি তত্ত্ব, কর্তব্যতত্ত্ব ও ফলাফল ভিত্তিক তত্ত্ব। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নীতিদর্শনে সদগুণাবলি তত্ত্বের প্রাধান্য ছিল। আধুনিক নীতিদর্শনে কর্তব্যতত্ত্ব প্রথম উত্থাপিত হয়েছে সতের শতকের জার্মান দার্শনিক স্যামুয়েল পুফেনড্রফের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে জন লক, কান্ট ও রসের আলোচনায় এর প্রাধান্য পায়। ফলাফল ভিত্তিক একটি ধারা হচ্ছে উপযোগবাদ। ইসলামী নীতিদর্শন একটি আদর্শনিষ্ঠ নীতিদর্শন যেখানে একই সাথে সদগুণাবলি, কর্তব্যের ধারণা এবং ফলাফলকে মূল্যায়ন করা হয়।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী (স.) এর বাণীসমূহে মানবজাতির জন্য নৈতিকতার যে ভিত্তি ও আদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিয়েই ইসলামী নীতিদর্শন। "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যার কাছ থেকে সবাই মঙ্গলের আশা করে এবং তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে"[২]- মহানবী (স.) এর এই উক্তিই এই নীতিদর্শনের মূল কথা। মানবতার কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে মানুষের জাগতিক ও অতিজাগতিক সফলতার পথ দেখানো ইসলামের সামগ্রিক লক্ষ্য। কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে এর কাঠামো গঠিত হলেও, ইসলাম প্রচলিত মানবীয় মূল্যবোধ বা সর্বজনীন নৈতিকতার কোনো পরিবর্তন করতে চায় না। বরং সেই মানবীয় মূল্যবোধগুলোর সর্বোচ্চ বিকাশের এবং সেগুলোর সুরক্ষার জন্য বিশেষ কিছু মানদণ্ড ও পথনির্দেশ দেয়। কুরআন অনুযায়ী, নৈতিকতা মানব সভ্যতার অস্তিত্বের সাথে জড়িত। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন একজন পূর্ণ মানব ও নৈতিকতার প্রথম আদর্শ। আদম (আ.) এর সৃষ্টির পর তাঁকে আল্লাহ স্বয়ং যেভাবে সবকিছুর নাম তথা জ্ঞানের বস্তু ও জ্ঞান শিক্ষা দিলেন সেখানে নিঃসন্দেহে নৈতিকতার জ্ঞানও ছিল, যা আমরা তাঁর

জীবনে দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে এতটাই সমৃদ্ধ ছিলেন, যার ফলে সমগ্র ফেরেশতা জগৎ আল্লাহর নির্দেশে তাঁর কাছে মাথা নত করেন।

সভ্যতার বিকাশে মিশরিয়, ব্যবিলনিয়, গ্রিক, রোমান বা পারসিকদের ভূমিকা অনেক। কুরআনের সাথে এসব সভ্যতার বিভিন্ন জ্ঞানের বিশেষত গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু মিল পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে, কুরআন সেখান থেকে নকল করেছে। আবার কুরআনের সাথে কোনো অমুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদী বা ধর্মনিরপেক্ষ দার্শনিকের কথা মিলে গেলে একথা বলাও অর্থহীন যে, তাঁরা এগুলো কুরআন থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন, ব্রাডলি, রাসেল, বার্গসঁ কিংবা পিটার সিঙ্গারের বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে কুরআনের মিল রয়েছে। মুসলিম দার্শনিকদের কেউ কেউ এরিস্টটল বা প্লেটোর মতের আলোকে কুরআন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন।[৩] কিন্তু কুরআন নিজের অনন্যতা সম্পর্কে বলেছে, "এটি তাওরাত, ইনজীলসহ পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী" (৩: ২)। সত্যায়নকারী কথাটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে, যথাযথ যাচাই পূর্বক সত্যতার সনদ প্রদান। কুরআন নিজেকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (ফুরকান) বা মানদণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করে।[৪] কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী যে কোনো জ্ঞানকে এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে স্বীকৃতি দিতে কুরআন প্রস্তুত। কিন্তু কুরআন সেই সাথে যে জিনিসটির দাবি করে তা হচ্ছে, এটি সম্পূর্ণ মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা যার মাধ্যমে মানুষ সমস্ত প্রকার অন্যায়, অশুভ ও মন্দ থেকে বেঁচে থাকতে পারে ও সর্বোচ্চ ভালোর অনুসরণ করতে পারে। পূর্ববর্তী মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকগণ অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে কুরআনের এ বিষয়গুলোর সুশৃঙ্খল ও পদ্ধতিগত রূপ দিয়ে গিয়েছেন। এই উন্নয়ন কার্যক্রম থেমে নেই, বরং এ এক অসমাপ্ত কাজ।

এই গ্রন্থটিকে ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো হচ্ছে- প্রথম অধ্যায়: **ভূমিকা**; দ্বিতীয় অধ্যায়: **সত্যবাদিতা ও সততা**; তৃতীয় অধ্যায়: **সুবিচার**; চতুর্থ অধ্যায়: **পরার্থপরতা**; পঞ্চম অধ্যায়: **ইসলামী নীতিদর্শনের পূর্ণাঙ্গতা**; ষষ্ঠ অধ্যায়: **ইসলামী নীতিদর্শনের বাস্তব প্রয়োগ: সমস্যা ও সম্ভাবনা**; সপ্তম অধ্যায়: **উপসংহার**। উপসংহারে সমগ্র আলোচনার সারাংশ ও নিজস্ব মূল্যায়ন এসেছে। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে ভূমিকা স্বরূপ এই প্রথম অধ্যায়টিতে আমরা ইসলামী নীতিদর্শনের পরিচয়, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, স্বীকার্য সত্যসমূহ; নৈতিক শুভ ও অশুভের ধারণা, প্রত্যাদেশ ও প্রজ্ঞার ভূমিকা প্রভৃতির বিশ্লেষণ করব। এই প্রাথমিক ধারণাগুলোর বিশ্লেষণ পরবর্তী অধ্যায়গুলোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

ইসলামী নীতিদর্শনের পরিচয়

সাধারণত, সঠিক কাজ ও সিদ্ধান্তের প্রকৃতি ও ভিত্তি সম্পর্কিত বিবরণ এবং যে সব নীতিমালার কারণে একটি কাজকে নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য বা পরিহারযোগ্য বলা যায় সেগুলোর যৌক্তিক আলোচনাই নীতিতত্ত্ব নামে

পরিচিত।[৫] অর্থাৎ নীতিবিদ্যায় সঠিক কাজ বা আচরণের ধরন বা প্রকৃতি, সঠিক কাজের ভিত্তি এবং যে মানদণ্ডের কারণে একটি কাজকে ভালো বা মন্দ, সঠিক বা ভ্রান্ত, উচিত বা অনুচিত বলা যায় সেগুলোর যুক্তিযুক্ত আলোচনা থাকে। নীতিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের বাস্তব জীবন-পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি সরবরাহ করা যেন সে প্রথমত, নিজের মনকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, কথায় ও কাজে সর্বোত্তম ভালোর অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়। মুহাম্মদ মিসকাওয়ার আলোচনাতেও এটি প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর মত ছিল, নীতিদর্শনের উদ্দেশ্য এমন চরিত্র অর্জন যার মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি কাজ সুন্দর ও সহজ হবে।[৬]তিনি নীতিদর্শনের প্রধান কাজটিকে বিবেচনা করেন ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ নীতিবিদ্যা দর্শনের অন্যান্য শাখার মত সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক নয় বরং অধিকাংশই প্রায়োগিক। ইসলামী নীতিদর্শন ইসলামের মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানবীয় আচরণ সমূহের মূল্যায়ন করে থাকে, কুরআনে যার পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে *'খুলুকুন'* শব্দটি, বহুবচনে *আখলাক* বা চরিত্র। নীতিদর্শনকে আরবী বা ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় *ইলমুল আখলাক*।

পবিত্র কুরআনে *খুলুক* শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে: একটিতে বলা হয়েছে পূর্ববর্তীদের আচরণ অর্থে (৩৬: ১৩৭) আর অন্যটিতে বলা হয়েছে, উত্তম আচরণ অর্থে- "নিশ্চয় তুমি (মুহাম্মাদ স.) মহান চরিত্রের অধিকারী"।[৭] আরবী অভিধানে *খুলুক* এর অর্থ করা হয়েছে, "মানুষের আত্মার এমন এক অবস্থাকে যা তার কর্ম নির্ধারণ করে"।[৮] অর্থাৎ মানুষের ভালো-মন্দ সব কর্মই চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। আল ফারাবী বলেন, "চরিত্র হচ্ছে মানুষের আত্মার এমন এক অবস্থা যার মাধ্যমে সে যখন ভালো কাজ করে তখন তা হয় সদগুণ আর যখন মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ করে তখন তা হয় অসদগুণ"।[৯] অর্থাৎ তিনি আত্মার মাধ্যমে সৃষ্ট মানুষের দুই ধরনের আচরণের বর্ণনাকেই চরিত্র বলেন। আল গাযালী মানুষের গঠনে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেন একটি হচ্ছে *খালক* (দেহ) অন্যটি *খুলুক* (চরিত্র)। তাঁর মতে, আত্মা মানুষের আধ্যাত্মিক উপাদান। আত্মাকে সদগুণে গুণান্বিত করা এবং অসদগুণ থেকে রক্ষাই হচ্ছে নৈতিকতার মূল কথা। তিনি মনে করেন নীতিদর্শন দর্শনের অন্যান্য শাখার মত নয় যা, দার্শনিকগণ উদ্ভাবন করেছেন, বরং এটিকে দার্শনিকগণ প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১০] আল রাযী, নাসিরুদ্দীন তূসী ও জালালুদ্দীন দাওয়ানীর কথায় সামগ্রিকভাবে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আত্মার এমন গুণ বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে যেখানে সেগুলোর বিকাশ কিংবা নিয়ন্ত্রণের নীতিমালা রয়েছে।[১১] ইবনে তাইমিয়ার মতে, নীতিবিদ্যা আমাদেরকে শেখায় কোন আচরণ করা উচিত এবং কোনটি করা উচিত নয়।[১২] তিনিও নৈতিকতাকে ব্যবহারিকবিদ্যা হিসেবে দেখেছেন। আধুনিক মুসলিম নীতিদার্শনিকদের মধ্যে আবদুল্লাহ দারাজ নৈতিকতাকে দেখেছেন নৈতিক আইন হিসেবে, আমরা প্রকৃতিগতভাবে যার অনুসরণ করতে বাধ্য।[১৩] তিনি পাঁচটি প্রধান ধারণার আলোকে ইসলামী নৈতিকতার ব্যাখ্যা দেন: বাধ্যবাধকতা, দায়িত্বপালন, অনুমোদন, অভিপ্রায় এবং প্রচেষ্টা বা *জুহ্‌দ*। অর্থাৎ ইসলামী নীতিদর্শন মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ ও মানুষের প্রতি

দায়িত্বপালন করতে বাধ্যবাধকতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। জর্জ এফ. হরানি সমকালীন নীতিদর্শনের আলোকে ইসলামী নৈতিকতাকে পরানীতিবিদ্যক ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন যেখানে এর বস্তুনিষ্ঠতার দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[১৪]

নীতিদর্শন সমাজের মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের মূল্যায়ন করে। মানুষের সব আচরণ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার সব ঐচ্ছিক আচরণও এর অন্তর্ভুক্ত নয় বরং যেগুলোর উপর নৈতিকতার প্রয়োগ হতে পারে অর্থাৎ ভালো ও মন্দকে আরোপ করা যায় সেসব ঐচ্ছিক আচরণই এর আলোচনার বিষয়। এটি একই সময় মূল্যায়নধর্মী ও আদর্শনিষ্ঠ। মূল্যবিদ্যার প্রধান একটি বিষয় মূল্যতত্ত্ব- যা আত্মনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ নামে বিভক্ত। আত্মনিষ্ঠ বা *সাবজেক্টিভ* মূল্যের অবস্থান থাকে ব্যক্তিতে। অর্থাৎ ব্যক্তির অস্তিত্বের কারণেই কোনো কিছুর মূল্যায়ন সম্ভবপর হয়। মূল্যায়নকারী ব্যক্তিই কাজের মূল্য নির্ধারণ করে। যেমন, খ্রিষ্টীয় দার্শনিকদের মতে ঈশ্বরই সব মূল্যের উৎস। অন্যদিকে বস্তুনিষ্ঠ মূল্য হচ্ছে, যা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, নিজ মূল্যের কারণেই তা মূল্যবান বা মূল্যহীন। যেমন, ফুলের সৌন্দর্য বস্তুতেই থাকে, কারো মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে না, দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর মূল্যায়নের জন্য ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। নিরপেক্ষভাবে দেখলে, আসলে মূল্যায়নের জন্য ব্যক্তি ও বস্তু উভয়ই প্রয়োজন। গরুর নিকট যেমন স্বর্ণের চেয়ে খড় বেশি মূল্যবান তেমনি একজন অসুস্থ মানুষের নিকট উৎকৃষ্ট খাবারের চেয়ে সামান্য মূল্যের ঔষধ বেশি প্রয়োজন। এ কারণে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে নীতিদর্শনের আলোচনা বেশি যুক্তিযুক্ত হতে পারে। তবে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের অনুসারীগণ নীতিবিদ্যাকে মূল্যায়নধর্মী বিদ্যা বলতে নারাজ। যেমন, মরিজ শ্লিক মনে করেন, নীতিবিদ্যা আমাদের কোনো আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞান দেয় না, কারণ এই অর্থে নীতিবিদ্যা অর্থহীন যেহেতু তার পরখ করা যায় না। বরং নীতিবিদ্যা হচ্ছে বর্ণনামূলক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব; কারণ, মানুষ স্বভাবতই আনন্দকে ব্যথার উপর অগ্রাধিকার দেয়।[১৫] বর্ণনামূলক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলতে বোঝায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ভিত্তিক সাধারণ বিজ্ঞানকে। নীতিবিদ্যাকে প্রত্যক্ষবাদীগণ মনোবিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি মানুষের জৈবিক আচরণ ও অন্যান্য জড়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ, নীতিবিদ্যা মূল্যায়নধর্মী না হলে নৈতিক উৎকর্ষতার প্রসঙ্গটি অনেকাংশেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট আকার বা সীমা থাকতে পারে না। কোনো স্থাপনা কতটা সুন্দর করে তৈরি করা যায় তার সীমা নির্ধারণ করা যায় না। একজন লোক সর্বোচ্চ কতটুকু সততার অনুসরণ করতে পারেন, তারও কোনো সীমা বেঁধে দেওয়া যায় না।

সাম্প্রতিক নীতিদর্শনে, বিশেষ করে জি. ই. মূর (১৮৭৩-১৯৫৮) এর ধারণায় নৈতিক মূল্যের আত্মনিষ্ঠতার দিকটির পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠতার দিকটি প্রাধান্য পায়।[১৬] মূর ভালো কী তার একটি সাধারণ অনুসন্ধানকেই নীতিবিদ্যার মূল কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেন। 'ভালো' গুণটিকে একটি অপ্রাকৃতিক গুণ অভিহিত করে তিনি বলেন, আমরা কেবল ভালো আচরণ নিয়েই নীতিবিদ্যার আলোচনা করি, অথচ আচরণ ছাড়াও অনেক জিনিস আছে ভালো। অপ্রাকৃতিক গুণ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ যাকে

অনুসরণ করতে পারে। অর্থাৎ দৃশ্যমান আচরণ, কথা, কাজ, বস্তু ইত্যাদিতে ভালো গুণটির প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু স্বয়ং ভালো হলুদ বা সাদা রঙের মতই অদৃশ্যমান থাকে। হলুদ বা সাদা রঙ যেমন নিজ গুণেই হলুদ বা সাদা তেমনি ভালো তার অন্তর্নিহিত গুণের কারণেই ভালো। একটি ভালো কাজ কোনো ব্যক্তির বা সমাজের সমর্থনের কারণে নয় বরং এর অন্তর্নিহিত গুণের কারণেই ভালো হয়ে থাকে। ইসলামী নীতিদর্শনের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে এই বস্তুনিষ্ঠতা পূর্ণভাবে দৃশ্যমান হয়। এখানে আত্মনিষ্ঠতার বিষয়ও রয়েছে যা আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে। কারণ, যদি ব্যক্তির কাজের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে যথার্থ মানসিক প্রশান্তি আসে না। নৈতিক পূর্ণতা বা সর্বোচ্চ প্রগতি হিসেবেও এর প্রয়োজন আছে। এজন্যই আল গাযালী নৈতিকতাকে সংজ্ঞায়িত করেন বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সৃষ্টিকারী স্বভাব হিসেবে।

আদর্শনিষ্ঠ নীতিদর্শন হিসেবে ইসলামী নীতিদর্শনের মূল আদর্শ এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। প্রতিটি ভালো কাজের কেন্দ্রবিন্দু একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ এবং একই সাথে মন্দ কাজ বর্জনের উদ্দেশ্য তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া। খ্রিষ্টীয় নীতিদর্শনেও ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জন মূল আদর্শ। তবে একমাত্র ইসলামে একেশ্বরবাদের ধারণা সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই পার্থিব ও অপার্থিব সুখ অর্জিত হয়। ইসলামী নীতিদর্শন তাত্ত্বিকভাবে আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস-কেন্দ্রিক। এই বিশ্বাস কেবল স্বীকার্য সত্য নয়, বরং এটি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ থেকে কেউ মুক্ত নয়- এমন দৃঢ় বিশ্বাস, যা একজন মানুষের নৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। আবার পরকালে জবাবদিহিতার অনুভূতি তাকে প্রতিটি কাজ দায়িত্ব-সচেতন থেকে ও সততার সাথে করতে প্রেরণা যোগায়। কুরআন মানুষকে তার ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় না, বরং বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উন্নত নৈতিক জীবনের আদর্শ উপস্থাপন করে বলেছে, যারা এর অনুসরণ করেছে তারা পৃথিবীতে সুন্দর ও সফলতার শীর্ষে উঠেছে আর যারা দাম্ভিকতা, অবিচার ও অনৈতিক কাজ করেছে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।[১৭]

অন্যান্য নীতিদর্শনেও নৈতিকতার আদর্শ নিয়ে আলোচনা এসেছে। তবে প্রধানত সুখবাদ, বুদ্ধিবাদ ও পূর্ণতাবাদ পৃথক আদর্শকে ধারণ করে নীতিবিদ্যার আলোচনা করে। প্রাচীন গ্রিসের এরিস্টিপাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩৫-৩৫৬) ছিলেন সিরিনিকবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন; কিন্তু সক্রেটিসের আদর্শ ও শিক্ষা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে ফেলেন। তাঁর মত ছিল, সুখই জীবনের লক্ষ্য। এখান থেকেই পরবর্তীতে এপিকিউরিয়ানবাদের সূচনা ঘটে, যার আধুনিক রূপ হচ্ছে সুখবাদ এবং বর্তমানে উপযোগবাদ। সুখবাদ গোড়া থেকে আত্মবাদী হলেও পরার্থবাদী রূপও ধারণ করে, যা উপযোগবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। এপিকিউরাস, হবস, নীটশে, ফ্রয়েড প্রমুখ আত্মবাদী সুখবাদের প্রধান সমর্থক। এটি মূলত মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের মতে, মানুষ বস্তুকে পাওয়ার জন্য বস্তু কামনা করে না বরং সুখের জন্যই তা কামনা করে। সুখই তার সমগ্র আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই নিজের সুখ চায়, এমনকি সে যখন অন্যের উপকার বা সুখের জন্য কাজ করে তখনও সে মূলত নিজের সুখের জন্যই তা করে।

অন্যদিকে পরার্থবাদী সুখবাদের ভিত্তিও মনস্তত্ত্ব, কিন্তু জে. এস. মিল সেটির ব্যাখ্যা করেন এভাবে, "প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সুখ তার কাছে ভালো আর সে জন্য সর্বসাধারণের সুখ সবার জন্য ভালো।"[১৮] বেনথাম ও মিলের মাধ্যমে উপস্থাপিত এই উপযোগবাদ বর্তমান পাশ্চাত্যের একটি গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় মতবাদ। উপযোগবাদীগণ বিভিন্নভাবে তাঁদের এই মতবাদকে উদার ও গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন এবং সমালোচকদের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মতবাদ সবার কল্যাণে সমান ভূমিকা রাখতে পারছে না। ব্র্যাডলি বলেন, "আনন্দ ও বেদনা হচ্ছে অনুভূতি; এবং অনুভূতি ছাড়া এগুলো কিছুই নয়; অর্থাৎ নৈতিকতার মানদণ্ড আনন্দ বা বেদনা হতে পারে না।"[১৯]

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশাতেই ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করার কাজ শুরু হয়ে যায়। তবে এসময় কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা, হাদীস ও ইসলামী আইনশাস্ত্র বা ফিকহের সুনির্দিষ্ট আলোচনা হয় আবদুল্লাহ ইবন উমর, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাসসহ সাহাবীদের একটি বড় গ্রুপের মাধ্যমে। চারজন খলীফার মধ্যে হযরত আলীর (রা.) জ্ঞানগর্ভ উক্তি, কাব্য-চর্চা, তাত্ত্বিক জ্ঞানের আলোচনা তাঁর রচনা হিসেবে খ্যাত *নাহজুল বালাগা* গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য সংকলন *দিওয়ানে আলী* বিভিন্ন উপদেশমূলক বক্তব্যের কারণে উচ্চমানের সাহিত্য হিসেবেও পরিচিত। মহানবী (স.) নিজেও তাঁর সাহস ও জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। মহানবীর ওফাতের (৬৩২ খ্রি.) পর খুব দ্রুত বিশ্বব্যাপী ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন ভাষার মানুষের নিকট তাদের পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামের নৈতিক বাণী প্রচার করা হয়। এ সময় নতুন জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামী জগতের জন্য বেশি প্রয়োজন ছিল ফিকহ বা আইন শাস্ত্রের। ইমাম আবু হানীফা (৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.) সেই ধারার সূচনা করেন এবং আইনশাস্ত্রই তখন নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, হাসান বসরীকে (৬৪২-৭২৮ খ্রি.) সাহাবী-পরবর্তী যুগে ইসলামী মরমী ধারা ও নীতিদর্শনের প্রথম শিক্ষক হিসেবে গণ্য করা হয়, যিনি মদীনায় মহানবী (সা.)এর গৃহে লালিত পালিত হয়েছেন এবং হযরত আয়িশা (রা.)সহ বেশ কিছু সাহাবীর মাধ্যমে, বিশেষত হযরত আলী (রা.) এর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে ইসলামের মৌলিক ও গভীর জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তাঁরই একজন ছাত্র ওয়াসিল বিন আতা (মৃ. ৭৪৮ খ্রি.) থেকে মু'তাযিলা ধারার ও সেটির প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবার তাঁর মতবাদের শিষ্য আবুল হাসান আশআরী (মৃ. ৯৩৫ খ্রি.) মু'তাযিলা মত পরিহার করে আশআরীয় ধর্মতাত্ত্বিক ধারার সূচনা করেন। কুরআনের নৈতিক দিকনির্দেশনার আলোকে মহানবী (স.) একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করলেও এর নৈতিক তত্ত্বগুলো সুশৃঙ্খল আকারে রূপ নিতে শত বছর লেগে যায়। বলা হয়ে থাকে, মু'তাযিলাগণই প্রথম কুরআনের "ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের"- মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী

নীতিদর্শনের সূচনা করেন।[২০]পরবর্তীতে মুহাম্মদ মিসকাওয়া (মৃ. ১০৩৪ খ্রি.) *তাহযীবুল আখলাক* গ্রন্থটি রচনা করলে ইসলামী নীতিদর্শনের প্রথম স্বার্থক রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

মু'তাযিলাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন আবুল হুদাইল (মৃ. ৮৪৯ খ্রি.), নাজজাম (মৃ. ৮৪৫ খ্রি.) এবং সর্বশেষ খ্যাতিমান প্রতিনিধি আবদুল জাব্বার (মৃ. ১০২৫ খ্রি.)। অন্যদিকে আশআরীয় ধারায় প্রসিদ্ধ ছিলেন স্বয়ং আবুল হাসান আশআরী, বাকিল্লানী (মৃ. ১০১৩ খ্রি.), আল বাগদাদী (মৃ. ১০৩৭ খ্রি.), জুয়াইনী (মৃ. ১০৬৪ খ্রি.), আল গাযালী (মৃ. ১১১১ খ্রি.), ফখরুদ্দীন রাযী (মৃ. ১২০৯ খ্রি.) প্রমুখ। ধর্মতাত্ত্বিক ধারার সাথে আরেকটি ধারা ছিল দার্শনিক ধারা যাঁরা গ্রিক দর্শনের সমন্বয়ে কুরআনের বিভিন্ন দার্শনিক ও নীতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মধ্যে আছেন আল কিন্দী (মৃ. ৮৬৬ খ্রি.), আল রাযী (মৃ. ৯২৫ খ্রি.), আল ফারাবী (মৃ. ৯৫০ খ্রি.), মিসকাওয়া (মৃ. ১০৩০ খ্রি.), ইবন সীনা (মৃ. ১০৩৭ খ্রি.), নাসিরুদ্দীন তুসী (মৃ. ১২৭৪ খ্রি.), জালালুদ্দীন দাওয়ানী (মৃ. ১৫০১ খ্রি.) প্রমুখ। উপমহাদেশের এক ক্রান্তিকালে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (মৃ. ১৭৬৪ খ্রি.) এর সংস্কার আন্দোলন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও নীতিদর্শনের উপর তাঁর আলোচনা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। সাম্প্রতিক কালের মিশরীয় দার্শনিক আবদুল্লাহ দারাজ (মৃ. ১৯৫৮ খ্রি.), জর্জ ফাদলু হরানি (১৯১৩-১৯৮৪ খ্রি.), এম. উমারুদ্দীন প্রমুখ আধুনিক দর্শনের সাথে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী নীতিদর্শনের নতুন সংস্করণ উপস্থাপন করেন।

ইসলামী নীতিদর্শনের সূচনাবিন্দু: শুভ কাজের আদেশ ও অশুভ কাজে নিষেধ

কুরআন প্রথমত দুটি শব্দের মাধ্যমে শুভ ও অশুভকে নির্দেশ করেছে: *মারূফ* ও *মুনকার*। শব্দ দুটির মূল অর্থ জানা ও অজানা। অর্থাৎ শুভ কাজ হচ্ছে এমন কাজ যা সবার নিকট স্বাভাবিকভাবে পরিচিত ও স্বীকৃত এবং অশুভ কাজ হচ্ছে যা স্বাভাবিকভাবে অপরিচিত।[২১] এ দুটি শব্দের মাধ্যমেই কুরআনি নীতিদর্শনের মূলনীতি *"আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার"* (শুভ কাজের আদেশ ও অশুভ কাজে নিষেধ) ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআনের এই মূলনীতি মু'তাযিলাদের প্রধান পাঁচটি মূলনীতির একটি ছিল। আইনগত দৃষ্টিতে এই কাজকে তাঁরা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় বা ফরজ-ই-আইন বলেছেন। অন্যদিকে আশআরীয়গণ এটিকে ফরজ-ই-কিফায়া বলেছেন। কুরআন ও হাদীসে এটিকেই আল্লাহর সব নবী ও তাঁদের অনুসারীদের প্রথম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কুরআনে এসেছে,

> তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে।[২২]

ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধের এই বিধান সর্বজনীন নৈতিক বিধান। কুরআন নাযিলের আগেও সব সমাজেই এর প্রচলন কম-বেশি ছিল। কিন্তু ইসলাম এটিকে এমন এক উচ্চ মার্গে নিয়ে যায় যে, আসলে এটি ছাড়া ইসলামই সম্ভব নয়। এর অর্থ নিজে ভালো থাকা এবং অন্যকে ভালো রাখার চেষ্টা করা। সূরা *আল-আসর*-এ এই বিষয়টিকে চারটি কাজের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে: আল্লাহর উপর বিশ্বাস, ভালো

কাজ করা, অন্যকে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া এবং বিপদে ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া। এই চারটি কাজ যে করবে না তাকে মহা বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহানবী (স.) বিভিন্নভাবে তাঁর উম্মতকে এই কাজ করতে নির্দেশ করেন। বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়ে তিনি মূলত অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায় কাজের বাস্তবায়নেরই চেষ্টা করেছেন। বুখারী মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন,

> তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় করতে দেখে সে যেন তার শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করে, তা না পারলে সে যেন কথার মাধ্যমে প্রতিহত করে, সেটিও না পারলে যেন অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে, আর এটিই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল প্রকাশ।[২৩]

অর্থাৎ নিজে একাকী ইবাদতমূলক বিভিন্ন কাজে রাত দিন কাটিয়ে দেওয়ার পরও সে ব্যক্তি ঈমানদারই হতে পারবে না, যদি সমাজের বিভিন্ন অপরাধ প্রতিহত করার ব্যাপারে তার কোনো পদক্ষেপ না থাকে। রাষ্ট্রক্ষমতা থাকলে এ কাজ বাস্তবায়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সেটি সম্ভব না হলে মুখে উপদেশ দিয়ে, নিন্দা করে তা প্রতিহত করতে হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা থাকলেও একাজ বন্ধ করা যায় না, বরং চিরন্তনভাবে চলবে। 'অন্তর দিয়ে প্রতিহত করার' অর্থ কেউ কেউ অন্তর দিয়ে ঘৃণার কথা বলেন, কিন্তু কথাটি ব্যাপক; ঘৃণা একটি মাধ্যম, যাকে বলা যায় শুরু। অন্তর দিয়ে চিন্তা করা, বিকল্প পথ খোঁজা, গবেষণা করে উপায় আবিষ্কার করা, আল্লাহর কাছে দো'আ করা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। এটিকে ঈমানের দুর্বলতম স্তর বলা হয়েছে। মূলত অন্যায় প্রতিরোধের এ কাজ থেকে বিরত থাকা মানে সমাজকে ধ্বংসের পথে ছেড়ে দেওয়া। আবার মানুষের সামনে এটি উপস্থাপনের আগে নিজেকে সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। "তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ কর আর নিজেদের ভুলে যাও?"[২৪] এটিকে বিভিন্ন স্থানে খুব বড় অপরাধ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যায় কাজে নিজেদের লিপ্ত থাকারও যেমন সুযোগ নেই তেমনি অন্যকে উপদেশ দেওয়ার এই কাজও বন্ধ করা যাবে না। মহানবী (স.) বলেছেন,

> তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে। তা না হলে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের শাস্তি দেবেন। তোমরা তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে কিন্তু আল্লাহ সেটি কবুল করবেন না।[২৫]

নিজে ভালো কাজ করা ও অন্যদেরকে সে পথে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই কেবল একটি সমাজ ত্রুটিমুক্ত হতে পারে। প্রতিটি মানুষই ভালো-মন্দের নৈতিক অনুভূতি নিয়ে জন্ম নেয়। সুতরাং কমপক্ষে নিজের সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হলেও ভালো কাজের প্রতিষ্ঠা ও মন্দকাজের প্রতিরোধ করা পিতা-মাতার কর্তব্য। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা সবাই দায়িত্বশীল, প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে"- এটিও প্রমাণ করে এ কাজ সবার জন্য অবশ্যই করণীয় কাজ। মহানবী (স.) মানুষকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন করেছেন। মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দায়িত্বের আমানত লাভ করেছে সেটির প্রধান অংশই হচ্ছে শুভ কাজের আদেশ ও বাস্তবায়ন এবং অশুভ কাজ নিষেধ করা ও বাধা দেওয়া। সুতরাং

এই কাজটি প্রত্যেকের জন্য করণীয় কাজ। কুরআনে আরো এসেছে, "যদি তোমরা আল্লাহর পথে বের না হও তাহলে, আল্লাহ কঠোর পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন" (৯: ৩৯)। আল গাযালী এজন্যই বলেন,

> এ কাজের জন্যই আল্লাহ তা'আলা সব নবী-রাসূলকে দুনিয়ায় পাঠান। যদি এর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত, তাহলে নবুওয়াত ও রিসালাত নিরর্থক হত, দীন বিলুপ্ত হত, আলস্য ব্যাপকতর হত, ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা চরম আকার ধারণ করত, অজ্ঞতা ও মূর্খতায় দুনিয়া পূর্ণ হয়ে যেত; ফেতনা ও ফাসাদে সারাদেশ আচ্ছন্ন হয়ে যেত।[২৬]

অর্থাৎ নৈতিকতার এই মূল সূত্র বা নির্দেশ মুসলিম সমাজের জন্য এক আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মানব সমাজের ক্রমবিকাশে ভালো কাজের যেমন বিভিন্ন ধরন পরিবর্তিত হয়েছে, খারাপ কাজও বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেছে। কিন্তু কুরআনের এই তাত্ত্বিক নীতি থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কোন কাজটিকে সমর্থন করা যায় এবং কোন কাজটি প্রতিহত করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভালো কাজ সমূহের মধ্যে রয়েছে: মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও সহজীকরণে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার, জ্ঞানের বিস্তার ও আন্তর্জাতিকীকরণ, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র কাঠামোতে বিভিন্ন স্তর ও পদের সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তায় বিভিন্ন ধরনের বাহিনী সৃষ্টি ও প্রযুক্তির ব্যবহার, চিকিৎসা ব্যবস্থায় হাসপাতাল ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন, আইনি সুবিচার পাওয়ার জন্য মানুষের দোরগোড়ায় সহযোগিতা ইত্যাদি। আধুনিক একটি রাষ্ট্রে সাধারণত এসব বা এর চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা নাগরিকগণ পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে খারাপ কাজেও ঘটেছে নতুন সংযোজন; যেমন, দুর্নীতি, বিভিন্ন ধরনের যৌন অপরাধের বিস্তৃতি, খাদ্যপণ্যসহ বিভিন্ন দ্রব্যে ভেজালের মিশ্রণ, বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড ও গুম, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, কিশোর অপরাধের বিস্তৃতি ইত্যাদি। এসব অপরাধ কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের নয়, বরং প্রতিটি রাষ্ট্রেই কম বেশি ঘটছে।

কুরআনের এই নীতি মানুষের ভালো কাজ বাস্তবায়নে যেমন সাহায্য করে তেমনি খারাপ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সমাজ জীবনকে সুন্দর রাখার জন্য শুধু মূলনীতি নয় কীভাবে তা মানুষের মধ্যে নৈতিকভাবে কার্যকর করা যায় সেটির বাস্তব ও ব্যবহারিক পন্থাও কুরআনে আছে। কুরআন প্রথমত, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটাতে চায়। এজন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় এবং রমযান মাসের রোযা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে সৎ লোকদের সাহচর্য। মানুষ একাকী ভালো হতে পারে না এবং থাকতেও পারে না। মানবসমাজের প্রতিটি ভালোকে কুরআন গ্রহণ করে এবং এগুলোর আরো উন্নয়নে সাহায্য করে। আবার খারাপ কাজগুলোকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে চায়, কোনো বিশেষ স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় না।

শুভ ও অশুভের ধারণা

নৈতিকতার মূল কথা হচ্ছে শুভ ও অশুভকে মানুষের আচরণে যুক্ত করে তার মূল্যায়ন। কিন্তু শুভ বা ভালো বলতে আসলে কী বোঝায়? এ বিষয়ে নীতিদর্শনে ব্যাপক আলোচনা এসেছে। কুরআনে ভালো ও মন্দকে প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ভালো অর্থে *মা'রূফ*, *হাসান*, *সলিহ*, *খাইর*, *বির*; মন্দ অর্থে *মুনকার*, *সূ*, *শার* প্রভৃতি। এগুলোর প্রতিটির অর্থে ভিন্নতা থাকলেও মূলত নৈতিক শুভ ও অশুভকে প্রকাশ করার জন্যই শব্দগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। মহানবী (স.)কে ভালো কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

> যে কাজে তোমার মন স্থিতি লাভ করে এবং যে কাজে হৃদয় ও বিবেক নিশ্চিন্ততা লাভ করে তাই পূণ্য কাজ। আর যে কাজে মন স্থিরতা পায় না এবং অন্তর নিশ্চিন্ত হতে পারে না তাই হচ্ছে পাপ বা মন্দ।[২৭]
>
> নাওয়াস ইবন সাম'আন আল-আনসারী (রা.) বলেন, "একদা আমি রাসূল (স.)কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম"। তিনি বললেন, "নেকী হল উত্তম চরিত্র আর পাপ হল যে কাজ তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে এবং ঐ কাজটি তুমি জনসমাজে প্রকাশ হওয়া অপছন্দ কর"।[২৮]

মহানবী (স.) এর এই দুটি কথায় ভালো মন্দের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো ও মন্দের উপলব্ধি করতে চায় তাহলে তার পক্ষে সঠিক কাজ খুঁজে বের করা সম্ভব। তবে যাদের বিবেক বা অন্তর মৃত হয়ে যায় তাদের কথা ভিন্ন। কুরআন তাদের প্রসঙ্গে বলেছে, "... তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বুঝতে পারে না, এরা পশুর মত, বরং তার চেয়েও পথহারা"।[২৯]

কুরআনে ভালো ও মন্দের যে বিবরণ এসেছে সেগুলোর মূল মানদণ্ড কী হবে– আল্লাহ আদেশ করেছেন সেজন্য ভালো, না কি সেগুলোর বস্তুনিষ্ঠ মূল্য আছে- এ নিয়ে মু'তাযিলা ও আশআরীয়দের মধ্যে অনেক বিতর্ক হয়। মু'তাযিলাগণ ভালো ও মন্দের সংজ্ঞা দেন বস্তুনিষ্ঠতার দৃষ্টিকোণ থেকে। ভালো হচ্ছে, "যার কারণে কর্তা নিন্দার যোগ্য হবে না।"[৩০] অর্থাৎ যে কাজ নিন্দনীয় সেটি ভালো নয়, বরং যা প্রশংসনীয় তাই হচ্ছে ভালো। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে, কার নিকট নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয়?–নিশ্চয়ই সমাজের বা সমাজের সদস্যদের কারো মাধ্যমে নিন্দা বা প্রশংসা হবে। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠতাও আসলে ব্যক্তি বা সমাজের মাধ্যমেই নিরুপণ হয়ে থাকে। ভালোর ভিত্তি হিসেবে তাঁরা চারটি বিষয়ের কথা বলেন: সুবিচার, উপকার, সত্যবাদিতা ও ভালোর ইচ্ছা। আশআরীয়দের মধ্যে, আল জুয়াইনি মু'তাযিলাদের বস্তুনিষ্ঠতার যুক্তি খণ্ডন করেন। হত্যা নিজস্ব সারসত্তার কারণে যদি অন্যায় হয় তাহলে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে আইনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটা অন্যায় হত। একটি শিশুর যে কাজে দায় মুক্তি, একই কাজে একজন বয়স্ক ব্যক্তি দায়ী হতে পারে। এভাবে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা অন্যায় নয় যদি অনুমতি থাকে, আল্লাহর জন্য মাথা নত করা ভালো কিন্তু শয়তানের জন্য নত করা অত্যন্ত খারাপ। আবার ব্যথা ভালো যদি এর উপকার বেশি হয়, কিন্তু

কম হলে খারাপ। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ ভালো বলতে কিছু নেই, বরং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর মূল্য পরিবর্তিত হতে পারে। আর প্রজ্ঞার মাধ্যমে কোনো কিছুর চূড়ান্ত মূল্য নির্ণয় করা যায় না, বরং আল্লাহর বাণীই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে।[৩১]

আবার আল গাযালী মু'তাযিলাদের কিছু অশুভ গুণের ধারণার স্বতঃমূল্যের সমর্থন করেন। যেমন, মিথ্যা, কুফর, অজ্ঞতা। কিন্তু সর্বজনীনতা নিয়ে তাঁর প্রশ্ন ছিল। যেমন, মিথ্যা কিছু ক্ষেত্রে বৈধ। আল্লাহর কৃতজ্ঞতাকে মু'তাযিলাগণ প্রজ্ঞাসম্মত আবশ্যকীয় ভালো কাজ বলেন। যেমন, প্রজ্ঞার দাবি হচ্ছে, উপকারীর উপকার স্বীকার করা আবশ্যকীয় শুভ। কিন্তু গাযালী বলেন, যা না মানলে আল্লাহ শাস্তির কথা বলেছেন সেটি করাই শুভ। আল্লাহর কোনো অভাব নেই, সমস্ত অভাব থেকে তিনি মুক্ত। আমাদের প্রয়োজনেই তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। মানুষ আল্লাহকে নৈতিক সীমা দিয়ে দেবে তা থেকে আল্লাহ মুক্ত, কারণ তিনি সমগ্র জগতের প্রভু, তিনি কারো অধীন নন।[৩২] আশআরীয় চিন্তাধারায় ভালো এর সংজ্ঞা হচ্ছে, "যা পার্থিব ও পরকালীন লক্ষ্য বাস্তবায়নে উপযোগী এবং একই সাথে আল্লাহ যা করার অনুমোদন দেন।"[৩৩]এর অর্থ আল্লাহর সব কাজকে ভালো বলা হয়, যদিও এসব কাজে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নেই। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ক্ষমতার প্রকাশের জন্য এবং তাঁর ইচ্ছাকে আমাদের উপলব্ধির জন্য। এসব উদ্দেশ্যে তাঁর কোনো স্বার্থ বা উপকার নেই। অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁর কাজে 'ভালো'কে প্রয়োগ করা যায় না। অন্যদিকে, মন্দকে আশআরীয়গণ ভালোর বিপরীত হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ যা মানুষের পার্থিব ও পরকালীন লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক ও আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত তাই মন্দ। মন্দ সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত এবং কোনো অর্থেই মন্দকে আল্লাহর সাথে যুক্ত করা যায় না। কারণ, অন্যের সম্পদকে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার মাধ্যমে মন্দের প্রকাশ ঘটে। আল্লাহ এ জগতের সব কিছুর মালিক, তাঁর অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করার প্রশ্নই আসে না। অর্থাৎ আল্লাহ কখনো মন্দ করতে পারেন না এবং মন্দ আদেশও করতে পারেন না। আশআরীয় ও মু'তাযিলাদের এই ধারণাকেই যথাক্রমে আত্মনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠতার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে ইবন রুশদ মনে করেন, কুরআন আত্মনিষ্ঠ বা বস্তুনিষ্ঠ কোনোটির ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেয়নি, তাই বস্তুনিষ্ঠ মূল্যকে অস্বীকার করলে কেউ কাফের হয়ে যাবে না।[৩৪]

সমকালীন চিন্তাবিদদের মধ্যে আবদুল্লাহ দারাজ কুরআনি নৈতিক আইনের বিশ্বজনীনতা ও বস্তুনিষ্ঠতার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর মতে,

> ...এতে আছে অনস্বীকার্য স্পষ্টতা, যা কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য; এর সুবিচারের বা সদগুণের ধারণা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি সবার জন্য প্রযোজ্য- কোনো আত্মীয় বা পথিক, ধনী বা দরিদ্র, অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক, বন্ধু কিংবা শত্রু সবার জন্য একই বিধান।[৩৫]

অর্থাৎ কুরআনের বিধানগুলো এতই বস্তুনিষ্ঠ ও সর্বজনীন যে, যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সহজেই তা প্রমাণ করা যায়। নিজ দেশের ক্ষেত্রে এক বিধান অন্য দেশের সাথে হলে অন্য বিধান, বন্ধুর সাথে এক রকম শত্রুর সাথে ভিন্ন আচরণ এমন নয়, বরং ধর্ম, বর্ণ, দেশ সীমা সব কিছু অতিক্রম করে সমগ্র মানব জাতির

নিকট এর সমান দৃষ্টি। তিনি আরো বলেন, এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য এটিকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না, বরং মানুষ সম্পূর্ণভাবে এর বিধান বাস্তবায়ন করতে সক্ষম।[৩৬] অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে যে সব সদগুণ অর্জনের কথা বলা হয়েছে তা সব যুগের সব মানুষ সহজে অনুসরণ করতে পারে।

ইসলামী নৈতিকতার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি

জ্ঞানতত্ত্ব হচ্ছে দর্শনের মৌলিক একটি শাখা যেখানে, জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ, বিষয়বস্তু, সত্যতা, বৈধতা, প্রমাণ প্রভৃতির আলোচনা করে। নৈতিক জ্ঞান যেহেতু জ্ঞানেরই একটি শাখা তাই এর উৎপত্তি, সত্যতা ও বৈধতার প্রমাণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। একবিংশ শতকের একজন আধুনিক মানুষ নৈতিকতাসহ জীবনের যে কোনো বিষয়কে যুক্তিপ্রমাণসহ বিশ্বাস করতে চান। পবিত্র কুরআন 'সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্কের' (১৬: ১২৫) মাধ্যমে মানব সমাজের নৈতিকতা ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানে '*হুজ্জাতুন বালিগাতুন*' বা পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ (৬: ১৪৯) প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রাচীনকাল থেকেই দর্শন জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা করে। নীতিদর্শনের ক্ষেত্রেও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, খোদ যুক্তি নিয়েই যখন দার্শনিকগণ সন্দেহ পোষণ করেন তখন চিন্তার মূল সূত্র আমরা কোথায় পাব? দার্শনিকদের মধ্যে এরিস্টটলের অবরোহ অনুমান বা সহানুমান নিয়ে প্রশ্ন ছিল অনেক আগে থেকেই। ফ্রান্সিস বেকনের আগে মুসলিম দার্শনিকগণ এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন। এর বিপরীতে আরোহ অনুমানকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে কার্যকরী যুক্তি প্রক্রিয়া হিসেবে ইবনে সীনা, আল গাযালী এবং আধুনিক যুক্তিবিদগণ প্রাধান্য দেন। কিন্তু গভীরভাবে তাকালে দেখা যায় আরোহ অনুমানও এক অর্থে অবরোহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে পড়ে। কারণ, আরোহ অনুমান কার্যকারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়ামানুবর্তিতা নীতির মত স্বীকার্য সত্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। অর্থাৎ অবরোহ যেমন স্বীকার্য সত্যের উপর নির্ভরশীল তেমনি আরোহেও তার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রাচীন গ্রিসের পিরো, আধুনিক যুগের হিউম এবং সর্বশেষ বার্ট্রান্ড রাসেলসহ দার্শনিকদের একটি শ্রেণি সব যুক্তি প্রক্রিয়াকেই এ কারণে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্ঞানের জগতে এ ধরনের সন্দেহবাদ ইতিবাচক। এতে সত্য অনুসন্ধানে দার্শনিকদেরকে আরো তৎপর করে।

তবে জ্ঞানতত্ত্বে সন্দেহ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা যায় না, বরং এতে অস্বস্তি বৃদ্ধি পায়। সি. এস. পার্স বিষয়টির সমাধান দিতে চেষ্টা করেন। তাঁর মতে,

> সংশয় হচ্ছে একটা অস্বস্তিকর ও অসন্তোষজনক অবস্থা, যার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা একটা বিশ্বাস অবস্থায় পৌঁছুতে চাই। মূলত সংশয়জনিত উত্তেজনাই বিশ্বাসে পৌঁছানোর প্রচেষ্টার পেছনে একমাত্র তাৎক্ষণিক তাড়না হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ অনুসন্ধানের সূচনা সংশয় থেকে শুরু হলেও একটা মীমাংসায় পৌঁছানোই তার মূল লক্ষ্য।[৩৭]

তিনি নিজে এবং প্রয়োগবাদী দর্শনও এধরনের মীমাংসার সমর্থক। যদিও তাঁরা অধিবিদ্যাবিদগণের স্বীকার্য সত্যকে বা কান্টের অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্বাসকে সহজে মানতে চান না, তথাপি একটা বিশ্বাসে উপনীত না হয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া যে কঠিন ব্যাপার তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নীতিদর্শনের যুক্তি বা অবধারণ গঠনের পেছনে পূর্বানুমান খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পিটার সিঙ্গারের মন্তব্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর মতে,

> আমরা কেন নৈতিকভাবে কাজ করব- এটি এমন এক প্রশ্ন যাকে চূড়ান্ত দার্শনিক প্রশ্ন হিসেবে প্রায়শ অভিহিত করা যায় এবং সাধারণভাবে এটি কোনো কিছুর পূর্ব অনুমান করে নেয়। এক্ষেত্রে পূর্ব অনুমানের ধারণাটিকে বাতিল করলে আমাদের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি।[৩৮]

কিন্তু তিনি সেই পূর্ব অনুমান সুনির্দিষ্টভাবে কী হবে তা বলতে পারেননি, বলেছেন সকলকে নৈতিকভাবে কাজ করার জন্য প্রেরণাদায়ক কোনো উত্তর দেওয়া যায় না। আরোহ অনুমান ও অবরোহ অনুমান উভয় প্রক্রিয়াই পূর্ব ধারণার সাথে যুক্ত। অবরোহ অনুমানে সরাসরি একটি সার্বিক সত্যকে স্বীকার করার মাধ্যমে যুক্তি শৃঙ্খলা তৈরি করে। এখানে, আকারগত নিশ্চয়তা বেশি থাকে। যেমন,

> প্রধান আশ্রয়বাক্য: ইসলামী নীতিদর্শনের প্রতিটি ধারণা অত্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক। [স্বীকার্য সত্য]
>
> অপ্রধান আশ্রয়বাক্য: সত্যবাদিতার ধারণা ইসলামী নীতিদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।
>
> সিদ্ধান্ত: সুতরাং এটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ধারণা।

এখানে, যদি প্রধান আশ্রয়বাক্য হিসেবে প্রদত্ত বাক্যটিকে স্বীকার করা না হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। সমস্যাটা হচ্ছে, পূর্বেই যদি একটি সার্বিক বাক্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে পৃথকভাবে স্বীকার করার কী অর্থ থাকতে পারে? অর্থাৎ অবরোহের মাধ্যমে নতুন কোনো জ্ঞান উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। এটি আকারগতভাবে সত্য হতে পারে এবং এর সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রতিটি বাণীকে যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে পূর্বেই স্বীকার না করি, তাহলে আদৌ তা ইসলামী নীতিদর্শনের অবধারণ হবে না। এই অর্থে ইসলামী নীতিদর্শন অবরোহ যুক্তিভিত্তিক। অন্যদিকে আরোহ যুক্তিতে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন,

> আশ্রয়বাক্য ১: মানুষের সাথে সুবিচার সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।
>
> আশ্রয়বাক্য ২: প্রকৃতির সাথে সুবিচার প্রকৃতির জগতের কল্যাণ নিয়ে আসে।
>
> আশ্রয়বাক্য ৩: অর্থনীতিতে সুবিচার অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা নিয়ে আসে।
>
> আশ্রয়বাক্য ৪: সুবিচার প্রতিষ্ঠার কারণে কেউ বিপদগ্রস্ত হয় না।
>
> সিদ্ধান্ত: অতএব সুবিচারের ধারণা এক অনন্য ধারণা যা মানব সমাজ ও প্রকৃতির জগতের কল্যাণে সহায়ক।

এই অনুমানটিতে চারটি দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আরোহ অনুমানে আশ্রয়বাক্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যুক্তি শক্তিশালী হয়। একটি বিজ্ঞানভিত্তিক আরোহ প্রক্রিয়ায় সদর্থক ও নঞর্থক আশ্রয়বাক্য থাকে।

এখানে তাই আছে। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, এখানে প্রতিটি বাক্যকে সত্য হতে হয়। কিন্তু সত্য হতে হলে তাকে আবার প্রমাণিত হতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব থেকেই প্রমাণের সেই মানদণ্ড নির্ধারণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত আশ্রয়বাক্যগুলো হবে বাস্তব পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণিত এবং প্রকৃতির নিয়ম ও কার্যকারণ নিয়মের সাথে অনিবার্যভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে একটি আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত আকারগত ও বস্তুনিষ্ঠ সত্যতার নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু অবরোহের মতই এখানেও পূর্ব স্বীকৃত বা স্বীকার্য বিষয়ের প্রয়োজন। কুরআনের যুক্তি প্রক্রিয়ার সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দিয়ে বারবার দৃষ্টি ফেরাতে বলেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহর কথার সত্যতা যাচাই করতে বলেন। যেমন,

আশ্রয়বাক্য ১: যিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন; তুমি দৃষ্টি ফেরাও কোনো ফাটল দেখতে পাও কি?

আশ্রয়বাক্য ২: আবার দৃষ্টি ফেরাও; তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসবে,

সিদ্ধান্ত: অতএব, তাঁর সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি পাবে না।[৩৯]

যুক্তির আকারের জন্য কোনো বাক্যকে আগে পরে নেওয়া যায়। এটি দোষের কিছু নয়। সুস্পষ্টভাবে এটি একটি আরোহ যুক্তি। কারণ, এখানে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। এখন, এর আশ্রয়বাক্যগুলো সত্য কি না- তার প্রমাণের জন্য পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক ও অভিজ্ঞতানির্ভর বিজ্ঞানের এগিয়ে আসা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। হাজার বছরের গবেষণায় দেখা যায়, কুরআনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি বাক্যও মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং বলা যায় অন্য সব বাক্যও একসময় সত্য প্রমাণিত হবে, যেগুলো এখনো প্রমাণিত হয়নি। তাহলে, দেখা যাচ্ছে, কুরআনে অবরোহ ও আরোহ উভয় ধরনের যুক্তি রয়েছে।

ইকবাল তৃতীয় আরেকটি যুক্তির কথা বলেছেন, সেটি হচ্ছে মরমী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা। তিনি মনে করেন, আল্লাহকে আবিষ্কারের জন্য স্বচ্ছ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি প্রয়োজন, যার মূল হচ্ছে *কাশফ* বা স্বজ্ঞা।[৪০] অর্থাৎ গভীর অনুভূতির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হলে তাঁর আদেশের মর্ম অনুধাবন করা যায়। ইমানুয়েল কান্টও বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার মাধ্যমে আল্লাহ বা তাঁর বাণীকে সত্য প্রমাণের অসম্ভাব্যতার কথা বলেন। এজন্য তিনি নৈতিকতাকে রক্ষার স্বার্থে ব্যবহারিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে যুক্তি দাঁড় করেন আর ঈশ্বর, আত্মার অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হন এবং এগুলোকে নীতিবিদ্যার পূর্ব ধারণা বা স্বীকার্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে ইসলাম আরো ব্যাপক অর্থে এগুলোকে স্বীকার করেছে। নৈতিক অবধারণের জন্য ইসলাম পরাতাত্ত্বিক এসব ধারণার সাথে মানুষের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, বৌদ্ধিক ও পরিবেশগত সামর্থ্যকেও সামনে রাখে।

ইসলামী নীতিদর্শনের স্বীকার্য বিষয় তার নিজ পরিভাষায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের অনিবার্যতা। অর্থাৎ এখানে যে সব যৌক্তিক আলোচনা হবে সেগুলোর আকারগত ও বস্তুগত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে এই স্বীকার্য সত্যসমূহের মাধ্যমে।

স্বীকার্য সত্যসমূহ

কুরআন 'ঈমান' শব্দটিকে এক্ষেত্রে পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। শব্দটি 'আম্ন' ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ আত্মার প্রশান্তি ও নির্ভীকতা লাভ। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগতভাবে ঈমান শব্দের অর্থ দাঁড়ায় মনের ভেতর কোনো কথা গভীর প্রত্যয় ও সত্যতার সাথে এমনভাবে দৃঢ়মূল করে নেওয়া, যার বিপরীত কোনো ধারণাকে সঠিক বলে মেনে নিতে মন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। বিশ্বাস শব্দটি এই ব্যাপকতর অর্থ প্রকাশ না করলেও ঈমান এর প্রতিশব্দ হিসেবে এটিই পরিচিতি পেয়েছে। অন্যদিকে, ইংরেজি 'প্রিসাপোজিশ্ন' বা 'এক্সিওম' শব্দও প্রায় একই ভাব প্রকাশ করে, যেগুলোর প্রতিশব্দ 'পূর্বানুমান' বা 'স্বীকার্য সত্য'। কুরআনি নীতিদর্শন বা যে কোনো নীতিদর্শনের জন্যই অথবা যে কোনো যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার জন্যই কিছু স্বতঃসিদ্ধ বা নিয়মকে স্বীকার করে আলোচনা শুরু করতে হয়।[৪১]

ক. তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস

এটিই হচ্ছে ইসলামী নীতিদর্শনের সবচেয়ে মৌলিক স্বীকার্য বিষয়। বিশ্বজগতের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বজ্ঞানী, সব পূর্ণতার কেন্দ্র, নৈতিকতার পরম উৎস হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে স্বীকার করার নাম তাওহীদ। এই স্বীকৃতি ও দৃঢ়বিশ্বাস একজন ব্যক্তির জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। ইহুদী ও খ্রিষ্ট ধর্মে এক ঈশ্বরের ধারণা থাকলেও এই দুই ধর্মের বিদ্বানগণ ঈশ্বরকে নিজেদের ব্যাখ্যায় অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ করে ফেলেন। খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদী দর্শন অর্থাৎ একের মধ্যে তিন লুকায়িত নির্ভেজাল একত্ববাদের ধারণাকে যৌক্তিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। ইসলাম এসব ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে একক চিরন্তন সত্তা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করার নির্দেশ দেয়। এর ফল মানব জীবনে নৈতিকতার চূড়ান্ত আশ্রয় হিসেবে আল্লাহর সমর্থন পাওয়া যায়।

কীভাবে একেশ্বরে বিশ্বাস মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে কুরআন বিভিন্ন স্থানে তার বিবরণ দিয়েছে। যেমন,

> তারা লোকদের কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে; কিন্তু, আল্লাহর কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে না, আল্লাহ তখনো তাদের সাথে থাকেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে রাতের বেলায় কথা-বার্তা বলে। তারা যা কিছুই করে আল্লাহ সবকিছুর উপর পরিবেষ্টনকারী।[৪২]

তিনি দৃষ্টির আড়ালে কিন্তু সবকিছু তাঁর সামনে। অর্থাৎ কেউ কোনো ভালো কাজ গোপনে করলে সেটা আল্লাহর কাছে অজ্ঞাত থাকে না আবার অন্যায় করলেও সেটি গোপন থাকে না। শুধু তাই নয় তিনি অণু পরিমাণ কাজেরও হিসেব নেবেন।

তবে কুরআন আল্লাহকে উপস্থাপন করেছে মানুষের গভীরতর ভালোবাসার দৃষ্টিতে, যেখানে সব সময় তিনি সাড়া দেন ও মানুষের আবেগ, প্রার্থনা ও আশা পূরণ করেন।

> আমার বান্দারা তোমার কাছে যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, "আমি অতি নিকটে; যখন কেউ আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই"।[৪৩]
>
> বল কে নিঃস্ব অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে আর কষ্ট দূর করে দেন? আল্লাহর সমকক্ষ আর কেউ কি আছে? তোমরা খুব কম উপদেশ গ্রহণ কর।[৪৪]

আবার যখন কেউ কোনো পাপের কাজ করে তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তিনি তাতে খুশি হয়ে তার পাপ মোচন করে দেন।

> যে কোনো মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর যুলম করে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে তখন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবে পায়।[৪৫]
>
> বলে দাও, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের উপর যুলম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।[৪৬]

আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মাধ্যমে জানা যায়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন, তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে চলার ক্ষমতা এই বিশ্বজগতের কারো নেই। মৃত্তিকার গভীর অন্ধাকারে কী আছে, মহাসমুদ্রের তলদেশের একটি ক্ষুদ্র প্রাণী বা জড়, মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান কোনো কণিকা বা অণুজীব কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নেই।

> তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না; জলে-স্থলে যা আছে সব তিনি জানেন, এমনকি মাটিতে একটি পাতা পড়লেও তাঁর অজানা থাকে না, মৃত্তিকার গভীর অন্ধকারে এমন কোনো দানা নেই এবং এমন কোনো শুষ্ক ও সিক্ত জিনিস নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।[৪৭]
>
> আসমান ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন কর আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন।[৪৮]

অর্থাৎ পার্থিব দৃষ্টিতে যত ভালো কাজই করা হোক না কেন তা কোন উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে- তাতে কোনো গোপন ইচ্ছা আছে কি না, সব তিনি জানেন। আবার কেউ খারাপ পরিকল্পনা করে অন্য কাউকে দিয়ে মানুষের ক্ষতি করে, অথচ সবাই জানে সে কখনো মানুষের ক্ষতি করে না- পার্থিব দৃষ্টিতে এধরনের ব্যক্তির অপরাধ যত মারাত্মক হোক না কেন তাকে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব নয় এমনকি ধর্মীয় দৃষ্টিতে তাকে খারাপ ধারণা করাও পাপ; আল্লাহ এ সমস্ত লোকের যথাযথ বিচার করবেন। নৈতিকতার জন্য এই বিশ্বাস বা জ্ঞান মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। আবার মানুষ যত সুরক্ষিত দূর্গেই থাকুক না কেন তিনি তাকে মুহূর্তের মধ্যে পাকড়াও করতে পারেন। "তোমরা যেখানেই থাক, মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই, এমনকি সুরক্ষিত দূর্গে থাকলেও"।[৪৯]মানুষকে সৃষ্টির পর তাঁর পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার পূর্ণমাত্রায়

তিনি হিসাব নেবেন। "এরপর তোমাদেরকে প্রতিটি নিয়ামতের ব্যাপারে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে;"(১০২: ৮)।

এই ধরনের বিশ্বাস একজন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারী হতে দেয় না। আল্লাহ সম্পর্কে কুরআনের এই ধারণা অন্যান্য মতবাদে অনুপস্থিত। অন্যরা বড় জোর বলতে পারেন একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বরের বা আদি কারণের প্রয়োজন আছে, যার মাধ্যমে জগতের সব কিছুর সৃষ্টি বা শুরু হয়েছে। কিন্তু তিনি যে শুধু চিন্তনের চিন্তন নন, অচালিত চালক নন বরং মহাবিশ্বের সবকিছু তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্বক্ষণিক পালন করছে কি না, যার যে দায়িত্ব রয়েছে সেগুলো অনুসরণ করছে কি না, সব সময় তিনি তা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করছেন- এটা সেসব ধারণায় অনুপস্থিত। তাই তাওহীদে বিশ্বাসই হচ্ছে একজন মানুষের বা একজন মুসলিমের নৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভিত্তি।

ইসলামী নীতিদর্শনে একেশ্বরে বিশ্বাসের উপজাত হিসেবে আল্লাহর ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাসের অপরিহার্যতাও বিদ্যমান। এর কারণ আল্লাহর একত্বে যেন কোনোভাবেই ভ্রান্ত-বিশ্বাস বা সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হতে না পারে। তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মে নানা রকম বর্ণনা আছে। কোনো ধর্মে তাদেরকে দেবতা বলা হয়েছে, কারো মতে তারা ঈশ্বরের সাহয্যকারী, আবার কেউ তাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান বলেছেন। কিন্তু ইসলামে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তাঁরা আল্লাহর দাস। আল্লাহ তাঁদের উপর যে দায়িত্ব দেন তাঁরা শুধু তাই করেন, কখনো তারা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করেন না।[৫০] মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য আল্লাহ তাদের ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন:

> যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে মানুষের আমলনামা গ্রহণ করে, সে যা উচ্চারণ করছে সাথে সাথে সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে।... প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে, তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী (ফেরেশতা)।[৫১]

আবার আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা বা নবী-রাসূলদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী আসত তার বাহকও ছিলেন ফেরেশতা। প্রাকৃতিক জগতে যে শৃঙ্খলা ও অলঙ্ঘনীয় নিয়মের রাজত্ব বিদ্যমান তা কীভাবে কার্যকর? এর উত্তরেও বলা যায় ফেরেশতারাই এগুলো আল্লাহর নির্দেশে বাস্তবায়ন করে থাকেন।

আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আরেকটি বিষয় জড়িত: অশুভের প্রতীক হিসেবে শয়তানের অস্তিত্বকে স্বীকার করা। শয়তানের স্রষ্টাও আল্লাহ। কিন্তু শয়তানকে আল্লাহ এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যার কারণে পৃথিবীর প্রথম মানুষকে সে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। শয়তান যখন আল্লাহর সাথে অহংকার করে চির অভিশপ্ত হয়ে পড়ে তখন থেকেই সে সব মানুষকে নিজের মত আল্লাহর অভিশপ্ত বানাতে চায়। কুরআনে আল্লাহ বলছেন,

> নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়। (৩৫: ৬)
>
> হে মুমিনগণ, তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২: ২০৮)

অর্থাৎ শয়তানকে আল্লাহ মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'তোমরা তার প্ররোচণা থেকে দূরে থাকো'। ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করতে শয়তানই মানুষকে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দেয়।

খ. রিসালাতে বিশ্বাস

মহানবী (স.)কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা ইসলামী নীতিদর্শনের মৌলিক স্বীকার্য সত্য। এই বিশ্বাসের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাকেঁ সমগ্র মানবজাতির জন্য উত্তম চরিত্রের এবং সর্বোচ্চ পূর্ণতার মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে"। [৫২] তবে এখানে শর্ত দেওয়া হয়েছে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করতে হবে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে অমুসলিমগণও স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর আদর্শকে ধারণ ও বিশ্লেষণের চেষ্টাও করছেন, যদিও তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নন। তাঁকে উচ্চতম মহান চরিত্রের অধিকারী বলে কুরআন ঘোষণা দিয়েছে।[৫৩]তিনি নিজেও বলেছেন, "উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি"।[৫৪] এ কারণেই মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী নৈতিকতার সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব তা উপলব্ধিতে কোনো সমস্যা হয় না।

আল্লাহ অদৃশ্য থেকেই তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন তাঁর নির্দেশনা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে এবং যেভাবে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর সেভাবে সমাজে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিতে। নবী-রাসূলগণ সরাসরি ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহর বাণীসমূহ শ্রবণ করে সেগুলো অন্তকরণে এবং লিখিত আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যান। নবীদের এই ধারাবাহিকতায় মুহাম্মদ (স.)ই হলেন সর্বশেষ। এই ধারা শেষ হলেও জাতির জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ তাঁদের উত্তরাধিকারী হয়ে সেসব বাণীর প্রচার ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। রিসালাত প্রসঙ্গে ইবন রুশদ বলেন,

> নবীর কাছ থেকে কখনো প্রজ্ঞা তিরোহিত হয় না। তাই সবচেয়ে সত্যকথা হচ্ছে- প্রত্যেক নবী এক একজন প্রজ্ঞাবান (হাকীম), কিন্তু সব প্রজ্ঞাবান নবী নন। কিন্তু নবীদের নৈতিক জ্ঞান সাধারণ বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ায় অর্জন সম্ভব নয়। একারণেই শরীয়ত শিক্ষার মাধ্যমে হয় না, বরং অহীর মাধ্যমে হয়।[৫৫]

অর্থাৎ নবুওয়াত বা রিসালাত ছাড়া শরীয়ত বা ঐশী বিধান সম্ভব নয়। নবী-রাসূলগণের মাধ্যমেই কেবল আমরা আল্লাহর আইন সম্পর্কে জানতে পারি। দার্শনিক ও নবীর সাথে তুলনায় আল-কিন্দী নবুওয়াত বা রিসালাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্যকে অধিকতর স্বচ্ছ, সমন্বিত ও নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেন। যদিও দার্শনিকের উদ্দেশ্যও নবীর মত সত্য উদঘাটন, কিন্তু তিনি নিজস্ব উপকরণ দিয়ে এবং অনেক জটিলতার ভেতর দিয়ে তা করতে সচেষ্ট হন। এজন্য তাঁর নিকট অর্জিত সত্য রিসালাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্যের মত নয়। সুতরাং রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া প্রকৃত ও বস্তুনিষ্ঠ সত্য অর্জন দুরুহ ব্যাপার।[৫৬] যারা রিসালাতকে বিশ্বাস করেন না বা এ সংক্রান্ত জ্ঞান রাখেন না তারা মূলত আল্লাহর নির্দেশনাকেই সন্দেহ করেন। যেমন, রুশো বলেছিলেন,

> সকল প্রকার ন্যায় ও নীতি খোদা থেকে আগত; কিন্তু আমরা যদি জানতাম যে কীভাবে সে স্বর্গীয় অবদান গ্রহণ করতে হয় তাহলে মানব সমাজে কোনো প্রকার শাসন ব্যবস্থা বা আইনের প্রয়োজন হত না।[৫৭]

প্রকৃতপক্ষে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে সেগুলো পেয়ে মানব জীবনকে সজ্জিত করতে চান। কিন্তু মানুষকে যেহেতু স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দেওয়া হয়েছে তাই মানুষ সেই স্বর্গীয় অবদানকে অনুসরণ করে নিজেদের অন্যান্য কাজে কর্মে সহজে প্রয়োগ করতে পারে অথবা সেটি নাও করতে পারে।

কুরআন মুহাম্মদ (স.)কে অনুসরণ একজন মুমিন হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় করে দিয়েছে। আল্লাহ যেহেতু মানুষকে ভালো-মন্দের ব্যাপারে পরীক্ষা নিতে চান তাই এ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কেউ যেন সঠিক পদ্ধতি জানা থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য নবী-রাসূলদের এই ধারাবাহিকতা। আল্লাহ এমন কোনো জনপদ সৃষ্টি করেননি, যেখানে কোনো সতর্ককারী আসেননি। মহানবী (স.) আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ সতর্ককারী ও নবী। তাঁর উপর সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআন নাযিল হয়। এই বিশ্বাসই হচ্ছে রিসালাতে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ছাড়া কুরআনি নীতিদর্শন শুরু হতে পারে না। ইকবাল রাসূলদেরকে তুলনা করেছেন এমন বৈপ্লবিক নেতা হিসেবে যাঁরা সফলতার সাথে সমাজে আল্লাহর নৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর ভাষায়,

> সামনের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা জয় করার মধ্য দিয়ে নবী নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং ইতিহাসের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। অতএব তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের আরেকটি মানদণ্ড হবে কোন ধরনের মানুষ তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন এবং তাঁর বাণীর প্রেরণায় কোন ধরনের তমদ্দুন বিকাশ লাভ করেছে।[৫৮]

নবীর কাজ যে উন্নত মানুষ ও সভ্যতা তৈরি করা এটিই এখানে দেখানো হয়েছে। আর মানুষের উন্নত নৈতিকতাই কেবল তা করতে পারে। মহানবী (স.) এর নবুওয়াতী জীবনের তেইশ বছরে তিনি এমন সব মানুষ গড়ে তুলেছেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে যারা ছিলেন অতুলনীয়, কুরআন নির্দেশিত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করে এমনভাবে তাদের অন্তরের প্রশান্তি ও সুস্থতা দিয়েছেন যে, তাঁরা অত্যন্ত মুষ্টিমেয় হলেও তৎকালীন শক্তিধর, সুসজ্জিত পরাশক্তি ও সভ্যতার ধারক বাহক রোমান ও পারস্য সভ্যতাকে বলা যায় বিনা রক্তপাতে ইসলামী সভ্যতার অধীন করে ফেললেন। তা সম্ভব হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে। কুরআন বলেছে,

> তিনিই নিরক্ষরদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়, কারণ তারা ইতঃপূর্বে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল।[৫৯]

অর্থাৎ নবীর প্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহর বাণী মানুষের সামনে পাঠ করে শুনানো। আল্লাহ প্রত্যেক নবীর নিকট তাঁর স্বজাতির ভাষায় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেন যেন মানুষকে তিনি সহজে আল্লাহর বাণী বোঝাতে পারেন (১৪: ৪)। এতে প্রজ্ঞাবান মানুষ নিজের করণীয় খুঁজে পান। কিন্তু নবীদেরকে দ্বিতীয় যে কাজটি

করতে হয় সেটি হচ্ছে মানুষকে নৈতিক দিক থেকে পরিশুদ্ধ করার বাস্তব প্রশিক্ষণ। মানুষ যতই সত্যানুসন্ধানী হোক না কেন শিক্ষক ছাড়া তার অনুসন্ধান কাজ সফল হতে পারে না। নবী-রাসূলগণ মানুষের বাস্তব জীবনের জন্য ক্ষতিকর এমন সব ধারণা, চিন্তা, আচরণ পরিবর্তন করে তার পার্থিব কল্যাণ ও অপার্থিব সফলতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তৃতীয় আরেকটি কাজ করেন: মানুষকে শুধু উপদেশমূলক শিক্ষাই নয়, বরং এমন নিখুঁত গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা তাদের শেখান যার মাধ্যমে নবীর তিরোধনের পর সেই প্রজ্ঞার উত্তরাধিকার পরবর্তী শত-সহস্র বছর ধরে চলমান থাকে।

সব নবী-রাসূলেরই এই দায়িত্ব ছিল। তবে শেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (স.)এর আগমনের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের শরীয়তকে রহিত করে একমাত্র কুরআন অনুসরণকেই আল্লাহ মানব জাতির জন্য নির্ধারণ করে দেন। পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোতে মানুষের মিশ্রণের কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা সেসব কিতাবের অনুসারীগণও স্বীকার করেন। নিখুঁতভাবে এখন আল্লাহর বাণী সমষ্টি একমাত্র কুরআনেই রয়েছে। মহানবী (স.)কে আইনপ্রণয়নের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি মানুষের অপরাধের প্রতিবিধান করতে পারেন, মানুষের অধিকার নষ্টকারী, চোর-ডাকাত-দুর্নীতিপরায়ণদের শাস্তির আওতায় এনে সমাজে নৈতিকতার উৎকর্ষতা ঘটাতে পারেন, মানুষের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কুরআন চূড়ান্তভাবে তাঁর পরিচয় দিয়েছে এভাবে, "যদি তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের মীমাংসায় তারা তোমাকে না মানে, তাহলে কখনো তারা মুমিন হতে পারবে না"।[৬০] আর একারণেই তাঁকে বলা হয়েছে সমগ্র জগতবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত; পথ অনুসরণে কাউকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করার দায়িত্বপ্রাপ্ত নন।

গ. আখিরাত বা পরকালীন জীবনে বিশ্বাস

আল-কুরআনের সামগ্রিক ধারণাটিই হচ্ছে পরকাল কেন্দ্রিক। মানুষের পার্থিব জবাবদিহিতার মতই পরকালীন জবাবদিহিতার ধারণা খুব স্বাভাবিক বিষয়। কুরআন সেটিকে কিয়ামতের বিচার আখ্যা দিয়েছে। সেই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সবাইকে তার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দিতে হবে। তবে এর আগে আরেকটি বিষয়ের স্পষ্ট করা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে মানুষের অমরত্ব।

রূহ বা আত্মাকে কুরআন আল্লাহর আদেশ (আম্‌র) হিসেবে বর্ণনা করেছে।[৬১] এর অবস্থান দেহে, কিন্তু দেহ থেকে কখনো আত্মা বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানুষের দেহের বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে, সাথে সাথে আত্মার কাজ বা ধরনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। মানুষের মৃত্যু তার দেহের সম্পূর্ণ ধ্বংস নয়, বরং একটি পর্যায় থেকে অন্য আরেকটি পর্যায়ে উত্তরণ। কুরআন সেটিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, "আমি অবশ্যই জানি মাটি তাদের কতটুকু ধ্বংস করবে, সবকিছুই আমার নিকট সুরক্ষিত কিতাবে লিখিত আছে"।[৬২] এখান থেকে প্রমাণিত হয় মানুষের দেহের কোটি কোটি কোষের ভেতর যদি আল্লাহ একটিকেও জীবিত রাখেন তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্লোনিং এর মত আল্লাহ সেই কোষ থেকে হুবুহু তাকে

পুনরায় রূপ দিতে পারেন। অথবা যেকোনো প্রক্রিয়াতেই প্রথমবারের মত দ্বিতীয়বার কেন আরেকটি মানুষ সৃষ্টি করতে পারবেন না তিনি? তাঁর কথায় এসেছে, নতুন সৃষ্টিতে কারো আঙুলের চিহ্নের সামান্য পরিবর্তনও হবে না? [৬৩] তাছাড়া বস্তুর নিত্যতার সূত্রও প্রমাণ করে কোনো বস্তু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না, বরং রূপ পরিবর্তিত হয়। তাহলে, আল্লাহর আদেশ হিসেবে যেভাবে রূহের মৃত্যু হতে পারে না, তেমনি সৃষ্টির মালিকও যেহেতু একমাত্র তিনি সেহেতু দেহেরও ধ্বংস হবে না। অর্থাৎ দেহ ও আত্মা উভয়ই অমর। এটি শুধু একটি বিশ্বাস নয়, বরং এই চিন্তাই মানুষকে স্রষ্টার সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত করতে পারে। কুরআন বিষয়টিকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে। যেমন:

> ক. সেদিন সবাই তার আমলনামা বা কর্মের হিসাব ও সাক্ষী নিয়ে হাযির হবে, এদিন সম্পর্কে অবশ্যই তুমি উদাসীন ছিলে, এখন তোমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, ফলে আজ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছ।[৬৪]
>
> খ. আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।[৬৫]
>
> গ. তারা তাদের চামড়াকে বলবে, 'তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন?' চামড়া তখন জবাব দেবে: 'যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন'।... তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না– এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার অনেক কিছুই জানেন না।[৬৬]
>
> ঘ. প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। এটা কখনো উচিত নয়, তোমরা অতিসত্বর জানবে। আবারও বলা হচ্ছে এটা কখনো উচিত নয়, তোমরা অতিসত্বর জানবে। কখনো নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দেখবে নিশ্চিত জ্ঞানসহকারে। এরপর অবশ্যই প্রতিটি নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।[৬৭]

এখানে কুরআনের কয়েকটি আয়াতমাত্র উপস্থাপন করা হল। মানুষ তাদের সমস্ত কর্মের রেকর্ড নিখুঁতভাবে দেখতে পাবে এমনকি অণু পরিমাণ হলেও। আর কেউ নিজে যখনই তার রেকর্ডকে অস্বীকার করতে চাইবে তখনই তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে, তখন হাত-পা, চামড়া, চক্ষু, কর্ণ কথা বলবে এবং কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। কুরআনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় পরকালের এমনই ছবি অঙ্কিত হয়েছে। মানুষের চিন্তা চেতনায় সব সময় যদি এ ধরনের ছবি লালন করা যায়, তাহলে তার পক্ষে অন্যায় ও অনৈতিক আচরণ করা কঠিন হবে। পার্থিব শাস্তির ভয়ে নৈতিকতার ধারণাকে কুরআন কোনোভাবেই সমর্থন করে না। পৃথিবীর কোনো শক্তিধরের সন্তুষ্টি বা ভয়ে যে কোনো ভালো কাজ করাকে কুরআন সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ (শিরক) মনে করে। পার্থিব লোভ ও ভয়ের উর্ধ্বে একমাত্র অদৃশ্য সত্তা আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য যে ভালো কাজ কেবল সেটিকেই কুরআন সঠিক নৈতিক কাজ হিসেবে সমর্থন দেয়। পরকালীন জীবনের বাস্তবতা স্বীকার না করলে লক্ষাধিক

নবী-রাসূলের প্রতিশ্রুতি, কুরআনের প্রতিশ্রুতি, জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা একেবারেই ধোঁকা বা নেশার মত মনে হবে এবং মানবেতিহাসের সর্বোত্তম ভালো লোকদেরকেও একই সময় মিথ্যাবাদীতে পরিণত করবে।

জড়বাদীগণ ঈশ্বরকে অস্বীকার করার সাথে সাথে আত্মার অমরতা ও পরকালীন জীবনকেও অস্বীকার করেন। সমকালীন খ্যাতিমান দার্শনিক গিলবার্ট রাইল তাঁর *দ্যা কনসেপ্ট অব মাইন্ড* গ্রন্থে মনকে দেহ থেকে পৃথক না করে বরং একই জিনিসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই মতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আত্মার অমরতার ধারণাটি অর্থহীন প্রমাণ করা। ডেভিড হিউমও মানুষের আত্মাকে বলেছেন সংবেদনের সমষ্টি, অর্থাৎ এর পৃথকীকরণ অসম্ভব। কিন্তু মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকে জড়বস্তুর মত এক জায়গায় জড় করা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সচেতনতা অন্য আরেকজন ব্যক্তির তুলনায় সব সময় একইভাবে থাকতে পারে না। দুজন মানুষের দেহ একই রকম দেখা গেলেও দুজন মানুষের মানসিক কাজ সম্পূর্ণ ভিন্নতর হতে পারে। রাইলের মতে,

> আমরা যাকে আত্মজ্ঞান বলি, তা কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। আমাদের নিজেদের কথা শোনা এবং নিজেদের আচরণ প্রত্যক্ষ করা থেকেই এর উৎপত্তি।[৬৮]

অর্থাৎ, আমাদের মানসিক কাজগুলো দৈহিক কাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। হিউমকে অনুসরণ করে এই আচরণবাদের উদ্ভব ঘটেছে। গিলবার্ট রাইল ছিলেন এ মতের প্রধান সমর্থক। আচরণবাদ অনুযায়ী আমরা চেতনা সম্পর্কিত যত ধারণা পোষণ করি সেগুলো দৈহিক আচরণে প্রকাশ পায়। কিন্তু কুরআন এই মতকে প্রত্যাখ্যান করে। কুরআন খালক (দেহ) ও নফস (আত্মা বা মন)কে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করেছে, যদিও মৃত্যু ছাড়া এ দুটোর পৃথক হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

ঘ. ইচ্ছার স্বাধীনতা, তাকদীর ও আল্লাহর সুবিচার নীতিতে বিশ্বাস

নৈতিকতার জন্য ইচ্ছার স্বাধীনতার ধারণা প্রতিটি আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক মতেই এসেছে। ইসলামী নীতিদর্শনে এর আলোচনা এসেছে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের অন্তর্গত তাকদীর বা কদর এর উপর বিশ্বাস থেকে। *কদর* শব্দের শাব্দিক অর্থ নির্ধারণ বা পরিমাণ নির্ধারণ। ইসলামে এর দ্বারা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও পূর্বনির্ধারণকে বোঝানো হয়।"তিনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তার তাকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন"।[৬৯] ইসলামী বিধান অনুযায়ী তাকদীর হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মহাপরিকল্পনা, যা তিনি প্রতিটি সৃষ্টির জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি যদি এ ধরনের কোনো নিয়মের সৃষ্টি ও অনুসরণ না করতেন তাহলে সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। জীবজন্তু ও প্রকৃতির জগতে এই পূর্বনির্ধারিত নিয়মের কারণেই কখনো পরিবর্তন দেখা যায় না। একমাত্র মানুষের কাজের ব্যাপারে তিনি কিছু পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এই পরীক্ষার জন্য যে কর্মের দিক থেকে কে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।[৭০]

অর্থাৎ মানুষ ভালো ও মন্দের জ্ঞানের মাধ্যমে কোনটি গ্রহণ করে এবং কোনটি বর্জন করে তার পরীক্ষা তিনি নিতে চান। এই স্বাধীনতাই তার জবাবদিহিতার জন্য প্রধান বিচার্য বিষয়। অন্যান্য প্রাণীর সেই স্বাধীনতা নেই বলেই তাদের জবাবদিহিতা বা বিচার হয় না। আবার কর্মের সামর্থ্যকে বোঝাতে কুরআনে *'ইস্তিতাআ'* শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "যে আল্লাহর ঘরে যাতায়াতের সামর্থ্য রাখে তার জন্য আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা আবশ্যকীয়"। [৭১] এখানে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য ইস্তিতাআ' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। আরেকটি শব্দ এসেছে *'মাক্ন'* ধাতু থেকে, যেমন:

আমি তাদেরকে পৃথিবীর কোথাও ক্ষমতা দিলে (মাক্কান্না) তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, ভালো কাজের প্রতিষ্ঠা করবে এবং খারাপ কাজ প্রতিরোধ করবে।[৭২]

অর্থাৎ সামর্থ্য বা ক্ষমতা দেওয়ার মালিক আল্লাহ। কিন্তু যখন আল্লাহ কাউকে সেটি দান করেন তখনই তা পালন করার স্বাধীনতাও প্রমাণিত হয়। একই কারণে তখন জবাবদিহিতার প্রশ্নও চলে আসে। মানুষের স্বাধীনতা ও সামর্থ্যের বিষয়টি ইসলামী ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যা থেকেই ইসলামের ইতিহাসে খারেজী, মুরজিয়া, কাদারিয়া, জাবারিয়া, মু'তাযিলা এবং সর্বশেষ আশআরীয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।[৭৩]

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)এর শাসনামলের শেষ দিক থেকেই মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী চিন্তা ও মতবাদের উদ্ভব ঘটে। তাঁর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.) চতুর্থ খলীফা হিসেবে অভিষিক্ত হলে মুয়াবিয়া (রা.) এর সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় আলীর পক্ষের বাহিনী দুটি ভাগ হয়ে যায়: একটি আলীর ইচ্ছায় যুদ্ধ বিরতি মেনে নেয় এবং অন্যটি যুদ্ধবিরতি মানতে রাজি হয়নি, বরং প্রতিপক্ষকে পরাজিত না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিল। কিন্তু আলী উদার মন নিয়ে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেন বড় ধরনের রক্তপাত ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত এড়াতে। দ্বিতীয় এই গ্রুপটিই আলীকে কাফের ঘোষণা করে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে (৬৫৮ সালে নাহওয়ানের যুদ্ধ হয়)। এরাই খারেজী নামক চরমপন্থী মতবাদের উদ্ভাবক। এদের প্রধান বিশ্বাস ছিল, একজন মুসলিম বড় পাপ (কবীরা গুনাহ) করলে সে মুসলিম থাকে না, বরং ইসলাম থেকে খারিজ বা বহিষ্কার হয়। আল্লাহকে তারা কঠোরভাবে উপস্থাপনের কারণে ইসলামের মূল চেতনা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সমসাময়িক যুগে 'মুরজিয়া' সম্প্রদায় নামে আরেকটি গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্থগিত রাখা। কুরআনে দুটি অর্থে এর ব্যবহার হয়েছে: আশা করা অর্থে (৪: ১০৫) এবং স্থগিত রাখা বা অবকাশ দেওয়া অর্থে (৭: ১১১)। এই মতের একজন পরিচিত সমর্থক ছিলেন সাবিত কুতনা (মৃ. ৭২৮ খ্রি.)। এই মতবাদ অনুযায়ী আল্লাহর উপর ঈমান থাকলে সে শিরক ব্যতীত যতই পাপ করুক আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না, বরং তার বিচার স্থগিত রাখবেন। এই ধরনের অতি আশাবাদের স্থানও ইসলামে নেই। ইসলাম মানুষকে তার প্রতিটি কর্মের জন্য জবাবদিহিতার কথা স্পষ্ট

জানিয়ে দিয়েছে। এজন্য এটিও ভ্রান্ত দল হিসেবে স্বীকৃত হয়। মহানবী (স.) তাঁর জীবদ্দশাতেই তাকদীর অস্বীকারকারী একটি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেন, যাকে তিনি তাঁর উম্মতের মাজুসী বা অগ্নি-উপাসকদের সাথে তুলনা করেন এবং এদের অসুস্থতায় না যেতে এবং জানাযা থেকে দূরে থাকতে বলেন"।[৭৪] এই মত অনুসারে সব কিছু মানুষের অধীন, সে যা ইচ্ছা করতে পারে। মানুষের ইচ্ছায় আল্লাহর হাত নেই। হাসান বসরীর প্রথম দিকের একনিষ্ঠ ছাত্র কুফার অধিবাসী মা'বাদ আল জুহানী (মৃ. ৬৯৯) কর্তৃক কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। মা'বাদ আল জুহানি প্রথমদিকে একনিষ্ঠ মুসলিম হলেও তাকদীর প্রসঙ্গে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং পথভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত হন। মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই মতবাদকে ভ্রান্ত মতবাদ হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়। এর কারণ ছিল তাকদীর বা পূর্বনির্ধারণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। কিন্তু ইসলামে তাকদীরের উপর ঈমানকে মৌলিক বিশ্বাস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৭৫] তবে সম্ভবত পরবর্তীতে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া মু'তাযিলা মতবাদ রাসূলের নির্দেশ করা দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সময় ইচ্ছার স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অদৃষ্টবাদী সম্প্রদায় রূপে আরেকটি মতবাদের জন্ম হয় *জাবারিয়া* সম্প্রদায় নামে। জবর শব্দের অর্থ চাপিয়ে দেওয়া বা বাধ্য করা। এই মতানুসারে, সবকিছু আল্লাহ পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেই তাকদীর বা পূর্বনির্ধারণ অনুযায়ী মানুষ কর্ম করে, তাই মানুষের খারাপ কাজের কোনো শাস্তি আল্লাহ দেবেন না। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাহম ইবন সাফওয়ান (মৃ. ৭৪৫ খ্রি.)।

বিষয়টির জটিলতার মূল কারণ আল্লাহর জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন। আল্লাহ যদি ভবিষ্যৎ না জানেন তাহলে তাঁকে সীমিত করা হয় আবার তিনি যদি ভবিষ্যতের সব জানেন তাহলে মানুষের কর্মের স্বাধীনতার অর্থ থাকতে পারে না। এই বিষয়ে মহানবী (স.)এর বাণী ছিল, এ নিয়ে বাড়াবাড়ি আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। তবুও বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকগণ চেষ্টা করেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, মহানবী ও সাহাবী-পরবর্তীযুগে ইসলামী নীতিদর্শনের প্রথম শিক্ষক ছিলেন হাসান বসরী (৬৪২-৭২৮)। তিনি মানুষের চিন্তা জগতকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। ইসলামের তাকদীরের ধারণাকে তিনি সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেন এবং আল্লাহর পূর্বনির্ধারণেরও স্বীকার করেন। তাঁর মতে, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে- কি করে তা পূর্বনির্ধারিত হতে পারে? অথচ আল্লাহ স্পষ্ট আদেশ করেছেন, ভালো কাজ করতে, সুবিচার করতে, আত্মীয়দের দান করতে এবং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকতে; (৫: ৫৮)। মানুষ চাইলে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ বাঁচতে পারে; (৮: ৪২)। আল্লাহ মানুষকে ভালো ও মন্দ বিষয়ের জ্ঞান দিয়েছেন; (৯১: ৭-১০)। আল্লাহ বিপদ আপদ পূর্ব-নির্ধারিত করে রাখেন মানুষ যেন অহঙ্কারী বা হতাশ হয়ে না পড়ে।[৭৬] তিনি প্রশ্ন করেন, সবকিছু যদি পূর্ব-নির্ধারিত হত তাহলে কুরআনের কী দরকার ছিল? নবী-রাসূলদের কী প্রয়োজন ছিল? চোর-ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রহরীর প্রয়োজন কেন? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভবিষ্যৎ জ্ঞানের ভুল অর্থের কারণ হচ্ছে, মানুষের দৈহিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যকে এক করে ফেলা। দেহের যন্ত্র, রং, আকার এগুলোতে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ

নেই; কিন্তু তার ভালো হওয়া খারাপ হওয়া তার ইচ্ছাধীন। মানুষের সামর্থ্যের কারণেই সে ভালো ও মন্দ করতে সক্ষম।[৭৭] হাসান বসরীর ছাত্র ওয়সিল বিন আতা (যাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন) কর্তৃক আবার সৃষ্টি হয় মু'তাযিলা মতবাদ যারা কাদারিয়া সম্প্রদায়ের মতই ইচ্ছার স্বাধীনতার পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়। তবে তারা সেই মতবাদকে আরো যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর ন্যায়বিচারের ধারক হিসেবে পেশ করে বলেন, আল্লাহর উপর কোনোভাবেই মানুষের অন্যায় ইচ্ছার দায় চাপানো যায় না। পূর্বনির্ধারণ নয়, বরং মানুষের ইচ্ছার কারণেই মানুষ সুপথপ্রাপ্ত হয় এবং ইচ্ছার কারণেই পথভ্রষ্ট হয়। তাঁদের যুক্তি ছিল, যদি আল্লাহকে আদেল বা ন্যায়বিচারক হিসেবে স্বীকার করা হয় তাহলে অবশ্যই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্রষ্টা মানুষ নিজে, এজন্যই আল্লাহ তাদের বিচার করতে পারবেন। তিনি কারো সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না এবং কারো উপর সামান্যতম অবিচার করবেন না বলে কুরআনে উল্লেখ করেন।[৭৮] সুতরাং মানুষের কর্মের নির্বাচন ক্ষমতা যদি না থাকত তাহলে আল্লাহর এসব কথার কোনো অর্থ করা যেত না। তাদের মতবাদের চূড়ান্ত পরিণতিতে একজন খ্যাতিমান মু'তাযিলা শিষ্য আবুল হাসান আশআরী স্বীয় মত ত্যাগ করে নতুন মত সৃষ্টি করেন, যা আশআরী মতবাদ নাম ধারণ করে। এই মতবাদ অনুযায়ী, মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নয় আবার বাধ্যও নয়। মানুষের কর্মের স্রষ্টা যদি মানুষকে করা হয় তাহলে বরং আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের কর্মের সৃষ্টি করেন"; (৩৭: ৯২)। অর্থাৎ মানুষকে যেমন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তেমনি তার প্রতিটি কাজের স্রষ্টাও আল্লাহ। মানুষের কাজের জবাবদিহিতার জন্য তাঁরা কুরআনের '*কাসব*' এবং '*ইকতিসাব*' পরিভাষা দুটির ব্যবহার করেন। "সে যা অর্জন করবে (*কাসাবাত*) তাই ফল হিসেবে পাবে এবং যা সে করবে (*ইকতাসাবাত*) তাই তার উপর বর্তাবে"।[৭৯] কাসব এবং ইকতিসাব শব্দ দুটির মূল অক্ষর একই এবং অর্থও এক। আশআরীর মতে, কাসব এর অর্থ হচ্ছে, সৃষ্ট সামর্থ্যের মাধ্যমে যা কিছু অর্জিত হয়। আলী ইবন মুহাম্মদ জুরজানী বলেন, কোনো উপকার বা ক্ষতি অর্জন করার নাম কাসব। আশআরীয়গণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ কাজের ইচ্ছা ও সামর্থ্য সৃষ্টি করেন, এ জন্য কাজের স্রষ্টা তিনিই, কিন্তু মানুষ নিজে তা সংঘটিত করে এজন্য মানুষই তার জন্য দায়ী। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি একটি কাগজে কলমের সাহায্যে লেখে। এখানে আল্লাহ তার মনে লেখার ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং একই সময় তাকে লেখার ক্ষমতা বা সামর্থ্য দেন। এজন্য লেখা কাজটির স্রষ্টা আল্লাহ। কিন্তু যেহেতু এটি ব্যক্তির মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে তাই ব্যক্তিই এখানে দায়ী। সমালোচকদের মতে, এটি আসলে ইচ্ছার বিষয়টিকে আল্লাহর দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। তবে ম্যাকডোনাল্ড মনে করেন, আশআরী এখানে লাইবনিজের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদের পূর্বসূরী। কারণ আল্লাহ আগেই সবকিছুতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, যার কারণে প্রতিটি 'মনাড' স্বাধীন হয়েও সুশৃঙ্খল নিয়মে চলমান।[৮০]

পূর্বনির্ধারণের দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থে পূর্বনির্ধারণ মানে সব কিছু আল্লাহ পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এই অর্থে মানুষ সব অপরাধ থেকে মুক্ত, তার ঐচ্ছিক কাজের কোনো মূল্য নেই। দ্বিতীয়

অর্থে, সব শক্তি ও ক্ষমতাও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন- মানুষের ইচ্ছা শক্তি, মানসিক শক্তি প্রভৃতি। আর সে কারণেই প্রতিটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং সবকিছু সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের ভিত্তিতে তিনি চলমান রেখেছেন। তবে এটা বলা যাবে না, আল্লাহ এই গতিতে কখনো হস্তক্ষেপ করবেন না। ইচ্ছার স্বাধীনতা, পূর্বনির্ধারণ ও আল্লাহর সুবিচার নীতি একটির সাথে অন্যটি জড়িত। আল গাযালীর মতে মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। বরং সে কেবল ইচ্ছা করতে পারে, আল্লাহ সেটা কার্যকরী করেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাই এখানে মুখ্য বিষয়। এর জন্যই তাকে শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করতে হবে।[৮১] এর অর্থ মানুষ পৃথিবীতে যতই ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন তার পক্ষে সব করা সম্ভব হয় না। তখনই কেউ কিছু করতে পারে যখন তাকে আল্লাহ সামর্থ্য দেন। আল্লাহ কাকে কতটুকু সামর্থ্য দেবেন এটি কেবল তাঁরই ব্যাপার। মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে *হিদায়াত* বা সুপথপ্রাপ্তি লাভের ইচ্ছা করলেও আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত হিদায়াত দেন না, যতক্ষণ না তিনি তাঁর সূক্ষ্ম বিচারে মনে করেন সে হিদায়াতের উপযুক্ত হয়েছে। যখন আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকরী হয় কেবল তখনই সে হিদায়াত লাভ করে। আবার মানুষ অপরাধের পথ অনুসরণ করে ততটুকুই সফল হতে পারে যতটুকুর ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকরী হয়। কেউ দুর্নীতি করতে চাইলে সে যে কোনোভাবেই ইচ্ছে মত করতে পারে না। একজন কর্মচারীর ভেতর দুর্নীতির ইচ্ছা সবসময় বিদ্যমান থাকলেও সে নিজেই কেবল কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে তার অর্জন বেশি হবে বলে মনে করে এবং নিজেকে অধিকতর নিরাপদ ভাবে সেখানে তা করবে; কিন্তু তাতেও সে সব সময় সক্ষম হয় না। এর কারণ আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ যাকে যতটুকু সামর্থ্য দেওয়ার ইচ্ছা করেন কেবল ততটুকুই সে পাবে। মোটকথা তার অপরাধের জন্য তিনি দায়ী নন, বরং অপরাধী নিজেই দায়ী। তাকে আরো স্বাধীনতা দিলে সে আরো অপরাধ করত।

ইবন রুশদ বলেন, মানুষের কাজের বাধ্যবাধকতার একটি শর্ত নৈর্বাচনিক ক্ষমতা, কিন্তু কীভাবে মানুষ স্বাধীন এর ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি। 'আল্লাহ যাকে চান পথ দেখান যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন'[৮২] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ একধরনের প্রবণতা সৃষ্টি করেন, যার ফলে চতুস্পার্শ্বের বাহ্যিক কারণ ও অন্তস্থিত প্রবণতার কারণে সে পথভ্রষ্ট হয়। কিন্তু কেন আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করবেন যে, সে পথভ্রষ্ট হবে? এর উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ সবার ভেতর কম পরিমাণে খারাপ প্রবণতা ও বেশি পরিমাণে ভালো প্রবণতা দেন, এগুলো প্রাকৃতিক উপাদান, যেখান থেকে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেন ও আকৃতি দেন (৮২: ৮); এর বিকল্প হতে পারত মানুষকে সৃষ্টি না করা।[৮৩]

মানুষের এই প্রবণতার কারণে আল্লাহর সুবিচার প্রশ্নবিদ্ধ হয় না। কারণ আল্লাহ সুবিচারের ভিত্তিতে এই মহাবিশ্ব পরিচালনা করছেন। আল গাযালীর মতে, আল্লাহর কোনো উদ্দেশ্য নেই, তিনি স্বপ্রশংসিত এবং কোনো প্রকার বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন তাঁর ক্ষমতার প্রকাশের জন্য এবং তাঁর ইচ্ছাকে আমাদের উপলব্ধির জন্য।[৮৪]বাকিল্লানী (মৃ. ১০১৩ খ্রি.) বলেন, আল্লাহ শিশুকে আঘাত দেন, মানুষকে মৃত্যু দেন, পুরস্কার বা শাস্তি ছাড়াই বিভিন্ন অনুগ্রহ দেন- এগুলো তাঁর জন্য অন্যায়

নয়। শাহরাস্তানি আরো স্পষ্ট করে বলেন, জগতে আল্লাহর সব আদেশই বিশ্বজনীন কল্যাণের জন্য যা সম্পূর্ণ ন্যায়। আল্লাহ এগুলো ভালো বা মন্দ হিসেবে আদেশ করেন না, বরং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের বাস্তবায়ন হিসেবে কার্যকর করেন।[৮৫] তবে আল্লাহর উপর কোনো কিছু আবশ্যক নয়। মু'তাযিলাগণ আল্লাহর উপর সুবিচারের শর্ত আরোপ করেন যে, তিনি সুবিচার করতে বাধ্য। আল গাযালী এর বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, আল্লাহ বিশেষ কোনো বাধ্যতাবোধের অধীন নন। জগৎ সৃষ্টি করা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না, যদি থাকত তাহলে তাঁর উপর আবশ্যকীয়তা আরোপ করা যেত। মু'তাযিলাদের মতে, আল্লাহ যেহেতু কল্যাণময় সেজন্য সৃষ্টি জগতের কল্যাণ করা তাঁর জন্য আবশ্যক এবং সৃষ্টি জগতের পরস্পরের কল্যাণের জন্যই তিনি এক একটি বিষয় সৃষ্টি করেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভাগ্য তিনি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন তার চেয়ে বড় বিষয় হলো, আমরা যখন কোনো কাজ করি তখন ভাবি না এটি আল্লাহ করতে বলেছেন তাই করি, বরং আমাদের নিজেদের ইচ্ছাতেই একটি কাজ করি। এরই জন্য আমরা পরস্পরকে দায়ী করি বা সম্মানিত করি।[৮৬]

আল্লাহ আমাদের এই ঐচ্ছিক কাজেরই নিখুঁত হিসেব নেবেন। তবে যখন কেউ কোনো কিছু করার ইচ্ছা করে তখন তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকে। অধিকাংশ সুন্নী এবং মু'তাযিলাদের কেউ কেউ মনে করেন, দুটি বিকল্পের মধ্যে একটি গ্রহণ করার পেছনে আবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে কিছু বিশেষ শর্ত- যেমন, বুদ্ধি, যা একটি বিকল্পকে গ্রহণ করা অসম্ভব করে তোলে। অন্যদিকে, মু'তাযিলাদের অধিকাংশ মনে করেন, স্বাধীন ব্যক্তি যে কোনো একটি কাজই করতে পারে। যেমন, শত্রুর ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো ব্যক্তি যে কোনোভাবেই বাঁচতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এটি সঠিক নয়। কারণ মানুষের পক্ষে ভবিষ্যৎ দেখা সম্ভব নয়; (৩১: ৪)। তবে মানুষের উন্নতি বা অধঃপতনের ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে; (২১: ৯-১০)। আবার মানুষের ইচ্ছার বাইরে কিছু চাপিয়ে দিলে সে তা থেকে দায়িত্বমুক্ত; (১৬: ১০৬) একইভাবে জীবন বাঁচাতে শুকর খেলে সে দায়িত্বমুক্ত। অর্থাৎ মানুষ যতটুকু সামর্থ্যের অধিকারী ততটুকুর জবাবদিহিতাই তাকে করতে হবে।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

মানুষের বিভিন্ন আচরণকে কোনো সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টাই প্রধানত মনোবিজ্ঞানের কাজ। মানুষের মনকে বস্তুর সাথে তুলনা করা যায় না বলেই তা অন্যান্য বিজ্ঞানের মত নয় যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানের এই প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা আসলে মনস্তত্ত্ব ছাড়া কোনো বিষয়ে সঠিকভাবে এগুতে পারি না। সে কারণেই মানুষের নৈতিক আচরণ ব্যাখ্যা করতে সঠিক মনস্তত্ত্ব জানতে হয়।

ইসলাম নৈতিক উন্নয়নের জন্য মানুষের অন্তঃস্থ দিকটিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। মহানবী (স.) সাহাবীদের সাথে নিয়ে যখন তাবুকের জিহাদ থেকে ফিরে আসেন তখন বলেন, "আমরা ছোট জিহাদ থেকে

বড় জিহাদে ফিরে এসেছি"। [৮৭]এই বড় জিহাদই হচ্ছে মনের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই। এই অদৃশ্য শত্রু মানুষের মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে সর্বমুহূর্তে। সুতরাং এই লড়াইয়ে বিজয়ী হতে না পারলে বাহ্যিক শত্রুর সাথে লড়াই করা সম্ভব নয়– যে কোনো মুহূর্তে প্রলোভন, সীমা লঙ্ঘন, কপটতা বা ভীরুতার মাধ্যমে একটি বড় বিজয় মারাত্মক পরাজয়ের পরিণতি লাভ করে। এ কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে চরিত্র মানেই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, যা ব্যক্তির সৌন্দর্য, দৃঢ়তা এবং সমাজের সংহতি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও উৎকর্ষতার জন্য প্রয়োজন। আল-কুরআন থেকে মুসলিম দার্শনিকগণ নীতিদর্শনের যে মূল উপাদান দিয়ে তাঁদের আলোচনা শুরু করেছেন তা হচ্ছে আত্মার ত্রুটি ও সদগুণ। এ জন্য আত্মার বা মনের প্রকৃতি, ধরন ও কাজের বিশ্লেষণ নৈতিকতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নৈতিক উন্নয়ন ও অবনতির জন্য বড় ভূমিকা রাখে। সহজাত প্রবৃত্তি কারো আয়ত্ত্বাধীন থাকে না, বরং বংশগতির জৈবিক পদ্ধতি এতে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। তবে কেউ একথা বলতে পারেন না ভালো বংশের মানুষ সব সময় ভালো মানুষ হবে। তবে যে বিষয়টি অনেকটা মানুষের আয়ত্ত্বের ভেতর সেটি হচ্ছে তার বেড়ে উঠার পরিবেশ। পরিবেশ চরিত্র গঠনে কত গুরুত্বপূর্ণ রাসেলের একটি কথায় দেখানো যেতে পারে। তিনি বলেন,

> প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই সবচেয়ে ভালো হয়ে বিকশিত হবার একটি, এবং সবচেয়ে খারাপ হয়ে বিকশিত হবার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো মানুষের অন্তঃস্থিত মহৎ শক্তির বিকাশ ঘটবে, না তা ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তার খারাপ প্রবৃত্তিগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠবে, না ধীরে ধীরে সেগুলো ভালোর দিকে মোড় নেবে, তা পরিবেশই স্থির করে। [৮৮]

অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সবচেয়ে পরিশুদ্ধ কিংবা সবচেয়ে কলুষিত হওয়ার স্বাধীন ক্ষমতা নিয়ে জন্ম নেয়। কিন্তু পরবর্তীতে পরিবেশের প্রভাবে তার চরিত্র সেদিকেই মোড় নেয়। মহানবী (স.) এর বাণীতেও সেটি স্পষ্ট এসেছে, প্রতিটি মানুষই স্বাভাবিক প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয়, এরপর পরিবেশের কারণেই সে বিভিন্ন ধর্ম বা মতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা মানব প্রকৃতির ভালো-মন্দের বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান পরিবেশের ভূমিকাকে তার আচরণের পেছনে খুব বড় করে প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে ওয়াটসনের আলোচনায় মানুষের ভবিষ্যত নির্ধারণে পরিবেশের ভূমিকার কথা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। এর ব্যাখ্যা করতে গেলে মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কাজ থেকে শুরু করতে হয়। শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া সংবেদনগুলো স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছে ও সংরক্ষিত হয়। স্নায়ুতন্ত্র মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংবেদন তৈরি করে। আলো, তাপ, শব্দ ইত্যাদি বাহ্যিক উদ্দীপক যখন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে তখন সংবেদনের সৃষ্টি হয়। এই সংবেদনই মানুষকে কাজ করতে প্রেষণা যোগায়। প্রেষণা হলো তার অভাব পূরণ। পরিবেশের খারাপ বিষয়গুলোর দ্বারা যখন বার বার কারো সংবেদন তৈরি হয় তখন মস্তিষ্ক তাকে খারাপ কাজের দিকে উদ্দীপ্ত করবে। মনোবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী এভাবে শিশুরা মন্দপ্রবণ হয়ে বেড়ে উঠে।[৮৯]

কুরআন মানব জীবনের প্রকৃতিগত বড় কিছু দুর্বলতার কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যা থেকে উত্তরণের জন্য নবী রাসূলগণকে শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। যেমন,

> আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৯০]
>
> আমি যখন মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদন করতে দেই, অতঃপর তার থেকে ছিনিয়ে নিই, তখন সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়ে পড়ে; আর যখন তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পর সুখ দান করি, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে, নিশ্চয় সে অহংকারী, উদ্ধত।[৯১]
>
> মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্কপ্রিয়।[৯২]
>
> মানুষ অত্যন্ত কৃপণ।[৯৩]
>
> নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরুরূপে, যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে, আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তখন কৃপণ হয়ে যায়।[৯৪]
>
> নিশ্চয় মানুষ অবিচারকারী, অজ্ঞ।[৯৫]

কুরআনের উদ্ধৃত বাক্যগুলো মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবকে বিবৃত করেছে। মানুষ প্রকৃতির জগতে সবচেয়ে দুর্বল ও সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল প্রাণী। জন্ম থেকে সে তার মায়ের উপর এতই নির্ভরশীল থাকে যে তার নিজের পক্ষে স্বাধীনভাবে কিছুই করার থাকে না, যা অন্য সব প্রাণীর মধ্যে থাকে। বড় হওয়ার পরও সে অসংখ্য প্রাণীর চেয়ে দুর্বল। তার এই দুর্বলতার কারণেই সে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর কারণেই সে কখনো হতাশ হয়ে পড়ে আবার কোনো ক্ষমতা বা সম্পদ পেয়ে অতিশয় কৃপণ ও অত্যাচারী হয়ে উঠে। তার অবৈধ কাজের জন্য সে বিভিন্ন যুক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। কুরআন মানুষের এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে উপায় বলেছে তা হলো শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ, যা সরাসরি নবী-রাসূলগণ করেছিলেন। শিক্ষণ হচ্ছে, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন। শিক্ষণের জন্য প্রয়োজন প্রেষণা সৃষ্টি। জৈবিক প্রেষণা হলো ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও যৌন বাসনা পূরণ। আর সামাজিক প্রেষণা হলো সম্মান অর্জন, সাফল্য লাভ প্রভৃতি। শিক্ষার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সবাই এদুটি জিনিস অর্জন করতে চায়। ইসলাম এ দুই ক্ষেত্রকেই উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছে। অর্থাৎ মানুষ শিক্ষা অর্জন করে পার্থিব তথা বস্তুগত সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে যা তার স্বভাবগত মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিবর্তন করে সৎ প্রবণতার বিকাশ ঘটাতে ভূমিকা রাখে।

নীতিদর্শনে মৌলিক তাড়না বিবেক নামে অভিহিত। কুরআনের পরিভাষায় এটিই হচ্ছে *নফসে লাউয়ামা* বা তিরস্কারকারী আত্মা, যা মানুষকে মন্দ কাজ করার আগে সতর্ক করে এবং করার পর তিরস্কার করতে থাকে। যে সব শক্তি মানুষের এই মৌলিক তাড়নাকে ব্যাহত করে বা বিকৃত করে সেগুলোর প্রভাব সবচেয়ে মারাত্মক। এসব প্রভাবের দ্বারা মানুষের এমন অভ্যন্তরীণ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে যে, তা কোনো দিন আর পূরণ হতে পারে না। তাড়না গঠিত হয় দুইভাবে: সহজাত প্রবণতা হিসেবে এবং সুযোগ ও পরিবেশের দ্বারা। প্রত্যক্ষ প্রচারণা চালিয়ে তাড়নার পরিবর্তন ঘটানো যায় না, বরং এতে কিছু প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তিকে

দমন করা যায়। রাসেল এজন্য তাড়নার গভীর উৎস সৃষ্টি করার প্রয়োজনকে স্বীকার করেন।[৯৬] ইসলাম তা করতে চায় মনের ভেতর এমন এক বিশ্বাস সৃষ্টি ও তার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে যা তাকে সবসময় ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখবে। সহজ কথায়, অতীন্দ্রিয় এবং সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী এক সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভালোবাসার সম্পর্কই পারে এধরনের গভীর উৎস সৃষ্টি করতে।

মুসলিম নীতিদার্শনিকদের মধ্যে মুহাম্মদ মিসকাওয়ার আলোচনাতেও এ বিষয়টি এসেছে। তিনি মানুষের ভালো মন্দের মূল কেন্দ্র হিসেবে মন বা আত্মাকে বিবেচনা করেন। কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশ করেন।

> শপথ আত্মার (নাফস) এবং যিনি এটিকে সুগঠিত করেছেন তাঁর, তিনি নাফসের মধ্যে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দেন। যে একে পরিশুদ্ধ করবে সেই সফল আর যে একে কলুষিত করবে সে ব্যর্থ হবে। (৯১: ৭-১০)

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই ভালো বা মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সৃষ্টি হয়, যা উপরে রাসেলের উদ্ধৃতিতেও আমরা লক্ষ করেছি। কুরআন মানুষের মনকে ক্বল্‌ব, নাফস ও রূহ নামে অভিহিত করেছে। যদিও এগুলোর পৃথক অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে তবুও সাধারণ ব্যবহারের জন্য আমরা মন শব্দটিকেই এখানে বেছে নিলাম।

আল গাযালী মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে নৈতিকতার জন্য আবশ্যকীয় মনে করেন।[৯৭] মানসিক কাজের কেন্দ্র হিসেবে তিনি মনকে নির্দেশ করেন, যেখানে ভালো ও খারাপ উভয় চিন্তা আসে। তিনি বলেন, যান্ত্রিক ও সংবেদনমূলক ক্ষমতার মাধ্যমে মন তার দৈহিক প্রয়োজন পূরণ করে। যান্ত্রিক ক্ষমতা প্রবৃত্তি ও তাড়নায় বিভক্ত। আর প্রবৃত্তির মধ্যে রয়েছে দুটি বিশেষ প্রকার: কামনাবৃত্তি ও ক্রোধ। কামনাবৃত্তির কাজ হলো দেহের ভালোর জন্য কাজ করা; যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতার অভাব পূরণ। আর ক্রোধের কাজ হলো দেহের জন্য ক্ষতিকর জিনিস প্রতিহত করা। যেমন, অসদাচরণের কারণে ক্রুদ্ধ হওয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ ইত্যাদি। আর তাড়নার ক্ষমতা অবস্থান করে পেশী, স্নায়ু এবং অন্যান্য টিস্যু বা কলায়, যা দেহকে কামনা ও ক্রোধের নির্দেশ অনুযায়ী চালিত করে। অন্যদিকে সংবেদনমূলক ক্ষমতার কাজ হলো দেহের জন্য ভালো বা ক্ষতিকর বিষয়গুলো অনুধাবন করা। এর অনুপস্থিতিতে প্রবৃত্তি ও স্বাভাবিক প্রবণতাগুলো অন্ধের মত হোঁচট খায়।

এতগুলো বিষয় মূলত দেহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য। অন্যান্য প্রাণীর সাথে এই বিষয়গুলোর পার্থক্য নেই। মানুষের দেহকে পরিচালনা করে *ক্বল্‌ব* বা অন্তর। মানুষের অন্তর দুটি গুণের অধিকারী যা অন্য প্রাণীদের নেই: *আকল* (প্রজ্ঞা) ও *ইরাদা* (ইচ্ছা শক্তি)। আকলকে আল গাযালী ঐশী উপাদান হিসেবে বর্ণনা করেন। আকল দিয়ে অনেক কিছুর উপলব্ধি করা গেলেও ইচ্ছা শক্তি না থাকলে তা কাজে লাগে না। ইচ্ছাবৃত্তির উৎপত্তি হয় তিনটি উপায়ে: পাশবিক, ক্রোধ ও ঐশী বুদ্ধি থেকে। প্রথম দুটি অন্য প্রাণীদের মতই। ঐশী বুদ্ধি থেকে সৃষ্ট ইচ্ছাশক্তিই মানুষের মধ্যে সত্যিকার নৈতিকতা সৃষ্টি করে। এর বিপরীত হচ্ছে শয়তানী বুদ্ধি থেকে সৃষ্ট ইচ্ছাশক্তি, যা মানুষকে পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট করে তোলে। আকল যেহেতু ঐশী

উপাদান তাই এর কাজ হয় মনের কামনা বা প্রবৃত্তি ও ক্রোধের বিরুদ্ধে লড়াই করে মন বা আত্মাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। এই লড়াইয়ে যে সফল হয় তাকে কুরআন বলেছে *'নাফস-ই-মুতমাইন্না'* বা প্রশান্ত মন, যে আত্মাকে সঠিক পথে রাখতে সবসময় মানবীয় মন্দ প্রবণতার সাথে লড়াই করে তাকে বলেছে *'নাফস-ই-লাউয়ামা'* বা তিরস্কারকারী মন আর যে এই লড়াইয়ে সম্পূর্ণ হেরে যায় তাকে বলেছে *'নাফস-ই-আম্মারা'* অসৎপ্রবণ মন। আত্মার এই মৌলিক পরিচয় মানুষকে আত্মশুদ্ধির পথ দেখাতে সাহায্য করবে।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ নীতিদর্শনগুলো মূলত মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে মানব শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে চায়, যেন সে বড় হয়ে সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের সম্পদ হতে পারে। এজন্য সে মানুষের আবেগ অনুভূতি, ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের পরিবর্তন ঘটাতে চায় শিক্ষণের মাধ্যমে। হতাশা, ব্যর্থতা দূর করে মানুষকে সামাজিক গুণে প্রশিক্ষিত করতে চায়। এর ফলে তার মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হতে পারে যা তাকে মানব কল্যাণে নিবেদিত করবে। ইসলামের সাথে এই মতের পার্থক্য নেই। বরং ইসলাম এই মতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসী। কিন্তু ইসলাম এরই সাথে ব্যক্তির মাঝে এক আধ্যাত্মিক চেতনা যোগ করতে চায় যেন নৈতিকতার পদস্খলন তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে, কিংবা পদস্খলন ঘটলেও সংশোধনের উন্নত পন্থা সে অবলম্বন করতে পারে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে, চরিত্রকে ব্যাখ্যা করা হয় মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি গুণ হিসেবে, যা ইচ্ছার স্থায়ী অভ্যাসের মাধ্যমে গঠিত হয়। ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় মানুষের জৈবিক, সামাজিক, মানসিক ও অর্জিত বিভিন্ন গুণাবলির সমন্বয়ে। যেমন, জৈবিক গুণ হিসেবে কারো দেহের গঠন ও সৌন্দর্য, ইন্দ্রিয়ের অসাধারণ সংবেদনশীলতা; সামাজিক গুণ হিসেবে সহনশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা বা সাহসিকতার গুণ; অর্জিত গুণ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, পেশাগত যোগ্যতা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। তবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে ব্যক্তির গুণগুলোর অধিকতর অনুশীলনের মাধ্যমে। আর এই ব্যক্তিত্বেরই একটি অংশ হচ্ছে চরিত্র। চরিত্র মানুষের অভ্যাস। ভালো অভ্যাস উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করে, মন্দ অভ্যাস মন্দ চরিত্র সৃষ্টি করে।[৯৮] ইসলাম চায় আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে মানুষের চরিত্রকে স্থায়ীভাবে সৌন্দর্য দান করতে। পবিত্র কুরআনে একটি কথা বার বার বলার কারণ মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে অভ্যস্ত করা। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এবং সালাতের প্রতিটি রাকা'আতে প্রায় একই জিনিস বারবার আবৃত্তি করা হয়। এর উদ্দেশ্য আল্লাহর নির্দেশনাগুলোকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে স্থাপন করা যেন অন্যায় চিন্তা বা কাজ করতে গেলে সেই স্মরণ তাকে বাধা দেয়। এটি যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখনই কেবল তা চরিত্র সৃষ্টি করে এবং এক পর্যায়ে স্থায়ী চরিত্রে রূপ লাভ করে। মূলত এ কারণেই নৈতিকতার জন্য মনস্তত্ত্ব প্রয়োজন।

মানুষের মৌলিক পরিচয় ও দায়িত্ব

বিশ্বজগতে মানুষের মর্যাদা ও মৌলিক পরিচয় বা তার সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্পর্কিত আলোচনা ইসলামী নীতিদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাগিব ইস্ফাহানী (মৃ. ১১০৮ খ্রি.) তাঁর *আয যারীআতু ইলা*

মাকারিমিশ শারীয়াহ গ্রন্থে মানুষের তিনটি পরিচয় বা সৃষ্টির উদ্দেশ্যের আলোচনা করেন[৯৯]: (১) পৃথিবীকে আবাদ করা, (২) আল্লাহর দাসত্ব করা ও (৩) আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা। ফখরুদ্দীন রাযী (মৃ. ১২০৯ খ্রি.) তাঁর *কিতাবুন্নাফস ওয়ার রূহ* গ্রন্থে আর জালালুদ্দীন দাওয়ানী (মৃ. ১৫০১ খ্রি.) তাঁর *আখলাক ই জালালী* গ্রন্থেও এ নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রথম বিষয়টির ব্যাখ্যায় ইস্ফাহানী বলেন, কুরআন মানুষের প্রথম পরিচয় দিয়েছে- তারা এখানে অন্যান্য প্রাণীর মতই বসবাস করবে। "তিনিই তোমাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে সেখানে আবাদ করিয়েছেন" (১১: ৬১)। অর্থাৎ নিষ্প্রাণ মাটি থেকে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং এখানে আবাদ করা বা বসবাসের যাবতীয় উপকরণ দিয়েছেন। জালালুদ্দীন দাওয়ানীর[১০০] মতে, অন্যসব প্রাণী বা জীব-জগতের উপর মানুষকে সম্মান দেওয়া হয়েছে যা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে,

> আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি, স্থলভাগ ও জলভাগে তার বাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তাকে পবিত্র জিনিস দিয়ে রিযকের ব্যবস্থা করেছি এবং আমার সৃষ্টি করা বহু জিনিসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[১০১]
>
> হে মানুষ তুমি কি লক্ষ কর না যে, দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে ...আল্লাহ তার সবই তোমাদের জন্য অধীন করে দিয়েছেন?[১০২]

আল্লাহর প্রতি কেন মানুষের দায়িত্ব থাকা উচিত সেগুলো আল্লাহ এখানে মানুষকে জানিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহ ও দানগুলোর উল্লেখ করে দাওয়ানী বলেন, অন্যান্য জীবের মত তারাও পৃথিবীতে বসবাস করবে, বংশ-বিস্তার করবে। কিন্তু অন্যদের উপর কুরআন নাযিল হয়নি এবং তাদের কোনো দায়িত্বের কথাও জানানো হয়নি। তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তাদের জীবন চলার জন্য আলাদা কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ অন্য সবকিছুর উপর সম্মানিত করেছেন। মানুষ বসবাসের জন্য বাড়ি-ঘর-অট্টালিকা বানাবে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, যান-বাহন, রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা তৈরি করবে, উন্নত জীবনোপকরণ সংগ্রহ করবে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই যে কেউ বলতে পারে মানুষের জীবন অন্যান্য প্রাণীর মত হওয়া উচিত নয়।

মানুষের দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে, মানুষ একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে। সে জীবন ধারণ করবে অন্যান্য প্রাণীর মতই। কিন্তু তার আচরণ কখনো অন্যান্য প্রাণীর মত হবে না, আল্লাহ তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন, সুন্দর ভাষায় সে আল্লাহকে ডাকবে, আল্লাহর দাসত্ব করবে। "আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছি"[১০৩]-এটিই হচ্ছে মানুষের পরিচয়। দাসত্বের অর্থ হচ্ছে আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা। কিন্তু এই দাসত্বের কাজটি আল্লাহ মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে, কে স্বেচ্ছায় তাঁর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করে আর কে সেগুলোকে অস্বীকার করে; কে জীবন মৃত্যুর পরীক্ষায় ভালোটি গ্রহণ করে আর কে মন্দকে গ্রহণ করে। এই বিষয়টির প্রশিক্ষণের জন্যই সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত- এই আনুষ্ঠানিক মৌলিক ইবাদতকে নির্ধারণ করা হয়েছে যেন মানুষ সব সময় নিজেকে

আল্লাহর স্মরণ, কৃতজ্ঞতা আদায় ও সমস্ত আদেশ-নিষেধ মেনে পার্থিব ও পরকালীন উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত হয়ে আল্লাহর দাসত্বের পরিচয় দিতে পারে।

মানুষের তৃতীয় পরিচয়, মানুষ কেবল দাস হিসেবে নয়, বরং বিশ্বজগতের স্রষ্টার একমাত্র প্রতিনিধি[১০৪]হিসেবে তাঁর আনুগত্য করবে ও অন্যকে নির্দেশনা দেবে। এ বিশ্বে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর সর্বোত্তম প্রতিনিধি হিসেবে যেভাবে সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছেন, বিশ্বময় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশেষ করে আল্লাহর শেষ নবী কুরআনের মাধ্যমে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন সে আদর্শকে সামনে রেখেই মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটিই সেই আমানতের দায়িত্বের পূর্ণাঙ্গ রূপ। কেউ এ দায়িত্ব পালন না করলে তাকে জবাবদিহি করা বা শাস্তির আওতায় আনাটা স্বাভাবিক বুদ্ধির দাবি। "সেদিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের বদলা পাবে এবং তাদের প্রতি কোনো যুলম করা হবে না"।[১০৫] ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর *কিতাবুন্নাফস ওয়ার রূহ* গ্রন্থে বলেন[১০৬], মানুষ অসীম জ্ঞান অর্জন করতে চায় যা দিয়ে সে এই বস্তু জগতের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। কিন্তু তার সীমিত সামর্থ্যের কারণে সে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, কিন্তু তাই বলে সে বসে নেই, বরং জ্ঞান চর্চায় সে অতৃপ্ত। তবে তার ভেতরকার যে বৌদ্ধিক ও নৈতিক শক্তি আছে তা দিয়েই সে বিশ্বজগতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করাটাই হচ্ছে কুরআনের ভাষায় আমানতের দায়িত্ব, মানুষ যা নিজ স্কন্ধে নিয়েছে। কুরআনের ভাষায়,

> নিশ্চয়ই আমি আসমান ও যমীনকে আমার আমানত বহন করার জন্য পেশ করেছি, তারা তা পালন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি, আর মানুষই তখন তা বহন করল, নিশ্চয় মানুষ অবিচারক অজ্ঞ।[১০৭]

এখানে মানুষকে নিজ ইচ্ছায় সে দায়িত্বভার গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। যদি তার মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া না হত তাহলে তাকে দায়িত্ব দেওয়ার একথা জানানোর প্রয়োজনও ছিল না। মু'তাযিলাগণ এ সম্পর্কে বলেন, মানুষের ইচ্ছা আর কামনা এক নয়। মানুষের ইচ্ছা তার ক্ষমতার প্রমাণ করে যেমনিভাবে ইচ্ছা না করাও তার ক্ষমতার প্রমাণ। অন্যত্র এসেছে,

> যদি এই কুরআনকে আমি পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তুমি অবশ্যই দেখতে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হচ্ছে, এসব দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে আমি এ জন্য পেশ করছি যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে।[১০৮]

এখানেও মানুষকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা পাহাড় পর্বতের মত সুদৃঢ় কোনো কিছুকে দেওয়া হয়নি এবং মানুষ তার চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে সহজে সেটি উপলব্ধি করতে পারে। মানুষকে আল্লাহ দায়িত্ব দেওয়ার সাথে সাথে সামর্থ্য দিয়েছেন। মু'তাযিলাগণ সামর্থ্যকে দায়িত্বের জন্য প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু আশআরীয়গণ সামর্থ্যকেও আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেন। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে সামর্থ্য দেন সেই কাজ সম্পন্ন করতে পারে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে কুরআনে বর্ণিত নির্দেশগুলোর বাস্তবায়ন মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী বা জড়ের পক্ষে সম্ভব নয়। এটিই তার দায়িত্ব

পালনের মূল ভিত্তি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী এর ব্যাখ্যায় বলেন, আসলে মানুষের মধ্যে সেই আমানত বহন করার সুপ্ত যোগ্যতা আছে। মানুষের অজ্ঞ থাকার অর্থও তার জ্ঞানী হওয়ার সামর্থ্যকে প্রমাণ করে।[১০৯] এই যোগ্যতা অনুযায়ী সে কাজ করে কি না সেটিই আল্লাহ যাচাই করবেন।

ইসলামী নীতিদর্শনে বাধ্যবাধকতার ধারণা

নৈতিক বাধ্যতাবোধ নীতিদর্শনের একটি সাধারণ ধারণা এবং নৈতিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা কেন্দ্রীয় ধারণা । পবিত্র কুরআনে এর পরিভাষা হচ্ছে *উজূব*। আল গাযালী আবশ্যকীয়তার অর্থ করেছেন, এমন বিষয় হিসেবে যা অবহেলা করলে ব্যক্তির প্রকৃত স্বার্থের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।[১১০] সুখবাদ, বুদ্ধিবাদ, পূর্ণতাবাদ, উপযোগবাদসহ প্রতিটি মতাদর্শে নৈতিক বাধ্যতাবোধের আলোচনা এসেছে। কারণ বাধ্যবাধকতা ছাড়া দায়িত্ব পালনের কোনো যৌক্তিকতা নেই আর দায়িত্ব পালন না করা হলে সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, খুব স্বাভাবিক কারণেই সুবিচার না থাকলে সমাজ রাষ্ট্র ও সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। এজন্য যে কোনো নৈতিক মতের জন্যই এই ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু কোনটি করা উচিত কোনটি উচিত নয় এটা বলার মাধ্যমে কেনো নৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একটি জিনিস সুন্দর মানেই হচ্ছে তাতে সৌন্দর্যের উপাদানগুলো অপরিহার্যভাবে অবস্থান করবে। ঐ জিনিসটির জন্য তা বাধ্যতামূলক। আবদুল্লাহ দারাজ এভাবে বাধ্যতাবোধের ধারণাকে স্পষ্ট করেন।[১১১] ইসলামী নীতিদর্শনে বিষয়টি আরো অনেকেই আলোচনা করেন।

আল গাযালীর মতে আবশ্যকতা দুই ধরনের: যৌক্তিক আবশ্যকতা এবং বিচক্ষণ চিন্তা থেকে সৃষ্ট আবশ্যকতা। যৌক্তিক আবশ্যকতা হচ্ছে জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের বস্তুর অস্তিত্বের আবশ্যকতা। অর্থাৎ আমরা যা জানি তা বাস্তব হওয়া। অন্যদিকে, বিচক্ষণ চিন্তা থেকে যা আবশ্যক তা হচ্ছে মানুষের প্রকৃত স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর জিনিস থেকে বেঁচে থাকা। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারা এটিকে শুধু পার্থিব ক্ষতি হিসেবে দেখেন, কিন্তু আল্লাহতে বিশ্বাসী ব্যক্তি এটিকে দেখেন উভয় জগতের ক্ষতি হিসেবে। অবিশ্বাসীগণ তাদের প্রজ্ঞার মাধ্যমে বলতে পারেন, ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া কিংবা অসহায়কে সাহায্য করা সামর্থ্যবানদের জন্য আবশ্যক। স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিক বার্গসোঁর মতে সামাজিক চাপ এবং ব্যক্তির সৃজনশীল মেধা ও অন্তর্দৃষ্টি থেকে বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হয়।[১১২] প্রকৃতপক্ষে এটিও চূড়ান্ত নয় বরং আংশিক সত্য। কারণ, পরকালীন ক্ষতি বা শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য কোন জিনিস আবশ্যক তা স্বজ্ঞা বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে বলা যায় না। সুতরাং কোন কাজ করা আবশ্যক তা চূড়ান্তভাবে কেবল প্রত্যাদেশই বলতে পারে।

প্রতিটি মানুষ সহজাত সত্য হিসেবে এটা স্বীকার করে যে, মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব তা করতে সে বাধ্য নয়। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবের কল্যাণ ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্টি করেননি (২: ২৯)। প্রকৃতির জগতে সবার নিয়ম মেনে চলা অপরিহার্য; সেখানে কোনো ব্যতিক্রম হলেই ধ্বংস ও বিপর্যয় নেমে আসে। এসব নিয়ম অলিখিত ও আবশ্যকীয়- ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সেগুলোকে মানতে হয়; (৩: ৮৩, ১৩: ১৫)। কিন্তু

মানুষকে নিয়ম মানার ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দেওয়া হয়েছে যদিও তা তার জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলেই যা ইচ্ছা তাই করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; (৪০: ২০, ৭: ১৫৬)। আবার বলা হয়েছে, তাঁর দয়া সব কিছুকে আবৃত করে রেখেছে; (৭: ১৫৬), কেন আল্লাহ শাস্তি দেবেন যদি তুমি কৃতজ্ঞ থাক ও বিশ্বাসী হও? আল্লাহ দায়িত্বশীল, সতর্ক; (৪: ১৪৭)। আল্লাহ কোনো জাতিকে তার অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী সুবিচারের ভিত্তিতে ধ্বংস করেন; (৫: ১৭)। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ অযথা কোনো কিছু করেন না, তাঁর আদেশে বা কাজে কোনো খামখেয়ালিপনা নেই, বরং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কাজ অত্যন্ত যৌক্তিক ও সুচিন্তিত; সুতরাং আল্লাহর আদেশ মেনে চললে মানুষের নিজেরই কল্যাণ। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নিজেকে উপস্থাপন করেছেন, সেগুলোকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে একসাথে। কারণ, আল্লাহর বিচারে ও সিদ্ধান্তে কেউ ত্রুটি দেখাতে পারে না, (৬৮: ৩)।

নৈতিক অনুমোদন

একটি নৈতিক তত্ত্বকে চূড়ান্তভাবে অনুসরণ করতে যে বাধ্যবাধকতা থাকে তা কীভাবে নির্ণয় করা যায় সেটিই নৈতিক অনুমোদন বা নিয়ন্ত্রণ। যেমন, উপযোগবাদী বেন্থাম নৈতিক নিয়ন্ত্রণকে প্রথমত দুটি ভাগ করেন: বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ। বাহ্যিকভাবে আমাদের নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক বিধান, রাষ্ট্রীয় আইন, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণভাবে আমাদের নৈতিক জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে বিবেকের শাসন।[১১৩]আবদুল্লাহ দারাজ বলেন, আমাদের দায়িত্বের ক্ষেত্র তিনটি বিষয়ের সাথে জড়িত: নৈতিক দায়িত্ব, আইনগত দায়িত্ব এবং ঐশ্বরিক দায়িত্ব। অনুরূপভাবে অনুমোদনের ধারণাটিও তিন ধরনের: নৈতিক অনুমোদন, আইনগত অনুমোদন এবং ঐশ্বরিক অনুমোদন।[১১৪]

আইন সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে: প্রাকৃতিক আইন, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক আইন এবং নৈতিক আইন। যে কোনো আইনই তার অধীনস্তদের অনিবার্যভাবে মানতে হয়, অথবা দণ্ড ভোগ করতে হয়। যে আইন মানা বাধ্যতামূলক নয় সেটি আদৌ আইন নয়। আইনের মধ্যে কঠোরতা বলতে কিছু নেই। আমরা স্বাস্থ্যবিধির শর্ত মেনে বেঁচে থাকি, তাতে যত কষ্টই হোক না কেন। একটি নৈতিক আইনের বাস্তবায়ন বা লঙ্ঘনে কেনো ফলাফল না থাকলে ব্যক্তির উপর তা চাপিয়ে দেওয়া কেবল অকার্যকরই হবে না বরং স্বেচ্ছাচারী ও অযৌক্তিক হবে। বাধ্যতামূলক না হলে এর কোনো অর্থই হয় না। অর্থাৎ শাস্তির মাধ্যমে অনৈতিক কাজ বন্ধ করাই হচ্ছে আইনগত অনুমোদন, যার বাস্তবায়ন করে আদালত। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী চললে কোনো সমাজই এর প্রতিদান দেয় না; কিন্তু অপরাধ করলে শাস্তি দেয়। অর্থাৎ আইন প্রতিদানমূলক নয়, বরং প্রতিরোধমূলক। আইনের উদ্দেশ্য অনৈতিক কাজ বন্ধ করা এবং এর জন্য সব সমাজেই কঠোর ও লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। নৈতিকতা বলতে যদি ভালো কাজের প্রতিষ্ঠা ও মন্দ কাজের প্রতিরোধকে বোঝানো হয় তাহলে আইন নৈতিকতার অর্ধেক অংশকে সুরক্ষা দেয়। অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে নৈতিকতার অর্ধেকের অনুমোদন ঘটে। ইসলামী আইনে দু'ধরনের শাস্তি রয়েছে: কঠোর (হুদুদ)এবং

সতর্কতামূলক (তা'যিরাত)। কঠোর শাস্তি কেবল কয়েকটি বিষয়ের জন্য: খুন, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ। এ সব অপরাধের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে তা বাস্তবায়নে কোনো বিশেষ বিবেচনার সুযোগ থাকে না। ইসলামের কঠোর শাস্তিগুলো অত্যন্ত তাত্ত্বিক ও দৃষ্টান্তমূলক। মহানবী (স.) এর দশ বছরের শাসনামলে এ ধরনের শাস্তি হয়েছে মাত্র হাতে গোণা কয়েকটি।

নৈতিক অনুমোদনের সাথে ফলাফলের বিষয়টিকেও কুরআন সমর্থন করে। উপযোগবাদ বা ফলাফল ভিত্তিক নৈতিক মতগুলোর সাথে এক্ষেত্রে ইসলামী নীতিদর্শনের মিল রয়েছে। স্বভাবতই আমাদের নৈতিক আচরণের জন্য আমাদের মধ্যে আনন্দ ও বেদনার সৃষ্টি হয়, সুস্থতা ও অসুস্থতা আসে। অর্থাৎ আমরা ভালো কাজ না করলে ক্ষতিগ্রস্ত হই, করলে উপকৃত হই। কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে তা স্বীকার করেছে এবং বিভিন্ন স্থানে এটিকে বর্ণনা করেছে। যেমন, তোমরা অর্বাচীনদের হাতে তাদের সম্পদ ন্যাস্ত করো না, যার দায়িত্ব আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, কিন্তু তাদেরকে খাবার ও পরিধেয় দাও (৪: ৫); এমন কিছু জিজ্ঞেস করো না যা জানলে তোমাদের কষ্ট হবে (৫: ১০১); (মুসলিম নারীদের পোশাক সম্পর্কে) যেন তারা চিহ্নিত হতে পারে এবং ক্ষতির সম্মুখীন না হয় (৩৩: ৫৯); মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর, তাহলে শত্রু বহুদিনের বিশ্বস্ত বন্ধুর মত হয়ে যাবে (৪১: ৩৩); শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায় (৫: ৯১); (*কিসাস* বা হত্যার পরিবর্তে হত্যা করার উদ্দেশ্য) তা না করলে সবার জীবন ঝুঁকিতে পড়বে (২: ১৭৯); সামরিক বাহিনী বা নিজ জাতির মধ্যে মতানৈক্য হলে পরাজয় ও ক্ষমতাহীনতা তৈরি হবে (৮: ৪৬); যুদ্ধের উদ্দেশ্য দেশ বিজয়, ক্ষমতা বা সম্পদ অর্জন নয়; বরং এর উদ্দেশ্য: (ক) অবিশ্বাসীদের আক্রমণাত্মক ক্ষমতা নষ্ট করা (৪: ৮৪); (খ) পৃথিবীতে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানো থেকে রক্ষা করা (২: ২৫১); (গ) ধ্বংসের হাত থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা (২২: ৪০); (ঘ) আগ্রাসীদের শাস্তি ও মুমিনদের নিরাপত্তা দেওয়া (৯: ১৪)। আয়াতগুলোর প্রতিটিতে ভালো কাজের বিনিময়ে একদিকে ভালো ফলাফলের কথা এসেছে, অপরদিকে না করলে সেটির কষ্টকর ও অনিবার্য পরিণতির কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তাৎক্ষণিক ফলাফলের জন্যও নৈতিকভাবে কাজ করতে বাধ্য।

ঐশ্বরিক অনুমোদনের ব্যাখ্যায় বলা যায়, আমরা বাহ্যত বিভিন্ন অপরাধীর বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত, রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত কিংবা প্রতিপক্ষের মাধ্যমে শায়েস্তা হতে দেখলেও আসলে এগুলো বিশ্বজনীন নিয়মের মধ্যে পড়ে না। কারণ অনেক অপরাধীকে পরিণামে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে দেখা যায় না। অন্যদিকে আমাদের সততার জন্যও আমরা পুরস্কার আশা করতে পারি। যদি অপরাধী অনিশ্চিতভাবে শাস্তিবিহীন থাকে তাহলে সৃষ্টি ব্যর্থতায় রূপ নিত। কুরআনে এসেছে পার্থিব ও পরকালীন উভয় সফলতার কথা। পার্থিব জীবনে সফলতা প্রসঙ্গে– যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাকে এমন রিযক দেবেন যা সে কল্পনাও করেনি (৬৫: ২-৩); "আমার অনুগত বান্দারা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে" (২১: ১০৫); "যদি আমার পথ থেকে মুখ ফেরাও অন্য জাতিকে ক্ষমতা দেব" (৪৭: ৩৮); যে সৎ কাজ করে আল্লাহ তাকে পথ দেখান (২৯: ২৯; ৫: ১৬); যে মন্দ কাজ করে তার পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেন (৫০: ২৮); যে ভালো কাজ করে আল্লাহ তাকে

ভালোবাসেন (২: ১৯৫)। কিন্তু পার্থিব এই সফলতা পূর্ণাঙ্গ সফলতা নয়। সার্বভৌম ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে একে সন্তোষজনক বলা যায় না। এগুলো কেবল পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচারের আভাস। সবচেয়ে বড় দুষ্কৃতিকারীও কোনো ভালো কাজ এমনকি ব্যক্তি-স্বার্থে করলেও আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান সে পাবে, যেমনিভাবে কেউ ব্যাংকে টাকা রাখলে তা ফেরত পায়, যদিও সে খারাপ ব্যক্তি হয়। পরকালে জান্নাত ও জাহান্নামের মাধ্যমে মানুষ বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিদান পাবে। আমাদের বিবেক যতই আমাদের ভালো কাজের চেতনা সৃষ্টি করুক না কেন আমরা দৈনন্দিন সব কাজেই প্রতিদানের আশা করি। একজন লেখক, বিজ্ঞানী বা বিখ্যাত ব্যক্তিকে যদি পুরস্কৃত করা না হয় তাহলে সেটিকে আমরা কেউই পছন্দ করব না। নোবেল পুরস্কার পাওয়া মহৎ প্রাণ ব্যক্তিগণ কেউ বলেন না তাঁকে পুরস্কৃত করে ভুল করা হয়েছে, বরং কর্তৃপক্ষকে এমন নির্বাচনের জন্য তাঁরা ধন্যবাদ জানান। সেই পুরস্কার যদি পরজগতে ঈশ্বর কর্তৃক দেওয়া হয় তাহলে তা অযৌক্তিক বলা সঙ্গত হতে পারে না।

অতএব বলা যায়, কুরআন নৈতিক আদেশ পালনে যে বাধ্যবাধকতার কথা বলেছে তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদনযোগ্য। তিনভাবে তা প্রমাণ করা যায়: আইনের মাধ্যমে, স্বাভাবিক নৈতিক চেতনার মাধ্যমে এবং চূড়ান্তভাবে পরকালীন বিচারের মাধ্যমে। তবে নৈতিক বিধান মানার এই আবশ্যকতা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হয়। ইসলামের যাবতীয় বিধান রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা ছাড়া সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেমন, ইসলাম যে সুবিচার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে তা স্বয়ং মহানবী (স.) করে দেখিয়েছেন। তিনি সুদ নিষিদ্ধ করেছেন, যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে তা নিয়ন্ত্রণ না করতেন, তাহলে তা তিনি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে পারতেন না। অন্যায় কাজ বন্ধের জন্য যেমন আইন প্রয়োগের ক্ষমতা প্রয়োজন তেমনি ভালো কাজের বাস্তবায়নের জন্যও তা প্রয়োজন। ইসলামকে এজন্যই একই সময় আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ধর্ম বলা হয়। অন্যসব নীতিদর্শনে এই তিনটি বিষয়ের মিলন পাওয়া যায় না।

সুখী ও উত্তম জীবন: চরম লক্ষ্য

কুরআন মানুষকে *'হায়াতান তায়্যিবাতান'* বা উত্তম জীবনের দিক নির্দেশনা দিয়েছে।[১১৫] যে কুরআনের এই নির্দেশনা মেনে চলবে কুরআন তাকে পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত যত ধরনের নৈতিক চিন্তাধারার আবির্ভাব হয়েছে, সেগুলোর প্রধান একটি আলোচ্য বিষয় 'সর্বোচ্চ ভালোত্ব' অর্জন। সেটি সম্ভব মানব জীবনের দুঃখ দূর করে সর্বোচ্চ সুখ অর্জনের মাধ্যমে। গ্রিক, ভারতীয় বা আধুনিক নীতিদর্শনে সুখ অর্জনকে জীবনের সব কাজের মূল কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়েছে। কুরআনও মানব জীবনের চরম সুখ অর্জনের পথ দেখিয়েছে।

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আল কিন্দী, আল ফারাবী, আল রাযী, মিসকাওয়া, আল গাযালীসহ প্রায় সবাই তাঁদের নৈতিক আলোচনার বড় একটি অংশ জুড়ে এটি আলোচনা করেছেন। দুঃখের সংজ্ঞায়ন, দুঃখের কারণ এবং দুঃখ দূর করার মাধ্যমে সুখ উৎপাদনের বিভিন্ন পন্থা তাঁরা বিশ্লেষণ করেন। আল কিন্দী

দুঃখের কারণ হিসেবে বলেন, মানুষ মনে যা কামনা করে সেটি অর্জনে ব্যর্থ হলেই দুঃখের সূচনা হয়। তিনি তাঁর *আল হীলা লি দাফয়িল আহযান* গ্রন্থে দুঃখ দূর করার পন্থা নির্দেশ করেন। সহজ কথায় সেটি হচ্ছে, অল্পে তুষ্টির পথ অনুসরণ। আরেকটি উপায় মৃত্যু ভয় দূর করা।[১১৬]আল রাযী তাঁর *আত তিব্বুর রূহানী* (আত্মার চিকিৎসা) গ্রন্থের শুরুতেই প্রজ্ঞার মহত্ত্বের আলোচনা করেন। তাঁর মতে, সুখবাদীগণ আনন্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কেই কেবল অজ্ঞ নন, বরং তারা প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তি যেখানে ক্ষণস্থায়ী বা বর্তমান সুখ চায়, প্রজ্ঞা সেখানে পরকালীন জীবনের বাস্তবতাকে আবশ্যকীয় মনে করে পরকালীন সুখ চায়।[১১৭] আল ফারাবী তাঁর *তাহসীলুস সাআ'দাইন* গ্রন্থে দেখান মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার মাধ্যমেই সুখ অর্জন করতে পারে।[১১৮]

মিসকাওয়া মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে সুখকে উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে নৈতিক পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমেই চূড়ান্ত সুখ আসে। চূড়ান্ত সুখ হচ্ছে বৌদ্ধিক ও অতি জাগতিক। মানুষ বৌদ্ধিক পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে উচ্চতর আধ্যাত্মিক জগতে যুক্ত হতে পারে, যেখানে সমস্ত দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর আলোতে নিজেকে আলোকিত করতে পারে।[১১৯] অর্থাৎ তাঁর নীতিদর্শনে প্রচলিত সুখবাদের বিপরীতে মানসিক ও অতি জাগতিক উভয় ধরনের সুখের কথা বলা হয়েছে, অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকগণ যার সমর্থন করেন। তিনি সুখ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দুটি বিষয় নির্দেশ করেন: একটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মাধ্যমে সুখ অর্জন, যা তার প্রবৃত্তি পূরণ করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে পরকালীন ও চূড়ান্ত সুখ অর্জন। এটিই হচ্ছে চূড়ান্ত সফলতা ও পরম সুখ, আল্লাহর সাক্ষাৎ ও তাঁর পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদা অর্জন। কুরআনের ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বিষয়টিকে স্পষ্ট করেন। কুরআন এটিকে বলেছে, "মানুষ জানে না তার কর্মের প্রতিদান স্বরূপ তার জন্য নয়ন জুড়ানো কোন কোন নিয়ামত গোপন রাখা হয়েছে";(৩২: ২১)। মহানবী (স.) বলেন, সেখানে আছে এমন সব জিনিস, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং মন চিন্তাও করতে পারে না, (বুখারী)।[১২০] আল কিন্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সুখ উৎপাদনে দুঃখ দূর করার কৌশল আলোচনা করেন। ভীরুতার, বিশেষত মৃত্যু ভয়ের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন মানুষে অজ্ঞতাকে। মৃত্যু ভয়ের কারণ, মৃত্যুর পর কী হবে তা না জানা। এই অজ্ঞতা দূর করতে হবে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান দিয়ে। যে জানে সে দৃঢ়তা লাভ করে, যে দৃঢ়তা অর্জন করে কল্যাণের পথ তার জন্য সহজ হয়। যে বিশুদ্ধ বাসনা নিয়ে সরল পথ সন্ধান করে সে নিশ্চিভাবে তাতে পৌঁছুতে পারে।[১২১]

ইবন হাযম এর মতে, হতাশা দূর করা মানুষের একমাত্র সাধারণ লক্ষ্যই নয় বরং তার সব কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, মানুষ এক কদমও সামনে এগুতে পারে না, যতক্ষণ না তার হতাশা দূর করতে পারে। এর সমাধানের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে পরকালীন কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে পূর্ণরূপে ফিরে আসা।[১২২]পার্থিব দৃষ্টিতে, মানুষ হতাশা দূর করতে চায় অভাব পূরণের মাধ্যমে। যেমন, সম্পদ, খ্যাতি,

কর্তৃত্ব অর্জনের মাধ্যমে, এমনকি জ্ঞানের অন্বেষণকারী অজ্ঞতা দূর করে হতাশা দূর করতে চায়। কিন্তু বাস্তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা, শত্রুতা ইত্যাদি কারণে তা অর্জন হয় না।[১২৩] এ কারণেই আত্মার প্রশান্তি অর্জনের মাধ্যমে হতাশা দূর করতে হয়, সৎ ব্যক্তি তাকওয়া ও ভালো কাজের মাধ্যমে তা করেন।[১২৪] অর্থাৎ পরকালীন চিন্তা ও কাজের মাধ্যমেই প্রকৃত সুখী জীবন লাভ সম্ভব।

রাগিব ইস্ফাহানী আত্মার মৌলিক গুণ হিসেবে সাহসের উল্লেখ করে বলেন, এর মাধ্যমেই ভয় ও হতাশা দূর করতে হয়। তবে তিনি ভয়কে দুটি ভাগ করেন: পার্থিব ভয় ও পরকালীন ভয়। পরকালীন ভয়ই হচ্ছে আল্লাহর ভয়, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে আর এটিই আল্লাহতে পূর্ণ সমর্পণ। অন্যদিকে পার্থিব ভয় সৃষ্টি হয় মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের কারণ থেকে– মানব অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে যার মুখোমুখি। এর উৎপত্তিতে আছে মানুষের এ জগতের অনিশ্চিত যাত্রা এবং দুঃখ-কষ্টের প্রতি অরক্ষিত প্রতিরোধ। প্রকৃতপক্ষে ক্ষণস্থায়ী এ বিশ্বে স্থায়িত্ব অসম্ভব। সুতরাং যে দুঃখ থেকে যথার্থ মুক্তি চায় সে বোকা, কারণ সে এমন জিনিস অর্জন করতে চায় যা তার অধীন নয়। বরং তার কর্তব্য দুঃখ সৃষ্টিকারী জিনিস অর্জন থেকে বিরত থাকা এবং অস্থায়ীভাবে যে সম্পদের মালিক হয়েছে তা বিলিয়ে দেওয়া।[১২৫]মৃত্যু ভয় থেকে বাঁচার চেষ্টা না করে বরং সবার উচিত মৃত্যুকে ভালোবাসা এবং অল্প সময়ের নোটিশে মৃত্যুকে গ্রহণ করার সম্ভাব্য বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করে সেগুলো মনে লালন করা। তাঁর মতে, তাকওয়াই মানুষকে মৃত্যু ভয় ও পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিতে পারে।[১২৬]

আল গাযালীর নৈতিক আলোচনার কেন্দ্রেই সুখের অবস্থান। সুখ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, নির্ভেজাল আনন্দ, সীমাহীন সম্পদ, চিরস্থায়ী পূর্ণতা এবং অতুলনীয় আনন্দের অপার্থিব অবস্থা যা সব সময়ের জন্য স্থায়ী। যে এ ধরনের অবস্থার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না সে এমন সুখের অর্জনের কষ্ট থেকে সম্ভবত বিরত থাকতে পারে। অবশ্যই কেউ কেউ এর উপযুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়, এমন প্রজ্ঞার কারণে, যা এগুলোর কোনো একটিকে অস্বীকার করে; যেমন, ইবন সিনার মত কিছু দার্শনিক। অথবা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার মাধ্যমে- নাস্তিক ও সুখবাদীগণ এদের অন্তর্ভুক্ত।[১২৭]

তিনি সুখকে সর্বোচ্চ ভালো হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে সেটিকে পার্থিব ও অপার্থিব নামে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন। পরকালীন সুখ মৌলিক হলেও পার্থিব সুখ অর্জন ছাড়া তা সম্ভব নয়। পার্থিব সুখের জন্য প্রয়োজন: (১) চারটি মৌলিক সদগুণ অর্জন: প্রজ্ঞা, সাহস, সংযম ও সুবিচার (২) স্বাস্থ্য, শক্তি, সুন্দর দেহ এবং দীর্ঘ জীবন, (৩) সম্পদ, পরিবার, সামাজিক পদবী ও সম্ভ্রান্ত বংশ, (৪) আল্লাহর হিদায়াত, নির্দেশনা ও সাহায্য। আত্মার গুণগুলো অনিবার্যভাবে অপার্থিব সুখের সাথে যুক্ত। অন্যগুলো বিভিন্ন স্তরের হতে পারে। যেমন, সম্পদ তাকওয়া ও দানশীলতার জন্য প্রয়োজন; সন্তান, আত্মীয়-স্বজন দুর্ভাগ্য ও উন্নতি উভয় ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে।[১২৮]

সাধারণত আনন্দকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, কামনার বস্তুকে অর্জন রূপে, আর কামনাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় তীব্র আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে ধারণ বা অর্জনের প্রতি আত্মার ঝোঁককে।[১২৯] আনন্দকে গাযালী তিনটি ভাগে বিভাজন করেন: (১) বুদ্ধিবৃত্তিক আনন্দ, যেমন, প্রজ্ঞা শিক্ষা করার আনন্দ (২) জৈবিক আনন্দ: মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে একই ধরনের। যেমন, খাবার, পানীয়, বংশ বিস্তার ইত্যাদি। (৩) সামাজিক বা রাজনৈতিক আনন্দ, যেমন, বিজয়ী হওয়ার বা সামাজিক পদবীর কামনা। এই তিন প্রকার আনন্দের মধ্যে গাযালী প্রথমটিকেই শ্রেষ্ঠ বলেন, যা পার্থিব ও পরকালীন উভয় জগতের জন্য প্রয়োজন।[১৩০] সুখবাদের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি ছিল–খাবারের আকাঙ্ক্ষা সব পাপের মূল, উদরপূর্তি কামনা শক্তি বাড়িয়ে দেয়, যৌনতা শয়তানের বড় হাতিয়ার, তবে বেঁচে থাকার জন্য পরিমাণমত খাবার অনুমোদনযোগ্য। গাযালীর বিভিন্ন গ্রন্থে এই বিষয়গুলোর বিবরণ এসেছে।

ফখরুদ্দীন রাযী সুখবাদের সমালোচনা করেন। তিনি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক সুখ নামে সুখের দুটি ভাগ করেন। ইন্দ্রিয় সুখের ক্ষেত্রে মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য নেই। সে কারণে, মানবীয় পূর্ণতা অর্জনে এটি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। আনন্দ বলতে তিনি দেখান যা অনিবার্যভাবে ব্যথা দূর করতে চায়। যেমন, একজন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাবারের আনন্দ বড়, গরম বা ঠাণ্ডায় কষ্ট পাওয়া ব্যক্তির নিকট অনুরূপ পোশাক আনন্দের।[১৩১] ইন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষার আনন্দ মানুষ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে আপেক্ষিক। যেমন, একটি কুকুরের কাছে একটি হীরক খণ্ডের চেয়ে একটি হাড় বেশি প্রিয়। কারণ, এটি তার প্রয়োজন পূরণ করে। তবে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেটিও আনন্দ দেয় না। যেমন, অতিরিক্ত খাবার কিংবা যৌনতা বরং ব্যথা বৃদ্ধি করে।

কিন্তু মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য আল্লাহর জ্ঞান সন্ধান, তাঁর আদেশ মেনে চলা এবং ভালোবাসার বন্ধনে তাঁর সাথে যুক্ত হওয়া। ইন্দ্রিয় আনন্দ এসব মহান লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধক। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয় আনন্দ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা সম্ভব নয়। বরং এগুলো সবসময় কষ্টের সাথে জড়িত, কিংবা দুঃখ বা ঘৃণা সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে; আবার পুরোপুরি অর্জন না হওয়ায় হতাশা ও দুঃখ উৎপাদন করে। মানুষের কামনা অনন্ত আর সে কারণে এগুলোর সন্তোষবিধান সম্ভব নয়।[১৩২] তিনি আরো বলেন, আনন্দ অর্জনের একটি মাধ্যম হচ্ছে সম্পদ। কুরআন কখনো এটিকে অর্জনের নিন্দা করেছে, কখনো প্রশংসা করেছে। অবশ্যই সম্পদ নিজে প্রশংসা বা নিন্দাযোগ্য নয়, বরং এর ব্যবহারের উপরই সব নির্ভর করে। ভালো কাজেও ব্যবহার করা যায়; যেমন, দান, যাকাত বা ধর্মীয় কাজে ব্যয় অনেক প্রশংসনীয়।

সুতরাং কুরআনের নৈতিক ধারণার উদ্দেশ্য সুখবাদ, উপযোগবাদ, প্রয়োগবাদ, পূর্ণতাবাদ, স্বজ্ঞাবাদ ও সব উন্নত আদর্শের ভেতরকার ভালো অংশগুলোর সমন্বয়ে এমন এক উত্তম আদর্শ উপস্থাপন যা মানব জাতির কল্যাণে অধিকতর উপযোগী। এজন্যই এটিকে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ব্যবস্থা বলা যায়। মানুষের দুঃখ দূর করার যত মাধ্যম আছে, তা কুরআনেই ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী নীতিদর্শনে প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের অবস্থান

মানব চরিত্রকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করতে কুরআন এক দিকে যেমন আদেশ স্বরূপ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছে, তেমনি নিজের আকল দিয়েও কাজ করতে বলেছে। এই উভয় প্রকার নির্দেশনার কারণে কুরআনের ব্যাখ্যায় প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের প্রাধান্য নিয়ে আলোচনা আসে। হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নৈতিকতার জন্য পার্থিব ও পরকালীন জগতের সবচেয়ে উপকারী বিষয় হচ্ছে ধর্মীয় জ্ঞানের স্পষ্ট উপলব্ধি।[১৩৩] অর্থাৎ ওয়াহীর জ্ঞানই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আবু বকর আল রাযী আকলকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে বর্ণনা করেন। কারণ, এটি এমন ক্ষমতা যা কেবল পশুদের থেকে মানুষকে পৃথক করে না, বরং বিশ্বজগতকে উপলব্ধি করতে পথ দেখায়। এটি আত্মার নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, যার কর্তৃত্ব কামনা বাসনাকে দমনের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের নিশ্চয়তা দেয়।[১৩৪] আবুল হাসান মাওয়ারদী হযরত আলী (রা.) এর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি এটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ বণ্টন হিসেবে বর্ণনা করেন, যার মাধ্যমে একজন যুবক সমাজে সম্মানিত বা অপমানিত হয়। তাঁর মতে বুদ্ধির অপপ্রয়োগে চতুরতা ও ষড়যন্ত্র হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধি সবসময় তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়ের সাথে যুক্ত, সে কারণে তা মন্দের উপাদান হতে পারে না।[১৩৫] ইবন হাযম আকলকে তাকওয়া ও সদগুণের অনুশীলনের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেন, যার বিপরীত হুম্ক বা অজ্ঞতা- যা অধার্মিকতা ও পাপের মূল। রাগিব ইস্ফাহানীর নৈতিক তত্ত্বে আকল বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাঁর মতে, আকল যখন পার্থিব ও পরকালীন জ্ঞান দ্বারা বাস্তব রূপ নেয় তখন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সদগুণ সৃষ্টি হয়; যেমন, বিচক্ষণতা, উত্তম কল্পনা, ঐশী প্রেরণা এবং আল্লাহর আনুগত্যের অনুভূতি।[১৩৬] তিনি আকল ও ওয়াহীর সমন্বয় করে বলেন, আকল হচ্ছে ভিত্তি, ঐশী বিধান হচ্ছে রাজপ্রাসাদ। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে আকল ওয়াহীর মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না। যেমন, শুকর বা মদ খাওয়া। মৃত ব্যক্তির শোনা ও দেখা ওয়াহীর জ্ঞান ছাড়া আকল দিয়ে উপলব্ধি সম্ভব নয়।[১৩৭]

কিন্তু নৈতিক জ্ঞান হিসেবে আকল আগে না কি ওয়াহী আগে সেই আলোচনা শুরু হয়েছে মু'তাযিলাদের মাধ্যমে। মু'তাযিলাগণ স্বীকার করেন, নৈতিক জ্ঞানের জন্য আকল ও ওয়াহী দুটোই প্রয়োজন, তবে আকল এর অবস্থান ওয়াহীর আগে। এর কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন, ওয়াহী প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতার মাধ্যমে নবী (স.) শুনতেন, সেটিই পরে অন্যদের কাছে বলতেন। শোনার জন্য আকল এর প্রয়োজন, যার বুদ্ধি কম সে কোনো কিছু শুনে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। মহানবী (স.) ছিলেন সবচেয়ে বেশি আকলসম্পন্ন। এজন্য তিনি ওয়াহীর যথার্থ মর্ম বুঝতেন।[১৩৮] এভাবে ওয়াহী বা

আল্লাহর বাণীর সত্যতার জন্য মু'তাযিলাগণ বুদ্ধির আশ্রয় নেন। তাদের মতে কুরআনকে যদি কুরআন দিয়ে সত্যায়ন করা হয়, তাহলে চক্রক হেত্বাভাসের সৃষ্টি হবে। বুদ্ধির পক্ষে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি ছিল, কুরআনকে ওয়াহী রূপে মেনে নিতে আকল এর প্রয়োজন। তবে আল-গাযালী তাদের বিরুদ্ধে বলেন, কুরআনকে আমাদের নিজ প্রয়োজনেই মেনে নিতে হয়, এতে বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। একজন রোগী ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ নিয়ে প্রশ্ন করে না, কীভাবে এটি কাজ করবে? তিনি বরং মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধেই চক্রক হেত্বাভাসের অভিযোগ করেন। যেমন, যদি মানুষ অনুসন্ধান না করে তাহলে প্রজ্ঞা ভিত্তিক অনুসন্ধানের আবশ্যকীয়তা জানবে না এবং যদি অনুসন্ধানের আবশ্যকীয়তা না জানে তাহলে তারা অনুসন্ধান করবে না।[১৩৯]এজন্য তাঁর মত হচ্ছে, আমাদের শুরুটা হবে ওয়াহীর মাধ্যমে আর এর সাথে আকল এর মিলনের মাধ্যমেই সরল পথ (*আস সিরাতুল মুস্তাকীম*) বা নৈতিকতার দিক থেকে পূর্ণতা অর্জিত হবে। প্রজ্ঞার কাজ হচ্ছে কামনা ও ক্রোধের ক্ষমতাকে অধীন করে রাখা।[১৪০] তাঁর মতে, অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞার (কাশ্‌ফ) মাধ্যমে আকল জ্ঞানের উৎপত্তিতে সাহায্য করে। আকল বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি- ক্ষুদ্রতম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক দ্রব্য বা আল্লাহর উপলব্ধি।

আবার ওয়াহী দুই ধরনের: *ওয়াহী মাতলূ* (কুরআন) এবং *ওয়াহী গাইর মাতলূ* (হাদীস)। পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত ও সংশয়ের উর্ধ্বে। কিন্তু হাদীস গ্রন্থাকারে লিখিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে ছিল। কিছু লোক স্মৃতিশক্তির স্বল্পতার কারণে, কিছু লোক খারাপ উদ্দেশ্যে এখানে নিজস্ব মিশ্রণ ঢুকাতে চেয়েছে। যখন লিপিবদ্ধ হলো তখন সেখান থেকে যে কোনো ভেজাল বা বানানো হাদীস বের করার বিভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করে যাচাই বাছাই করা হলো- কোনটি বিশুদ্ধ (সহীহ) কোনটি বিশুদ্ধ নয়। এর ফলে বিশুদ্ধ হাদীস পেতে কোনো সমস্যা হয় না। কুরআন মহানবী (সা.) এর কথার ব্যাপারে বলে দিয়েছে: "তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি, বিপথগামীও হননি, তিনি নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে কথা বলেন না;" (৫৩: ২-৩)। মহানবী নিজেও বলেছেন, "আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা এদুটো আঁকড়িয়ে ধরবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অন্যটি আমার জীবনাদর্শ (সুন্নাহ)। বুখারী ও মুসলিমসহ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহের সহীহ হাদীস ইসলামের মৌলিক বিধি-নিষেধের প্রামাণ্য দলীল। এসব গ্রন্থের প্রতিটিতে বিরাট একটি অংশ জুড়ে আছে *আদাব* বা শিষ্টাচার অধ্যায়, যেখানে আছে নৈতিকতার বিভিন্ন নিয়ম ও ব্যবহারিক জীবনে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার গুরুত্ব ও পদ্ধতি।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের আত্মার প্রধান সদগুণ হিসেবে আকল এর আলোচনা এসেছে। কুরআন সেটিকে সমর্থন করেছে। সক্রেটিস বলেছিলেন, বুদ্ধিই হচ্ছে জ্ঞানের প্রধান উৎস আর জ্ঞানই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সদগুণ। প্লেটো তাঁকে সমর্থন করে বলেন, প্রত্যক্ষণ বা অভিজ্ঞতা নয় বরং মানুষের প্রজ্ঞাই তাকে ভালো-মন্দসহ সব জ্ঞান দেয়। ফ্রান্সিস বেকনের মতে, কিছু পূর্বসংস্কারের কারণে মানুষ সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না; যেমন, (১) স্বভাবগত পূর্বসংস্কার (২) ব্যক্তিগত পূর্বসংস্কার (৩) জনশ্রুতিমূলক পূর্বসংস্কার

(৪) প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রাধিকারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য । তবে কী করলে সত্য ও সঠিক জ্ঞান পাওয়া যাবে তা তিনি বলেননি। ডেকার্ট মনে করেন আমাদের মনের বিভিন্ন ধারণা থেকে আমরা জ্ঞান পাই; যেমন আগন্তুক ধারণা, কৃত্রিম ধারণা ও সহজাত ধারণা। তবে সহজাত ধারণা থেকেই আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান পাই। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ার কারণে তিনি আধুনিক বুদ্ধিবাদী দর্শনের প্রধান পুরুষ। আবার জন লক বলেছেন, মানুষের মন জন্মের সময় সাদা কাগজের মত স্বচ্ছ থাকে; ধীরে ধীরে সে দেখতে দেখতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখে এবং ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সে তার জীবন পরিচালনা করে। কান্ট এসে বললেন বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা দুটির মিলনেই প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব, পৃথকভাবে নয়।

অন্যদিকে আল্লাহ মানুষকে তার বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাতে বলেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গবেষণা করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে আদেশ করেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে– 'মানুষ কেন চিন্তা-ভাবনা করে না', 'কেন গবেষণা করে না' ইত্যাদি। কিন্তু এক পর্যায়ে কুরআন বলেছে মানুষের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার কাজও সীমিত। সব সময় বুদ্ধির মাধ্যমে সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যেমন, একজন চোরের শাস্তি কেমন হওয়া উচিত, মানবেতর প্রাণীর সাথে আমাদের আচরণ কেমন হবে–ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলোর ব্যাপারে সব বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ কখনো এক হতে পারেন না। একজনের কাছে যা খুব যুক্তিসঙ্গত অন্যজন ভিন্নতর যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডনও করতে পারেন। এ সমস্যার সমাধানে কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর আদেশ বা ওয়াহী মানুষের বিতর্কের সমাপ্তি করতে পারে; (৩২: ২৫)। কুরআন বলছে, তোমাদের মতবিরোধে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন কেবল আল্লাহ; তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক। তাঁর বিচারে কোনো ধরনের বৈষম্য নেই। তবে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে কুরআন বাতিল করে দেয়নি।

নৈতিকতার জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে অজ্ঞতা বা '*জাহালাত*'। সক্রেটিসের এই কথাকে কুরআন স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু কুরআন বলে দিয়েছে, "তোমাদেরকে খুব কম পরিমাণ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে" (১৭: ৮৫); সে কারণে, "রাসূল তোমাদের সামনে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা বর্জন করতে বলেছেন তা পরিহার করো"(৫৯: ৭)। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান সহজাত ধারণার মাধ্যমেই হোক আর ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই হোক তা খুব সীমিত এবং সবসময় সিদ্ধান্ত সূচক নয়। কুরআন যে বাণী দিয়ে শুরু হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, "আল্লাহই মানুষকে কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, এমন শিক্ষা তিনি দিয়েছেন যার জ্ঞান মানুষের ছিল না; (৯২: ৪-৫)। এখানে যে জ্ঞান সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে তা ব্যাপক। তবে তাতে নৈতিক জ্ঞানও থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। আবার বলা হয়েছে,

> তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছো? তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ কর, তাতে তোমরা যা পছন্দ কর তাই পাও? না কি তোমাদের সাথে আমার কিয়ামত পর্যন্ত বলবত এমন কোনো চুক্তি আছে যে, তোমরা নিজের জন্য যা চাইবে সেখানে তাই পাবে? জিজ্ঞেস করো তাদেরকে, এ ব্যাপারে কে দায়িত্বপ্রাপ্ত? (৬৮: ৩৭-৪০)

সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানুষের স্বভাব ও মানসিক বিষয়, মানুষের প্রয়োজন বা সমস্যা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানবেন, কোন জিনিস তার জন্য কল্যাণকর সেটিও তিনি জানবেন এবং মানুষের ভালো ও মন্দ কাজের পর্যবেক্ষণ যেভাবে করতে হয় তিনি সেভাবে তা করবেন– এ বিষয়গুলো তিনি মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং নৈতিক জ্ঞান হিসেবে প্রত্যাদেশের অবস্থানকে ইসলাম যেমন সবার উপরে রেখেছে তেমনি আকল বা বুদ্ধিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। যখন উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হবে তখন প্রত্যাদেশকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. আল-কুরআন, ১৬: ৯৭। [مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ] উল্লেখ্য, এই গ্রন্থে কুরআনের আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধানত অনুসরণ করা হয়েছে- মুহাম্মদ শফী, *মাআরেফুল কোরআন* (সংক্ষিপ্ত), অনু. মুহিউদ্দীন খান (মদীনা মোনাওয়ারা: বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৯৯২)।

২. আবু ঈসা আত তিরিমিযী, *জামি' তিরমিযী*: ২২৬৩। (خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ) । গবেষণায় হাদীসের নাম্বারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নাম্বারিং এর অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1991), p.7.

৪. আল-কুরআন, ২: ১৮৫।

৫. Majid Fakhry, *Ethical Theories in Islam* (Leiden: Brill, 1999), p. 1.

৬. Ahmad ibn-Muhammad Miskawayh, *Tahdhib al-Akhlaq,* tr. in English, Constantine K. Zurayk (Beirut: American Univesity of Beirut, 1968), p.1.

৭. আল-কুরআন, ৬৮: ৪ (وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ)।

৮. আবুল ফদল জামাল উদ্দীন ইবন মনযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দারুস সদর, ১৯৯৬), পৃ. ১২৪৪।

৯. Mohd. Nasir Umar, *Christian and Muslim Ethics* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 2003), p. 1.

১০. Abu Hamid al-Ghazzali, *Al-Munqidh min al Dalal* (Sharjah: Dar al Anadalus, 1981), p.110.

১১. Mohd. Nasir Umar, *loc. cit.*

১২. R. G. Hovanniasian, *Ethics in Islam* (California: Undena Publications, 1983), p. 11.

১৩. Abdullah Draz, *The Moral World of the Quran* (London: I. B. Tauris, 2008), p.1
মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দারাজ (১৮৯৪-১৯৫৯) মিশরিয় বংশোদ্ভূত মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক। তিনি আল আযহারে অধ্যয়ন শেষে ফ্রান্সের সর্বন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ. ডি. থিসিসটি পরবর্তীতে *The Moral World of the Quran* নামে প্রকাশিত হয়, যা আধুনিক ইসলামী

নীতিদর্শনের জন্য মাইলফলক। পরে আল আযহারে অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন এবং বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হন। ইসলামী নীতিতত্ত্বকে আধুনিক দর্শনের সাথে তুলনা করে তিনি এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট ছিলেন। এছাড়া *Introduction to the Qur'an, The Qur'an: an Eternal Challenge, Morality in the Quran: The Greater Good of Humanity* তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

১৪. George F. Hourani, *Reason and Tradition in Islamic Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press,1985), p.1. জর্জ ফাদলু হরানি (১৯১৩-৮৪) বৃটেনের ম্যানচেস্টারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অক্সফোর্ড থেকে অধ্যয়ন শেষ করে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। আমেরিকার মিশিগান এবং বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ অধ্যাপনা করেন। ইসলামী নীতিদর্শনের উপর তাঁর আকর্ষণ ছিল। তিনি *Islamic Rationalism*; *Reason and Tradition in Islamic Ethics*; *Ethical Value* প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়াও অনেক প্রবন্ধ লেখেন যেগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এই বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা। ইসলামী নীতিদর্শনের বস্তুনিষ্ঠতাকে তিনি গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন।

১৫. Rudolf Carnap, "The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language" in A. J. Ayer (ed.) *Logical Positivism* (New York: The Free Man Press, 1966), p. 61.

১৬. হাসনা বেগম, *মূওরের নীতিতত্ত্ব*, অনু. কালী প্রসন্ন দাস (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১২-১৩।

১৭. Bashir Ahmad Dar, *Quranic Ethics* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1993), pp. 65-66.

১৮. John Stuart Mill, *Utilitarianism* 1863 (Canada: Batoche Books Limited, 2001), p. 10.

১৯. F. H. Bradley, *Ethical Studies* (Oxford: Oxford University Press, 1988), p. 94.

২০. Abul-Ḥasan Ali Ibn-Ismail al Ashari, *Kitab Maqalat al-Islamiyi wa-Ikhtilaf al-Muṣallin* (Berlin: Berlin International University of Applied Sciences press, 2005), p. 278. কুরআনের ভাষায় সেই মূলনীতিটি হচ্ছে: كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (৩: ১১০)।

২১. মুহাম্মদ শফী, *মাআরেফুল কোরআন* (সংক্ষিপ্ত), অনু. মুহিউদ্দীন খান (মদীনা মোনাওয়ারা: বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৯৯২), পৃ. ১৯৩-৪।

২২. আল-কুরআন, ৩: ১০৬।

২৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*: ৪৯।

২৪. আল-কুরআন, ২: ৪৪।

২৫. *জামি' তিরমিযী*: ২১৬৯।

২৬. ইমাম আল গাযালী, *এহইয়াউ উলূমিদ্দীন* (৪র্থ খণ্ড), অনু. এম. এন. এম. ইমদাদুল্লাহ (ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি., ২০০১), পৃ. ২৬৭।

২৭. *জামি'তিরমিযী*: ২৩৮৯।

২৮. *সহীহ মুসলিম*: ২৫৫৩।

২৯. আল-কুরআন,৭: ১৭৯।

৩০. George F. Hourani, *Reason and Tradition in Islamic Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), p.103.

৩১. *Ibid.*, p. 131-3.

৩২. *Ibid*., p.65.

৩৩. *Ibid*., p.141

৩৪. *Ibid*., p.251

৩৫. Abdullah Draz, *The Moral World of the Quran* (London: I. B. Tauris, 2008), p. 6.

৩৬. *Ibid.*

৩৭. আবদুল মতীন (সম্প.), *দার্শনিক যুক্তিবিদ্যা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৯-১০।

৩৮. পিটার সিঙ্গার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* , অনু. প্রদীপ কুমার রায় (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ২০৮।

৩৯. আল-কুরআন, ৬৭: ৩-৪।

৪০. Muhammad Iqbal, *op. cit.*, p.15.

৪১. Bashir Ahmad Dar, *op. cit.*, p. 2.

৪২. আল-কুরআন, ৪: ১০৮

৪৩. প্রাগুক্ত, ২: ১৮২

৪৪. প্রাগুক্ত, ২৭: ৬২

৪৫. প্রাগুক্ত, ৪: ১১০

৪৬. প্রাগুক্ত, ৩৯: ৫৩

৪৭. প্রাগুক্ত, ৬: ৫৯

৪৮. প্রাগুক্ত, ২: ২৮৪

৪৯. প্রাগুক্ত, ৪: ৭৮

৫০. প্রাগুক্ত, ৬৬: ৬

৫১. প্রাগুক্ত, ৫০: ১৭, ১৮, ২১

৫২. প্রাগুক্ত, ৩৩: ২১

৫৩. প্রাগুক্ত, ৬৮: ৪

৫৪. আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ:* ৮৯৫২; *মুয়াত্তা ই ইমাম মালিক*: ৮।

৫৫. George F. Hourani, *op.cit.*, p.265.

৫৬. Peter Adamson, Peter E. Pormann (eds.), *The Philosophical Works of al-Kindi* (New York: Oxford University Press, 2012), PP. 46-47.

৫৭. জাঁ য্যাক রুশো, *সমাজ সংস্থা*, অনু. নূর মোহাম্মদ মিঞা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮০), পৃ. ৫১।

৫৮. Muhammad Iqbal, *op. cit.*, p.110.

৫৯. আল-কুরআন, ৬২: ২।

৬০. প্রাগুক্ত, ৪: ৬৫।

৬১. প্রাগুক্ত, ১৭: ৮৫।

৬২. প্রাগুক্ত, ৫০: ৪।

৬৩. প্রাগুক্ত, ৭৫: ৪।

৬৪. প্রাগুক্ত, ৫০: ২১, ২২।

৬৫. প্রাগুক্ত, ৩৬: ৬৫।

৬৬. প্রাগুক্ত, ৪১: ২১, ২২।

৬৭. প্রাগুক্ত, ১০১: ১-৮।

৬৮. Gilbert Ryle, *The Concept of Mind* (London: Hutchinson's University Library, 1959), p. 11.

৬৯. আল-কুরআন,২৫: ২।

৭০. প্রাগুক্ত, ৬৭: ২।

৭১. প্রাগুক্ত, ৩: ৯৭।

৭২. প্রাগুক্ত, ২২:৪১।

৭৩. M. Saeed Sheikh, *Islamic Philosophy* (London: The Octagon Press, 1982), pp. 1-3.

৭৪. *আবূ দাউদ:* ৪৬৭৪।

৭৫. T. J. De Boer, *The History of Philosophy in Islam* (London: Luzaq & co., 1903), p. 43-45.

৭৬. আল-কুরআন, ৫৭: ২২।

৭৭. Majid Fakhry, *op. cit.*, p.155.

৭৮. M. M. Sharif, *A History of Muslim Philosophy* (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963), pp.199-201.

৭৯. আল-কুরআন, ২: ২৮৬।

৮০. M. Saeed Sheikh, *op.cit.*, pp.18-20.

৮১. M. Umaruddin, *The Ethical Philosophy of al-Ghazzali* (Aligarh: Educational Book House, 1962), p. 104.

৮২. আল-কুরআন, ১৬: ৯৫।

৮৩. George F. Hourani, *op. cit.*, p. 259.

৮৪. *Ibid.*, p.142.

৮৫. Majid Fakhry, *op. cit.*, pp. 56-57.

৮৬. Abdullah Draz, *op. cit.*, pp. 64-65.

৮৭. *বায়হাকী:* ৩৭৩।

৮৮. Bertrand Russell, *Political Ideals* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1933), p. 18.

৮৯. F. C. Bartlett, *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology* (Cambridge: Cambridge University Press, 1932), pp. 112-4.

৯০. আল-কুরআন, ৪: ২৮।

৯১. প্রাগুক্ত, ১১: ৯-১০।

৯২. প্রাগুক্ত, ১৮: ৫৪।

৯৩. প্রাগুক্ত, ১৭: ১০০।

৯৪. প্রাগুক্ত, ৭০: ১৯-২১।

৯৫. প্রাগুক্ত, ৩৩: ৭২।

৯৬. Bertrand Russell, *op. cit.*, pp. 22-24.

৯৭. M. Umaruddin, *op. cit.*, pp.93-95.

৯৮. O. Klinberg, *Social Psychology* (New York: Henry Holt, 1954), p. 120.

৯৯. Ragib Iṣfahani, *al-Dhariah ila Makarim al-Shariah* (Cairo: Dar al-Wafa, 1987), pp. 91-92.

১০০. Jalal al-Din Dawwani, *Akhlaq-i Jalali,* eng. tr. W. F. Thompson (London: Allen and Co. 1839), p. 25.

১০১. আল-কুরআন, ১৭: ৭০।

১০২. প্রাগুক্ত, ২২: ৬৫।

১০৩. প্রাগুক্ত, ৫১: ৫৬।

১০৪. প্রাগুক্ত, ২: ৩০।

১০৫. প্রাগুক্ত, ২: ২৮১।

১০৬. Fakhr al-Din Razi, *Kitab al-Nafs wa'l-Ruh,* tr. Muhammad Saghir Hasan Masumi (Islamabad: Islamic Research Institute, 1969), p. 43.

১০৭. আল-কুরআন, ৩৩: ৭২।

১০৮. প্রাগুক্ত, ৫৯: ২১।

১০৯. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা* (প্রথম খণ্ড), অনু. আহমদ মানযুরুল মাওলা (ঢাকা: ফেরদৌস পাবলিকেশান্স, ১৯৭৮), পৃ. ৬৬।

১১০. George F. Hourani, *Islamic Rationalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), p. 138.

১১১. *Ibid*., p. 64.

১১২. Henri Bergson, *The Two Sources of Morality and Religion* (New York: Doubleday Anchor Books, 1954), pp. 24-26.

১১৩. Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Kitchener: Batoche Books, 2000), pp. 27-29.

১১৪. Abdullah Draz, *op. cit.*, pp. 15-25.

১১৫. আল-কুরআন, ১৬: ৯৭।

১১৬. Majid Fakhry, *op. cit.*, p. 70.

১১৭. Al-Razi, *Al-Tibb-al-Ruhani* (*The Spiritual Physic of Rhazes*), tr. in English A. J. Arberry (London: Allen and Co., 1950), p.72.

১১৮. Majid Fakhry, *op. cit.*, p. 80.

১১৯. Ahmad ibn-Muhammad Miskawayh, *op. cit.*, p. 52.

১২০. *Ibid*., pp. 71-76.

১২১. *Ibid*., p. 177.

১২২. Ibn Hazm, *al-Akhlaq wa`l-Siyar* (Cairo:TA-HA Publishers, in internet archive, 1990), p.15.

১২৩. *Ibid*.

১২৪. *Ibid*. p.17.

১২৫. Ragib Iṣfahānī, *op. cit.*, p. 126.

১২৬. *Ibid*. p.127.

১২৭. Abu Hamed al-Ghazali, *Mizan al-Amal* (Cairo: Tijariyya Press, 1937), p. 7.

১২৮. *Ibid*. p.85.

১২৯. *Ibid*. p.92.

১৩০. *Ibid*. p.93.

১৩১. Fakhr al-Din Razi, *op. cit.*, p. 90.

১৩২. *Ibid*. p.107.

১৩৩. Abul-Qasim al-Qushayri, *Al-Risala al-Qushayriyya fi Ilm al-Tasawwuf*, Eng. tr. Alexander D. Knysh, Reviewed by Dr Muhammad Eissa (UK: Garnet Publishing Limited, 2007), p. 288.

১৩৪. Al-Razi, *op. cit.*, p. 1.

১৩৫. Abul Hasan al-Mawardi, *Kitab Adab al- Dunya wal- Din* (Istambul: Qastantina Press, 1999), p. 13.

১৩৬. Ragib Iṣfahānī, *op. cit.*, p. 60.

১৩৭. *Ibid*., p. 51.

১৩৮. George F. Hourani, *Reason and Tradition in Islamic Ethics*, p. 129.

১৩৯. *Ibid*., p. 160.

১৪০. al-Ghazali, *Mizan al-Amal*, p. 68.

২য় অধ্যায়

সত্যবাদিতা ও সততা

পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে জিনিসটিকে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হতে দেখা যায় তার নাম সত্যবাদিতা ও সততা। কুরআন প্রতিটি মানুষকে সত্যবাদী বানাতে চায়। মানুষ যা বলে সে অনুযায়ী কাজ করলেই তাকে সত্যবাদী বলা হয়। এ জিনিসটিকে আবেগময় ভঙ্গিতে কুরআনে আল্লাহ উপস্থাপন করেন,

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না? আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার যে, তোমরা এমন কথা বলবে যা তোমরা কর না।[১]

তবে সত্য বলার আগে সত্য কী সে প্রশ্নও প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে। সত্যকে কুরআনে *হাক্ক* বলা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ বাস্তব বা প্রকৃত । সর্বোচ্চ প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে সত্য। দর্শনের মৌলিক কাজ সত্যের অনুসন্ধান। প্রকৃত সত্য কোথায় আছে কিংবা আমাদের জীবন ও জগতের সবচেয়ে মৌলিক সত্য কোনটি, আমরা কেন সত্যকে ভালোবাসব- ইত্যাদি প্রশ্নের যৌক্তিক অনুসন্ধান দর্শনের কাজ। এ ব্যাপারে কুরআনের কথা হচ্ছে, "সত্য কেবল তোমার রবের পক্ষ থেকেই আসে, সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না"।[২] এ বিশ্বজগতের সবকিছুর স্রষ্টা যেহেতু তিনি, তাই সবকিছুর বাস্তব অবস্থা বা প্রকৃত সত্য জানার দাবি তিনি করতে পারেন। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এই কুরআন নিশ্চিত সত্য এবং সন্দেহের উর্ধ্বে। তবে দর্শন যে সত্যের অনুসন্ধান করে সে সত্যের অনুসন্ধানে কুরআন কোনো বাধা নয় বরং কুরআনেরও নির্দেশ তাই। কুরআন এবং মহানবী (স.) এর মাধ্যমে আমরা যে সব বিয়ষয়কে জেনেছি তা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করার পরও দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি যেখান থেকে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন খুব কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে দার্শনিক পদ্ধতির প্রয়োগ স্বাভাবিক বিষয়। কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে, "তোমরা না জানলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো"।[৩] "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেই বিষয়ের অনুসরণ করো না"।[৪] অর্থাৎ এই গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়নি বা যেগুলোর ব্যাখ্যা ছাড়া উপলব্ধি সম্ভব নয় সে সব সমস্যার সমাধানে জ্ঞানীদের পদ্ধতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যথাযথ জ্ঞান না থাকলে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এখানে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামে সত্য অনুসন্ধানের সাথে সাথে ইবাদতকেও সত্য উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। "তুমি ইবাদত করো যতক্ষণ না নিশ্চিত জ্ঞান আসে;" (১৫: ৯৯)। এখানে ইবাদতের অর্থ জ্ঞানের অনুসন্ধান।[৫] কারণ ইবাদতের মাধ্যমেই বাস্তব জগৎ ও আল্লাহকে সত্যরূপে উপলব্ধি করা যায় এবং আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধানে অধিকতর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আমরা সত্যবাদিতার স্বরূপ, আল্লাহর সাথে সত্যবাদী আচরণ

এবং মানুষের পরস্পর সত্যবলা এবং কাজে কর্মে ও আচরণে সততার অনুসরণ সম্পর্কে ইসলামী নীতিদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করব। তবে শুরুতে সত্য কাকে বলে এ সম্পর্কে দর্শনের কিছু মতামত উল্লেখ করতে চাই।

১. সত্যের স্বরূপ

সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে জ্ঞানবিদ্যায় বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এরিস্টটলের মতে, মৌলিক সত্য হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধসমূহ, যেগুলোর পূর্ববর্তী এমন কোনো বচন নেই যা আমরা বেশি জানি।[৬] এর অর্থ হচ্ছে যে প্রাথমিক বাক্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কথাগুলোর শৃঙ্খল তৈরি হয় সেগুলোই মৌলিক সত্য। লাইবনিজ কিছুটা তাঁর অনুসরণ করে সত্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন: প্রজ্ঞাপ্রসূত সত্য ও বাস্তব ঘটনাপ্রসূত সত্য।[৭] প্রজ্ঞাপ্রসূত সত্যকে তিনি আবশ্যিক সত্য হিসেবে উল্লেখ করেন। যেমন, আমাদের অভিজ্ঞতার আগেই চিরন্তনভাবে বিদ্যমান দেশ কালের অস্তিত্ব সত্য। ডেকার্ট যেভাবে পরম সত্য হিসেবে মনের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেন এটি সেধরনের সত্য। তবে এর মাধ্যমে কিছু সত্যের আবিষ্কার করা গেলেও সব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায় না। কারণ, স্বতঃসিদ্ধও কখনো কখনো ভুল প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে ঘটনাপ্রসূত সত্য হচ্ছে শর্ত-নির্ভর। বিশ্লেষণের মাধ্যমে যতক্ষণ না তা প্রমাণিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেটিকে সত্য বলা যায় না।[৮] প্রয়োগবাদী মতে, যা আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করে তাই সত্য এবং যা করে না তাই মিথ্যা। অর্থাৎ যা বিপর্যস্ততা, ভারসাম্যহীনতা বা বিস্ময়ের উদ্ভব ঘটায় তাই মিথ্যা।[৯]এই মতবাদও সম্পূর্ণভাবে সত্য বা মিথ্যাকে প্রকাশ করে না। কারণ, কেউ যে পরিমাণ সন্তুষ্ট হবে বলে আশা করেছিল সে পরিমাণ সন্তুষ্টি না ঘটলে ঘটনাটা মিথ্যা হয়ে যায় না। সত্য সম্পর্কে অনুরূপতাবাদের মূল কথা হচ্ছে যা বাস্তব ঘটনার অনুরূপ তাই সত্য, যা অনুরূপ নয়, তাই মিথ্যা। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল একথাটি প্রথম বলেছিলেন, যা পরবর্তীতে ভিটগেনস্টাইন, মূর, রাসেল প্রমুখ বাস্তববাদী দার্শনিকদের কথায় আরো স্পষ্ট হয়।[১০] সত্য সম্পর্কে হেগেল ও ব্রাডলি যে মত পোষণ করেন তা হচ্ছে সঙ্গতিবাদ। এর মূল কথা হচ্ছে, এ জগতে ঈশ্বরই হচ্ছেন পরম সত্তা এবং একই সময় পরম সত্য। এজন্য যা কিছু পরম সত্তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাই হচ্ছে সত্য।[১১] অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁর সৃষ্টির অলঙ্ঘনীয় নিয়মের সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ হবে তাই সত্য।

দর্শনের কাজ সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হলেও কুরআন এ কাজকে কেবল অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্ত বলে। কুরআনের ভাষায়,

> তারা তো কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোনো কাজে আসে না। কাজেই যে আমার স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর পার্থিব জীবন ছাড়া (অন্য কিছুই) কামনা করে না, তুমি তাকে এড়িয়ে চল। এটাই তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা। নিশ্চয় তোমার রব সবচেয়ে ভালো

জানেন তার সম্পর্কে, যে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন তার সম্পর্কে, যে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। (৫৩: ২৮-৩০)

অর্থাৎ প্রকৃত সত্যের উৎস অনুমান ভিত্তিক ধারণা হতে পারে না। মানুষের পক্ষে সব বিষয়ের নিখুঁত জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় বলেই সত্য সম্পর্কে সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানুষ কেবল তার জানা সত্যের সাথে অজানা বিষয়ে অনুমান করতে পারে। অনুমানে বিভিন্ন মতামত থাকাটা খুব স্বাভাবিক, অন্যদিকে প্রকৃত সত্য চিরদিন একটিই থাকে। ইসলামী নীতিদর্শনে কুরআনের বাণীকে সত্যের সর্বোচ্চ মানদণ্ড বলার কারণ এটি স্বয়ং আল্লাহর বাণী যিনি সব কিছুর সর্বোচ্চ বাস্তব অবস্থা সবচেয়ে বেশি জানেন।

২. সত্যবাদিতার অর্থ

যা সত্য বা বাস্তব তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করার নামই হচ্ছে সত্যবাদিতা। সহজ কথায়, সত্যবলার গুণই হচ্ছে সত্যবাদিতা। সত্যবাদিতার পরিভাষা হিসেবে কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে *আস-সিদক* শব্দটি। আবু সাঈদ আল খাররাজের মতে, সত্যবাদিতার বাস্তব রূপায়নের ক্ষেত্রে *ইখলাস* (নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা) শব্দটি কুরআনে বেশি এসেছে।[১২]এর ব্যাখ্যায় আরো উল্লেখ করেছেন *আমানত* ও *হানীফ* (একনিষ্ঠ) শব্দকে। অর্থাৎ তিনি সত্যবাদিতা বলতে বোঝাতে চেয়েছেন নিষ্ঠার সাথে কর্মসম্পাদনকে। সত্যবাদিতার বিপরীত শব্দ হিসেবে *কিযব* (মিথ্যা), *ইফতিরা* (মিথ্যা অপবাদ), *বুহতান* (মিথ্যা অপবাদ), *খিয়ানাত* (বিশ্বাস-ঘাতকতা) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আল গাযালী মনে করেন, ছয়টি বিষয় যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে পূর্ণ সত্যবাদী: বচনে, ইচ্ছায়, প্রতিশ্রুতি প্রদানে, প্রতিশ্রুতি রক্ষায়, অন্তঃস্থ ভাবের সাথে বাইরের সমান আচরণে এবং দীনের স্তরগুলোর পূর্ণজ্ঞান লাভে যে সত্যপরায়ণ।[১৩] অর্থাৎ প্রকৃত সত্যবাদী হওয়ার জন্য এই বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হয়, না হয় তাকে সত্যবাদী বলা যায় না। পবিত্র কুরআনে সত্যবাদীদের যে বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সাথে এই শর্তগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে।

তবে যে সত্য প্রকাশে মানুষের কোনো উপকার নেই সে সত্য বলাকে সত্যবাদিতা বলে না। বরং যা প্রকাশ করলে মানুষের ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর জীবন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় এমন বিষয় সাহসিকতার সাথে উপস্থাপন করাই হচ্ছে সত্যবাদিতা। মহানবী (স.) মি'রাজ থেকে এসে যখন ভোরবেলায় কা'বার সামনে বসে রাতে দেখে আসা ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর শত্রুরা তাঁকে পাগল বলতে শুরু করল। কিন্তু তিনি যখন তাঁর স্মৃতিপট থেকে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের বাস্তব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন, তখন তারা বলল, এ বড় যাদুকর। আবু বকর এসে বললেন, মুহাম্মদ (স.) যা বলেছেন সন্দেহাতীতভাবে তা সত্য। মহানবী তাকে তখন বললেন, "আবু বকর, তুমি শুধু সত্যবাদী নও, বরং তুমি মহা সত্যবাদী (সিদ্দীক)"।[১৪] অর্থাৎ কেউ যখন কোনো সত্য ঘটনা প্রমাণসহ বিবৃত করে, তখন তাকে অস্বীকার করা বা যাদুকরি বলা- এক ধরনের মিথ্যা আচরণ। বরং তাকে সত্য বলে স্বীকার করাই সত্যবাদিতা। সত্যবাদিতা

এমন একটি গুণ যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক যত প্রকার সম্পর্ক আছে তার মূল হচ্ছে সত্য আচরণ ও সততা। মিথ্যার উপর মানুষের সম্পর্ক একদিনের জন্যও স্থাপিত হতে পারে না। যারা মিথ্যা বলে, তারা নিজেরা স্বীকার করে না যে, তারা মিথ্যা বলছে; বরং কোনো মিথ্যাকে সত্য বানানোর জন্য তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। আবার কোনো সত্যকে নিজস্ব স্বার্থে মিথ্যা বানানোর জন্য একই পদ্ধতিতে তারা প্রকৃত ঘটনাকে অস্বীকার করে। কুরআনে এধরনের লোকদের দ্বিমুখী আচরণের বিস্তর বিবরণ আছে। "বরং তাদের কাছে সত্য আগমনের পর তারা তাকে মিথ্যা বলছে, এতে তারা নিজেরাই সংশয়ের মধ্যে পড়েছে"। [১৫]অর্থাৎ একটি বাস্তব সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না: একবার বলছে, এটি যাদুকরি; আবার বলছে, কেউ তাঁকে পুরনো গ্রন্থ থেকে শেখায়। সত্য অস্বীকারের ধরনটা- সেটি বৈষয়িক কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে হোক আর অতিজাগতিক বিষয়ের ব্যাপারে হোক, সাধারণত এ রকমেরই হয়ে থাকে।

মহানবী (স.) বলেন, "সত্য হলো প্রশান্তি এবং মিথ্যা হলো সংশয়"।[১৬] অর্থাৎ সত্য বললে সাধারণভাবে মনে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, অস্থিরতা দূর হয় এবং নিজেকে পাপ-মুক্ত রাখার আনন্দ উপভোগ করা যায়। পৃথিবীর কোনো কিছুকে তখন এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে হয় না। মূসা (আ.) এর সত্য মু'জিযা দেখে যখন তৎকালীন মিশরের শ্রেষ্ঠ যাদুকরেরা নিজেদের মিথ্যা যাদুর প্রমাণ পেয়ে গেল তখন ফেরআউনের সামনে প্রশান্ত ও নির্ভীক চিত্তে আল্লাহর উপর ঈমানের ঘোষণা দিয়ে দিল। ফেরআউন তাদেরকে কঠোর শাস্তির নির্দেশ দিলেও যাকে তারা সত্য বলে ঘোষণা করেছে তা অস্বীকার করতে চায়নি। এটিই হচ্ছে সত্যবাদিতার প্রশান্তি। অন্যদিকে, মিথ্যা বলা মানেই সংশয়ের মধ্যে পড়ে যাওয়া। যেমন, সাধারণভাবে যে কোনো একটি মিথ্যাকে ঢাকার জন্য আরো অনেক মিথ্যা রচনা করতে হয়, এজন্য মিথ্যা হচ্ছে সংশয়।

সত্যবাদিতার উপরই আল্লাহর সমস্ত প্রাকৃতিক বিধান ও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর নবী হওয়ার জন্য প্রথম যে গুণটিকে আবশ্যকীয়ভাবে যাচাই করা হয়েছে তা হচ্ছে তাঁদের সত্যবাদিতা। একজন নবীও জীবনে কখনো মিথ্যা বলেননি। আদম (আ.) পৃথিবীতে এসেছিলেন নিজের একটি ভ্রান্তির কারণে। কিন্তু পৃথিবীতে নেমে তিনি প্রথম যে কাজটি করলেন সেটি হচ্ছে, আল্লাহর নিকট সেই ভ্রান্তির সত্য অনুশোচনা। আল্লাহ তাঁর এই সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ক্ষমা করে দেন। আদম (আ.) মানবজাতির জন্য প্রথমবারের মতো দেখিয়ে দেন অপরাধ করে সত্যভাবে তা স্বীকার করতে হয় এবং অনুশোচনা বা তাওবা করতে হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রসঙ্গে এসেছে, "আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের স্মরণ করুন, নিশ্চয় তিনি ছিলেন পরম সত্যবাদী, নবী"।[১৭] তাঁর ব্যাপারে আরো এসেছে, "তোমাদের জন্য ইবরাহীমের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ"।[১৮]তিনি যখন নিজের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে সত্যিকারভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহরই আদেশে যবেহ করতে নাঙ্গা ছুরি নিয়ে প্রস্তুত এবং পুত্র ইসমাঈল নিজেকে প্রিয় বাবার হাতে নিহত হওয়ার জন্য চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করে দিলেন, তখন আল্লাহর ঘোষণা এলো, "হে ইবরাহীম, তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করলে।... নিশ্চয়ই এটা ছিল প্রকাশ্য ও বিরাট পরীক্ষা"। [১৯]এই স্বপ্নের আদেশ

স্পষ্ট আদেশ ছিল না; বরং বলা হয়েছে, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস যেন তিনি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেন। ইবরাহীম (আ.) ভিন্নভাবে তা করার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি ভাবলেন, সবচেয়ে সত্য কথা হলো, তাঁর একমাত্র পুত্রই তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয়। তাই তিনি নিজের সাথে মিথ্যা আচরণ করতে পারলেন না। অন্য নবীদের প্রসঙ্গেও সত্যবাদিতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যেমন, "ইসমাঈলের কথা স্মরণ করুন, তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী, রসূল, নবী"।[২০] "এই কিতাবে ইদরীসের কথা স্মরণ করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী"। [২১]

পবিত্র কুরআনে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর চরিত্রের বিভিন্ন গুণ তথা সত্যবাদিতা, সাহসিকতা, ত্যাগ, ধৈর্য ইত্যাদির বর্ণনা এসেছে সবচেয়ে বেশি। যেমন,

> তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। আর প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি কথা বলেন না।[২২]
>
> যদি সে আমার নামে কোনো কথা রটনা করত, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, অতঃপর তার ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।[২৩]

এখানে মুহাম্মদ (স.)এর প্রশংসা করা হয়েছে যে, তিনি মিথ্যা থেকে মুক্ত। প্রবৃত্তির তাড়নায় বা বিপদে পড়ে তিনি কখনো সত্য গোপন করেননি। তিনি কখনো আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করবেন এটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কুরআন চূড়ান্তভাবে তাঁর পরিচয় দিয়েছে এভাবে, "যদি তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের মীমাংসায় তারা তোমাকে না মানে, তাহলে কখনো তারা মু'মিন হতে পারবে না"।[২৪] অর্থাৎ তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে কোনো মুসলিম ব্যক্তির সামান্য সন্দেহ করার সুযোগকেও আল্লাহ সমর্থন করেননি। তাঁকে উচ্চতম মহান চরিত্রের অধিকারী বলে কুরআন স্বীকৃতি দিয়েছে।[২৫]তিনি নিজেও বলেছেন, "উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি"।[২৬] সত্যবাদিতা, সততা, প্রতিশ্রুতিপূরণ, আমানতের সুরক্ষা, কথায় ও কাজে পূর্ণ মিল- এগুলো ছিল তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিক। তিনি নিজে যেমন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তেমনি সঙ্গী-সাথীদেরকেও সেভাবে গড়ে তোলেন। নবীদের প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষের চারিত্রিক পরিশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নতির কাজ। মহানবী (স.) মক্কী জীবনের তেরটি বছর তাঁর সঙ্গী ও অনুসারীদেরকে এমন আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যে, তাঁরা সত্যবাদিতা ও সততায় পাহাড়ের মত অটল অবিচল থাকার শক্তি অর্জন করেন যেন কোনো কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হলেও সততার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে না পড়েন। তাঁর এই কাজে প্রথমবার প্রলোভনের যে প্রস্তাব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তিনি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী, শ্রেষ্ঠ নেতা, শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী পাওয়ার প্রস্তাবে তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে জানিয়ে দেন, "ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয়, তবুও আমি এই পথ থেকে বিচ্যুত হব না"। [২৭]তবে এই প্রচণ্ড সাহস ও মানসিক শক্তির কারণ হচ্ছে তিনি নিজে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতি মুহূর্তে সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ সে দৃশ্য সরাসরি দেখছিলেন। আল্লাহর সাথে এই গভীর সংযোগে তাঁদের জীবনের সমস্ত বৈষয়িক সুবিধা ও প্রয়োজন

তুচ্ছ হয়ে যায়। সব সময় তাঁরা ভাবতেন, কখন আল্লাহ তাঁদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। অর্থাৎ আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা তাঁদের নৈতিকতার জন্য বড় শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছিল। *সূরা তাওবার* ১১৮ নং আয়াতে বর্ণিত একটি দৃষ্টান্ত।[২৮]তাবুকের অভিযানে যাওয়ার সময় অলসতা করে তিনজন সাহাবী পেছনে থেকে যান, যা ছিল আল্লাহর অপছন্দ। বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে মুনাফিকদের কেউ সেই যুদ্ধে যায়নি। এই তিনজনের মধ্যে তার কিছুটা প্রভাব পড়ে। অভিযান থেকে ফিরে আসলে তাঁরা অকপটে সত্য বলে দেন। শাস্তিস্বরূপ দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন সম্পূর্ণ সামাজিক বয়কট এমনকি একটি পর্যায়ে নিজ স্ত্রীর সাথেও কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি তাঁদের। সবাইকে তাঁরা সালাম দিতেন কেউ সালামের জবাব দিত না, মুখ ফিরিয়ে তাকাতো না। নবীকে সামনে পেছনে বিভিন্নভাবে সালাম দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতেন কিন্তু কোনোভাবেই তিনি তাকান না। এমনি একসময় রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে গাসসান রাজা তাদেরকে সমবেদনা জানালেন এবং তাদের নিকট চলে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হলো। চিঠিটি তারা আগুনে পুড়িয়ে দেন। পঞ্চাশ দিন পর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত নাযিল হল, "তাঁদের ক্ষমার ঘোষণা করা হয়েছে", তখন সবাই তাঁদেরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেন। সত্যবাদিতার এমনি পুরস্কার তাঁরা পেয়ে গেলেন যে, অনন্তকাল ধরে তাঁদের সম্পর্কে মানুষ কুরআনে পড়বে; আর পরকালীন সফলতা তো আছেই। আল্লাহ তাঁদের উপর এত খুশি হন যে, ১১৯ নম্বর আয়াতেই বলা হয়েছে, "তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাক" অর্থাৎ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। এই ছিল মহানবীর নৈতিক প্রশিক্ষণের সামান্য একটি দৃষ্টান্ত। তবে কুরআন ও মহানবী (স.) এর জীবনাদর্শ আমাদের সামনে উপস্থিত থাকায় আমরা বর্তমানেও এই অভ্যাস সৃষ্টিতে সফল হতে পারি। তবে সে যুগের সোনার মানুষ হওয়া কখনো সম্ভবপর হবে না; কারণ তাঁরা সরাসরি মহানবীর সাহচর্য পেয়েছিলেন।

সত্যবাদিতা মানুষকে পাপের পথ থেকে মুক্তি দেয়। সত্যকথা অনেক সময় বড় বিপদ ডেকে আনে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। এর পরিণাম সবসময় ভালো। যিনি সত্য পথ অবলম্বন করেন তিনি যে কোনোভাবেই হোক একটি মুক্তির পথ পেয়ে যান। আর পথ না পেলেও সত্য আচরণের জন্য তিনি মানব সমাজে সাহসী ও সৎ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। অন্যদিকে, মিথ্যাবাদী সাময়িক সুবিধা অর্জন করলেও মানব সমাজে স্থায়ী সম্মান অর্জন করতে পারে না। মহানবী (স.) বলেন,

> তোমাদের সত্যবাদী হওয়া উচিত। কেননা সত্যবাদিতা পূণ্যের পথ দেখায়, আর পূণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। যে সব সময় সত্য বলে এবং সত্য বলার চেষ্টা করে আল্লাহর নিকট তাকে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়, আর পাপাচারিতা জাহান্নামের পথ দেখায়। যে সব সময় মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা বলার চেষ্টা করে, আল্লাহর দরবারে তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখে রাখা হয়।[২৯]

অর্থাৎ, সত্যবাদিতা সব ভালো কাজের পথ প্রদর্শক এবং সমস্ত সদগুণের ভিত্তি যা পার্থিব ও পরকালীন উভয় জগতের সফলতার জন্য দরকার। একইভাবে মিথ্যা পাপাচারিতার মূল যা মানুষকে খারাপ পরিণতির দিকে

নিয়ে যায়। কুরআনে পরকালীন উপকারিতার কথা এসেছে এভাবে, "এই তো সেদিন- যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সততার জন্য উপকৃত হচ্ছে; তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত"।[৩০] অর্থাৎ সত্যবাদীদের সততার পুরস্কার আল্লাহ বিচার দিবসে নিশ্চিতভাবেই প্রদান করবেন। আর মিথ্যাবাদীদের পরিণামও তারা দেখতে পাবে। মহানবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মুমিন ব্যক্তি ভীরু বা কৃপণ হতে পারে কি না, তিনি বললেন, তা হতে পারে, কিন্তু মিথ্যাবাদী হতে পারে না।[৩১] মহানবী (স.) সত্যবাদীদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যামিনদার হবেন। যেমন,

> তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের যামিনদার হব: ১. যখন তোমরা কথা বলবে সত্য বলবে। ২. যখন প্রতিশ্রুতি দেবে, তা পালন করবে। ৩. তোমাদের কাছে আমানত রাখা হলে তা আদায় করবে। ৪. নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করবে। ৫. তোমাদের চক্ষু অবনমিত রাখবে। ৬. নিজেদের হস্তসমূহকে সংযত রাখবে।[৩২]

মহানবী (স.) আমাদেরকে কথায় ও কাজে কীভাবে পূর্ণ সততা অবলম্বন করতে হয় ছয়টি বাক্যের মাধ্যমে তা এখানে দেখালেন এবং এর পরিবর্তে উত্তম ও স্থায়ী প্রতিদানেরও নিশ্চয়তা দেন। সত্য বলা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং আমানত রক্ষা এই তিনটি বিষয়ের উপরই প্রধানত সত্যবাদিতার স্তম্ভ দণ্ডায়মান। আর বাকী তিনটি গুণ আমাদের সৎ জীবনের ব্যবহারিক অনুশীলনের জন্য অপরিহার্য উপাদান। পবিত্র কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে সত্যবাদিতার দুটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে: আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়া ও মানুষের সাথে সত্যবাদী হওয়া।

৩. আল্লাহর সাথে সত্যবাদী

এটি মূলত সত্যবাদী হওয়ার ও সততার পথ অনুসরণ করার তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রশিক্ষণ। আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ যা বলেছেন তা পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্বীকার করা। মুখে স্বীকার করার সাথে সাথে অন্তরে যদি সেটার স্বীকৃতি না থাকে তাহলে সেটিকে স্বীকৃতি বলে না, বরং তা এক ধরনের প্রতারণা। কেউ যখন আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে বিশ্বাস করার ঘোষণা দেয় কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলে না, বরং কাজে কর্মে তার বিপরীত করে আল্লাহর দৃষ্টিতে সে সত্যবাদী নয়।

> মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকাল দিবসের উপর ঈমান আনলাম, প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের ধোঁকা দেয়, আসলে তারা নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারে না।[৩৩]

অর্থাৎ আল্লাহকে মুখে বিশ্বাস করলেই ঈমান হয় না বরং আন্তরিকতায়, কথায় ও কাজে তার প্রমাণ দিতে হয়; তবে কেউ মনে কিছু গোপন করলে, সেটি মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব না হলেও আল্লাহ অবশ্যই জানবেন; কারণ তিনি সবার মনের খবর জানেন। "আর যদি তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর, অথবা কোনো কিছু গোপন রাখ, আল্লাহ সমস্ত বিষয়েরই হিসেব নেবেন"।[৩৪] সত্যবাদীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে

প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যবাদী।[৩৫]এখানে সত্যবাদিতার অর্থ করা হয়েছে সন্দেহ না করা। কোনো বাস্তব বিষয়কে যদি কেউ সন্দেহ করে তাহলে তাকে সত্যবাদী বলা যায় না। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সত্যবাদী কারা সেটি যাচাইয়ের মানদণ্ড সন্দেহাতীতভাবে তাকে স্বীকার করা। তবে তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন কারা সন্দেহ পোষণ করে না। সেটি হচ্ছে জীবন ও সম্পদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম করার পরীক্ষা। সংশয়বাদীগণ এ দুটোর কোনোটিকেই উৎসর্গ করতে রাজি নয়।

> মানুষ কি মনে করে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি; সুতরাং কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা অবশ্যই আল্লাহ জেনে নেবেন। যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের এই সিদ্ধান্ত খুব নিকৃষ্ট। যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে; তিনি সব শোনেন ও সব দেখেন।[৩৬]

অর্থাৎ ঈমানের ঘোষণা শুধু মৌখিকভাবে দিলেই হয় না, বরং কেউ যদি এমনটি কল্পনা করে যে, 'আমি মুসলিম বা মুমিন'-তাহলে আল্লাহ সেটিকে মেনে নেন না। তাকে বাস্তবে সৎকাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয়। সুতরাং আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়ার দাবি করলে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এই পরীক্ষার স্বরূপ ছিল বিলাল, আম্মারদের জীবনে, প্রতিটি যুদ্ধের ময়দানে, যেখানে সাহাবীগণ সবকিছু উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর প্রেমের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য। পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদেরও সেই দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে হয়েছে। যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়েছিল তারা যতই নিজেদেরকে শক্তিশালী মনে করতো একদিন তাদের মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়তো। প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদের মিথ্যা ঢাকতে পারলেও আল্লাহর সাথে কোনো মিথ্যা আচরণ ঢাকতে পারি না। আমরা প্রত্যেক সালাতের প্রতিটি রাকাআতে সূরা ফাতিহায় বলে থাকি, "আমরা একমাত্র তোমারই আদেশ-নিষেধ মেনে চলব (ইবাদত করব) এবং তোমারই কাছে সাহয্য চাইব"- এটি আল্লাহর ইবাদতের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বাস্তবে যখন এর বিপরীত করি, তখন বলা যায় আল্লাহর সাথে আমরা মিথ্যা বলি।

আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়ার অর্থ একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, যেখানে কোনো প্রদর্শনেচ্ছা, লৌকিকতা বা বৈষয়িক স্বার্থ থাকবে না। বুখারীর প্রথম হাদীসটিতেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক কাজের মূল্য নির্ধারিত হয় নিয়ত বা মনের ইচ্ছার উপর। হিজরতের মত অত্যন্ত কঠিন একটি ইবাদতের কোনো মূল্য নেই, যদি কারো মনের নিয়ত থাকে কোনো নারীকে বিয়ে করা অথবা কোনো বৈষয়িক স্বার্থ। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, প্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে চার জন লোককে: যে আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে, যে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিল ফলে লোকেরা তাকে বড় আলিম হিসেবে ভক্তি করত; যে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করত আর মানুষ অভিভূত হয়ে শোনত; যে প্রচুর দান করত এবং এতে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর কাছে তারা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ বলবেন, তারা আল্লাহর জন্য করেনি, বরং লোকেরা মৃত্যুর পর শহীদ বলে ডাকবে এই আশায় সে শহীদ হয়েছ, লোকেরা

ভালো 'ক্বারী' বলে ডাকবে, আলিম বলে ডাকবে এবং দানশীল দয়ালু বলে ডাকবে বলে আশা পোষণ করতে, তারা যা চেয়েছে সব পেয়ে গেছে, সুতরাং তাদের অবস্থান আজ জাহান্নাম।[৩৭] এ কারণে কেউ যদি কেবল আল্লাহকে বিশ্বাস করার সাথে সাথে সামান্য লোক দেখানোর চিন্তাও মনে রাখে তাকে আল্লাহ সত্যবাদী বলবেন না। তবে মানুষের মধ্যে ভুল-ত্রুটি হবে, মানুষ বিভিন্ন অপরাধও করবে, কিন্তু পরক্ষণেই সে যদি নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তবে বিষয়টি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ, কেউ সত্যিকারভাবে অন্য কাউকে শ্রদ্ধা করে কি না, এটা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে উত্তম ধারণাকে মহানবী (স.) উত্তম ইবাদত বলে গণ্য করেন।[৩৮]

কুরআন নাযিলের যুগে কপটবিশ্বাসী বা মুনাফিকরা ভয় পেত, তাদের গোপন নিয়ত আল্লাহ কুরআনে প্রকাশ করে দেন কি না। মুনাফিক হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক, যে সামনে একরকম প্রতিশ্রুতি দেয় পেছনে তার অস্বীকার করে। এরা কোনো একদিকে স্থির থাকে না। যে দিকে সুবিধা পায় সে দিকে যায়, আবার সমস্যায় পড়লে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এদের পরিচয় প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে,

> মুনাফিকরা প্রতারণা করেছে আল্লাহর সাথে, আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করেছে। তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শিথিলভাবে দাঁড়ায় লোক দেখানোর জন্য।... এরা মূলত দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়।[৩৯]

সূরা আল মুনাফিকূন এধরনের মিথ্যাবাদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়।

> মুনাফিকরা তোমার কাছে এসে সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[৪০]

এটিই মুনাফিকদের স্বভাব। তারা সামনে সামনে সব স্বীকার করবে কিন্তু মনে তার সম্পূর্ণ বিপরীত থাকে। আল্লাহ তাদের মিথ্যাচারকে কুরআনে প্রকাশ করে দেন। তারা এটা জানত যে, কুরআন ভুল বলতে পারে না। যেমন,

> আর যখন কোনো সূরা নাযিল হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে (এবং ইঙ্গিতে বলে) তোমাদেরকে কেউ দেখছে না তো? অতঃপর তারা চলে যায়; আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে (আলো থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সমাজ!"[৪১]

অর্থাৎ কুরআন নাযিলের যুগে তারা ভয় পেত কুরআন তাদের সম্পর্কে সব ফাঁস করে দেয় কি না। প্রকৃতপক্ষে তারা কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করত, কিন্তু তারা নিজেদের অহংকার, অবৈধ উপার্জন, ভোগবিলাসিতা ও লালসার জীবন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় মহানবী (স.) এর বিরোধিতা করত। কারণ, মহানবী (স.) এর পক্ষ থেকে এমন ভবিষ্যদ্বাণী তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সত্যি সত্যি তিনি বা এই দরিদ্র মুসলিমগণ অচিরেই বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। মহানবীর ওফাত-পরবর্তী যুগে মুনাফিকদের সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা আর সম্ভব হয় না। তবে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে মহানবী (স.) মুনাফিকের স্বভাব বলে উল্লেখ করেন: মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও আমানতের খেয়ানত করা।[৪২] অন্য একটি হাদীসে চতুর্থ

বৈশিষ্ট্য হিসেবে গালি-গালাজ করাকে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৩] তবুও কে আল্লাহর সাথে মিথ্যা বলছে এটা নির্ণয় করা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এগুলোকে নিয়ে আসা যায়।

আবার আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা বলা কুরআন সবচেয়ে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি এসেছে,

> যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে, এবং তার কাছে সত্য আগমনের পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে? ... যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে, এবং সত্যকে মেনে নিয়েছে তারাই আল্লাহ-ভীরু"।[৪৪]
>
> যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে?[৪৫]

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সত্য বলার কারণে একদিকে যেমন মানুষকে তিনি সান্নিধ্য ও আশ্রয় দেন তেমনি মিথ্যা বলা কিংবা আল্লাহকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হলে তিনি তাকে যালিম হিসেবে সাব্যস্ত করেন। মানুষ আল্লাহর সাথে সত্য আচরণ করে কি না, তা যাচাই করার জন্য তিনি মানুষকে কিছু বাহ্যিক ইবাদতের নির্দেশ দেন, যেগুলোর নিয়মিত ও যথার্থ চর্চার মাধ্যমে অন্য সমস্ত কাজে আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার প্রমাণ হয়।

৩.১. নিষ্ঠার সাথে ইবাদত

আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়ার প্রথম প্রমাণ নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদত করা। মানুষের নৈতিক জীবনে আল্লাহতে বিশ্বাস যে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে, তা কোনোভাবেই অর্জন সম্ভব নয় যদি আল্লাহ নির্ধারিত ইবাদতসমূহ পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পালন করা না হয়। নিষ্ঠার সাথে সেগুলোর সম্পাদন না করলে বরং ভণ্ডামির প্রকাশ ঘটে। ইসলামী নীতিদর্শন যেহেতু পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণের জন্য সৃষ্ট তাই আল্লাহর সাথে গভীর সংযোগের মাধ্যমেই সেই কল্যাণ অর্জন করতে হয়। সেটি সম্ভব আল্লাহর বিধান পালনে নিষ্ঠা ও মনোযোগের মাধ্যমে। মহানবী (স.) বলেন, "জেনে রাখো, আল্লাহ কোনো উদাসীন অন্তরের প্রার্থনা কবুল করেন না"।[৪৬] অর্থাৎ কেউ যদি অন্য মনস্ক হয়ে আল্লাহকে ডাকে তাহলে আল্লাহও তার প্রতি মনোযোগী থাকেন না। আবার যে গভীর মনোযোগ নিয়ে তাঁকে ডাকে তিনিও তার প্রতি মনোযোগী হয়ে তার ডাকে সাড়া দেন। ইসলামের মৌলিক আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও কুরবানী অন্যতম। এসব ইবাদত নিষ্ঠার সাথে পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার প্রমাণ দিতে হয়। কিন্তু এগুলোর উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে উন্নত নৈতিকতা গঠন। এর প্রমাণ, প্রতিটি ইবাদত আবশ্যক করার কারণ ঐ বিধান বর্ণনার সাথে সাথেই ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ সেই উদ্দেশ্য অর্জন করতে না পারে তাহলে সহজে অনুমান করা যেতে পারে, তার ইবাদত সত্যিকারের ইবাদত হয়নি। কুরআন এটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছে,

> তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোনো কল্যাণ নেই; বরং কল্যাণের কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও সমস্ত নবী রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহর

ভালোবাসার্থে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীদের জন্য এবং বন্দিমুক্তিতে সম্পদ ব্যয় করে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট-দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়- তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।[৪৭]

এখানে একসাথে ইসলামী নৈতিকতার মূল বিষয়গুলোর উপস্থাপন করা হয়েছে যেগুলোর শেষ কথা হচ্ছে সত্যবাদিতা ও তাকওয়া অর্জন। এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ইহুদীদের দাবির সত্যতা যাচাই করতে। তারা নিজেদেরকে একমাত্র ও প্রকৃত আল্লাহ-প্রেমিক বলে দাবি করত। কিন্তু আল্লাহ যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতে বলেন তখন তারা এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। নিচে সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করা হবে কীভাবে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ইবাদত সত্যবাদিতা ও সততার প্রশিক্ষণে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

৩.১.১. সালাত

ইসলামী নৈতিকতার জন্য এবং বিশেষত সত্যবাদিতার গুণ অর্জনের জন্য আল্লাহ প্রতিটি মুসলিমের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় ফরয করেছেন। প্রতিটি সালাতের মধ্যে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং প্রতিটি রাকা'আতেও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি থাকে। বারবার একই বিষয়ের আবর্তনের কারণ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করে বলে প্রথমবার যে স্বীকৃতি দিয়েছে, তা বারবার মনে করিয়ে দেওয়া। আবার প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য যে কোনো সূরা বা সূরার অংশ মেলাতে হয়। সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মেলানোর মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি কুরআনের বিভিন্ন নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকে, এর ফলে সে সালাতের মাধ্যমেই তার কর্মের সঠিকতা যাচাই করতে পারে। একজন ব্যক্তি মানুষের সাথে প্রতারণা করার পর যখন সালাতে দাঁড়িয়ে নিজে তিলাওয়াত করে বা ইমামের তিলাওয়াত শোনে, "আল্লাহ তোমাদের মনের খবরও জানেন"- তখন সে সালাতের মধ্যেই চিন্তা করবে তার সে কাজ করা ঠিক হয়নি। যে আরবী ভাষা জানে না তার পক্ষে সালাতে মনোযোগী হওয়া কঠিন। কিন্তু সবাই যে সঠিকভাবে ভাষা শিখতে পারবে তা আরো অসম্ভব ব্যাপার। যেটা সবার আয়ত্বের ভেতর আছে তা হলো সালাতে পঠিত সাধারণ আরবীগুলোর অর্থ রপ্ত করে নেওয়া। প্রকৃতপক্ষে ভালো আরবী জানা সত্ত্বেও সালাতে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয় যদি কেউ পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে না দাঁড়ায়।

সালাতের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে কুরআনে দুটি বিষয় এসেছে: একটি হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ[৪৮]; দ্বিতীয়টি হচ্ছে অশ্লীলতা ও দুর্নীতিমুক্ত থাকা।[৪৯]এদুটি উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন মানেই হচ্ছে মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সফলতা। মানুষের জীবনে যৌবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলো এতই স্পর্শকাতর যে, যে কোনো ভালো মানুষ যে কোনো অবস্থাতেই পদস্খলনের শিকার হতে পারেন। নির্জনে বসে লোকালয়ের আড়ালে কেউ যদি পর্নোগ্রাফি দেখে সময় ব্যয় করে তাকে সেখান থেকে কে রক্ষা করবে? পাশ্চাত্যের সমাজে ব্যাপক যৌন-স্বাধীনতার পরও বেশি যৌন অপরাধ ঘটছে। ইসলাম এই অপরাধের বিস্তার রোধে সালাতকে অত্যন্ত

ফলপ্রসূ হিসেবে উল্লেখ করেছে। দ্বিতীয়ত সমস্ত নিকৃষ্ট কাজ থেকে সালাত মানুষকে বিরত রাখে। মুনকার বা নিকৃষ্ট ও মন্দ কাজ বলতে দায়িত্বপালনে অবহেলা, অন্যের অধিকার নষ্ট করা, সময় মত কাজ না করা, দেশ ও জাতির সম্পদ অপচয়সহ যে কোনো অন্যায় কাজই হতে পারে। একজন মানুষ যখন বিশেষত দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে দাঁড়ায় তার ভেতর আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং সে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ করতে শতবার চিন্তা করবে। আর এই চিন্তাই তাকে সমস্ত নিকৃষ্ট ও অশ্লীল কাজ করা থেকে বিরত রাখবে। তাছাড়া যখন সে বারবার উচ্চারণ করছে, "আমাদেরকে তুমি সফল ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল কর, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে আমরা যেন না যাই"- তখন সে কি করে মন্দ পথে চলাকে নিজের জন্য নির্বাচন করতে পারে?

বর্তমান মুসলিম সমাজের অধিকাংশই সালাত আদায় করে না, এমনকি সাপ্তাহিক জুমার নামাযেও অনেকে উপস্থিত হয় না। আর যারা সালাত আদায় করে তারাও সালাতের মর্ম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত। এ কারণে সালাত আদায়কারীদের জীবনেও সালাতের প্রভাব পড়ে খুব সীমিত। সালাতে না আসার কারণ কুরআনে এভাবে এসেছে, "যখন তোমরা সালাতের জন্য ডাক, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা মনে করে; কারণ তারা এমন সম্প্রদায় যারা বুদ্ধি খাটায় না"।[৫০] এখানে মানুষের সালাত আদায়ে উদাসীনতার কারণ হিসেবে অজ্ঞতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে চায় যে, তা মানুষকে অন্ধকার, অজ্ঞতা বা জাহালাত থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে চায়। মানুষ যখন সালাতের প্রয়োজনীয়তা বুঝবে না তখন সালাতকে তারা খেলার বস্তু ও অহেতুক সময় অপচয় হিসেবে কল্পনা করবে। আবার কেউ কেউ এটাকে একটি উৎকৃষ্ট শরীর চর্চা মনে করেন, তাৎক্ষণিক উপকার হিসেবে এটাও সত্য। কিন্তু আল্লাহ মানুষকে এই একটি জিনিসের মাধ্যমে সততা ও সত্যবাদিতার এমন প্রশিক্ষণ দিতে চান যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রয়োজন। কারণ মানুষ জীবনের শেষ অবস্থাতেও সত্যকে অস্বীকার করতে পারে এবং অন্যের ক্ষতি করে পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারে। একজন ব্যক্তির মনে আত্মহত্যার প্রবণতা আসার কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে অস্বীকার করছে। আল্লাহ তাকে জীবন দিয়েছেন, আল্লাহই সময় হলে তার নিজের জীবন নিয়ে নেবেন। তার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে নিজের পরিবারসহ অনেক মানুষের সে ক্ষতি করল। সালাত মানুষকে এ ধরনের যে কোনো চরম নিকৃষ্ট কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। কুরআন আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হয়ে সালাত আদায়কে অনিবার্য সফলতার মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছে। "মুমিনগণ অবশ্যই সফল, যারা তাদের নামাযে ভীতসন্ত্রস্ত বিনয়ী থাকে..."।[৫১] মহানবী (স.) সালাতকে আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যে আল্লাহর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে তার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তিনিই নিতে পারেন। বিশেষত মানুষ যখন রাতের অন্ধকারে নির্জনে আল্লাহর স্মরণে সালাত আদায়ে দণ্ডায়মান হয়, তখন তার সাথে আল্লাহর এমন এক অব্যক্ত ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যা তার বিপদে আপদে ধৈর্যের শক্তি যোগায়, মানসিক প্রশান্তিতে তার দিন কাটে। সালাতের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলের স্তরভেদ আছে।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়ার জন্য ফরয ওয়াজিব ও সুন্নাতের যথাযথ আদায়ের পর নফল সালাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শেষ রাতের নফল সালাত আদায় প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

> আমাদের প্রভু পরওয়ারদিগার তাবারাকা ওয়া তা'আলা প্রত্যেক রাত্রে দুনিয়ার আসমানে (যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়) নেমে আসেন যখন রাত্রের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের কে আমাকে ডাকবে! আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দেব, কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব"।[৫২]

অর্থাৎ ফরয সালাতের পর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য শেষ রাতের নফল সালাত সর্বোত্তম মাধ্যম। এসময় আল্লাহর নিকট নিজের কষ্টের কথা প্রাণ খুলে বলা যায়, আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায়ে নয়ন ভাসানো যায়, যা অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

যে এভাবে সালাত আদায় করবে তার পক্ষে কারো অধিকার নষ্ট করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানুষের জীবন দুঃখ-কষ্টের এমন অলিখিত নিয়মে বাধা যে, কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না সে আগামীকাল কোনো জায়গা থেকে পিছলে পড়ে যাবে না, তার উপর কোনো ভয়ঙ্কর বিপদ বা রোগ-ব্যাধির আক্রমণ ঘটবে না। এমতাবস্থায় ধৈর্যের সাথে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার শক্তি সৃষ্টি করে সালাত। সুতরাং কেউ যখন নিষ্ঠার সাথে সালাত আদায় করে তখন আল্লাহর সাথে তার সত্য সম্পর্কেরই উন্নয়ন ঘটে।

৩.১.২. সিয়াম

বছরে একবার এবং দীর্ঘ একমাস ধরে সিয়াম সাধনা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে। আল্লাহ দেখতে চান কে আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলে। এটি আল্লাহকে বিশ্বাস করার ঘোষণার আনুষ্ঠানিক বা বাহ্যিক দ্বিতীয় প্রমাণ। মানুষের নৈতিক জীবনের শুদ্ধতার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন। মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক কাজগুলোকে ইচ্ছে মতো করবে, না কি পরিমাণ মতো ও নির্ধারিত সময় অনুযায়ী করবে তা নির্ভর করে সে নিজেকে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার উপর। কেউ অনেক অর্থবিত্তের মালিক হয়ে গেলে কোন পথে তা ব্যয় করবে, কতটুকু বিশ্রাম করবে, কতটুকু সময় জৈবিক কাজে ব্যয় করবে তা সঠিকভাবে নির্ণয় বা সম্পাদন তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। সঠিকভাবে তা করতে পারলে তার বৈষয়িক ও পরকালীন সফলতা অনিবার্য। আবার যার সম্পদ ও সামর্থ্য খুব সীমিত তার জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। রোযা রমযান মাসের সময়কে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যয় করতে শেখায় এবং খাবার ও জৈবিক কাজ সমূহের সময় নির্ধারণ, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা শিক্ষা দেয়। ইসলাম এই কারণে মুসলিমদের উপর রোযার প্রশিক্ষণ আবশ্যক করেছে যেন সে পৃথিবীতে কারো বোঝা না হয়ে, বরং দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য এটিকে ইবাদত না বলে নৈতিক প্রশিক্ষণ বললেই হয়ত বেশি উপযুক্ত হত। কারণ রোযার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে মিথ্যাবাদিতা ও নিকৃষ্ট

কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। মহানবী (স.) বলেন, "যে মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা কাজ ছাড়তে পারল না, আল্লাহর নিকট তার পানাহার ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই"।[৫৩] অর্থাৎ রোযা একজন মুসলিমকে সারা দিন পানাহার থেকে উপবাস রেখে ও যে কোনো উপায়ে যৌনকর্ম থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়- এদুটো জিনিস তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। এ সময় সে গোপনে এক ফোটা পানিও পান করে না এবং সময় হওয়ার আগে ইফতার করে না। রোযা না রেখে কেউ রোযাদারের ছদ্মবেশে ইফতার করতে পারে, কিন্তু রোযা তার অন্তরে কোনো অনুভূতি সৃষ্টি করবে না। কেবল আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা থেকে যে রোযা হবে সেটিই হবে বাস্তব রোযা। এই প্রশিক্ষণ থেকে ব্যক্তি সারা বছর আল্লাহর স্মরণ ও ভয়ের অনুভূতি নিয়ে কাজ করবে এটাই হচ্ছে রোযার মূল উদ্দেশ্য- "যেন তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পার"।[৫৪]

আল গাযালী রোযার তিনটি স্তরের কথা বলেন। প্রথম স্তর হচ্ছে শুধু পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকা। দ্বিতীয় স্তরঃ পানাহার, যৌনাচার ও নিজের কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা। তৃতীয় স্তরঃ পানাহার, যৌনাচার, কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণসহ ব্যক্তির যাবতীয় সমস্ত প্রকার কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়ের অনুভূতি নিয়ে সম্পাদন করা, যা শুধু রমযান মাসে নয় বরং অন্য মাসগুলোতেও তার চরিত্রে প্রতিফলিত হবে। তৃতীয় প্রকারের রোযাই হচ্ছে প্রকৃত রোযা। রোযা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি ছয়টি নির্দেশনা দিয়েছেনঃ ক. দৃষ্টি সংযম এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে এমন জিনিস থেকে বেঁচে থাকা, খ. অনর্থক কথাবার্তা, মিথ্যা, গালিগালায বর্জন করা; গ. খারাপ বা অশ্লীল, মন্দ কথাবার্তা শ্রবণ না করা; ঘ. হাত পা এবং অঙ্গকে মন্দ বিষয় থেকে দূরে রাখা; ঙ. ইফতারে হালাল খাবার বেশি না খাওয়া; চ. ইফতারের পর নিজেকে এমন আশা ও ভয়ের মধ্যে রাখা যে, আল্লাহ তাঁর রোযা কবুল করলেন কি না।[৫৫]

রোযা প্রতিটি মুসলিমকে এভাবেই নৈতিকতাসম্পন্ন করতে চায়। কুরআন তাকওয়া অর্জনের যে উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছে তার অর্থই হচ্ছে আল্লাহকে সার্বক্ষণিক স্মরণে রাখা এবং তাঁর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতিকে জাগ্রত রাখা। আর এই অনুভূতিই মুসলিমকে পূর্ণ সততা অর্জন করতে সাহায্য করে।

৩.১.৩. হজ্জ

সামর্থ্যবান মুসলিমদের উপর জীবনে একবার হজ্জ সম্পন্ন করা আবশ্যকীয় করা হয়েছে। হজ্জের এই আনুষ্ঠানিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে চূড়ান্তভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি গ্রহণ। এখানে প্রদর্শনেচ্ছার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কেউ হজ্জ করে এসে 'হাজী সাহেব' নাম ধারণ করতে পারেন। তার এই হজ্জের কোনো অর্থ নেই। এটি হজ্জের সাথে মিথ্যা আচরণ। মহানবী (স.) এ সম্পর্কে বলেন,

> যে কেবল আল্লাহর জন্য হজ্জ করল, এসময় স্ত্রী সহবাস ও কোনো প্রকার পাপাচারের কাজ করল না সে তার মা কর্তৃক ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মতই হয়ে গেল।[৫৬]

অর্থাৎ কেউ যদি হজ্জ করার পর বাস্তব জীবনে হজ্জের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তাহলে সে নিষ্পাপ শিশুর মত পবিত্র হয়ে যাবে। এজন্য তাকে অবশ্যই পাপ ও মন্দ কাজ ত্যাগ করতে হবে এবং ভালো কাজের অনুসারী হতে হবে।

ইবরাহীম (আ.) এর মাধ্যমে হজ্জের প্রচলন হয়েছে। ইবরাহীম (আ.)কে কুরআনে বারবার উল্লেখের কারণ তিনি ইহুদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম- তিনটি ধর্মের অনুসারীদের নিকট সম্মানের স্থান দখল করে আছেন। ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ তাঁকে যেভাবে স্মরণ করে সত্যিকার অর্থে ইবরাহীম (আ.) তাদের ধারণার সাথে সম্পূর্ণ সে রকম ছিলেন না। তাদের এই ধারণাগুলো খণ্ডন করে ইবরাহীম (আ.) এর তাওহীদবাদী ধারণাকে উপস্থাপনই কুরআনের মূল লক্ষ্য। ইবরাহীম (আ.) শিশু ইসমাঈলকে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং তাঁরই আদেশে মক্কার জন-মানবহীন উপত্যকায় রেখে ফিলিস্তিন ফিরে যান। ইসমাঈল (আ.) বড় হলে আল্লাহর নির্দেশে কা'বা নির্মাণ করতে মক্কায় আসেন। কা'বা নির্মাণ শেষ হলে এর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিতে বলা হয়, যেন দূরদূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে বা বাহনে চড়ে তারা হজ্জ করতে আসে; (২২: ২৭)। হজ্জের উদ্দেশ্যে জীবনে একবার হলেও কা'বার সামনে এসে আল্লাহর জন্য নিজেকে নিবেদিত করতে বলা হলো। তিনি দোআ করেন,

> হে আমাদের রব, আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত এক দল লোক সৃষ্টি করুন, আর আমাদেরকে হজ্জের রীতিনীতি বলে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।[৫৭]

অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্যই হজ্জ করতে হবে। আর সেটি পালন করতে হবে যথাযথ নিয়মে। এর আনুষ্ঠানিক প্রতিটি কাজ যেন সঠিকভাবে করা যায় সেজন্য আল্লাহর কাছে সাহায্যও চাইতে হবে। হজ্জের সময় কোনো প্রকার বৈধ যৌনকর্মও নিষেধ করা হয়েছে; পাপাচার ও ঝগড়া বিবাদ করা যাবে না। কোনো বৈধ প্রয়োজনেও বিবাদ করা যাবে না।

> হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত। কেউ যদি ঐ মাসগুলোর মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে তাহলে সে হজ্জের সময় সহবাস, দুষ্কর্ম ও কলহ করতে পারবে না এবং তোমরা যে কোনো সৎ কাজ কর না কেন আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন। (২: ১৯৭)

অর্থাৎ এটি এমন এক প্রশিক্ষণ যেখানে নিজেকে সর্বাবস্থায় নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। নিজের ক্রোধ, কাম, মোহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শক্তিশালী হতে হয়। এগুলোর অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগেই জগতের অধিকাংশ অঘটন ঘটে। রোযার শিক্ষাও ছিল এ ধরনের। এখানেও সেই একই প্রশিক্ষণ। হজ্জ শেষ করার পর জীবনকে নতুন করে সাজাতে হয়। যার শুরু হয় আল্লাহর স্মরণে বেশি ব্যাপৃত হওয়ার মাধ্যমে। "তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজ্জের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ"।[৫৮] হজ্জ শেষ করার পর কুরবানী করতে হয়; সেটি কীভাবে করতে হবে কুরআনে এসেছে,

> আর কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়- তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি ওগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৩৯]

এখানে কুরবানীর নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উট কুরবানী করতে হবে দাঁড়ানো অবস্থায়; এবং সম্পূর্ণরূপে এরা জীবন ত্যাগ করলে সেগুলোর গোশত কেটে নিজেরা খেতে হবে এবং অন্যদেরকেও খাওয়াতে হবে। কুরআনের এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে হজ্জের শিক্ষার প্রমাণ হয়।

বর্তমানে আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ করি না। অথচ হজ্জের প্রতিটি প্রতীকী কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহরামের কাপড় পরার সাথে সাথে বারবার উচ্চরণ করতে হয় (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা----) "হে আল্লাহ! আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত কেবল তোমার এবং সমগ্র রাজত্ব কেবল তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই"। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া বা কারো নিকট মাথা নত করার ধারণা বর্জন করা হয়েছে। কা'বার চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণের অর্থ সারা বিশ্বের মুসলিমগণ এক কা'বা কেন্দ্রিক ঐক্যবদ্ধ জাতি। আরাফাতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ মুসলিম একজন ইমামের বক্তৃতা শোনেন নিস্তব্ধ নিরবতায়। এর অর্থ মুসলিম জাতি তাদের নেতার সৎ নির্দেশ পালনে প্রস্তুত থাকবে। কংকর নিক্ষেপের অর্থ শয়তানকে নিজের মন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া; সা'য়ী করা মানে বীরত্বের সাথে আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও টিকে থাকার প্রশিক্ষণ। এরপর কুরবানীর মাধ্যমে হজ্জের সমাপ্তির দিকে যাওয়া হয়। আর এই কুরবানীর গোশতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "নিজেরা খাও আর যারা চায় এবং যারা সংযম অবলম্বন করে তাদেরকে খাওয়াও"। সর্বশেষে বলা হয়েছে, হজ্জ শেষ করে আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করতে হবে।

আসলে হজ্জের মাধ্যমে যা অনুশীলন করা হয় তার চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে আল্লাহকে অধিক স্মরণ করার মাধ্যমে নিজের নৈতিক জীবনকে সুন্দর করা। অন্যায় কথা, কাজ ও চিন্তা তখনই বাধাগ্রস্ত হয় যখন মনে বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ আসবে। অন্যের হক নষ্ট করার চিন্তা কখনো আসবে না, যদি আল্লাহর স্মরণ মনে থাকে। এই ধরনের হজ্জের ব্যাপারেই বলা হয়েছে মানুষ নিষ্পাপ শিশুর মত পবিত্র হয়ে যায়।

৩. ১. ৪. যাকাত

ইসলামের উপর বিশ্বাসের স্বীকৃতির প্রমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যাকাত। মানব সমাজে ধনী ও গরীব শ্রেণি সব সময় ছিল এবং থাকবে। আল্লাহর সৃষ্টির নৈপূণ্যের অংশ হিসেবে তিনি এই পার্থক্য রেখেছেন। বাস্তবেই সবাই চেষ্টা করেও সম্পদশালী হতে পারে না, সবাই উচ্চ মর্যদা পায় না, সবার মন এক কাজের দিকে ধাবিত হয় না। যদি তাই হতো তাহলে সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেত। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলো গরীব রাষ্ট্রগুলোর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। উন্নত রাষ্ট্রগুলো ইচ্ছে করে গরীবদেরকে আরো গরীব

হওয়ার সুযোগ করে দেয়- কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আমরা বিশ্বের উচ্চ অর্থনীতির দেশসমূহে বেকারত্বের হার দেখতে পাই, বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে, মহামারিতে, রাজনৈতিক কারণে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। রোগ-ব্যাধি, দুর্ঘটনায় অনেকে চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে একজন সম্পদশালী মুহূর্তের মধ্যে কপর্দক-শূন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সূদের বোঝা টানতে না পেরে অনেক নামকরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে। গোত্রে গোত্রে সহিংসতার কারণে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়া হয়, সর্বোপরি যুদ্ধের মাধ্যেমে একটি রাষ্ট্র চরম মানবিক বিপর্যয়ের শিকার হয়। পৃথিবীতে এসব সমস্যা কোনো দিন শেষ হবে না। একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রগুলোর উপর কর্তৃত্ব করতে চাইবে- এটাও স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। এ কারণে উদীয়মান অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তিকে কীভাবে দাবিয়ে রাখা যায় সেই চেষ্টা থেকে শুরু হয় অবরোধ আরোপ। সরাসরি যুদ্ধ না করে একটি রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। সিরিয়া, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, উত্তর কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে চরম মানবিক বিপর্যয় মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট। কিন্তু যা হয়েছে সেই বাস্তবতার সমাধান করা বিশ্ববাসীর, বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব।

এজন্য ইসলাম চিরন্তনভাবে যাকাতের মত পদ্ধতি রেখেছে। এটি পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের জন্য আল্লাহর বিধান হিসেবে কার্যকর ছিল। এমনকি ঈসা (আ.) এর জন্মের পর তিনি অলৌকিকভাবে মায়ের কোলে প্রথম যে কথাগুলো বলেছিলেন সেখানে সালাত ও যাকাতের কথাও আছে।[৬০] যাকাত পুঁজিবাদী সমাজের দানের মত নয়; বরং এটি আদৌ কোনো দান নয়। এটি সম্পদশালীদের কাছে থেকে আল্লাহ কর্তৃক বার্ষিক কর আদায়। কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে এই কর দিতে হয় না। কিন্তু যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে বলে স্বীকৃতি দেবে তাকে যাকাত দিতেই হবে।

ইসলাম যে মানবতাবাদী সভ্যতা সৃষ্টি করেছে এবং সবসময় তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায় তার মূল কথাই হচ্ছে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, মানুষের পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ অর্জন। শুধু অপার্থিব কল্যাণ বা সফলতা অর্জনের জন্য পার্থিব বিষয়কে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া কোনোভাবেই ইসলামী আদর্শ নয়, বরং পার্থিব ভোগ সামগ্রী যা মানুষের কল্যাণের জন্য বা উপকার গ্রহণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে উপকার গ্রহণ না করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। যাকাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন সফলতা। সালাত ও সিয়াম আদায়ের মাধ্যমে মানুষ নৈতিকভাবে যে উন্নতি অর্জন করে তার বাস্তব প্রতিফলন যাকাতের মাধ্যমে ঘটাতে হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ গরীব মিসকিনসহ আট শ্রেণির মাঝে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে সমাজের বিশাল জনগোষ্ঠী স্বচ্ছলতা লাভ করতে পারে। তাদেরকে স্বাবলম্বী করে দেওয়ার মাধ্যমে বেকারত্ব দূর হয়। যার উপর যাকাত ফরজ হয়নি তাকে এতটুকু সম্পদ যাকাত হিসেবে দেওয়া যায় যতটুকু পেলে তার উপর যাকাত ফরজ হবে না। তবে তিনি যদি স্ত্রী সন্তানদের জন্যও যাকাত নিতে চান যারা যাকাতের হকদার, তাতে যাকাত নিতে আপত্তি নেই। এতে তাদের পৃথকভাবে কারো উপর যাকাত ফরজ না হলেও সবাই মিলে একটি বড় অংকের টাকার মালিক হয়ে যান।

এই অর্থ তিনি ব্যবসায় খাটাতে পারেন এবং সবার কল্যাণে তা ভূমিকা রাখতে পারে। এভাবে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার বড় ধরনের সমাধান হয়ে যাচ্ছে। যারা যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত তাদের মাসিক বেতনও এই খাত থেকে দিতে হয়। সুতরাং ইসলামের যাকাত বিধান মানবতার কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যাকাতের সম্পদ সাধারণভাবে অমুসলিমদের দেওয়া যায় না; এর অর্থ এই নয় যে, অমুসলিম দরিদ্রদের প্রতি মুসলিমদের করণীয় নেই। বরং একজন মুসলিম যখন দান সাদকা করবে তা যে কোনো ধর্মের মানুষকেই সে করতে পারে, এতে তার পূণ্যের কমতি হবে না।

তবে যাকাত আদায় সহজ কথা নয়। যাদের অন্তরে সংকীর্ণতা আছে, কিংবা যারা নিজেদেরকে ক্রমাগত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা সম্পদশালী করতে চায় তারা বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মধ্যে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা যাকাত আদায় করবে এটি কি করে সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে এ কারণেই মহানবীর (স.) ইন্তিকালের পর আরবের কিছু নও মুসলিম গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে। তারা নামাজ, রোযা ও হজ্জ করতে প্রস্তুত, কিন্তু যাকাত দিতে প্রস্তুত নয়। আবু বকর (রা.) এদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করতে অস্বীকার করলেন। তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করেন। যে ইসলামের একটি মৌলিক ভিত্তিকে অস্বীকার করবে, সহজ কথায় তার ইসলামে প্রবেশের দাবি সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে প্রবেশ মানে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ। যে ইসলামে প্রবেশের ঘোষণা দেয় কিন্তু পরে ইসলামের ফরয বিধান মানতে রাজি হয় না সে আল্লাহর সাথে মিথ্যা দাবি করে। অথচ এই মিথ্যা বর্জন করার নামই ইসলাম। যাকাতের মাধ্যমে মানুষকে নিজের উপার্জিত প্রিয় সম্পদ বিনা শর্তে উৎসর্গ করতে হয়। সম্পদের এধরনের উৎসর্গ মানুষের জন্য কঠিন পরীক্ষা। মানুষ সামান্য সম্পদ রক্ষার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়; আর সেই অবস্থায় আল্লাহর নামে কোনো বিনিময় ছাড়া সম্পদ প্রদান বড় কঠিন কাজ। এজন্যই আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার প্রমাণের জন্য যাকাতকে সব যুগেই অবধারিত রাখা হয়েছিল।

৩. ১. ৫. কুরবানী

ইসলামের আরেকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত হচ্ছে কুরবানী। কুরবানীর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পশু যবেহ করলেও এর উদ্দেশ্য থাকে মনের ভেতরের পশুত্বকে বিসর্জন দিয়ে সেখানে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য ও ভালোবাসা স্থাপন করা। কুরবানী শব্দের অর্থ হচ্ছে নৈকট্য অর্জন। পশু যবেহর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হয় বলে একে কুরবানী বলা হয়। হযরত আদম থেকে শুরু করে সব নবীর উম্মতের জন্যই কুরবানীর বিধান ছিল। বর্তমান কুরবানীর ধারা শুরু হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মাধ্যমে।

কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় সৃষ্টি। ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যবাদিতার চরম পরীক্ষা দিচ্ছিলেন এবং একে একে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলছিলেন, এমনি সময় তাঁর উপর সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা এল-নিজ সন্তানকে যবেহ করা। পুত্রের পরিবর্তে তিনি স্বর্গীয় দুম্বা কুরবানী করলেন আর সেটিই ইসলামে আবশ্যকীয় করা হয়। হিজরী বর্ষের শেষ মাস যিল হজ্জের ১০ম তারিখ কুরবানীর দিন, যদিও পরের দুই দিনও কুরবানী করা যায়। এ সময় প্রচুর গোশত বণ্টন হয় এবং

খাওয়া হয়। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের পশুর গোশত, রক্ত আল্লাহর কাছে কখনো পৌঁছে না, পৌঁছে তোমাদের অন্তরের তাকওয়া"।[৬১] অর্থাৎ কুরবানীর প্রথম উদ্দেশ্য মনের গহীনে আল্লাহর ভয়কে গভীরভাবে স্থাপন করা। সত্যবাদী হওয়ার জন্য আল্লাহর ইচ্ছাকে মনে প্রাণে মেনে নিতে হয়। কুরবানীর দ্বিতীয় শিক্ষা পশুর গোশত নিজে তৃপ্তিসহকারে খাওয়া এবং অন্যদের মধ্যে বণ্টন করা। সেগুলোকে না বিলিয়ে জমা করে রাখা ত্যাগের পরিচয় নয়। আবার কুরবানীর পশু সুন্দর হতে হয় যেন তার প্রতি ভালোবাসা জাগে। এবং সেই প্রিয় জিনিসকে যবেহ করে যেন আমরা বেদনাহত হতে পারি, যে কষ্ট বা বেদনার মূল কারণ নিজের অর্থের ও সম্পদের বিয়োগ। কিন্তু আবার তৃপ্তি আসবে এ কারণে যে, আমরা আল্লাহর আদেশ পালন করছি। সে কারণেই এটিকে ঈদের দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখান থেকে যখন আমরা মানবতার কল্যাণের শিক্ষা নিতে পারব তখনই আমাদের কুরবানী স্বার্থক হবে।

৩.১.৬. পোশাক

সত্যবাদিতা প্রসঙ্গে পোশাকের বিষয়টির আলোচনা এজন্যই প্রয়োজন যে, অনেকে বাহ্যিক পোশাকের মধ্যেই ইসলাম খুঁজতে চান। অথচ ইসলাম মানুষের বাইরের দিকের চেয়ে ভেতরটাকেই আগে সুদৃঢ় করতে চায়। ইসলামের আনুষ্ঠানিক বা বাহ্যিক ইবাদতের মধ্যে শালীন পোশাক পরিধান অন্যতম। এক্ষেত্রে সাধারণ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'লিবাস' শব্দটি। এর শাব্দিক হচ্ছে যা আবৃত করে। পরিভাষায় বাহ্যিক পোশাক ও দৈহিক প্রকাশ সবই লিবাসের অন্তর্ভুক্ত, যেমন: দাড়ি , চুল, গোঁফও লিবাসের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (সা.) নিজে কখনো অশালীন পোশাকে চলাফেরা করেননি; নিজের পোশাক পরিধানে কোনো বিলাসিতার আশ্রয় নেননি আবার অসুন্দর ও বেমানান পোশাকও পরেননি।

পোশাকের ব্যাপারে কুরআনের সাধারণ নির্দেশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এখানে কয়েকটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা অন্য কোনো মতাদর্শে পাওয়া যায় না। কুরআনের আদেশটি হচ্ছে,

> তোমাদের জন্য আমি পোশাক নাযিল করেছি; যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করবে আর আমিই সৌন্দর্যের পোশাক অবতীর্ণ করেছি। তবে তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম।[৬২]

অর্থাৎ পোশাকের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সৌন্দর্য প্রকাশ করা। তবে অন্য এক ধরনের পোশাককে সর্বোত্তম পোশাক বলা হয়েছে: সেটি হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক যা ইসলামী নীতিদর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণা। আগেই বলা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র তাকওয়াই মানুষকে সৎ মানুষে পরিণত করতে পারে। তাকওয়ার পোশাক মানে এমনভাবে বাহ্যিক পোশাক পরা যার মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ পায় না; আর অন্তরকে আল্লাহর ভয় দিয়ে ঢেকে রাখা, যার ফলে তার বাহ্যিক আচরণে আল্লাহর দাসত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়, চেহারায় আল্লাহর প্রতি বিনয়ের ভাব পরিস্ফুট হয় এবং লোকেরা তার কাছ থেকে কোনো ক্ষতি দূরে থাক কেবল উপকার ও সহমর্মিতার আশা করবে। এটিই হচ্ছে সত্যিকার তাকওয়ার পোশাক, এর জন্যই এখানে নির্দেশ করা হয়েছে। বাহ্যিক পোশাক পরিধানের ব্যাপারে বরং বলা হয়েছে সুন্দর পোশাক পরে মসজিদে উপস্থিত হতে।

বাহ্যিক পোশাকের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়টি হচ্ছে, পোশাকের মাধ্যমে ইসলামী একটি ধারার প্রচলন। এক্ষেত্রে মহানবীর নির্দেশনা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখ, অন্য জাতি কী পোশাক পরেছে সেটি নয় বরং আল্লাহর ইবাদত পালনে যে পোশাক তোমাদের জন্য সহজতর সেটি পরিধান করো। তা কেমন হবে তিনি নিজে দেখিয়েছেন। প্রতিটি যুগে এবং বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পোশাকে বিভিন্ন পরির্বতন থাকতে পারে, কিন্তু যারা ইসলামের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন ও বাস্তবে অনুসরণের চেষ্টা করেন, অলিখিতভাবেই দেখা যায় তাদের পোশাকের ধরন প্রায় একই রকম।

বাহ্যিক পোশাকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হচ্ছে, এমন পোশাক পরিধান যাতে মুসলিম নারীদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে এবং নিজেরা অন্যান্য নারীদের চেয়ে বখাটে ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষদের হাত থেকে বেশি নিরাপত্তা লাভ করে। ইসলামের এই বিষয়টি পর্দা প্রথা। একটি জীবন ব্যবস্থায় যদি নারী ও পুরুষের আচরণ, চলাফেরা কিংবা কাজ কর্মের সাদৃশ্য ও ভিন্নতার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা না থাকে তাহলে সে মতবাদকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে ইসলামে তার পূর্ণ নির্দেশনা আছে। পোশাকের ক্ষেত্রে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি কখনো কোনো চূড়ান্ত ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারেনি এবং হয়ত পারবেও না, সে কারণেই কুরআন এ ব্যাপারে মুসলিম নারীদের পোশাক ও পুরুষদের পোশাককে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। নারী পুরুষের চলা ফেরার ব্যাপারে যদি ইসলামে কোনো অস্পষ্টতা থাকত তাহলে ইসলামকে সেকেলে বলা যেত। ইসলাম নারীর সম্মান রক্ষার্থে *জিলবাব* বা ভিন্ন কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে রাখার কথা বলেছে যাতে তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ না পায়; এবং নিজেদের দৃষ্টি, কথা বার্তা ও চলা ফেরাকে সংযত ও অবনমিত রাখতে বলেছে যেন পরপুরুষের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়।[৬৩]

কিন্তু এতসবের পরও কুরআন মানুষের বাহ্যিক লেবাসের চেয়ে তাকওয়ার লেবাসকে সর্বোত্তম আখ্যা দিয়েছে। দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবির বাহ্যিক আবরণের ভেতর যদি অন্তরে তাকওয়ার আবরণ না থাকে তাহলে এই পোশাকের কোনো মূল্য নেই। যে নারী অত্যন্ত সুন্দরভাবে পর্দা মেনে চলেন কিন্তু অন্তরে অন্য নারীদের উপকারের জন্য তার কোনো অনুভূতি আসে না, তার এই আবরণকেও মূল্যবান বলা যায় না। মহানবী (সা.) এর মৌলিক দায়িত্ব ছিল উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ নমুনা উপস্থাপন। তাঁর স্ত্রী কন্যাদের সাথে আচরণের মাধ্যমে পৃথিবীর সব নারীদের জন্য তিনি সেই আদর্শ উপস্থাপন করেন। পবিত্র কুরআনে যে দুজন নারীকে পৃথিবীর অন্যান্য নারীর আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাঁরা হলেন, ফেরাউনের স্ত্রী এবং ঈসা (আ.) এর মা মরিয়ম (আ.)।[৬৪] মরিয়মের চরিত্রের প্রধান গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, নিজের যৌবনকে পবিত্র রাখা। অর্থাৎ প্রকৃত কথা হচ্ছে পোশাকের মাধ্যমে নিজের যৌবনকে পবিত্র রাখা। বাহ্যিক পোশাকের মাধ্যমে যদি নিজের যৌবনকে অন্যের হাত থেকে নিরাপদ রাখা যায় তাহলে সেই পোশাকের মর্যাদা স্বীকার করতে হবে, চাই সেটি পুরুষের কিংবা নারীর পোশাক হোক। এর উপর যখন অন্তরের তাকওয়ার লেবাস যুক্ত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সেই নারী বা পুরুষকে পার্থিব ও পরকালীন সফলতার অংশীদার মনে করা যেতে পারে।

ইসলামে পর্দার সাথে কমপক্ষে তিনটি বিষয় জড়িত: পোশাক, দৃষ্টি ও শ্রবণ। পোশাকের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের নিজেদের সতর ঢাকতে হয় আর বিপরীত লিঙ্গের নারী-পুরুষ পরস্পরের উপর দৃষ্টিকে হেফাযত করতে হয়। নারীদেরকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, পুরুষদের সাথে সুন্দর কণ্ঠে কথা না বলতে, কারণ এতে রোগাক্রান্ত হৃদয় লোভাতুর হয়ে উঠে (৩৩: ৩২)। কুরআন এই তিনটি বিষয়কে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছে। প্রথম বিষয়টির আলোচনা উপরে এসেছে। দ্বিতীয় বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার এটি বড় একটি প্রমাণ। এটিই মূলত প্রকৃত পর্দা। একজন মুসলিম নারী বাইরে বের হওয়ার সময় হয়ত পর্দা করে বের হবেন, কিন্তু অন্য ধর্মের নারীদের তো ইসলামী বিধান মানা আবশ্যক নয়। তাহলে এক্ষেত্রে একজন পুরুষ মুসলিমের পক্ষে নিজের দৃষ্টিকে সংরক্ষণ রাখা কত কঠিন কাজ। এজন্য পর্দা প্রতিপালনে একজন মুসলিম পুরুষের দায়িত্ব অনেক বেশি এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি আগে পরিবর্তন করতে হয়। মহানবী (স.) মক্কায় যখন ইসলামের প্রচার করেন তখন পর্দার বিধান নাযিল হয়নি, কেবল বলা হয়েছে মুমিনগণ তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তখন যারা ইসলামে দীক্ষা লাভ করেন তাঁরা আল্লাহর উপর প্রবল বিশ্বাস ও আল্লাহর সৌন্দর্যে এতই বিভোর ছিলেন যে সামান্য নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লালসার পেছনে মনোনিবেশ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই অনুভূতি সৃষ্টিই পর্দার মূল লক্ষ্য। আধুনিক যুগে বাইরের চেয়ে বরং ঘরে এবং যখন কেউ একাকী অবস্থান করে তা আরো বিপজ্জনক পরিস্থিতি। আধুনিক ডিভাইসগুলো যুবক নারী পুরুষকে তাদের দৃষ্টির এবং কর্ণের সংরক্ষণে সবকিছুকে এলোমেলো করে দিয়েছে। পর্দার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এখানে। মহানবী (স.) অন্ধ ব্যক্তি থেকেও নারীদের পর্দা করতে বলেছেন। কারণ চোখে না দেখলেও তার শ্রবণশক্তি সজাগ থাকে। সুতরাং তাকওয়ার লেবাস না পরা পর্যন্ত যত পোশাকি পর্দাই আমরা করি না কেন সেটির মূল্য খুব বেশি নয়। আল্লাহর দৃষ্টি থেকে আমরা কখনো মুক্ত হতে পারব না-এই বিশ্বাসের স্বীকৃতির নামই হচ্ছে আল্লাহকে বিশ্বাস করার ঘোষণা। এই প্রকাশ্য ঘোষণা ছাড়া কেউ মুসলিম হতে পারে না। কেউ প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দিয়ে যদি গোপনে আল্লাহর দৃষ্টিকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাহলে সে সত্যবাদী নয়।

তবে ইসলামের প্রতিটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের বাহ্যিক দিকের গুরুত্ব কোনোভাবেই তুচ্ছ নয়। বরং অভ্যন্তরীণ দিকটির বাহ্যিক প্রকাশ তার অনুষ্ঠানে প্রকাশ পাবেই। এটিই ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলিম আমলের দিল্লীর লাল কেল্লার চরম বিলাসিতাপূর্ণ একটি সুরম্য অট্টালিকার গায়েও লেখা ছিল,

তোমার পায়ে বন্ধন, তোমার দিল তালাবদ্ধ,
চক্ষযুগল অগ্নিদগ্ধ আর পদযুগল কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত;
ইচ্ছা তোমার পশ্চিমে সফর করার
অথচ চলেছ পূর্বমুখী হয়ে,
পশ্চাতে মনযিল রেখে কে তুমি চলছ
এখনো সতর্ক হও।

এর অর্থ ইসলামের স্বীকৃতি মানেই হচ্ছে মুসলিম জীবন বল্গাহারা স্বাধীন হতে পারে না। তাকে তার বিশ্বাস এমনভাবে জড়িয়ে রাখবে যে, সে তার নিজের প্রতিটি কর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকবে। তার বাহ্যিক চালচলনে কেউ কোনো কষ্ট পাবে না এবং গোপনে কেবল সে অন্য মানুষের কল্যাণ কামনা করবে।

মানুষ আল্লাহর জন্য যখন নির্ভেজাল ইবাদত করবে, তখন তাতে আল্লাহর সন্তোষ অর্জিত হবে, যার প্রতিফল পরকালীন সফলতা। পার্থিব জীবনে কারো উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট কি না সেটি নির্ণয় বা পরিমাপ সম্ভব নয়। মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহর উপর আস্থা রেখে আল্লাহর হকসমূহ আদায় করা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হক বলতেও কিছু নেই, বরং হাক্কুল্লাহ মূলত হাক্কুন্নাফস বা নিজের নফসের হক। আল্লাহ মানুষের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন, বরং তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে ও সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। মানুষ যদি আল্লাহর নির্দেশ মেনে আল্লাহকে সিজদা করে সালাত আদায় করে, রোযা রাখে বা ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলে তখন তাতে আল্লাহর উপকার হয় না, বরং ব্যক্তির নিজের উপকার হয়, যাকে বলা যায়- পার্থিব দৃষ্টিতে উন্নত নৈতিকতা অর্জন আর অপার্থিব দৃষ্টিতে পরম সাফল্য। এমনকি সমগ্র পৃথিবীর সবাই যদি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে তাতেও আল্লাহর কোনো উপকার নেই, আবার যদি সবাই তাঁর অকৃতজ্ঞতা ও না-ফরমানি করে তাতেও তাঁর সামান্য ক্ষতি নেই। কারণ তিনি জগতের সব কিছুর ঊর্ধ্বে। মানুষ মদ্যপান করলে আল্লাহর দেওয়া নিজ দেহকেই ক্ষতি করে। এতে সে আল্লাহর দানের অমর্যাদা করছে, আল্লাহর হক নষ্ট করছে। কিন্তু যদি মদ্যপানের কারণে অন্যের ক্ষতিসাধন করে তাহলে এর পাপ আল্লাহ ও মানুষের উভয়ের হক নষ্ট করার মাধ্যম হয় । আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার ক্ষতি তিনি ক্ষমা করবেন না।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামী নীতিদর্শনে পোশাকের প্রসঙ্গটি একান্তভাবে নৈতিকতার সাথে যুক্ত বিষয়। পাশ্চাত্য দর্শন বা অন্যান্য জীবনধারায় এটির গুরুত্ব যতই কম হোক না কেন ইসলামী জীবনদর্শনে এর গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। আল্লাহ এবং তাঁর নবীর প্রদর্শিত সরল পথকে সত্যিকারভাবে অনুসরণের জন্য এটির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

৩.২. আল্লাহর প্রতিনিধিত্বে সততা

মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ তাঁর খলীফার জন্য যে সব দায়িত্ব দিয়েছেন সেগুলো যথাযথভাবে পালনের অর্থই হচ্ছে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সততা। এই প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মানুষকে তিনি সব ধরনের যোগ্যতা এবং উপায় উপকরণ দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে,

> তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করে দিয়েছি বিশ্রাম, রাতকে করেছি আবরণ, আর দিনকে করেছি জীবিকা সংগ্রহের মাধ্যম। আর আমি তোমাদের উপরে বানিয়েছি সাতটি সুদৃঢ় আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল প্রদীপ। আর আমি বর্ষণ করি বৃষ্টিবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি, যাতে আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ, আর ঘন উদ্যানসমূহ"।[৬৫]

এর মানে বিশ্বজগতের যাবতীয় উপকরণ দেওয়া হয়েছে মানুষের সম্মানজনক জীবনধারণ ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। "আর সঠিক পথ বাতলে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব, এবং পথের মধ্যে কিছু আছে বক্র। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন"।[৬৬] অর্থাৎ ভ্রান্ত ও সঠিক পথ- দুটোই আল্লাহর সৃষ্টি। যে সঠিক পথে চলতে চাইবে আল্লাহ তাকে সেই পথে চলতে সাহায্য করবেন। এই স্বাধীনতার কারণও প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা। আবার কীভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে সে নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব স্বাভাবিক কারণেই আল্লাহ নিজের হাতে রেখেছেন। তিনি মানুষকে জোর করে সঠিক পথ প্রদর্শন বা মন্দ পথে পরিচালনা করেন না। ফেরেশতারা আল্লাহর প্রতিনিধি নন, কেবল দাস; কিন্তু মানুষ দাস ও প্রতিনিধি; এজন্য ফেরেশতারাও মানুষকে সেজদা করেছেন। কিন্তু শয়তান সেটিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এজন্য বিশ্বজগতের সব কিছুকে মানুষ করায়ত্ত্ব করতে পারে, কিন্তু শয়তানের সাথে পেরে উঠে না। একটি শক্তিধর রাষ্ট্রকে অন্য একটি শক্তিধর রাষ্ট্র মুহূর্তের মধ্যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে, কিন্তু শয়তানের একটি ডানার অগ্রভাগও তার ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ, শয়তানকে সেই শক্তি কেবল আল্লাহই দিয়েছেন। শয়তানের সাথে লড়াইয়ে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তখনই সফল হবে যখন সে আল্লাহর হিদায়াতের পূর্ণ অনুসরণ করবে। আদম ও হাওয়া (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

> তোমরা সবাই সেখান থেকে নেমে যাও, তবে যদি তোমাদের নিকট আমার হিদায়াত আসে অতঃপর যে আমার হিদায়াত অনুসারে চলবে তাদের না থাকবে কোনো ভয় ও না থাকবে দুশ্চিন্তা। (২: ৩৮)

বলা বাহুল্য এই হিদায়াত পাওয়ার জন্য আদমকে কয়েকশত বছর পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এর একটি উদ্দেশ্যও ছিল: যে পৃথিবীতে সব কিছুর উপর রাজত্ব করার বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই সাম্রাজ্যকে ভালো করে দেখা নেওয়া।

প্রতিনিধির প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে নিয়োগকর্তার পূর্ণ আনুগত্য, শাসন ও ক্ষমতা মেনে নেওয়া। মানুষ তার বাহ্যিক দেহের যে অংশের উপর কর্তৃত্ব করে তা ঠুনকো মাটির তৈরি তুচ্ছ জিনিস। এই জিনিসের পক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। বরং আল্লাহর তাঁর রূহের ফুৎকার মানুষের মধ্যে দেওয়ার কারণেই মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা পায়। এই ফুৎকার তিনি অন্য প্রাণী-উদ্ভিদ বা জড়ের উপর দেন না। একারণে আল্লাহর সাথে মানুষের যে রূহের সম্পর্ক তার বাস্তব প্রতিফলন আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যের মাঝে। কেউ যদি নিজেকে "আমিই সর্বোচ্চ রব" বলে দাবি করে তাহলে আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার পরিবর্তে সে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। আবার কেউ যদি দুনিয়ার শক্তিধর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে আল্লাহর অন্য প্রতিনিধি ও বান্দাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে তাহলে সে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন না করে বরং আল্লাহর কর্তৃত্বের সাথে নিজের কর্তৃত্বের অংশ বসাতে চায়। আল্লাহ তাকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিয়ে তার বিদ্রোহের শাস্তি দেন। ফেরাউনকে আল্লাহ মাত্র দুটো পানির ঢেউ দিয়ে ধ্বংস করেন। নমরুদকে সামান্য মশার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন। সুতরাং প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে সেই দায়িত্বপালনে মনকে প্রস্তুত করাই তার সততার পরিচয়।

আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দ্বিতীয় দায়িত্ব মানুষের খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিবর্তে আল্লাহর পাঠানো হিদায়াতের পূর্ণ অনুসরণ। "যে আমার হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তার জন্য একটি শয়তানকে নির্ধারণ করে দিই।"[৬৭] অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বাণীর অনুসরণ করবে না সে শয়তানের অনুসরণ করে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের পদ বিসর্জন দেয়। আল্লাহ এমন কর্মচারীকে কেন তাঁর কর্মচারী হিসেবে পুরস্কৃত করবেন যে কর্তৃপক্ষের আদেশকে আমলে নেয় না? অথচ তাকে দায়িত্ব দেওয়ার আগে তিনি স্বীকৃতি আদায় করেছেন- "আমি কি তোমাদের রব নই?" তারা বলল, "অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি"।[৬৮] এটি ছিল রূহের জগতের স্বীকৃতি। আমরা কেউই এধরনের স্বীকৃতির কথা জানি না। কিন্তু কুরআন আমাদেরকে জানিয়েছে আমরা এধরনের স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি। এটি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সময়ও পৃথিবীর জীবনটাকে আমাদের মনে হবে আমরা একটা স্বপ্নের জগতে ছিলাম, একটি সকাল বা সন্ধ্যার মত।

তৃতীয় দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বব্যাপী আল্লাহর হিদায়াত অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। শয়তান মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, তাই মানুষকে পথভ্রষ্ট করা ছাড়া তার আর কোনো কাজ থাকতে পারে না। শয়তান চায় পুরো মানবজাতিকে তার পথে পরিচালিত করতে। কিন্তু এভাবে যদি আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব থেকে মানুষের পদস্খলন ঘটে তাহলে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিফল হবে। গোটা মানবজাতিকে এজন্য সঠিক পথে পরিচালিত করতে আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে লিখিত গ্রন্থসহ লক্ষাধিক পথ প্রদর্শক নবী প্রেরণ করেন। এসব গ্রন্থের ভাষা ভিন্ন হলেও ভাব, অর্থ, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ এক; যদিও বিভিন্ন জাতিকে তাদের অধঃপতনের ধরন অনুযায়ী কিছু ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকার দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন আল্লাহর নিজস্ব বক্তব্য এবং তাঁর আদেশের প্রথম অনুসারী হিসেবে অন্যান্য নবীদের কথা, কাজ ও চিন্তাগুলোকে সমন্বিত ও একত্রিত করে প্রকাশ করেছে। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালনের জন্য এটি শেষ ও চূড়ান্ত পথনির্দেশ।

কুরআন বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের তৃতীয় এই দায়িত্বকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যেমন,

> তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলোকে নিভিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, এতে কাফেরগণ যতই অপছন্দ করুক। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[৬৯]

এর মানে, মহানবী (স.) এর দায়িত্ব ছিল কুরআনের হিদায়াতকে গোটা মানবজাতির কল্যাণে প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের বাস্তবায়ন করা। এর সুফল সম্পর্কে কুরআনে এসেছে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে আসমানের বরকত এবং যমীনের বরকত নাযিল হতে থাকে। "যদি সে জনপদের

অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম" (৭: ৯৬)।

সৃষ্টিজগতে মানুষই কেবল তাঁর এই আদেশ বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য রাখে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ এর কারণ ব্যাখ্যা করেন এভাবে, মানুষ ব্যতীত আর যত সৃষ্টি আছে তারা হয় শুধু আলেম ও আদেল অর্থাৎ জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ।[৭০] অজ্ঞতা, অবিচার তাদের নিকট পৌঁছুতে পারে না। যেমন, অজ্ঞতা ও অবিচার ফেরেশতাদের মধ্যে পৌঁছুতে পারে না। অথবা সেগুলো শুধু অজ্ঞ ও যালেম: জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা তাদের নেই, অর্থাৎ পশু। সুতরাং আমানত ও দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য তাদের নেই। ফেরেশতাগণের পক্ষে নিজের শক্তির মাধ্যমে কোনো কিছু অর্জন করার ক্ষমতা থাকে না, তারা কেবল আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় থাকেন। অন্যদিকে, পশুরা শুধু নিজেদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। কামনা, বাসনা, চরিতার্থ করাই তাদের কাজ। মানুষের মধ্যে উভয় শক্তি বিদ্যমান। তবে উভয় শক্তির আকর্ষণ বিপরীতমুখী। ফেরেশতা স্বভাব মানুষকে উচ্চতর নৈতিকতার দিকে ক্রমাগত আকর্ষণ করে আর পশুস্বভাব ক্রমাগত তাকে নিম্নস্তরে নামাতে চায়। মানুষ তার সামর্থ্যের কারণে যে কোনো পথ অবলম্বন করতে পারে।[৭১] আর যে পথে সে যেতে চায় আল্লাহর তার জন্য সেই পথ সহজ করে দেন (৯২: ৬-১২)।

মানুষকে এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণের পর মানুষ সেটি পালনে যখন অনীহা করে তখনই আল্লাহ তার নবী পাঠিয়ে পুনরায় সেটির বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দেন যেন, তাদের পরবর্তীরা সে ধারা অব্যাহত রাখতে পারেন। আদম (আ.)এর পর কুরআনে নূহ (আ.) এর কথা এসেছে এবং অন্যান্য নবীদের ব্যাপারেও একই কথা বলা হয়েছে,

> তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই বিধি-ব্যবস্থাই দিয়েছেন যার হুকুম তিনি দিয়েছিলেন নূহকে। আর সেই (বিধি ব্যবস্থাই) তোমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে দিলাম যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে- তা এই যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠিত কর, আর তাতে বিভক্তি সৃষ্টি করো না, ব্যাপারটি মুশরিকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যার দিকে তুমি তাদেরকে আহবান জানাচ্ছ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাঁর পথে বেছে নেন, আর তিনি তাঁর পথে পরিচালিত করেন তাকে, যে তাঁর অভিমুখী হয়। (৪২: ১৩-১৫)

এখানে যে কথাগুলো এসেছে- প্রথমত পূর্ববর্তী সব নবী তথা নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসাসহ অন্যান্যদের প্রতি আদেশ ছিল তাঁরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে যারা সঠিক জ্ঞান আসার পরও কেবল নিজেদের মনের বক্রতার কারণে এব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করেছে তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী (স.) এর কাজও সেটি ছিল। আর সেই মহান দায়িত্বের প্রকৃতি হচ্ছে, মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা। দাউদ (আ.)কে আল্লাহ এটিই বলেছেন, "তোমাকে আমার প্রতিনিধি করেছি, কেবল মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে।" মূসা (আ.)কে বলা হয়েছে, যালিম ফেরাউনের হাত থেকে মযলুম ইহুদীদেরকে রক্ষা করে তাদের মধ্যে সুবিচার ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু ইহুদী জাতি পরে নিজেরাই যুলমের পথ বেছে নেয়। ফলে তারা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ

মর্যাদা নষ্ট করে ফেলে। এমনকি সামান্য মাছ ধরার ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের লোভ সামলাতে পারেনি। শনিবার যখন দাউদ (আ.) যাবুর পড়তেন, তখন সমুদ্রের মাছেরা তা শুনতে কিনারায় জড় হত। এজন্য শনিবার মাছ ধরা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহুদীরা সে দিন মাছ না ধরে মাছগুলোকে পরিবেষ্টন করে ফেলত যেন পরের দিন ধরতে পারে। তাদের এই লোভের কারণে তাদের উপর অপমান ও দারিদ্র্য আপতিত হয়।

মহানবী (স.) আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, তাঁর সুবিচার ও ভালোবাসার সুফল মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী উদ্ভিদ এবং প্রাকৃতিক জগতও ভোগ করেছে। কুরআনের ভাষায়, "আমি তোমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি"; (২১: ১০৭)। প্রতিনিধি হিসেবে তাদের মৌলিক কাজ কী হবে নিচের আয়াতটিতে সেটি স্পষ্ট করা হয়েছে:

> তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে। (২২: ৪১)

অর্থাৎ তারা যে কোনো জায়গায় দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে এই চারটি কাজ করবে। এই চারটি কাজই মূলত আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মৌলিক দায়িত্ব। গভীরভাবে তাকালে দেখা যায়, মানব জাতি ইহুদী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা হিন্দু- যে কোনো ধর্মের হোক কিংবা সমাজবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ বা অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসী সবাই এই আয়াতে উল্লেখিত তৃতীয় ও চতুর্থ কাজ তথা পৃথিবীতে ভালো কাজের বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজ প্রতিহত করতে চায়। ভালো মন্দের এই চিরন্তন অনুভূতি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার সেই যোগ্যতারই অংশ, যা তাদেরকে সহজাত হিসেবে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে জলে ও স্থলে বর্তমানে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে সেটি থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো তাদের জ্ঞানী, প্রাজ্ঞসহ সবাই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের পক্ষেই এই বিপর্যয় রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। অন্য কোনো প্রাণী বা অতিজাগতিক ফেরেশতা এসে এগুলো করে দেবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর পৃথিবী উপহার দেওয়ার চেষ্টা তারা করে যাচ্ছেন। পৃথিবীতে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে ভারসাম্যমূলক একটি অবস্থানও অধিকাংশ সময়ে বিদ্যমান থাকে। এজন্য কেউ এককভাবে কোনো বড় ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ নিতে পারে না। আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রসমূহের উন্নয়নের মূল কারণ সূদ ভিত্তিক অর্থনীতি কিংবা সমাজবাদী অর্থনীতির কারণে নয়, বরং ভালো কাজের বাস্তবায়ন ও মন্দ কাজের প্রতিহতকরণের কারণেই। এটিই ছিল প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে যত বেশি সততা থাকবে পৃথিবীতে তত বেশি সুখ ও সমৃদ্ধি আসবে। বর্তমান আমেরিকা-ইউরোপে প্রকৃতির এত দানের কারণ আর কিছু নয় যে, তারা নিজেদের মধ্যে সততার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এই আয়াতটিতে সততার বাস্তবায়নের পূর্বে প্রথমে দুটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে: সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়। এর অর্থ মানুষের বৈষয়িক উন্নয়নের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটলে ভালো কাজের বাস্তবায়ন তথা সুবিচার ভিত্তিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সহজতর হয় এবং মন্দ কাজ তথা যুলম নিপীড়নমূলক কাজ

বন্ধ করাও সহজতর হয়। এজন্যই ইসলামের আলোকে জীবন পরিচালনা করলে অন্যদের চাইতে অনেক সহজ পদ্ধতিতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে সব মানুষ সমান জ্ঞান, মেধা, যোগ্যতা নিয়ে সৃষ্টি হয় না। যারা প্রকৃতিগতভাবে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী তাদের মধ্যেই আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের অনুভূতি বেশি আসবে। তারা যদি তাদের দায়িত্বপালনে অধিকতর সচেতনতা ও সততা দেখাতে পারেন তাহলে তাদের পক্ষে সেটি সম্ভব। মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে উন্নত মেধার অধিকারী বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ সবই আছেন কিন্তু তাঁদের ভেতর আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সত্যিকার অনুভূতি খুব সীমিত। এটি সৃষ্টি হলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে দুর্নীতি, সামাজিক বৈষম্য, অবিচার এবং দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেত। বর্তমানে খিলাফতের ধারণাকে খুব বিতর্কিত করা হয়েছে এবং কিছু লোককে দিয়ে সেটির উদ্ভট দৃশ্যায়ন মানুষের মধ্যে এ নিয়ে ভীতি সৃষ্টি করেছে। অথচ যথাযথভাবে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের অর্থই হচ্ছে আল্লাহর সাথে মানুষের সত্য আচরণের বহিঃপ্রকাশ। এর সুফল ভোগ করবে মানুষ, এতে আল্লাহর কোনো স্বার্থ নেই। মানুষ স্বাধীনভাবে চলতে পারবে, যার যার ধর্মের অনুসরণে বাধা আসবে না, বৈষম্যহীন ও সুবিচারপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কারণে সবাই শান্তি পাবে।

৪. মানুষের সাথে সত্যবাদী হওয়া

মানুষের সাথে সত্য আচরণই মানুষের চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিক। আল্লাহর সাথে মিথ্যা বললে, আল্লাহ সেটি ক্ষমা করে দিতে পারেন যদি কেউ সত্যিকারভাবে ক্ষমা চায়। কিন্তু মানুষের সাথে কথা দিয়ে কথা না রাখলে বা মিথ্যা বললে মানুষকে প্রতারণা করা হয়। এধরনের অপরাধ ক্ষমা করার দায়িত্ব আল্লাহ নেন না, এমনকি যদি সে আল্লাহর পথে শহীদও হয়। এজন্যই কুরআন নির্দেশ দিয়েছে, "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক;"(৯: ১১৯)। এখানে সত্যবাদীদের সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে, সব সময় আন্তরিকভাবে নিজে সত্য বলা এবং সত্যের সমর্থন করা আর নিজেকে সব ধরনের মিথ্যা থেকে রক্ষা করা এবং মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবীদের পথ অনুসরণ করা।[৭২] মানুষের সাথে সত্যবাদিতার প্রকাশ ঘটে প্রধানত সত্য বলা, প্রতিশ্রুতি পালন ও আমানত রক্ষার মাধ্যমে।

পারস্পরিক কথাবার্তায় সত্য বলা ইসলামের প্রথম দাবি। কুরআন বলছে, "তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর না? (৬১: ২)। এর অর্থ যে কাজটি অন্যের কাছে বলতে হবে, সেটি সবার আগে নিজে করে দেখাতে হবে। মহানবী (স.) একটি শিশুকে মিষ্টি খাওয়া কমাতে বলার আগে নিজে কিছুদিন সে বিষয়টির অভ্যাস করেন এবং তারপর শিশুটিকে ডেকে বলেন, "বাবা, মিষ্টি বেশি খেয়ো না"। একটি শিশুকেও উপদেশ দেওয়ার আগে কীভাবে নিজে সেটির অনুসরণ করতে হয় মহানবী (স.) নিজে তা করে দেখালেন। পূর্ববর্তী জাতির লোকদের অধঃপতনের কারণ হিসেবেও কুরআনে এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদী জাতির আলেম সমাজ মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দিত আর নিজেরা তার বিপরীত কাজ করত;

(২: ৪৪)। এরপর তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের অপমানকর পরিস্থিতি ও দারিদ্র্য আপতিত হল; (২: ৬১)। এই প্রাকৃতিক বিধান সব যুগের মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। শুধু পার্থিব পরিণতি নয় পরকালেও ভীষণ শাস্তি হবে। যেমন, মহানবী (স.) বলেন, "যে লোক দুনিয়াতে দ্বিমুখী হবে, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা লাগানো হবে"।[৭৩] অর্থাৎ এক একজন ব্যক্তির সাথে যে বিভিন্নভাবে কথা দিয়ে প্রতারণা করে তার এই পরিণাম হবে। এর বিপরীতে কুরআন বলছে সঠিক কথা সঠিকভাবে বলার জন্য। "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল"; (৩৩:৭০)। এখানে *সাদীদ* শব্দের ব্যবহার হয়েছে যার অর্থ মানুষের সাথে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সত্য না বলা, বরং সরলভাবে সত্য উপস্থাপন করা এবং যা বলবে কাজে কর্মে তার বিপরীত না করা।[৭৪] সত্য বলা এবং কথায়-কাজে এক থাকা ইসলামের প্রধান দাবি। ঈমান আনার সাথে সততার পথ অবলম্বন করা বা আমলে সলেহ করাই হচ্ছে ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ।

জীবনের প্রতিটি কর্মে সততার প্রয়োগই সৎ মানুষ হওয়ার উপায়। কুরআনে এসেছে, "তারা তাদের আমানত ও চুক্তিসমূহ রক্ষা করে" (২৩: ৮)। আমানত ও চুক্তি রক্ষা করা সত্যবাদিতার নিদর্শন। সূরা *মায়িদায়* আল্লাহ আদেশ করেন, "তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা কর"; এমনকি শুধু রক্ষা নয়, যদি কেউ তার শপথ ভঙ্গ করে কোনো কাজ করে তাহলে তার শপথ ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে: দশ জন দরিদ্রকে একবেলা মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো, যা তার পরিবার সাধারণভাবে খেয়ে থাকে, অথবা তাদেরকে বস্তু প্রদান করা, অথবা একজন ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করা, সেটিও না পারলে পরপর তিনটি রোযা রাখতে আদেশ করা হয়েছে (৫: ৮৯)। মহানবী (স.) হুদায়বিয়ার চুক্তি লেখার সময় একজন নির্যাতিত মুসলিমের আবেদন রাখতে পারেননি শুধু এ কারণে যে, চুক্তিতে স্বাক্ষর না হলেও যেহেতু মৌখিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে- কোনো মুসলিম মদীনায় যেতে চাইলে যেতে দেওয়া হবে না। এই চুক্তি দশ বছরের জন্য হলেও প্রতিপক্ষ দুই বছরের মধ্যে কিছু শর্ত পরিবর্তন করতে এলে তা তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতি হচ্ছে- কেউ চুক্তি করতে চাইলে তুমি প্রস্তুত থাক কিন্তু যদি প্রতিপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে চুক্তি বাতিল করে দাও; (৮: ৫৮)। মহানবী (স.) জীবনে কখনো কাউকে মিথ্যা বলেননি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেননি, আমানতের খেয়ানত করেননি। তিনি বলেন, "যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার মধ্যে ঈমান নেই, যে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে না তার মধ্যে কোনো দীন নেই"।[৭৫] অর্থাৎ আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা ইসলামের প্রাণ। এ দুটি ছাড়া কেউ ইসলামে প্রবেশের দাবি করতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বেশ তাকিদ করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ জাতির সাথে অত্যন্ত সদয় এবং তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে, কিন্তু নিজ দেশের উন্নয়নে অন্য যে কোনো দেশের সাথে করা প্রতিশ্রুতিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। কুরআন সেটিকেও স্পষ্ট করে দেয়,

> তোমরা যখন অঙ্গীকার করবে, তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ করবে আর পাকাপোক্ত শপথ করার পর তা ভাঙবে না। তোমরা তো তার জন্য আল্লাহকে যামীন রাখছ। তোমরা যা করছ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার খবর রাখেন। আর তোমরা সে নারীর মত হবে না, যে তার শ্রমে কাটা সুতো মজবুত করার পর টুকরো টুকরো করে ফেলে। তোমরা নিজেদের শপথকে পরস্পরের প্রতারণা এবং হস্তক্ষেপের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে থাক, যেন এক জাতি অন্য জাতির চেয়ে বেশি উপকৃত হয়। (১৬: ৯১-৯২)

এখানে প্রতিশ্রুতি পালনে সততার পরিচয় দিতে বলা হয়েছে। মানুষ আল্লাহকে সাক্ষী রেখে প্রতিশ্রুতি দেয় অথচ ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে সেই প্রতিশ্রুতি রাখে না। এ ধরনের কাজকে তুলনা করা হয়েছে অত্যন্ত পরিশ্রম করে তুলে আনা শস্যকে নষ্ট করে ফেলার সাথে। একজন নারী অনেক কষ্ট করে সুতো দিয়ে কিছু তৈরির পর তা নিজেই টুকরো টুকরো করে ফেললে তার কষ্টের শ্রম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। এটি হচ্ছে চুক্তি ভঙ্গের দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় যে বিষয়টি এখানে এসেছে, তা আধুনিক বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য। এসব রাষ্ট্র স্বজাতির উন্নয়নে অন্য জাতির সাথে করা চুক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে চলে না। যেমন, বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্র নিজ জনগণের সাথে প্রতারণা করে না, সময়মত সব কাজ করে, নৈতিক নিয়ম মেনে চলে; কিন্তু ফিলিস্তিনের সাথে করা কোনো চুক্তি মেনে চলে না, যতক্ষণ না তাদের নিজ প্রয়োজনে তা কাজে লাগে। যে কোনো সময় তাদের উপর হামলা, ঘরবাড়ি ধ্বংস, পানি বন্ধ করে দেওয়া, বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া, নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা- এগুলো করতে তারা আদৌ তাদের চুক্তির কথা চিন্তা করে না। মহানবী (স.) এর জীবনে হুদায়বিয়ার চুক্তির সময় তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এক সঙ্গীর আবেদন ও স্বার্থ প্রত্যাখ্যান করেন কেবল প্রতিশ্রুতি পালনের স্বার্থে। চুক্তি লঙ্ঘনকারীদের পরিণাম সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

> যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারের পর তা ভঙ্গ করে, যে আত্মীয়তার সম্পর্ককে রক্ষা করতে বলা হয়েছে তা নষ্ট করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের উপর অভিশাপ এবং তাদের ঠিকানা হবে নিকৃষ্ট। (১৩: ২৫)

আবার যারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তাদের মর্যাদার স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। "কেবল জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে- যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ করে আর পাকাপোক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না" (১৩: ১৯-২০)।

উমর (রা.)এর শাসনামলে আবু উবায়দার (রা.) নেতৃত্বে ইরাকে অভিযান চলাকালীন একজন মুসলিম ক্রীতদাস ঐ শহরের অধিবাসীদের নিরাপত্তা দেয়। উমরের কাছে তিনি পরামর্শ চাইলে উমর উত্তর দেন,

> নিঃসন্দেহে আল্লাহ অঙ্গীকার পূরণের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করেন। তোমরা যতক্ষণ ক্রীতদাসেরও নিরাপত্তা প্রদান করবে না, ততক্ষণ তোমরা অঙ্গীকারপূরণকারী সাব্যস্ত হতে পারবে না। সুতরাং অঙ্গীকার পূরণ কর এবং দুশমনদের ত্যাগ করে চলে এসো।[৭৬]

তবে এ কথার অর্থ এ নয় যে, যে কেউ নেতৃত্বের প্রতি অবহেলা করে নিজে দায়িত্ব নিতে যাবে। উমর এটিও পরিষ্কার করে দেন, "তোমরা এমন অঙ্গীকরের দায়িত্ব নিবে না, যা তোমরা পালন করতে পারবে না"।[৭৭]

সত্য বলা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং আমানত সংরক্ষণকে ভিত্তি করেই মুসলিম জীবনে প্রকৃত সততার প্রকাশ ঘটে। আবার একজন ব্যক্তির সততা প্রকাশ পায় প্রধানত তার বেঁচে থাকার জন্য উপার্জন মাধ্যম ও

ব্যয়ের উপলক্ষণগুলোর মাধ্যমে। এ পর্যায়ে আমরা প্রথমে উপার্জনের ও পরে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সততার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

৪. ১. সম্পদ উপার্জনে সততা

ইসলাম হালাল ও পবিত্র সম্পদ অর্জনের নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে সেটি উপার্জনে বৈধ পন্থা অবলম্বনেরও নির্দেশ দেয়। মহানবী (স.) কিয়ামত দিবসে যে পাঁচটি প্রশ্নের জবাবদিহিতার কথা বলেছেন তন্মধ্যে দুটিই উপার্জন ও ব্যয় সংক্রান্ত। স্বচ্ছতার সাথে সম্পদ উপার্জনে আমাদের যে চেতনা থাকা দরকার সেটি সৃষ্টি ও মূল্যায়নের কাজটিই হচ্ছে নীতিদর্শনের কাজ। ইসলাম এক্ষেত্রে সামগ্রিক যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে তা হচ্ছে, সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি। এই আধিবিদ্যক চেতনাই উপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সততা সৃষ্টি করতে পারে। পুঁজিবাদ সম্পদ উপার্জনে কেবল রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধকেই যথেষ্ট মনে করে। আবার রাষ্ট্র দেখে কে তাকে সর্বোচ্চ রাজস্ব কর দিতে পারে। এজন্য এখানে উপার্জন মাধ্যমের চেয়ে বরং অধিক কর প্রদানের সামর্থ্যকে বৈধতার মানদণ্ড ধরা হয়।

ইসলাম মানুষকে যে মর্যাদার আসন দিয়েছে তাতে অপরের অনুকম্পা পাওয়ার আশা নিয়ে কারো বেঁচে থাকার প্রশ্ন বাতিল হয়ে যায়। মহানবী (স.) কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর নিকট চাইতে নির্দেশ করেন। মানুষের কাছে হাত জোড় করে ভিক্ষাবৃত্তি ইসসলামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈধ কাজ। এর বৈধতার কারণ, মানুষের আকস্মিক বিপদ আপদ বা রোগ-ব্যাধি। এ অবস্থায় সীমিত সময়ের জন্য অন্যের কাছ থেকে ততটুকুই চেয়ে নেওয়া বৈধ যতটুকু তার জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। যে আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে রিযক অন্বেষণ কাজ চালিয়ে যাবে আল্লাহ তার জন্য সম্মানজনক পথ দেখাবেন। তবে রিযক কম বেশি হওয়াটা আল্লাহর নিকট মর্যাদার কোনো মাপকাঠি নয়। কেউ সামান্য চেষ্টাতে অনেক উপার্জন করতে পারে আবার কাউকে অনেক শ্রম বিনিয়োগ করে অর্থোপার্জন করতে হয়। কিন্তু চেষ্টার পর আয় আসবে না- এটি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার উপায় উপকরণ আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন।

কৃষিকাজকে ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। মহানবী (স.) বলেন,

> কোনো মুসলিম যদি বৃক্ষ রোপন করে কিংবা খাদ্যশস্য বপন করে অতঃপর তা থেকে কোনো মানুষ, পাখী বা পশু কিছু খায় তা তার জন্য সদকাহস্বরূপ হবে।[৭৮]

এখানে প্রথমত, কৃষিকাজকে হালাল উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মহানবীর আরো অনেক বাণীতেই কৃষিকাজকে উৎসাহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, কৃষি পণ্য বিক্রয় করা কেবল উপার্জন হিসেবেই উত্তম নয় বরং এটিকে সদকাহ বা দানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, কৃষির উন্নয়নে কাজ করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে কৃষির সাথে জড়িত পেশা হিসেবে গবাদি

পশুপালন, দুগ্ধ খামার, মৌমাছি চাষ, মৎস্য চাষ, নার্সারি প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইসলামী নৈতিকতা এক্ষেত্রে যে নির্দেশনা দেয় তা হচ্ছে কৃষিকাজে এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করা যাবে না, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, পরিবেশের কিংবা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি হয়; বরং মানুষ ও প্রকৃতির স্বার্থ রক্ষা করে চাষাবাদ করতে বলে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা স্থাপন করে উপার্জনকেও ইসলাম বৈধ উপার্জন মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ-কর্মের মাধ্যমে হালাল উপার্জন করা যায়। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য কুরআনের ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, "তোমরা দেখ সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজগুলো চলাচল করে যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার"(৩১: ৩১)। যেসব পণ্য লেনদেনে সরকারি বা আন্তার্জাতিক বিধিনিষেধ রয়েছে, সেসব পণ্য যথাযথ বিধি অনুযায়ী বাজারজাত ও ক্রয়-বিক্রয় করাটা নৈতিকতার অংশ। সরকারকে ফাঁকি দিয়ে কোনো বাণিজ্যিক কার্যক্রম ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ এতে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে কিংবা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার মাধ্যমে সরকারকে ক্ষতি করা হয়।

নিচে আমরা প্রধানত উপার্জনের দুটি মাধ্যমকে সততার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব: ব্যবসায় ও লেনদেনে সততা এবং কর্মক্ষেত্রে সততা।

৪.১.১. ব্যবসায় ও লেনদেনে সততা

মানুষের জীবিকা উপার্জনের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ব্যবসায় হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন ও সাধারণ পেশা। ক্ষুদ্র ব্যবসায় থেকে বৃহত্তর, বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ও লেনদেন মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রেখেছে। সত্যবাদিতা যখন ব্যবসায় জীবনে প্রতিফলিত হয়, তখন তার নাম হয়ে ব্যবসায়িক সততা। এখানে পারস্পরিক অধিকার জড়িত। কোনো মানুষের সামান্য সম্পদও তার অনুমোদন ছাড়া ভোগ বা জবর দখল করলে আল্লাহ কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে। "হে ঈমানদারগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; তবে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা করতে পার;" (৪: ২৯)। অর্থাৎ অসৎ বা অন্যায় কোনো প্রক্রিয়ায় একে অপরের সম্পদ দখল করবে না। তবে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারবে সততার মাধ্যমে। ব্যবসায়িক লেনদেনে অসততা কোনো সমাজের জন্য কল্যাণকর নয়।

অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের চেয়ে ইসলামী ব্যবসায় নীতি কিছুটা ভিন্ন তাৎপর্যের অধিকারী।[৭৯] এর প্রধান দিকগুলো হচ্ছে: (১) ব্যবসায়ের লক্ষ্য হবে মানব কল্যাণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, (২) ব্যবসায়ের মূলনীতি হবে, নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া এবং অন্যের ক্ষতি না করা, (৩) হালাল, পবিত্র ও ভেজালমুক্ত পণ্যের ব্যবসায় করা যা কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন ও আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কর্তৃক স্বীকৃত, (৪) লেনদেন হবে পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে (৫) উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে কোমলতা

ও সম্মানবোধ, (৬) মজুদদারি ও ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট থাকবে না। এছাড়াও প্রচলিত ইতিবাচক ও কল্যাণকর সব মূল্যবোধকে ইসলাম সমর্থন করে। ব্যবসায় মিথ্যার আশ্রয় ও অসততাকে কুরআন কঠোরভাবে নিন্দা করেছে। অসততা হতে পারে ওজনে কম-বেশ করে, ভেজাল পণ্য বিক্রয় করে অথবা অন্য কোনো অবৈধ পন্থায়। একটু বিশ্লেষণ করলে বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হবে।

(১) ব্যবসায়ের লক্ষ্য মানবকল্যাণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন: ইসলাম ব্যবসায় বাণিজ্যকে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছে। হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

> ক. আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন। (২: ২৭৫)
>
> খ. হে ঈমানদারগণ, জুম'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। আর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৬২: ৯-১০)
>
> গ. সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। (২৪: ৩৭)

মহানবী (স.) বলেন, "সৎ আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সঙ্গে থাকবে"।[৮০] এইসব আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ব্যবসায় একটি সম্মানজনক পেশা এবং আল্লাহর অনুমোদিত উপার্জন মাধ্যম। কিন্তু এখানে লক্ষ করতে হবে সুদের মিশ্রণ ঘটছে কি না, কিংবা আল্লাহর স্মরণ, সালাত আদায় বা অন্যান্য মৌলিক ইবাদত থেকে ব্যবসায় কাউকে বিরত রাখছে কি না। ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ বা রিযক পেয়ে থাকে; আর এতে তার সালাত, আল্লাহর স্মরণ ও অন্যান্য ইবাদতে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যবসার উদ্দেশ্য জীবিকা উপার্জন ও মুনাফা বৃদ্ধি। কিন্তু ইসলামী নীতিদর্শন অনুযায়ী শুধু জীবিকা উপার্জন নয়, বরং এর মাধ্যমে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে এর লক্ষ্য মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা। অর্থাৎ ব্যবসায়ী ও ভোক্তার মাঝে কেবল অর্থনৈতিক বা যান্ত্রিক সম্পর্ক নয়, বরং থাকবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। সুদের মত অমানবিক উপার্জন মাধ্যমের পরিবর্তে ব্যবসায় ভিত্তিক সম্মানজনক উপার্জনের ফলে সমাজে বৈষম্য দূর করাও ইসলামী ব্যবসায় নীতির লক্ষ্য।

(২) ব্যবসায়ের মূলনীতি- নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া এবং অন্যের ক্ষতি না করা: ইসলামী ব্যবসায় নীতির এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মহানবী (স.) ব্যবসায় প্রসঙ্গে বলেন, "নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অন্যের ক্ষতি করা কোনোটিই উচিত নয়"।[৮১] অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

> একদিন রাসূল (স.) বাজারে গিয়ে একজন খাদ্য বিক্রেতার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি খাদ্যের ভেতরে হাত প্রবেশ করে দেখলেন ভেতরের খাদ্যগুলো ভেজা বা নিম্নমানের। এ অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে খাবারের পণ্যের মালিক, এটা কী?" লোকটি বলল,

"হে আল্লাহর রাসূল, এতে বৃষ্টি পড়েছিল।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি সেটাকে খাবারের উপরে রাখলে না কেন; যাতে লোকেরা দেখতে পেত? যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মত নয়"।[৮২]

সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্যে মানুষের সাথে প্রতারণা করা ইসলাম থেকেই বের হয়ে যাওয়ার শামিল।

যে অনৈতিক কাজের জন্য হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতির অধঃপতন হয়েছে কুরআনের অন্তত তিনটি জায়গায় তার বিবরণ এসেছে, "তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করো এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না" (৭: ৮৫)। সামান্য পরিবর্তন করে একই কথা এসেছে, ১১: ৮৫ এবং ২৬: ১৮১-৮৩ আয়াতে। আয়াতগুলোতে যে কথাটি বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে, তাঁর জাতির অধিকাংশ লোক এই অপরাধে যুক্ত ছিল এবং শু'আইব (আ.) এর পক্ষে কোনোভাবেই তাদের এই যুলম বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তারা যখন কোনো কিছু মানুষের কাছ থেকে আদায় করত তখন সেখানে কোনো কমতি থাকত না, কিন্তু অন্যদেরকে দেওয়ার সময় কম করে দিত। ক্রেতা জানতে চাইলে তাকে হেনস্তা ও মারধর করা হত। এই বৈশিষ্ট্য কখনো স্বাভাবিক মানবিক বিষয় হতে পারে না। এরপর একদিন প্রচণ্ড অগ্নি-বৃষ্টিতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। মুমিনদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এটা আল্লাহর নৈতিক বিধান। যারা মানুষের উপর যুলম করবে তাদের পরিণতি ভোগ করতে হবে। হাজার বছর আগে যেভাবে এটি কার্যকর ছিল এখনো সেভাবেই আছে ও থাকবে। ওজনে সঠিক মাপ দেওয়া ব্যাপারে কুরআনে আরো অনেক আয়াত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি:

ক. যারা ওজনে কম দেয়, নিজের অংশ নেওয়ার সময় বেশি নেয় এবং অন্যের অংশ দিতে কম দেয়, তাদের জন্য ধ্বংস। (৮৩: ১-৩)

খ. মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম, এর পরিণাম শুভ। (১৭: ৩৫)

গ. ওজন ও মাপ পূর্ণ করো ন্যায়সহকারে। (৬: ১৫২)

ঘ. তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম করো এবং ওজনে কম দিয়ো না। (৫৫: ৯)

ব্যবসায় ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য সরবরাহ করে। বিক্রেতার দায়িত্ব হচ্ছে ক্রেতাকে যথাযথভাবে তা প্রদান করা। পাওনা সঠিকভাবে আদায় না করলে মিথ্যাচারের প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ মূল্য নেওয়ার সময় যে পরিমাণ দেওয়ার কথা থাকে, বাস্তবে ঠিক তার বিপরীত থাকে। এটি হচ্ছে একধরনের যুলম যা মানুষের অধিকারকে নষ্ট করে। উপরের আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই দায়িত্বটা আসলে বিক্রেতার। যারা এ কাজ সঠিকভাবে করবে তাদেরকে শুভ পরিণামের সুসংবাদের কথাও এখানে বলা হয়েছে। এই পরিণাম পার্থিব দৃষ্টিতেও সঠিক এবং পরকালীন দৃষ্টিতেও যথার্থ। সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত কোনো ব্যক্তি ক্রেতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পণ্য বিক্রয় করেন না। তার সুখ্যাতির কারণে মানুষ যেমন তার কাছে ছুটে আসে তেমনি মানুষের বিশ্বাসের বিপরীতও তিনি কিছু করেন না। এভাবে পার্থিব সমস্ত সুবিধা তিনি পেয়ে থাকেন। মহনবীর একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,

সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে- তুমি তোমার মুসলিম ভাইকে এমন কথা বলবে, যে তোমার কথা সত্য মনে করে তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তুমি তার সাথে মিথ্যা কথা বলছ।[৮৩]

অর্থাৎ এটিকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই অপরাধটি বেশি ঘটে। সুতরাং মানুষকে ব্যবসায় অথবা যে কোনো লেনদেনে এমন কথা বলা কোনো মুমিন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রাষ্ট্রকর্তৃক দাম নির্ধারণও সঙ্গত নয়। এতে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একটি হাদীসে এসেছে,

রাসূলুল্লাহ (স.)এর যুগে (একবার পণ্যের) মূল্য বেড়ে গেল। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.), "আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন"। তখন তিনি বললেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহই হচ্ছেন মূল্য নির্ধারণকারী; তিনি সঙ্কোচনকারী, সম্প্রসারণকারী ও রিযকদাতা। আর আমি অবশ্যই এমন এক অবস্থায় আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যাতে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার বিরুদ্ধে রক্ত (প্রাণ) ও সম্পদ সম্পর্কে যুলমের অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে।[৮৪]

অর্থাৎ ক্রেতা বা বিক্রেতা যেন ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেটির চেষ্টা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সাধারণভাবে মূল্য নির্ধারণ করে দিলে যদি কোনো পক্ষের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয় তাহলে সেটি বর্জন করা উচিত। আবার ব্যবসায় পণ্য বিক্রয় করে কী পরিমাণ লাভ করা যায় তা নির্ধারণ করাও সঙ্গত নয়। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এভাবে এসেছে,

উরওয়া ইবন আবিল যাদ (রা.) বর্ণনা করেন। নবী করীম (স.)-এর নিকট পশুর একটি চালানের সংবাদ আসল। তিনি আমাকে একটি দীনার দিয়ে বললেন, "উরওয়া, তুমি চালানটির নিকট যাও এবং আমাদের জন্য একটি বকরী ক্রয় করে নিয়ে আস"। তখন আমি চালানটির কাছে গেলাম এবং চালানের মালিকের সাথে দরদাম করে এক দীনার দিয়ে দুইটি বকরী ক্রয় করলাম। বকরী দু'টি নিয়ে আসার পথে এক লোকের সাথে দেখা হয়। লোকটি আমার থেকে বকরী ক্রয় করার জন্য আমার সাথে দরদাম করল। তখন আমি তার নিকট এক দীনারের বিনিময়ে একটি বকরী বিক্রয় করলাম এবং একটি বকরী ও একটি দীনার নিয়ে চলে এলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল (স.), এই হচ্ছে আপনার দীনার এবং এই হচ্ছে আপনার বকরী"। তখন রাসূল (স.) বললেন, "এটা করলে কীভাবে?" উরওয়া বলেন, আমি তখন তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তার হাতের লেন-দেনে বরকত দিন'।[৮৫]

এর মাধ্যমে বোঝা যায় বাজারে পণ্যের সরবরাহের ভিত্তিতে দাম উঠা-নামা করতে পারে।

(৩) হালাল, পবিত্র ও ভেজাল-মুক্ত পণ্যের ব্যবসায়: যে সব পণ্য হারাম সেগুলোর ব্যবসায়ও হারাম। কুরআনে এসেছে,

হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া কিছুই নয়। অতএব এগুলো থেকে বিরত থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৫: ৯০)

সুতরাং এ ধরনের দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসায় বাণিজ্য বৈধ নয়। শরীয়ত নির্ধারিত যবেহ বিহীন মৃত পশুর গোশতকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়গুলোর নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এগুলো মানুষের দেহ ও মনের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। আবার জুয়াখেলার মাধ্যমে উপার্জন মানুষকে এক অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম এ ধরনের ভাগ্য-নির্ভর উপার্জনের পরিবর্তে হালাল ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জনের পথ দেখায়। আবার হালাল পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোকেও কুরআন নিষেধ করেছে– "তোমরা সত্যের সাথে অসত্যের মিশ্রণ ঘটিও না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না"; (২: ৪২)। এখান থেকে প্রমাণিত হয় কোনো ব্যবসায়ী পণ্যে বা লেনদেনে সবসময় স্বচ্ছ থাকতে হয়। কেবল জেনে শুনে ভেজালযুক্ত খাবার বিক্রয় নয় বরং সন্দেহজনক কোনো কিছুও যেন সে তালিকায় আসতে না পারে তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে ঈমানের দাবি। যারা এ কাজ করে উপার্জন করে সেগুলো অবৈধ উপার্জন। অন্যের বৈধ সম্পদের সাথে নিজের অবৈধ সম্পদের মিশ্রণ দ্বারা অবৈধ মাল বৈধ হয়ে যায় না। এ প্রসঙ্গে এসেছে,

> ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। আর ভালো মালকে মন্দ মাল দ্বারা পরিবর্তন করো না। তাদের (ইয়াতীমদের) সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে খেয়ো না; নিশ্চয়ই তা মহাপাপ।
>
> (৪: ২)

মানবস্বাস্থ্য ও অন্যান্য উপকারী প্রাণী বা উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর কোনো দ্রব্যের ব্যবসায় করা যাবে না। গরু ছাগল হাঁস মুরগি মাছ ইত্যাদিকে হারাম ও ক্ষতিকর জিনিস খাইয়ে মোটাতাজা করা হলে সে সব প্রাণী জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে বান্দার হকের ক্ষতি হচ্ছে যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। উপার্জনের অবৈধ পন্থার কারণেও পণ্য হারাম হয়ে যেতে পারে। যেমন, চুরি করা মাল বাজারে বিক্রয় করলে আর কেউ জেনে শুনে তা ক্রয় করলে তা হারাম হবে। মহানবী (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি জেনেশুনে চুরি করে আনা মাল ক্রয় করল, সেও চুরির পাপের মধ্যে শামিল হল"।[৮৬] অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্যই ইসলাম সবধরনের অবৈধ ও হারাম উপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছে।

(৪) লেনদেন হবে পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে: ইসলাম ব্যবসায়িক লেনদেনকে পরস্পরের সন্তোষের ভিত্তিতে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। জোরপূর্বক ক্রেতাকে পণ্য কিনতে বাধ্য করা বৈধ নয়। উভয়ের সম্মতি ও সদাচরণে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মান-মর্যাদাও রক্ষা পায়। কুরআনে এক্ষেত্রে সুবিচার ও তাকওয়ার মাধ্যমে লেনদেন করতে বলা হয়েছে। যেমন,

> "... তবে যদি নগদ ব্যবসা হয় যা তোমরা হাতে হাতে লেনদেন কর, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। আর তোমরা সাক্ষী রাখ, যখন তোমরা বেচা-কেনা করবে এবং কোনো লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা কর, তাহলে নিশ্চয় তা হবে তোমাদের পক্ষে পাপাচার। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী। (২: ২৮৩)

এখানে ব্যবসায় লেনদেনের ক্ষেত্রে ঋণের লেনদেনের মত সাক্ষী রেখে কাগজে লিখতে বলা হয়নি, বরং যদি সাক্ষী রাখা হয় তাহলে তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করতে বলা হয়েছে যেন সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর

সামগ্রিক লেনদেনে আল্লাহর ভয়কে অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ব্যবসায়ে যে পারস্পরিক বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা, আমানতদারি প্রয়োজন সেটি তাকওয়ার মাধ্যমেই বাস্তব রূপ নিতে পরে।

(৫) উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে কোমলতা ও সম্মানবোধ: এটিও ব্যবসায় নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহানবী (স.) বলেন, "আল্লাহ তার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন যে বিক্রয়ের সময়, ক্রয়ের সময় এবং অভিযোগের সময় সদয় থাকে"।[৮৭] অর্থাৎ ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের আচরণ কেমন হবে সেটিও মহানবী বলে দিয়েছেন। যারা এ ক্ষেত্রে কোমল ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করবে আল্লাহ তাদেরকে দয়া করবেন। মূলত ইসলাম ব্যবসার ক্ষেত্রে সেসব মূল্যবোধ রক্ষা করতে বলে যেগুলো উভয় পক্ষের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। ভোক্তা হিসেবে পণ্যের মান জানার অধিকার তার আছে, এমনকি কোনো প্রতারণার শিকার হলে আইনের আশ্রয় নেওয়ারও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে আবার একথাও বলা হয়েছে, কেউ যেন কোনো অবৈধ সুবিধা নেওয়ার জন্য আইনের আশ্রয় না নেয়। পরস্পর লেনদেনে ইসলামের বাস্তব প্রয়োগের ফলে যে আবেগময় ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তার একটি দৃষ্টান্ত নিচের হাদীসটিতে পাওয়া যাবে :

> আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "এক লোক অপর লোক হতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরিদকৃত জমিতে একটা স্বর্ণ ভর্তি ঘড়া পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে তা ফেরত নিতে অনুরোধ করে বলল, কারণ আমি জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, "আমি জমি এবং এতে যা কিছু আছে সবই বেচে দিয়েছি"। অতঃপর তারা উভয়েই অপর এক লোকের কাছে এর মীমাংসা চাইল। তিনি বললেন, "তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে?" একজন বলল, "আমার একটি ছেলে আছে"। অন্য লোকটি বলল, "আমার একটি মেয়ে আছে"। মীমাংসাকারী বললেন, "তোমার মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দাও আর প্রাপ্ত স্বর্ণের মধ্যে কিছু তাদের বিবাহে ব্যয় কর এবং বাকী অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও"।[৮৮]

এটি হচ্ছে ব্যবসায় বাণিজ্যে ইসলামের বাস্তব প্রতিফলন। পরস্পরকে সম্মান করা, অগ্রাধিকার দেওয়া এবং ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(৬) ইসলামে মজুদদারি ও ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট নেই: পণ্যের দাম বৃদ্ধির জন্য বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে গুদামজাত করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমদানি করবে সে রিযকপ্রাপ্ত হবে। আর যে গুদামজাত করবে, সে অভিশপ্ত হবে"।[৮৯] মজুদদারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "কেউ যদি মুসলমানদের থেকে নিজেদের খাদ্যশস্য আটকিয়ে রাখে (মজুদদারি করে), তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর মহামারি ও দরিদ্রতা চাপিয়ে দেন"।[৯০] বর্তমানে বিভিন্ন দেশে মজুদদারির মাধ্যমে নিজ দেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। এতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির ফলে মানুষ যখন নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন দুর্ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়।

কোনো একটি পণ্যের দাম বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের ভেতর গোপন লেনদেনের মাধ্যমে বিভিন্ন অপকৌশল প্রয়োগ করে থাকে। যেখানে স্বাভাবিক মুনাফায় জনগণের আয়

অনুযায়ী পণ্য কেনার সামর্থ্য থাকে সেখানে কোম্পানিগুলোর উচ্চাভিলাসী পুঁজিবাদী মানসিকতার কারণে মানুষের সেই সামর্থ্য ধূলায় মিশে যায়। এই ধরনের দাম বৃদ্ধির কৌশলকে সিন্ডিকেট ব্যবসা বলে। বাংলাদেশের বর্তমানে প্রচলিত আইনে ত্রিশদিন পর্যন্ত পাইকারগণ ধান ও চাল মজুদ রাখতে পারবেন আর খুচরা বাজারে পনের দিন রাখার বিধান রয়েছে। অথচ এখানকার সিন্ডিকেট ব্যবসার কারণে প্রতিবছর বিশেষ কিছু মৌসুমে জনগণ চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা থাকতে হবে, যেন এ ধরনের সিন্ডিকেটের সৃষ্টি হতে না পারে। কিন্তু মানুষ যখন নিজের বিবেকবোধের সামনে দাঁড়াতে চাইবে না, তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইসলাম এজন্যই 'সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী'র ধারণা দিয়েছে যার অবস্থান আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাদের সাথে হবে।

ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি সামগ্রিকভাবে সামনে রাখলে দেখা যাবে ইসলামের ব্যবসায়নীতি সম্পূর্ণ ন্যায় ভিত্তিক ও জনকল্যাণমুখী। ইসলাম সব ধরনের ব্যবসাকে বৈধ রাখেনি। যে ব্যবসায় সূদের লেনদেন থাকে সেই ব্যবসা এখানে নিষেধ। এছাড়া প্রধানত পাঁচটি পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যবসায় নীতির বাস্তবায়ন করা হয়। (১) লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের একক ব্যবসা (বাই'উ মুরাবাহা); (২) ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময় এক সাথে অথবা কিস্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় (বাই'উ মুয়াজ্জাল); (৩) ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময় সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে শরী'আত অনুমোদিত নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য সামগ্রীর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় (বাই'উ সালাম)। বাই'উ সালাম প্রসঙ্গে বুখারীর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মদীনায় আসলেন তখন লোকেরা (ফল-ফসলের জন্য) অগ্রিমমূল্য প্রদান করত। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি অগ্রিম মূল্য প্রদান করবে সে যেন তা সুনির্দিষ্ট মাপের পাত্রের দ্বারা ও সুনির্দিষ্ট ওযনে প্রদান করে"।[৯১](৪) এক পক্ষের মূলধন এবং অপর পক্ষের দৈহিক ও বুদ্ধি ভিত্তিক শ্রমের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবসায় (বায়'উ মুদারাবা)। এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তিহারে বণ্টিত হবে। (৫) মূলধন ও লভ্যাংশের ব্যাপারে দুই বা ততোধিক অংশীদারের মধ্যকার চুক্তি অনুসারে ব্যবসা (বাই'উ মুশারাকা)। মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসায় লাভ হ'লে অংশীদারগণ পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ করে নেয়। আর লোকসান হলে অংশীদারগণ নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে বহন করে।

সহজ কথায় ইসলাম ব্যবসায় বাণিজ্যকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে যেমন প্রশংসা করেছে, তেমনি এর জন্য এমন উৎকৃষ্ট মানবিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে যে, এসব নিয়ম নীতি মেনে চললে কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বর্তমানে মুসলিম জাতি যদি এসব নিয়ম কানুনের কিছুটাও অনুসরণ করত তাহলে তাদের ব্যবসায় বাণিজ্য অনেক উন্নত হত। কিন্তু অতি মুনাফার লোভে তারা কুরআন হাদীসের উপদেশের বিপরীত কাজ করছে এবং নিজেদের ও অন্যদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৪.১.২. দায়িত্বপালনে সততা

মানুষের বড় পরিচয় হচ্ছে সে যে কোনোভাবেই হোক দায়িত্বশীল। আর দায়িত্বপালন জবাবদিহিতার সাথে জড়িত। মহানবী (স.) বলেন, "তোমাদের সবাই দায়িত্বশীল, প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে"।[৯২] কুরআনে এসেছে, "নিশ্চয় শ্রবণ, দৃষ্টি, অন্তর প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে"; (১৭: ৩৬)। অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেককে তার দৈহিক অঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদিত কিংবা মানসিক চিন্তার মাধ্যমে সৃষ্ট সব কাজের ব্যাপারেই জবাবদিহি করতে হবে। কেউ জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নেই। এর কারণ মানুষ সৃষ্টিজগতে একমাত্র নৈতিক সচেতনতাসম্পন্ন জীব। আর নৈতিক অনুভূতি মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিভিন্ন দায়িত্বপালনে বাধ্য করে।[৯৩] দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রেই সঠিক দায়িত্বপালন ও দায়িত্বে অবহেলার প্রশ্ন আসে। সঠিকভাবে দায়িত্বপালনের নামই দায়িত্বপালনে সততা। মানব সমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সঠিকভাবে দায়িত্বপালন অথবা চাকুরিতে সততা দরকার আমাদের নিজ স্বার্থেই। একজন অসৎ কর্মচারীকে সবাই ঘৃণা করে। পবিত্র কুরআন বলছে:

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং তোমাদের নিজেদের পারস্পরিক কাজেও বিশ্বাসঘাতকতা করো না। (৮: ২৭)

আল্লাহর প্রতি ও মানুষের প্রতি দায়িত্বপালনে একই অনুভূতি লালনের কথা এখান থেকে প্রমাণিত হয়। সেটি হচ্ছে দায়িত্বপালনে অবহেলা করা যাবে না, নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্বে সততার পথ অবলম্বন করতে হবে।[৯৪]

আমরা যে পেশাই গ্রহণ করি না কেন সেটি একান্তই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাপার। জোর করে কাউকে কর্মে নিয়োগ করা যায় না। তবে যখন কর্মস্থলে আমরা যুক্ত হই, তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় চাকুরি-বিধি, নিয়মনীতি ইত্যাদি মেনেই কাজ শুরু করি। নিজেদের নিযুক্তির পর কর্মস্থলে সৎ থাকা একজন চাকুরিজীবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথমত, এখানে প্রয়োজন পেশাদারিত্বকে যথাযথভাবে বিবেচনা করা। যে যেই পেশা গ্রহণ করবে সেই পেশার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু তাকে জানতে হবে এবং সেটার উন্নয়নের জন্য তাকে সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে। একজন শিক্ষক তাঁর বিষয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে পাঠ দান করবেন, একজন ডাক্তার রোগীকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার জন্য সর্বশেষ উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করবেন, একজন প্রকৌশলী প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় জেনে সংশ্লিষ্ট কাজটি সম্পাদন করবেন, একজন আমলা প্রশাসনের আইন-বিধি মেনে তাঁর দফতর পরিচালনা করবেন। এসব ক্ষেত্রে যথাযথ মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে কর্ম সম্পাদন সততার জন্য প্রথম বিবেচ্য বিষয়। যদি কেউ তার উপর অর্পিত দায়িত্বের সম্মান না করে উদাসীনতার পরিচয় দেন তাহলে তার কারণে অন্যদের এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধিত হতে পারে, যার জন্য তাকে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। কেউ যদি কর্মস্থলে সময়মত না গিয়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় কাজ করেন তবে কোনো অবস্থাতেই তাকে সৎকর্মচারী বলা যাবে না। বরং যদি বাড়তি কিছু করতে হয়, তাকে অবশ্যই নিজ দায়িত্ব সম্পাদন শেষ করে বা

প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি না করেই তা করতে হবে। এটিই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা না করার ব্যাখ্যা। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনা দায়িত্বগ্রহণের পর সেই দায়িত্ব পালনের শপথ করে বা প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় যে কোনো দায়িত্বের শপথই হোক না কেন তা মেনে চলা আল্লাহর আদেশ। সেখান থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তার উপর প্রচলিত দণ্ডবিধি কার্যকরে কুরআন কোনো বাধা দেয় না, বরং এর উপর কুরআনের আদেশ অনুযায়ী তাকে শপথ ভঙ্গের কাফফারাও আদায় করতে হবে। "তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ মেনে চলো;"(৫: ১)। এখানেও চুক্তি মেনে চলার কথা এসেছে। আরবী *'উকূদ* শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বন্ধন বা সংযুক্তকরণ; তাফসীরবিদগণ এর অর্থ করেছেন আল্লাহর প্রতি, বিশ্বজগৎ ও নিজের প্রতি এবং সকল মানুষের সাথে নৈতিক বন্ধন ও অনিবার্যভাবে দায়িত্ব পালন।[৯৫] "তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে;" (১৭: ৩৪)। অর্থাৎ বিষয়টিকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার সাথেও যুক্ত করা হয়েছে। মানুষের কর্মক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে সামনে রাখলে তার পক্ষে দায়িত্বপালনে অবহেলা করা যায় না। তবে আনুগত্যের সীমা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে, এমন আনুগত্য ও দায়িত্বপালন করা যাবে না, যা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কর্মস্থলে সততার জন্য বিভিন্ন বিষয় মূল্যায়ন করা হয়। কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি একটি বড় বিষয়। এক্ষেত্রে কোনো বৈষম্যকে কুরআন সমর্থন করে না।

> তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে তা করবে সাম্যনীতির ভিত্তিতে আর তোমরা ইনসাফ করবে; নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। (৪: ৫৭)

এই সাম্যনীতি কর্মচারীদের ব্যাপারে দায়িত্বপালন, পদোন্নতি ও পদাবনতির প্রধান মাপকাঠি। স্বজনপ্রীতি, দলীয় দৃষ্টিকোণ ইত্যাদির ভিত্তিতে কর্মে নিয়োগ হলে মানুষের যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন হয় না। মানুষের কর্মক্ষেত্রে তার দায়িত্ব-বণ্টনে বৈষম্য, বেতন বৈষম্য, বিরতিতে বৈষম্য, ছুটিতে বৈষম্য প্রভৃতি বর্তমান *ওয়ার্ক এথিকসের* গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। ইসলাম এই বিষয়গুলোকে সুবিচার নীতির ভিত্তিতে সমাধানের চেষ্টা করে থাকে।[৯৬] ইসলাম ফরজ ইবাদতের পর বৈধ পন্থায় রিযক অন্বেষণকে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে। এ কারণে এখানে নিয়োগ কর্তার যেমন নৈতিক দায়িত্ব আছে তেমনি কর্মচারীদেরও নৈতিক দায়িত্ব আছে। কর্মস্থলে পরস্পরের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ কোন্দল, হয়রানিসহ বিভিন্ন অন্যায় প্রতিহত করতে সাহায্য করে।

ঘুস বা উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে অফিস আদালতে বা কর্মস্থলের কিছু লোক মানুষের কাজ করে দেয়। অথচ তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল মানুষের কাজ করে দেওয়ার জন্য, যার বিনিময়ে সে মাসিক বেতন নিচ্ছে। পূর্ববর্তী যুগেও এর প্রচলন ছিল। মানুষকে তাওরাতের ভুল ব্যাখ্যা করে ইহুদী আলেমগণ ঘুষ নিত। তাদের নিকৃষ্ট স্বভাবের বর্ণনা এসেছে : 'তারা মিথ্যা শোনায় এবং ঘুস গ্রহণ করে'(৫: ৪২)। এমনি একটি দৃষ্টান্ত *সূরা আ'রাফে* এসেছে:

> তুমি তাদেরকে সে লোকের অবস্থা শুনিয়ে দাও, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ... সে অধঃপতিত এবং নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণকারী। তার দৃষ্টান্ত এমন কুকুরের মত যাকে তাড়া করলে হাঁপাবে আর ছেড়ে দিলেও হাঁপাবে। এ হলো সেসব লোকের উদাহরণ যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলে। (৭: ১৭৫-৭৬)

কুরআন যে সব ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে মানবজাতিকে শিক্ষা দিতে চায় এটি তার একটি। এখানে, একজন বিখ্যাত ইহুদী আলেমের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর অবাধ্য হয়। মানুষকে বাইরের লেবাস দিয়ে প্রতারণা করে। এটি আমাদের জন্য বড় শিক্ষা। বর্তমানে অফিস-আদালতে ফাইল নড়া-চড়ার জন্য ঘুস দিতে হয়। দেখতে নামাযী ও ধর্মের লেবাস পরেও কিছু লোক এ কাজ করে। মহানবী (স.) সরকারি কর্মচারীদের ঘুস গ্রহণ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর উক্তি করেন। বুখারীর বর্ণনায় এসেছে,

> রাসূলুল্লাহ (স.) বনু আসাদ গোত্রের ইবন লুতাইবা নামক একজন ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি মদীনায় উপস্থিত হয়ে বললেন, "এটা আপনাদের জন্য, আর এটা আমার জন্য উপহার"। মহানবী (স.) তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী ঘোষণা করে বলেন, "কি হলো সেই কর্মচারীর? আমরা তাকে প্রেরণ করলাম। তারপর সে এসে বলল, এটা তোমাদের জন্য, ওটা আমার জন্য। সে তার পিতা মাতার ঘরে বসে থাকছে না কেন, সে দেখুক তাকে উপহার দেওয়া হয় কি না। শপথ সে সত্তার যার হাতে আমার জীবন, যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবে রোজ কিয়ামতে সে তা বহন করে আনবে...।[৯৭]

কর্মস্থলে সততা সৃষ্টির জন্য কুরআনের চারটি সাধারণ নির্দেশনা আছে। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বে সততা প্রসঙ্গে একটু আগে আমরা যে আয়াতটি উল্লেখ করেছি সেটি এখানেও প্রযোজ্য: "তাদেরকে আমি পৃথিবীর কোথাও দায়িত্বে স্থলাভিষিক্ত করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে; (২২: ৪১)। এখানে আমরা বলব মানবসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যে কোনো পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে আল্লাহর প্রতিনিধির মত একই কাজ করতে হয়। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে- প্রথমত,সালাত বা নামায কায়েম মানে হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেতন করা। যার ভেতর আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা থাকে সে সময় সচেতন হয় এবং কর্মে ফাঁকি না দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে; নামাযের মাধ্যমে তখনই ব্যক্তির এই গুণ অর্জন হবে যখন সে সত্যিকারভাবে সালাত আদায় করবে। কারণ, নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখে,"(২৯: ৪৫)। সুতরাং সঠিক অর্থে সালাত আদায়কারীর পক্ষে যৌন-কেলেংকারী ও আর্থিক দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। সালাতের জন্য পাঁচবার মানুষকে যে আহবান জানানো হয় তাতে আছে *হাইয়া আলাল ফালাহ* (কল্যাণের দিকে আস); এটি প্রমাণ করে সালাত মানুষকে সব সময় কল্যাণের পথ দেখায়।[৯৮] বর্তমানে কেউ কেউ সালাত আদায়ের নামে অহেতুক সময় অপচয় করে কাজে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেন। এটি মূলত সালাতের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেউ নিজের উপার্জনকে অবৈধ করার জন্য তা করতে পারেন না।

তবে সালাত আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা মানুষের ধর্মপালনের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে। দ্বিতীয়ত, যাকাত আদায় মানেই হচ্ছে সম্পদের পূর্ণ হিসেব করে নির্ধারিত অংশ গরীব-অসহায়কে প্রদান করা। এই কাজ করতে গেলে মানুষের সমস্ত সম্পদকে বছরে একবার নিখুঁতভাবে হিসেব করতে হয়। কেউ যদি অবৈধ পন্থায় কোনো পয়সা উপার্জন করে তখন সেটি সবাই দেখতে পাবে, অর্থাৎ তার দুর্নীতি ফাঁস হয়ে যাবে। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া গেলেও যাকাত ফাঁকি দেওয়া যায় না; ফাঁকি দিলে আদৌ যাকাত আদায় হবে না। তৃতীয় বিষয়টি, সৎ কাজের বাস্তবায়ন। এর অর্থ অফিসের যাবতীয় আদেশ কর্মচারীকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে, যদি কোনো অন্যায় বা সীমালংঘনমূলক আদেশ না হয়। এর ফলে একজনের কাজের বোঝা অন্যের উপর গড়াবে না। চতুর্থ হচ্ছে, অসৎ কাজে নিষেধ করা। নিজেদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ে বা পড়ার চেষ্টা করে অন্যদের করণীয় হচ্ছে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় কুরআন শুধু সৎ হতে বলে না, বরং কীভাবে সততার প্রশিক্ষণ নিতে হয় এবং বাস্তবে সৎ হওয়া যায় তার নির্দেশনাও দিয়ে দিয়েছে।

৪.২. সম্পদ ব্যয়ে সততা

সম্পদ উপার্জনের পর সেই সম্পদ অপচয় ও অপব্যয় এবং কৃপণতা না করে নিজে ও পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় করাটাই হচ্ছে বৈধ ব্যয়। আত্মীয় স্বজন-প্রতিবেশী-আপনজন-বন্ধুবান্ধবদের জন্য খরচ করা এবং সমস্ত বৈধ প্রয়োজন পূরণে সম্পদ ব্যয় করতে ইসলাম নিষেধ করে না। ইসলামে অপচয় অপব্যয় ও বিলাসিতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার জন্য, পাপ ও মন্দ কাজের প্রসারতায় এবং অন্যের ক্ষতি করার জন্য যে কোনো ধরনের অর্থ সম্পদ ব্যয় ইসলামে নিষিদ্ধ। নৈতিক অধঃপতনের সূচনা হয় অপব্যয় ও বিলাসিতার মাধ্যমে। কুরআনে এসেছে,

> হে আদম সন্তান, প্রতিটি ইবাদতের সময় সাজসজ্জা পরিধান কর; খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। বল, কে আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে এবং পবিত্র খাদ্য বস্তুসমূহকে হারাম করেছে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য উদ্ভাবন করেছেন? বল, এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামত দিবসে বিশেষভাবে তাদেরই জন্য। এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা জ্ঞানী। (৭: ৩১-৩২)

এই আয়াতটি আমরা একটু আগে উল্লেখ করেছি পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনার প্রমাণ হিসেবে। এখানে অর্থ ব্যয়ের প্রসঙ্গে আবার উল্লেখ করা হয়েছে। মূর্খতার যুগে হজ্জ করার সময় মুশরিকগণ রাতের বেলায় উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করত, কারণ তাদের ধারণা ছিল তাদের অন্যায় উপার্জনের কারণে তাদের পোশাক অপবিত্র। ইসলাম এ ধরনের নির্লজ্জতাকে কখনো সমর্থন করে না। তাদের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। কিন্তু উপায়টি ছিল খুব নিষ্ঠুর ও অমানবিক। খ্রিষ্ট ও বৌদ্ধধর্মে যেভাবে বৈরাগ্য সাধনায় উৎকৃষ্ট খাবার বর্জনের মাধ্যমে শারীরিকভাবে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করা হয়, তা স্বাভাবিক মানব প্রকৃতি বিরোধী। ইসলাম এ ধরনের কৃচ্ছতা ও কঠোরতা পছন্দ করে না। বরং জগতের এসব নিয়ামত থেকে উপকার গ্রহণের

নির্দেশ দেয়। এসব অনুগ্রহ ভোগ করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে ও তাঁর ইবাদত করবে।

৪.৩. সামরিক ক্ষেত্রে সততা

ইসলামে যুদ্ধের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র মানবতাকে রক্ষার জন্য। আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামে যুদ্ধের সুযোগ নেই। যুদ্ধে জড়ালেও কুরআন ও হাদীসের মৌলিক কিছু নিয়মনীতি মানতে হয়, যার প্রথম কথাটি হচ্ছে কুরআনের ভাষায়,

> যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি এবং তোমাদের গৃহ থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কারও করেনি তাদের সাথে উত্তম আচরণ এবং সুবিচার করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি ঘর থেকে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কারে অন্যদের সহযোগিতা করেছে আল্লাহ তো কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা যালেম-অবিচারকারী। (৬০: ৮-৯)

কুরআনের এই বাণীতে যে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে তা হলো যুদ্ধ কেবল তখনই ইসলাম অনুমোদন দেয় যখন মানুষ যুলমের শিকার হয় কিংবা বাড়ি ঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়। অন্যথায় প্রতিপক্ষের সাথে সুন্দর আচরণ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। যারা সরাসরি যুলম করে কিংবা যুলমে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে তাদের সাথে এমনকি কোনো বন্ধুত্বও গড়ে উঠতে পারে না। মুসলমানদের নিজেদের রক্ষার জন্য আল্লাহর এটি সীমা। এই সীমা লঙ্ঘন এক ধরনের যুলম বা অবিচার।

যুদ্ধকালীন সময়ে সর্বোচ্চ সততা প্রদর্শনের জন্য ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে। এক যুদ্ধ শেষে মহানবী (স.) কিছু সংখ্যক শিশুর লাশ দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হন। জনৈক সাহাবী আরয করলেন, এরা তো মুশরিকের সন্তান। নবীজী অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, "এ শিশুরা তোমাদের চেয়ে উত্তম। কারণ তারা প্রকৃতির উপর রয়েছে। তোমরা কি মুশরিকদের সন্তান নও? সাবধান! শিশুদের হত্যা করবে না; সাবধান! শিশুদের হত্যা করবে না।" আরেকটি যুদ্ধে একজন মহিলার লাশ দেখে নবীজী বলেন, "তোমরা নারী ও শিশুদের হত্যা করবে না"।[৯৯] আবু বকর (রা.) একবার সৈনিকদের লক্ষ্য করে বলেন,

> তোমরা এমন কিছু লোক দেখতে পাবে, যারা বলে আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। সুতরাং তাদেরকে সে লক্ষ্যের জন্য ছেড়ে দাও যে জন্য তারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে রেখেছে। কোনো নারী, কোনো শিশু এবং দুর্বল বৃদ্ধকে হত্যা করবে না।[১০০]

উমর (রা.) এর নির্দেশ ছিল, "তোমরা আমানতের খিয়ানত করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না আর কৃষকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।"[১০১] ইসলামের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন শাসকের এই উপদেশ ইসলামেরই বিধান। যুদ্ধের সময় অত্যন্ত সীমিত ক্ষয়ক্ষতির দৃষ্টান্ত ইসলামের

ইতিহাসের বড় বড় যুদ্ধগুলোতে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। অথচ তখনো মানুষ রোম ও পারস্যের যুদ্ধের বিভীষিকার কথা ভুলতে পারেনি। মহানবী (স.) যুদ্ধকে একটি প্রতারণা বলেন। এর অর্থ আবার এ নয় যে, তাতে বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করবে। এর অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে কৌশল অবলম্বন করা। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি শত্রু গোয়েন্দাদের ধোঁকায় ফেলার জন্য বেশি সংখ্যক রান্নার চুলার ব্যবস্থা করেন আর কম সংখ্যক টয়লেটের ব্যবস্থা করেন। এতে শত্রুরা আগুনের লেলিহান দেখে এবং সকাল বেলার টয়লেটের লাইন দেখে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি ও আতংকে পড়ে যায়। এটি ছিল শত্রুদের বোকা বানিয়ে সহজে যুদ্ধ জয়ের কৌশল। যুদ্ধের এসব নিয়ম সর্বজনীন বৈধ নিয়ম। কিন্তু সীমালঙ্ঘন করাকে কুরআন স্পষ্ট নিষেধ করেছে।

> তারা তোমাদেরকে যেভাবে আক্রমণ করে, তোমরাও তাদেরকে সেভাবে আক্রমণ কর। তবে তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলবে; জেনে রাখ আল্লাহ সাবধানজনদের সাথেই কেবল থাকবেন। (২: ১৯৪)

এখানে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আর একমাত্র আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকলেই সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা যায়। আলী (রা.) একজন শত্রুর সাথে কুস্তি লড়ছিলেন। হঠাৎ সে আলীর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। আলী তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দেন। চূড়ান্ত ধরাশায়ী অবস্থায় আকস্মিক ছেড়ে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে, আলী বলেন, "এতক্ষণ আমি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করছিলাম, কিন্তু যখন সে আমার মুখে থুথু মেরেছে তখন লড়াইটাতে আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ যুক্ত হয়, যার কারণে আল্লাহ আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি"। অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ই কেবল মানুষকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখতে পারে। মহানবী (স.) আরো বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে অর্থাৎ রাষ্ট্রের অনুগত কোনো অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে লাভ করা যাবে"।[১০২] রাসূলুল্লাহ (স.) মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করতে নিষেধ করেন, "আগুন দ্বারা কেউ শাস্তি দিতে পারে না আল্লাহ ব্যতীত"। তিনি আরো বলেন, "তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি প্রদান করো না"।[১০৩] রাসূলুল্লাহ (স.) যখন কোনো বড় কিংবা ছোট সেনাদলের উপর কাউকে 'আমীর' নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহর ভয় নিয়ে চলার এবং তার সঙ্গী মুসলমানদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন,

> আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে গমন করো এবং যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। সাবধান! জিহাদ করো, কিন্তু গনীমতের মালে খিয়ানত করো না, চুক্তি ভঙ্গ করো না, নিহতদের অঙ্গহানি করো না, কোনো শিশুকে হত্যা করো না।[১০৪]

কুরআনেও একই কথা এসেছে,

> যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক আল্লাহ অক্ষুণ্ন রাখাকে বিধিবদ্ধ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (২:২৭)

এখানে স্পষ্টভাবেই সামরিক বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন কোন নৈতিক নিয়ম আবশ্যকীয় করে দেওয়া হয়েছে তার বর্ণনা এসেছে। ইসলামের এসব আইন মানবতার জয়গান ছাড়া আর কিছু নয়। শান্তিতে ও সমরে মুসলিম বাহিনী একই চরিত্রের হবে।

যুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা প্রতিটি দেশের জন্য আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিগণের চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জেনেভা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২-তে বলা হয়েছে,

> সশস্ত্র ও নিরস্ত্র জনগণ, যাদের কথা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আসছে, নির্বিশেষে সকল আহত ও রোগক্লিষ্ট লোকের সর্বাবস্থায় মর্যাদা রক্ষা করতে হবে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আর বিবাদমান গোষ্ঠীগুলোর উপর দায়িত্ব হবে, যারা তাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসবে তাদের সাথে মানবিক আচরণ করা এবং লিঙ্গ, বর্ণ, জাতীয়তা, ধর্ম, বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির সাথে বৈষম্য না করে সকলের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করা।"[১০৫]

১৯৪৯ সালে প্রণীত এই আইনের সাথে ইসলামের বিরোধ নেই। কুরআন এর সমর্থনেই বলছে, "... যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের উপর অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে নিকৃষ্ট আবাস" (১৩: ২৫)।

৪.৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সততা

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ও জটিল বিষয় হচ্ছে এই প্রযুক্তির ব্যবহার। একটি যন্ত্র হিসেবে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের কোনো অপরাধ নেই, ইন্টারনেটেরও কোনো দোষ নেই, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকেও দায়ী করা যায় না। এর ব্যবহারকারীর উপরই সব দায়িত্ব বর্তায়। এর মাধ্যমে মানুষ সবচেয়ে বেশি অপরাধপ্রবণ হচ্ছে আবার এর মাধ্যমেই বর্তমান পৃথিবীটা একটা ছোট গ্রামে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আইন তৈরি করে যাচ্ছে। এর অপব্যবহারের কারণে সৃষ্ট নৈতিক অধঃপতন রোধে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে প্রয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই এর অপপ্রয়োগ বন্ধ করা যাচ্ছে না। প্রচলিত বিভিন্ন অপরাধ যেমন চুরি, ডাকাতি, অনাচার ইত্যাদি এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটালাইজ্ড হয়ে পড়ে, যার ফলে অপরাধপ্রবণতা আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর অর্থ একে বাদ দেওয়া নয়, বরং বাদ দেওয়া সম্ভবও নয়, তবে সঠিক প্রয়োগের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা যেতে পারে। ইসলাম এমন বৈশ্বিক নৈতিক সমস্যার সমাধানে কুরআন হাদীসের পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে চায়।

আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব, স্কাইপি প্রভৃতি নামের সাথে জড়িত। প্রচলিত পত্র-পত্রিকা, সংবাদ সংস্থা, টেলিভিশন, সিনেমা ইত্যাদির স্থানে এগুলোর অভিষেক ঘটে। হাতের মুঠোয় একসাথে এখন সব পাওয়া যায়। এর সমাধানের লক্ষ্যে পাশ্চাত্য নীতিদার্শনিকগণ প্রধানত যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন সেগুলো হচ্ছে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নষ্ট, সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারিতে থাকা, হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে তথ্য পাচার ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি সাধন, পর্নোগ্রাফির বিস্তার, কপিরাইট বা

ব্যক্তিমালিকানার চুরি ইত্যাদি। এছাড়া প্লেজারিজমের মাধ্যমে অন্যের জ্ঞান, মেধাকে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। গণতান্ত্রিক সমাজে তথ্যের অবাধ প্রবাহ সবাই কামনা করলেও বিভিন্ন সময় মিথ্যা তথ্যের কারণে গুজব সৃষ্টি এবং মুহূর্তের মধ্যে সব তোলপাড় হয়ে যায়। এ সমস্যাগুলো প্রচলিত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতেও ছিল, কিন্তু এন্ড্রয়েড সেলফোনের মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুত সংক্রমণ ঘটছে। এক্ষেত্রে সততার বাস্তবায়ন এবং কোনটি প্রকৃত সত্য সেটি উদ্ঘাটনে বেশ বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। গবেষকগণ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলোর ব্যাখ্যা করেন।[১০৬] কম্পিউটার ও প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে কয়েকটি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করা যায় যার **প্রথমটি** সময়ের অপচয়। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, বিশেষ করে ৮-১৮ বছরের ছেলে-মেয়েরা প্রচুর পরিমাণে ইন্টারনেট আসক্তিতে ভোগে। দীর্ঘ সময় ধরে ডিভাইসের সামনে থাকার ফলে এদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। এর ভেতর আছে পর্নোগ্রাফি দেখা, কম্পিউটার গেম খেলা প্রভৃতি। গুগলের একটি জরিপে দেখা যায় যৌনতা-বিষয়ক সাইটগুলো দেখার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম দশটির মধ্যে ছয়টি মুসলিম রাষ্ট্র, যেগুলোর প্রথম পাকিস্তান, দ্বিতীয় মিশর, চতুর্থ ইরান, পঞ্চম মরোক্ক এবং সপ্তম সৌদি আরব। এর সমাধানে মুসলিমদেরকে প্রথমত সময় সচেতনতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে হবে। পবিত্র কুরআন সময়ের ব্যাপারটিকে সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে দেখেছে: "সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ মহা ক্ষতিতে নিমজ্জিত"(১০৩: ১-২)। অর্থাৎ সময়কে যথাযথ গুরুত্ব না দিলে ক্ষতি ছাড়া জীবনে কিছু আসতে পারে না। **দ্বিতীয়** বিষয়টি সততার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। সেটি হচ্ছে, এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ কর্মস্থলের গুরুত্বপূর্ণ ডাটা অন্যদের কাছে পাচার করা। এর ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের হিসাব থেকে কোটি টাকা চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। যে কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত বেতন ভোগ করছে, সে কর্মচারী বেশি পাওয়ার লোভে নিজ প্রতিষ্ঠানের বড় ক্ষতিতে অংশ নিচ্ছে। মহানবী (স.) বলেন,

> যে মুসলিম আমানতদার কোষাধ্যক্ষ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মুতাবিক যথাযথভাবে হুকুম পালন করে বা দান করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপককে পূর্ণমাত্রায় দান করে, সেও একজন দাতা হিসেবে গণ্য হবে।[১০৭]

ইসলাম দায়িত্বপালনে সততার জন্য এভাবে উৎসাহ দেয়। কিন্তু এরপরও যারা চুরি করে তাদের জন্য পার্থিব শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে ও পরকালীন জবাবদিহিতার বিষয়ও আছে। **তৃতীয়** বিষয়টি হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা চুরি হওয়ার আশঙ্কা। ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে কেউ চাইলে অন্যায়ভাবে অন্যের একাউন্টে ঢুকে ডাটা চুরি করতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার শতকরা ৭৪ ভাগ কোম্পানি অন্য কোম্পানি কর্তৃক তাদের গোপনীয় ডাটা চুরির মাধ্যমে হয়রানির আশঙ্কায় থাকে। কুরআন এ ব্যাপারে বলেছে, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্যদের ঘরে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সেই ঘরের অধিবাসীদের অনুমতি নেবে এবং সালাম প্রদান করবে;" (২৪: ২৭)। অর্থাৎ এখানে অন্যের ঘর উল্লেখ করলেও স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, এর মাধ্যমে অন্যের মালিকানাধীন যে কোনো স্থানে প্রবেশে অবশ্যই

অনুমতি নিতে হবে। শুধু তাই নয়, বরং সালামের মাধ্যমে ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রেখে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। একটি হাদীসে এসেছে,

> উমর (রা.) আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কে ডেকে পাঠান। তিনি উমরের ঘরের দরজায় তিনবার সালাম দিয়ে কোনো সাড়া না পেয়ে ফিরে আসেন। উমর তাকে পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, "আমি মহানবী (স.)কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পর কোনো সাড়া না পেলে সে যেন ফিরে যায়"।[১০৮]

এটি ছিল অনুমতি প্রার্থনার অত্যন্ত শালীন পদ্ধতি, যা ইসলাম তাঁকে শিখিয়েছে। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে এত বেশি গুরুত্ব দেয়, যেন সমাজ জীবন সুস্থ থাকে। **চতুর্থত**, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের নিরাপত্তা দারুনভাবে চ্যালেঞ্জর শিকার হয়ে থাকে। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও ডাটা হ্যাকারদের মাধ্যমে আক্রমণের শিকার হতে পারে। এমনকি একটি দেশের সেবা খাতে যখন এধরনের আক্রমণ ঘটে তখন ব্যাপক মানবিক বিপর্যয়ের শঙ্কা তৈরি হয়। কুরআন এক্ষেত্রে বলছে, "তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে"।[১০৯] অর্থাৎ মানুষকে সব সময় কল্যাণের পথে ডাকতে হবে এবং কল্যাণের পথে রাখতে হবে। অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। **পঞ্চমত**, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ যেমন, গ্রন্থস্বত্ব, বৈজ্ঞানিক প্যাটেন্ট, বাণিজ্যিক মালিকানা ইত্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে চুরির ঘটনা ঘটে। ইসলাম এক্ষেত্রেও স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে, "পুরুষ যা উপার্জন করে তার মালিক সে, নারী যা উপার্জন করে সেটিও তার মালিকানাধীন" ।[১১০] অন্যের মালিকানাধীন বস্তুগত বা অবস্তুগত যে কোনো সম্পদই হোক না কেন, তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বা উপকার গ্রহণ কোনোভাবেই অন্যের জন্য বৈধ হতে পারে না এবং কোনো সমাজই তা সমর্থন করে না।

এসব অপরাধের সমাধানে ইসলাম প্রথমত আল্লাহর উপর বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে বলে। কারণ, এই বিশ্বাসই কেবল মানুষের সমস্ত গোপন চিন্তা, কাজ ও পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আল্লাহর উপর বিশ্বাসী বলে যে দাবি করে সে নিজেকে আল্লাহর সার্বক্ষণিক দৃষ্টির আড়াল হতে পারে বলে কখনো ভাবতে পারে না।

৪.৫. চিকিৎসা ক্ষেত্রে সততা

আধুনিক বিশ্বে একদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে, অন্যদিকে এর অপপ্রয়োগের হারও ক্রমাগতভাবে বেড়ে যায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয় হিসেবে যেগুলো বেশি আলোচিত হচ্ছে তন্মধ্যে রোগীর গোপনীয়তা রক্ষা, অঙ্গ দান ও প্রতিস্থাপন, অন্য প্রাণীর অঙ্গ সংযোজন, ক্লোনিং, গর্ভপাত, কৃপা হত্যা প্রভৃতি বেশি আলোচিত হচ্ছে। আমরা এখানে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণে যাব না, শুধুমাত্র সাধারণ নৈতিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করব। ইসলাম এক্ষেত্রে প্রথম যে নির্দেশনা দিয়েছে তা হচ্ছে অসুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে; এজন্য আল্লাহর কাছে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয় যেমনটি ইবরাহীম (আ.) বলেছিলেন, "আমি যখন অসুস্থ হই তখন তিনিই আমাকে সুস্থ করেন"। আইয়ূব

(আ.) বলেছিলেন, "হে আমার রর, আমাকে নিশ্চয় বেদনা স্পর্শ করেছে আর আপনিই সর্বোত্তম দয়ালু"। এর পরবর্তী কাজ হচ্ছে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া। চিকিৎসা পাওয়া একজন রোগীর মৌলিক অধিকার। ইসলামী মেডিকেল এথিকসের প্রধান চারটি মূলনীতি রয়েছে: (১) উপকার করার মানসিকতা (২) ক্ষতি করার চিন্তা না করা (৩) সুবিচারের ভিত্তিতে চিকিৎসা করা (৪) রোগীর স্বাধীনতা।[১১১] এই মূলনীতির আলোকেই বর্তমান বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। ইসলামী শরীয়ার প্রধান উদ্দেশ্য পাঁচটি: জীবন, বংশ, দীন, বুদ্ধি ও সম্পদ রক্ষা। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এটিই প্রধান মূলনীতি। অর্থাৎ চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে হয়।

চিকিৎসক হিসেবে সাধারণভাবে রোগীর সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করবেন এটিই হচ্ছে স্বাভাবিক মানবিক ও নৈতিক দাবি। একজন দরিদ্র রোগী আর একজন ক্ষমতাধর বা সম্পদশালী রোগীর ক্ষেত্রে আচরণে পার্থক্য করা রোগীর উপর অবিচারের শামিল। তবে রোগীর স্বজনদেরও এমন আচরণ করা ঠিক নয় যাতে সেবাদানকারীদের প্রতি অবিচার না হয়। বিশেষত দুর্ঘটনা বা আকস্মিক সমস্যায় পড়া মানুষের চিকিৎসা প্রদানে সুবিচার করা ডাক্তার ও হাসপাতালগুলোর জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় রোগীর পরিবারের সদস্যদের ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়, একটি দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকেও মেনে নিতে হয়। ডাক্তারের মানবিক আচরণ না থাকলে রোগীর অসুস্থতা বেড়ে যায়, আর তিনি এতে যদি নিজ চেম্বারে অথবা বিশেষায়িত কোনো হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যেতে বলেন, এতে ঐ রোগীর অর্থনৈতিক অভাবের কারণে চিকিৎসা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যাদের অর্থবিত্ত বেশি তারা উন্নত চিকিৎসা নিয়ে দ্রুত আরোগ্য লাভ করছে।

বর্তমানে ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ বা নিম্নমানের ঔষধ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা উঠে আসে। জীবন রক্ষার জন্য যে ঔষধ প্রয়োগ হওয়ার কথা সেখানে তা জীবনের ক্ষতিতে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া অঙ্গ চুরি, বিক্রয় ইত্যাদির মতো চরম অমানবিক কাজও কিছু অসৎ লোক ও ডাক্তারদের মাধ্যমে ঘটে থাকে। ইসলাম এ ব্যাপারে শাস্তি প্রদানের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু নৈতিক চেতনা তৈরি না হলে শাস্তি কখনো কার্যকরী উপায় হতে পারে না। সেই চেতনার জন্য শুরুতেই ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসা তৈরি করতে হবে।

৫. সত্যের সাক্ষী হওয়া

নিজের চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে কেউ সততাকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করলে তাকে কুরআন সত্যের সাক্ষী বলেছে। সত্যের এই বাস্তব সাক্ষী হওয়া সততার উচ্চতর প্রকাশ।

> এভাবেই আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ জাতি করেছি, যেন তোমরা সমগ্র মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পার এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন। (২: ১৪৩)

এর অর্থ হচ্ছে মুসলিম জাতিকে অন্য সবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে; কারণ তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার সেই নৈতিক শক্তি ও যোগ্যতা আছে। প্রচলিত সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী, সাক্ষীকে সত্যবাদী হতে হয় এবং

ভয়-ভীতি ও প্রলোভনের শিকার হওয়া যায় না; উৎকোচ গ্রহণের সাথেও যুক্ত থাকা যায় না।[১১২]কুরআন যাদেরকে মানবজাতির জন্য সাক্ষী বানানোর ঘোষণা দিয়েছে তারা অবশ্যই সত্যবাদিতার সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে- এটাই স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথা ছিল। তাদের চরিত্র সম্পর্কে এসেছে,

> নিশ্চয় মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে; যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে- এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরো রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৮: ২-৪)

মুমিন ব্যক্তির সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে ভক্তি আবেগে তাদের হৃদয় কেঁপে উঠে, আল্লাহর এক একটি নিদর্শন বা আয়াত তাদের সামনে দৃশ্যমান হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, এভাবে তাদের ভেতর আল্লাহর প্রতি চরম আস্থাশীলতা সৃষ্টি করে। প্রশান্তির আবেগে তাদের হৃদয় থেকে কান্নার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। পরম আশাবাদী হয়ে তারা আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে চায়। এমন আধ্যাত্মিক চরিত্রের মানুষের পক্ষে সত্যের বাস্তব সাক্ষী হতে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। তারা আল্লাহর প্রতি যেমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নিজেদের প্রতিও তেমনি দায়িত্বশীল। মানুষের সাথে কখনো তারা প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারে না।

> আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, বার বার পঠিত। যারা তাদের রবকে ভয় করে এতে তাদের চামড়ার উপর লোম কাঁটা দিয়ে উঠে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ...। (৩৯:২৩)

এখানে, আল্লাহর বাণীকে সর্বোত্তম বাণী বলা হয়েছে, যার মধ্যে কোনো স্ববিরোধ নেই। এতে এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, বারবার একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে যেন অন্তরে মজবুতভাবে গেঁথে যায়। কুরআনের সত্যিকার পাঠক এই সত্য উপলব্ধি করে আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়, এমনকি তা তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চেহারা ও চামড়ায় প্রকাশ পায়। এই কথার উদ্দেশ্য, মানুষের মধ্যে এটি এমন আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম যা তাকে সত্যের পক্ষে কথা বলতে এমনকি যালিম শাসকের সামনেও সাহসী করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, সত্যের সাক্ষী হিসেবে মানুষের মধ্যে তখন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, অন্যকে প্রতারণা করা বা আমানতের খেয়ানত করা সম্ভব হয় না। মৌখিকভাবে সত্যের সাক্ষী হওয়ার জন্যও কুরআন বলেছে, "তুমি তোমার রবের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশসহকারে আর সর্বোত্তম যুক্তির মাধ্যমে বিতর্ক করো" (১৬: ১২৫)। আর বাস্তব সাক্ষ্য হচ্ছে নিরবে নিস্তব্ধে স্বীয় চরিত্রের দ্বারা অন্যকে সত্য উপলব্ধি করতে আহ্বান জানানো।

সত্যবাদিতা ও সততার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে সত্যের সাক্ষী হওয়ার মাধ্যমে। সত্যের সাক্ষ্য দিতে হয় মৌখিকভাবে এবং বাস্তব উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে। মুসলিম জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যই নিজেকে এধরনের উন্নত সত্যবাদীতে পরিণত করা।

৬. মন্তব্য

সত্যবাদিতা ও সততা সম্পর্কে এতক্ষণ যে বিশ্লেষণ করা হলো তাতে আমরা স্পষ্ট করতে চেয়েছি সত্য উদ্ঘাটন বা আবিষ্কারের যেমন প্রয়োজন তেমনি সেটির বাস্তব স্বীকৃতি ও অনুসরণও প্রয়োজন। সত্যবাদিতার গুণ যখন মানুষ অর্জন করতে পারবে তখন তার পক্ষে মিথ্যা বলা বা মিথ্যার অনুসরণ সম্ভব নয়। কুরআন এটিকেই বলেছে, "সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদূরিত হবেই"। সুতরাং যে জিনিসটির ধ্বংস ও ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়ে পড়ে সেই জিনিসকে অনুসরণ করার কোনো অর্থ হয় না। দর্শন মানব জীবনের জন্য সবচেয়ে বাস্তব সত্য আবিষ্কার করতে চায় মূলত মানুষের কল্যাণের জন্যই। কিন্তু সেই সত্য নবীগণ অর্জন করে থাকেন আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণীর মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সত্যতা যাচাইয়ে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হয় তেমনি ধর্মীয় সত্য প্রমাণেও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। ঐশী বাণীর সত্যতা যখন প্রমাণিত হয়ে পড়ে তখন তা বিশ্বাস না করার কারণ থাকতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে আমাদের সত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে মিথ্যা সংশয়ের সুযোগ থাকে না। আর যখন আল্লাহর বিধান পালনে আমরা সততা ও নিষ্ঠার চর্চা করব তখন আমাদের বাস্তব জীবনের সব ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার বাস্তব রূপায়ন সম্ভবপর করতে পারব। ইসলামের যাবতীয় মৌলিক, আনুষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ ইবাদতসমূহের উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়ার প্রশিক্ষণ, যা কর্মজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন।

সত্যবাদিতা এমন একটি সর্বজনীন নৈতিকগুণ যার সমর্থনে পৃথিবীর সবাই একমত। কিন্তু যে ভিত্তির উপর ইসলামী নীতিদর্শনে সত্যবাদিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটি অন্য নীতিদর্শনে নেই। এখানে সত্যবাদিতা মানে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের প্রমাণ এবং একই সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি। যার ভেতর সততার গুণ নেই তার পক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব হলেও মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন সম্ভব হয় না। সততাকে পাশ্চাত্যে সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ইসলামে সততা হচ্ছে সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক গুণ। সমাজের নেতৃত্ব প্রদানে, ব্যবসায় পরিচালনায়, জ্ঞান সাধনায়- সবক্ষেত্রে এটি উত্তম একটি পন্থা হিসেবে প্রমাণিত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা পর্যন্ত যত ধরনের সম্পর্ক সবক্ষেত্রে সততার ফলাফল সর্বোচ্চ। কিন্তু ইসলামী নীতিদর্শন সততাকে কেবল সুনাম-সুখ্যাতির মাধ্যম ও সর্বোত্তম পরিচালনা-প্রক্রিয়া হিসেবেই মূল্যায়ন করে না, বরং একে দেখে আধ্যাত্মিক শক্তি ও পরমানন্দ পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবেও।

তথ্যনির্দেশ

১. আল-কুরআন, ৬১: ২-৩ (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ)

২. প্রাগুক্ত, ২: ১৪৭।

৩. প্রাগুক্ত, ২১:৭।

৪. প্রাগুক্ত, ১৭: ৩৬।

৫. মুহাম্মদ ইকবাল, *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন* (ঢাকা: আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০৫), পৃ. ৭।

৬. আর. এম. চিজম, *জ্ঞানবিদ্যা*, অনু. মো. আবদুর রশীদ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৫০।

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

৮. *প্রাগুক্ত*।

৯. John Dewey, *Logic: The Theory of Inquiry* (New York: Henry Holt & Co., 1938), pp. 8-9.

১০. https://plato.stanford.edu/index.html, *Aug 16, 2018.*

১১. *Ibid.*

১২. Abu Saeed al Kharraj, *The Book of Truthfulness (Kitab Al- Sidq*), tr. A. J. Arberry (Oxford: Oxford University Press, 1937), p. 1.

১৩. আল গাযালী, *এহইয়াউ উলূমিদ্দীন* (৮ম খণ্ড), অনু. এম. এমদাদুল্লাহ (ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানি লি.,২০০১), পৃ. ১২০।

১৪. ইবন হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, অনু. আকরাম ফারুক (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১), পৃ.১০৭।

১৫. আল-কুরআন, ৫০: ৫।

১৬. *তিরমিযী*: ২৫১৮।

১৭. আল-কুরআন, ১৯: ৪১।

১৮. প্রাগুক্ত, ৬০: ৪।

১৯. প্রাগুক্ত, ৩৭: ১০৪-৭।

২০. প্রাগুক্ত, ১৯: ৫৪।

২১. প্রাগুক্ত, ১৯: ৫৬।

২২. প্রাগুক্ত, ৫৩: ২-৩।

২৩. প্রাগুক্ত, ৬৯: ৪৪-৪৭।

২৪. প্রাগুক্ত, ৪: ৬৫।

২৫. প্রাগুক্ত, ৬৮: ৪।

২৬. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ:* ৮৯৫২।

২৭. ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

২৮. মুহাম্মদ শফী, *মাআরেফুল কোরআন* (সংক্ষিপ্ত), অনু. মুহিউদ্দীন খান (মদীনা মোনাওয়ারা: বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৯৯২), পৃ. ১১০০।

২৯. *মুসলিম:* ৬৬৩৯।

৩০. আল-কুরআন, ৫: ১১৯।

৩১. ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*: ১৯।

৩২. আহমাদ: ২২৭৫৭; বায়হাকী: ১২৬৯১।

৩৩. আল-কুরআন, ২: ৮-৯।

৩৪. প্রাগুক্ত, ২: ২৮৪।

৩৫. প্রাগুক্ত, ৪৯: ১৫।

৩৬. প্রাগুক্ত, ২৯: ২-৫।

৩৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*: ১৯০৫।

৩৮. *আহমাদ*: ৮৭০৩ ; *আবু দাউদ*: ৪৯৯৩।

৩৯. আল-কুরআন, ৪: ১৪২-৩।

৪০. প্রাগুক্ত, ৬৩: ১।

৪১. প্রাগুক্ত, ৯: ১২৭।

৪২. *বুখারী*: ৩৩।

৪৩. *প্রাগুক্ত*: ৩৪।

৪৪. প্রাগুক্ত, ৩৯: ৩২-৩।

৪৫. প্রাগুক্ত, ৬১: ৭।

৪৬. *তিরমিযী*: ৩৪৭৯।

৪৭. আল-কুরআন, ২: ১৭৭।

৪৮. প্রাগুক্ত, ২০: ১৪।

৪৯. প্রাগুক্ত, ২৯: ৫৫।

৫০. প্রাগুক্ত, ৫: ৫৭।

৫১. প্রাগুক্ত, ২৩: ১-২।

৫২. *বুখারী:* ৭৪৯৪; *মুসলিম*: ৭৫৮।

৫৩. *বুখারী:* ১৯০৩ (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)।

৫৪. আল-কুরআন, ২: ১৮৩।

৫৫. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত* (১ম খণ্ড), পৃ. ৪২৫-৭।

৫৬. *বুখারী:* ১৫২১।

৫৭. আল-কুরআন: ২: ১২৮।

৫৮. প্রাগুক্ত, ২: ২০০।

৫৯. প্রাগুক্ত, ২২: ৩৬।

৬০. প্রাগুক্ত, ১৯: ৩১।

৬১. প্রাগুক্ত,২২: ৩৭।

৬২. প্রাগুক্ত,৭: ২৬।

৬৩. প্রাগুক্ত, ৩৩: ৩২।

৬৪. প্রাগুক্ত, ৬৬: ১১-১২।

৬৫. প্রাগুক্ত, ৭৮: ৯-১৬।

৬৬. প্রাগুক্ত, ১৬: ৯-১০।

৬৭. প্রাগুক্ত, ৪৩: ৩৬।

৬৮. প্রাগুক্ত, ৭: ১৭২।

৬৯. প্রাগুক্ত, ৬১: ৮-৯।

৭০. প্রাগুক্ত, ৭: ৯৬ ।

৭১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা* (১ম খণ্ড), অনু. আহমদ মানযুরুল মাওলা (ঢাকা: ফেরদৌস পাবলিকেশান্স, ১৯৭৮), পৃ. ৫৫-৫৬।

৭২. ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর, *তাফসীর ইবনে কাসীর* (৮ম-১১শ খণ্ড), অনু. মুজিবুর রহমান (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন, ২০০৪), পৃ. ৮৩৮-৩৯।

৭৩. *আবু দাউদ*: ৪৮৭৩।

৭৪. ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর, *প্রাগুক্ত* (১৫শ খণ্ড), পৃ. ৮৮২।

৭৫. *আহমাদ*: ১২৫৬৭।

৭৬. সাইয়েদ কুতুব, *বিশ্বশান্তি ও ইসলাম*, অনু. গোলাম সোবহান সিদ্দিকী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১৯০।

৭৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০-১ ।

৭৮. *বুখারী:* ২৩২০; *মুসলিম:* ১৫৫৩।

৭৯. Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1996), pp. 39-45.

৮০. *তিরমিযী*: ১২০৯।

৮১. *ইবন মাজাহ*: ২৩৪১; *আহমাদ*: ২৮৬৫।

৮২. *মুসলিম:* ১০২।

৮৩. *আবু দাউদ*: ৪৯৭১।

৮৪. *আহমাদ*: ১১৮০৯।

৮৫. *বুখারী*: ৩৬৪২।

৮৬. *মুসতাদরাকে হাকিম*: ২২৫৩।

৮৭. *বুখারী:* ২০৭৬; *তিরমিযী*: ১৩২০।

৮৮. *বুখারী:* ৩৪৭২।

৮৯. *ইবন মাজাহ:* ২১৫৩।

৯০. *আহমাদ*: ১৩৫; *ইবন মাজাহ:* ২২৩৮।

৯১. *বুখারী*: ২২৩৯।

৯২. *বুখারী*: ৮৯৩; *মুসলিম*: ১৮২৯।

৯৩. Abdullah Draz, *The Moral World of the Quran* (London: I. B.Tauris, 2008), p. 64.

৯৪. *Ibid*, p.15.

৯৫. Seyyed Hossein Nasr, *Traditional Islam in the Modern World* (London: Kegan Paul International, 1994), p.35.

৯৬. Shukri Ahmad, "The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition", *International Journal of Business and Social Science,* Vol. 3, no. 20, (USA: Center for Prmoting Ideas, 2012), p. 121.

৯৭. *বুখারী*ঃ ৬৬৭৬।

৯৮. Seyyed Hossein Nasr, *op.cit.*, p. 35.

৯৯. *বুখারী*ঃ ৩০১৫।

১০০. *মুয়াত্তা ই মালিক*ঃ ৯৬৩।

১০১. সাইয়েদ কুতুব, *বিশ্বশান্তি ও ইসলাম*, অনু. গোলাম সোবহান সিদ্দিকী (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১৯৮।

১০২. *বুখারী*ঃ ৩১৬৬।

১০৩. *বুখারী*ঃ ৩০১৭।

১০৪. মুসলিমঃ ১৭৩১।

১০৫. আমের আয যামালী, সম., *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন* (ঢাকাঃ আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি, ২০১৬), পৃ. ১৭।

১০৬. Abdul Kadar Muhammad Masum, "Ethical Issues in Computer Use: A Study from Islamic Perspective" in *Global Journal of Computer Science and Technology Interdisciplinary,* Volume 13 Issue 2 Version 1.0, Year 2013.

১০৭. *বুখারীঃ* ৮৯৩।

১০৮. *বুখারীঃ* ৬২৪৫।

১০৯. আল-কুরআন, ৩ঃ ১০৪।

১১০. প্রাগুক্ত, ৪ঃ ৩২।

১১১. Yassar Mustafa , "Islam and the four principles of medical ethics", *Journal of Medical Ethics,* August 2013;0:1–5. doi:10.1136/medethics-2012-101309 1.

১১২. *সাক্ষ্য আইন*, ১৮৭২, ধারাঃ ১৪৬, ১৫৩।

৩য় অধ্যায়

সুবিচার

ইসলামে জাস্টিস বা সুবিচারের ধারণা অত্যন্ত মৌলিক। ইসলামের এ সংক্রান্ত আলোচনার পরিধি অন্যান্য ধর্ম ও চিন্তাধারার চেয়ে অধিকতর ব্যাপক। সুবিচার বোঝাতে কুরআনে প্রধানত তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে: *আদল*, *কিস্ত* ও *তাসওয়ীয়াহ*। *আদল* শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সমতা বা সমতার মাধ্যমে বিচার।[১] *কিসত* এর অর্থ ন্যায্যভাবে কাজ করা বা বণ্টন করা। *তাসওয়ীয়াহ* অর্থ হচ্ছে সমান ভাগ করা। অর্থাৎ তিনটি শব্দের মূল ভাবার্থ প্রায় একই। এর বিপরীত শব্দ হিসেবে এসেছে *যুল্ম* ও *জাওর* যার অর্থ অবিচার ও অন্যায়। আল্লাহ বলেন, "আমি কখনো আমার বান্দার উপর যুলম করি না"।[২] অর্থাৎ তিনি কখনো সুবিচারের বিপরীত কোনো কাজ করেন না আর এই কাজকে অন্য কারো জন্য অনুমোদনও দেন না; বরং এই গুণ অর্জন মানুষর জন্য তিনি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর মতে *আদল* বা সুবিচার হচ্ছে, আত্মার এমন শক্তি যার মাধ্যমে মানব সভ্যতার শৃঙ্খলা-বিধানের কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।[৩] অর্থাৎ এই নীতি মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে- ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতা সবকিছু পরিচালনার মৌলিক নীতি। তিনি বলেন, মানুষের যখন এই গুণ অর্জন হবে, তখন মানুষ সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতাদের কাতারে উপনীত হবে। কুরআন থেকে চারটি মৌলিক গুণের আলোচনায় এটিকে তিনি চূড়ান্ত ও পূর্ণতাদানকারী গুণ হিসেবে উল্লেখ করেন। বাকী তিনটি গুণ হচ্ছে: পবিত্রতা, বিনয় ও উদারতা। এমন কোনো বিষয় নেই যেখানে ন্যায় বা ইনসাফের প্রাসঙ্গিকতা আসে না। সে কারণেই ইসলামী নীতিদর্শনে গুরুত্বের সাথে এই সদগুণটির আলোচনা করা হয়েছে। সুবিচার সম্পর্কে কুরআনের সাধারণ নির্দেশ হচ্ছে,

> নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচার, পরোপকার ও নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ করেন আর অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[৪]

অর্থাৎ আল্লাহ সুবিচারকে একজন মুসলিমের জন্য সাধারণ আবশ্যকীয় কাজ হিসেবে নির্ধারণ করে দেন। এতে আরো প্রমাণিত হয়, শুধু সুবিচারই যথেষ্ট নয়, বরং অন্যের উপকারের জন্য নিজেদের নিবেদিত করাও ইসলামের প্রধান লক্ষ্য। এই অধ্যায়ে আমরা দার্শনিক ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিচারের প্রকৃতি, ইতিহাস ও এর বিভিন্ন ধরন বা প্রকৃতির বিশ্লেষণ করব, যার মাধ্যমে একটি নৈতিকগুণ হিসেবে এর ভূমিকা স্পষ্টতর হবে বলে আশা করি।

১. সুবিচারের জন্য বিশ্বজনীন স্বীকার্য বিষয়

সুবিচারের ধারণা এবং আলোচনা জ্ঞানের রাজ্যের সূচনাকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। প্রতিটি সভ্যতায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ছিল। সাধারণভাবে সুবিচারের আলোচনার জন্য কয়েকটি মৌলিক পূর্বানুমান বা স্বীকার্য বিষয়কে ধরে নেওয়া হয়। যেমন, **প্রথমত**, সত্য। সুবিচার বাস্তব সত্যের অনুরূপ হয়। অর্থাৎ সুবিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট বক্তব্যকে সত্য হতে হয়। মিথ্যা বক্তব্যে কখনো সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। **দ্বিতীয়ত**, সুবিচার হবে সবার জন্য এক। স্বজাতি ও ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিকট এর অর্থ ভিন্ন হবে না। **তৃতীয়ত**, সুবিচার হতে হলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। **চতুর্থত**, সুবিচারের নিশ্চয়তার জন্য স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হয়। **পঞ্চমত**, প্রাকৃতিক সামর্থ্যের সাথে মিল রেখে সুবিচার করতে হয়। অর্থাৎ কারো সামর্থ্যের বাইরে চাপিয়ে দিলে সেটি সুবিচার হয় না।[৫] এ বিষয়গুলো নিয়ে পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের মতবিরোধ নেই। বরং ইসলামও এই বিষয়গুলোকে সমর্থন করে। ইসলামে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কোনো ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের প্রতি সামান্য বৈষম্যও করা হয়নি। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি নিজ পিতা-মাতার বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয় তবে তাই করতে হবে (৪: ১৩৫)।[৬] অর্থাৎ সুবিচার এমনই বিশ্বজনীন ও সাধারণ বিষয় যাতে সবচেয়ে আপনজনকেও বিবেচনা করা হয় না।

তবে সুবিচারের পূর্বে আরেকটি প্রশ্ন আসে- কিসের ভিত্তিতে আমরা সুবিচার বা বিচার করব? রাষ্ট্রদর্শনে আইনের মাধ্যমে এ বিষয়টির সমাধান দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ আইন অনুযায়ী যথার্থ বিচার মানেই সুবিচার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আইনের কাছে সুবিচার দায়বদ্ধ। আর্নেস্ট বার্কার আইনের সাথে সুবিচারকে একীভূত করে সুবিচারের চারটি উৎসের কথা বলেন। **প্রথমত**, সুবিচারের উৎস ও শক্তি হচ্ছে **ধর্ম; দ্বিতীয়ত**, প্রকৃতি; **তৃতীয়ত**, অর্থনীতি এবং **চতুর্থত**, নীতিবিদ্যা। তাঁর মতে, ধর্ম আমাদেরকে ঈশ্বরের আদেশ সরবরাহ করে, যা সবচেয়ে কল্যাণময়। প্রকৃতি থেকে আমরা প্রাকৃতিক আইন খুঁজে পাই, যেখানে কোনো ধরনের বৈষম্য নেই এবং সব সময় তা একই আচরণ করে, কোনো ব্যক্তিভেদে এর আচরণ ভিন্ন হয় না। অর্থনীতির ব্যাখ্যায় মার্কসবাদী নীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, অর্থনীতির নীতিমালা মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু মার্কসবাদের পক্ষে সেই অর্থে সাম্য সম্ভব নয়। সর্বশেষে নীতিবিদ্যার ব্যাখ্যায় তিনি বিবেকের শাসনের কথা বলেন।[৭] অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যে তিনি প্রমাণ করেন সুবিচারের আগে আইনের প্রয়োজন রয়েছে। আর সেই সাথে আইনের বিভিন্ন উৎসের কথাও প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে। ইসলামে আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদীস। নিখুঁত ও সর্বজনীন আইনের উৎস হিসেবে কুরআনকে স্বীকার করা ইসলামী দর্শনের মৌলিক বিষয়। আর আইনপ্রণেতা হিসেবে বিশ্ব সভ্যতায় মহানবী (স.)এর ভূমিকাও অত্যন্ত গভীর।

আইনের সাথে আরেকটি বিষয় অনিবার্যভাবে জড়িত, সেটি হচ্ছে অধিকার বা প্রাপ্য। প্লেটো যেমনটি বলেছিলেন, ন্যায়বিচার মানে অন্যের প্রাপ্য আদায় করে দেওয়া। অবশ্যই সেই প্রাপ্য আদায়ের জন্য

দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। অর্থাৎ পাগল, মাতাল বা শিশুকে যে কোনো সময় তাদের প্রাপ্য আদায় করা যায় না। তবুও মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্যই যে আইন রচিত হয় তা নিয়ে কারো মন্তব্য নেই। বিচারক সেই আইন অনুযায়ী প্রাপকের প্রাপ্য আদায়ের আইনগত রায় দেন। সেটির বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ। রাষ্ট্রদর্শনে ন্যায়বিচারের ধারণা এজন্যই রাষ্ট্রের তিনটি মৌলিক বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত: আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ। কোনো একটির অসহযোগিতায় আদৌ রাষ্ট্রীয় সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মানুষের পারস্পরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হয়। এজন্যই মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষের পারস্পরিক হক আদায়ের ক্ষেত্রে কুরআনেও প্রথমত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যা মহানবী (স.) নিজে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। রাষ্ট্র গঠনের মূল উদ্দেশ্য পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠা; সুবিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন, অপরাধ দমন প্রভৃতি। তবে রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে সার্বভৌমত্ব, অঞ্চল, সরকার ও জনগণ। সার্বভৌমত্ব মানেই হচ্ছে স্বাধীনতা। নৈতিকতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীন ইচ্ছা কেবল স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব আর স্বাধীন ইচ্ছা ছাড়া কোনো ইচ্ছারই নৈতিক মূল্য নেই। অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায়, নৈতিকতার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজন অপরিহার্য। আবার সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি। একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সংবিধানে বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা। সংবিধানই মানুষের মৌলিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

২. সুবিচারের ইতিহাস

প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)এর সময় থেকেই সুবিচারের ধারণা এসেছে। আগেই উল্লেখ করেছি, সুবিচার করা না হলে সেখানে যা ঘটে তাই হচ্ছে অবিচার। আদম যখন আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে স্ত্রী হাওয়া (আ.)সহ নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট গেলেন, তখন এটি হয়েছিল তাঁদের নিজেদের প্রতি অবিচার। এজন্য তাঁরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, "হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব"।[৮] আল্লাহ প্রার্থনা কবুল করে তাঁদের ক্ষমা করে দেন। প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন কুরআনে এসেছে তাতে দাউদ (আ.) এবং বাদশা যুলকারনাইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাসক হিসেবে যখন দাউদ (আ.) রাজ্য পরিচালনা করছিলেন আল্লাহ তখন তাকে আদেশ করেন,

> হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি পৃথিবীতে সুবিচারের সাথে শাসন পরিচালনা করো এবং নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না; তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।[৯]

একটি জাতির প্রসঙ্গে যুলকারনাইনকে আল্লাহ বলেন,

> "হে যুলকারনাইন তুমি চাইলে এই জাতিকে শাস্তি দিতে পার আবার চাইলে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে পার"। যুলকারনাইন তখন বলল, "যে যুলম করবে তাকে আমি অচিরেই শাস্তি দেব এরপর তাকে তার রবের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে, অতঃপর তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন"।[১০]

এখানে প্রথমত একজন নবীকে শাসন পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে দুটি বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে: সুবিচার বাস্তবায়ন এবং খেয়ালখুশি বর্জন। পৃথিবীর যে কোনো কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে এ দুটি বিষয়ের বিপরীত ঘটে থাকে বেশি। এমনকি সুবিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রের বা প্রতিষ্ঠানের বিশাল অর্থ অপচয়ের ঘটনা ঘটে। তাতে প্রত্যক্ষভাবে কেউ আক্রান্ত না হলেও রাষ্ট্রীয় অর্থের সাথে যে অবিচার করা হয় তাতে সন্দেহ নেই। এজন্যই সুবিচারের স্বার্থে এটিকে বর্জন করতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টিতে আল্লাহ যুলকারনাইনকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা দেন- তিনি কি সুবিচার করেন, না কি যুলমের পথ অবলম্বন করেন। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। তিনি নিজে সুবিচার করবেন শুধু তাই নয়, বরং তাঁর অধীনস্তদের কেউও যুলমের পথ অবলম্বন করতে পারবে না- এমন প্রতিশ্রুতি তিনি আল্লাহকে দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য ইতিহাস অনুসারে ব্যবিলনের শাসক হাম্মুরাবি (মৃত্যু: খ্রি.পূ. ১৭৫০) কর্তৃক যে আইন রচিত হয়েছিল, যার শিলালিপি ফ্রান্সের যাদুঘরে এখনো রক্ষিত আছে, সেই আইনই মানুষকে সুবিচারের প্রথম নিশ্চয়তা দেয়। এর ২৮২টি ধারার সবকটি আধুনিক দৃষ্টিতে যথার্থ না হলেও এটি এক প্রামাণ্য দলীল। গ্রিক সভ্যতায় প্লেটো-এরিস্টটলের বক্তব্যে সুবিচারের ধারণা আসে। *রিপাবলিক* গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সুবিচার বা জাস্টিস কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করা। প্লেটো যুক্তি প্রমাণ দিয়ে দেখালেন, সুবিচার রাষ্ট্র ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। একজন শক্তিশালী প্রজ্ঞাবান রাজার অধীনে যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের নিশ্চয়তাকেই তিনি সুবিচার বলেছেন। তবে রাষ্ট্রের আগে নিজের সাথে সুবিচারের ব্যাখ্যাও তিনি দেন। প্রজ্ঞা, সংযম, সাহস- আত্মার এই তিনটি মৌলিক গুণের সমন্বয় হলে মানুষ নিজের প্রতি ও অন্যদের সাথে সুবিচার করতে পারে। এরিস্টটল সুবিচারকে গণ্য করেছেন মধ্যম পন্থা এবং সমস্ত সদগুণের ভিত্তি হিসেবে।[১১] বর্তমান যুগ পর্যন্ত মুসলিম ও অন্যান্য দার্শনিক বা চিন্তাবিদদের অধিকাংশই সুবিচারের সংজ্ঞায়নে এ কথাগুলোই বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন।

আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমতা ও সুবিচার। সাম্য অর্থ মূলত সুযোগের সমতা, কর্মক্ষমতার সমতা নয়। ইসলামে যে সাম্যের ধারণা তা সব মানুষকে সমান করার ধারণা নয়, বরং মানুষের সুবিচার পাওয়ার সমতা। সমাজবাদ যেভাবে মানুষকে সমান করতে চেয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। সব মানুষ যদি সমান হতো তাহলে, পৃথিবীর শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যেত। পৃথিবীতে অনেক মানুষ নিজ থেকেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে, আর অনেকে অধীনস্ত থাকতেই বেশি পছন্দ করে। সবাইকে এক করলে তা সম্ভব হবে না। স্রষ্টা প্রদত্ত সামর্থ্যের ভিত্তিতেই মানুষকে মূল্যায়ন করতে হয়। নারী পুরুষের মধ্যে সমতা হচ্ছে অধিকার ও সুযোগের সমতা। তবে উভয়ের অনেক কার্য ভিন্ন থাকায় তাদেরকে এক দৃষ্টিতে সমান করার চেষ্টা উভয়ের প্রতি অবিচার করার শামিল। উভয়ের দেহ মন এক রকম নয়, কাজের ধরনও এক রকম নয়। কোনো পুরুষ কখনো গর্ভধারণ করতে পারে না। সুতরাং তাদের কাছ থেকে একই কর্মক্ষেত্রে একই ধারায় সব কাজ আদায় করার চেষ্টা তাদের উপর নিঃসন্দেহে অবিচার। প্রকৃতির

স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কেউই স্থায়ীভাবে সফলতা অর্জন করতে পারে না। তবে আইনের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার অবশ্যই সবাই সমানভাবে ভোগ করবে।

৩. সুবিচারের বিভাজন

নৈতিকতা পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকারের সাথে জড়িত বিষয় হওয়ার কারণে ইসলামে সুবিচারের ধারণা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। তবে ব্যক্তিগত জীবনে নিজের দেহ ও মনের সাথে সুবিচারের বিষয়টিকেও ইসলাম বাদ দেয়নি। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিচারকে আমরা তিনটি মৌলিক অংশে ভাগ করতে পারি: আল্লাহর সাথে সুবিচার, মানুষের সাথে সুবিচার ও প্রকৃতির সাথে সুবিচার। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের যে কোনো আলোচনার ক্ষেত্রেই তিন ধরনের সম্পর্ককে সামনে রাখতে হয়।

৩.১. আল্লাহর প্রতি সুবিচার

আল্লাহর প্রতি সুবিচারের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা। আল্লাহর হক হচ্ছে তাঁকে এক বলে স্বীকার করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা। যে আদেশগুলো প্রত্যক্ষভাবে অন্য কারো ক্ষতি বা উপকারের সাথে যুক্ত নয়, বরং সরাসরি ব্যক্তির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক স্থাপনের আবশ্যকীয় মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয় সেগুলোই হচ্ছে আল্লাহর হক। যেমন, একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য সালাত, সওম, হজ্জ সম্পন্ন করা, যাকাত আদায় করা প্রভৃতি। আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলাম আল্লাহর কোনো অভাব নেই, তাই তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। পরস্পরের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে নিজের স্বত্ব বা প্রাপ্য দাবি করি আল্লাহর হক আদায়ের বিষয়টি সে রকম নয়। কারণ আল্লাহর হক আদায় না করলে তিনি কারো কাছ থেকে আদায় করে ছাড়েন না। বরং এটিকে মানুষের অন্যায় কর্ম হিসেবে পরকালীন জবাবদিহিতার জন্য রেখে দেন। তবে মৃত্যুর আগে যদি কেউ আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে এবং আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় নিজেকে সংশোধন করে তাহলে তিনি সেগুলো ক্ষমা করে দিতে পারেন। একটি হাদীসে আল্লাহর সাথে সুবিচার বা তাঁর হক সম্পর্কে সহজে বর্ণনা করা হয়েছে,

> হজরত মু'আয ইববে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বিশ্বনবীর পেছনে 'উফায়ের' নামক গাধার উপর বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, "হে মু'আয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী? মু'আয বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো- একমাত্র তাঁরই 'ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো- যে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করে না তাকে শাস্তি না দেওয়া।" হজরত মু'আয বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি এ ব্যাপারে মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করব?" তিনি বলেন, "তাদের এ সুসংবাদ দিও না; কারণ তারা হাত-পা গুটিয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে কাজ-কর্ম ও ইবাদত করা ছেড়ে বসে থাকবে"।[১৪]

অর্থাৎ, মানুষের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব হচ্ছে তাঁর দেওয়া আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা, নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদত করা প্রভৃতি। শিরক থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজে ক্ষমা পাওয়া যায় এই কথাটিই এখানে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে এসেছে, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করো না"।[১৩] সূরা আল কাফিরূনেও শিরককে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে,

> বলো, হে কাফিররা, "তোমরা যার 'ইবাদত কর আমি তার 'ইবাদত করি না'। এবং আমি যার 'ইবাদত করি তোমরা তার 'ইবাদতকারী নও'। আর তোমরা যার 'ইবাদত করছ আমি তার 'ইবাদতকারী হব না'। আর আমি যার 'ইবাদত করি তোমরা তার 'ইবাদতকারী হবে না'। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন"।[১৪]

সুতরাং আল্লাহর প্রতি সুবিচার মানেই হচ্ছে তাওহীদের অনুসরণ করে কেবলমাত্র তাঁর দাসত্ব করা এবং শিরককে সম্পূর্ণ বর্জন করা। শিরককে আল্লাহর সাথে সবচেয়ে বড় অবিচার হিসেবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫]সংক্ষেপে বললে, তাওহীদ বা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করা এবং তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলার মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে সুবিচার করা হয়। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা আল্লাহর হককে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি: তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় এবং তাঁর সাথে শিরক না করা।

ক. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা

কুরআনে কৃতজ্ঞতার পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে *শোকর* শব্দটি। আরবী অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে, অনুগ্রহের স্বীকৃতি ও প্রচার হিসেবে। আল্লাহর শোকর আদায় মানে হচ্ছে সুন্দরভাবে তাঁর প্রশংসা করা।[১৬]আল্লাহকে প্রকৃত নিয়ামতদাতা বলে বিশ্বাস করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ের মাধ্যমে একজন মু'মিনের পরিচয় প্রকাশ পায়। "তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করে শেষ করতে পারবে না"।[১৭] এজন্যই সুলাইমান (আ.) বলেন,

> হে আমার রব, তুমি আমার উপর এবং আমার বাবা-মা এর উপর যে নিয়ামত দিয়েছ তার জন্য আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতা আদায়ের এবং তোমার পছন্দ অনুযায়ী নেক আমল করার সামর্থ্য দাও আর আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করো।[১৮]

এখানে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়কে তাঁর স্বাভাবিক দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ দায়িত্ব পালনে যেন তিনি কখনো অক্ষম হয়ে না পড়েন সে জন্য আবার তাঁর কাছেই তিনি সাহায্য চেয়েছেন; কৃতজ্ঞতা আদায়ের মাধ্যম হিসেবে অনুগ্রহদাতা আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী ভালো কাজ করার শক্তি প্রার্থনা করেছেন আর এভাবে তিনি পরকালীন সফলতার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এটি কৃতজ্ঞতা আদায়ের একটি ঐশী নির্দেশনা। দীর্ঘ সময় রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের কারণে মহানবী (স.)এর দুই পা ফুলে যেত। সাহাবীগণ আরয করলেন, "আপনার পূর্বের ও পরের সব পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আপনি কেন এত কষ্ট করেন? নবীজী তখন জবাব দেন, "আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?"[১৯]অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে

এত বড় ঘোষণার কারণে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা একজন বান্দার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে পড়ে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর সাথে তাঁর সুবিচার। শয়তানের একটি চ্যালেঞ্জ ছিল,

> অবশ্যই আমি তাদের নিকট উপস্থিত হব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। তিনি (আল্লাহ) বললেন, ধিকৃত আর বিতাড়িত হয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যা, তাদের মধ্যে যারা তোকে মান্য করবে তোদের সবাইকে দিয়ে আমি অবশ্যই জাহান্নাম ভর্তি করব।[২০]

এখানে লক্ষ করা যাচ্ছে, শয়তানের কাজ মানুষকে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করা। কিন্তু আল্লাহ জানিয়ে দেন যারা অকৃতজ্ঞ হবে তাদের সবাইকে তিনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তিনি একথা বলেননি যে, পৃথিবীতে তাদেরকে সম্মান, সম্পদ কর্তৃত্ব দেবেন না, বরং পরকালীন বিচারের কথাটিই জানিয়ে দেন। কুরআনে কৃতজ্ঞতার বিপরীত শব্দ হিসেবে *কুফর* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। এ শব্দটি আরবী ভাষায় ইসলাম-পূর্ব যুগেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম একে বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছে, যার অর্থ আল্লাহর নিয়ামতের সাথে অকৃতজ্ঞ আচরণ। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যদি আমার কৃতজ্ঞতা আদায় কর, তাহলে অবশ্যই তোমাদের আমি নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেব আর যদি অস্বীকার বা কুফরি কর তাহলে জেনে রাখবে, আমার শাস্তি বড় ভয়াবহ"।[২১]

আমাদের কেন সার্বক্ষণিক আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত- তার মূল কারণ তিনি আমাদের সার্বক্ষণিক লালনপালন করে যাচ্ছেন, তিনি *রব্বুল আলামীন*। ইসলামী মূল্যবোধসমূহের মধ্যে কৃতজ্ঞতার এই গুণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবেও স্বীকৃত। বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন আবুল হাশিম।[২২]তাঁর মতে, আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজাহানের লালনপালন করছেন এবং সমগ্র বিশ্বজগৎ তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় নিবেদিত। একমাত্র মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা থাকায় একটি অংশ কৃতজ্ঞ আচরণ করছে আর অন্য অংশ তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করছে না। আল্লাহ কোনো ধরনের প্রত্যাশা বা ব্যক্তিগত সুবিধা পাওয়ার জন্য মানুষের কল্যাণ করছেন, তা নয়। বরং তিনি মানুষের কৃতজ্ঞতারও মুখাপেক্ষী নন। আমরা যদি তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করি তা আমাদের কল্যাণের জন্যই কাজে লাগবে। তিনি তাঁর অকৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে এবং যে তাঁকে অস্বীকার করে তাকেও কল্যাণ ও সফলতা দান করে যাচ্ছেন। মানুষকে তিনি জীবন ধারণের যাবতীয় সামগ্রী বিনা শর্তে দান করেন। আলো বাতাস আগুন পানি মাটি ইত্যাদি তিনি সব মানুষের জন্য কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই দিয়েছেন। কারো ক্ষেত্রে এ সব সামগ্রী ভোগে তিনি কোনো বৈষম্য রাখেননি। যে অগ্নি উপাসক তাকেও দিচ্ছেন, যে আল্লাহর উপাসনা করে তাকেও সমানভাবে দিচ্ছেন। আল্লাহর এসব দানের মতই আরেকটি উপহার তিনি সমগ্র মানুষকে বিনা শর্তে দিয়েছেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহর প্রত্যাদেশ বা আল-কুরআন। এটি মানুষের জন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। কোন পথে চললে মানুষ পার্থিব ও পরকালীন সফলতা পাবে কুরআন থেকে মানুষ সহজেই তা জানতে পারছে। আল্লাহর এসব দানের কারণে তিনি *আর-রহমান* বা পরম দয়ালু। তাঁর আরেকটি নাম *আর-রহীম*। এই নামের অর্থও দয়ালু। কিন্তু এখানে তাঁর দয়া কিছুটা

সীমিত; এর কারণ, পরকালে তিনি দুনিয়ার মত অকৃতজ্ঞ বান্দাদের আর কোনো সুযোগ সুবিধা দেবেন না। তিনি অকৃতজ্ঞদের বিচার করবেন সবচেয়ে সুবিচারের ভিত্তিতে; আর সৎ লোকদেরকে রেহাই দেবেন তাই নয়, বরং তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দেবেন।

সুতরাং মানুষের আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ের মাধ্যমে নিজের কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না। এই নৈতিক গুণ থেকেই তার ভেতর মানবীয় কৃতজ্ঞতাবোধেরও জন্ম হয়। মহানবী (স.) আল্লাহর সাথে কৃতজ্ঞতা আদায়ের সাথে সাথে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায়েরও নির্দেশ দেন। এটি মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। উপকার গ্রহণের পর কৃতজ্ঞতাবোধের অনুভূতি সমাজকে শান্তিময় ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ করে তোলে।

খ. শিরক না করা

আল্লাহর সাথে অবিচারের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা বা শিরক করা। এর মানে হচ্ছে আল্লাহর প্রকৃতির উপর অন্যায় বা মিথ্যা কিছু আরোপ করা। আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে তাঁর আদেশসমূহ মেনে চলা যেমন তাঁর প্রতি সুবিচার তেমনি তাঁর সত্তার প্রতি মিথ্যা ধারণা ও মিথ্যা কর্ম থেকে বেঁচে থাকাও তাঁর প্রতি সুবিচারের অংশ। কোনো মানুষ অন্য মানুষের অধিকার নষ্ট না করে শিরক ব্যতীত যত পাপ করবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সেগুলো ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু শিরককে কখনো ক্ষমা করবেন না।

কুরআন মানুষকে শিরক-মুক্ত সরল পথ দেখাতে চায়। এই পথ অবলম্বনে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। একেবারে স্পষ্ট লেখা, যে পড়বে সেই তার গন্তব্য খুঁজে পাবে। যে তাকে ভুল পথে নিয়ে যেতে চাইবে, সে যতই বাহ্যিক বেশধারী ধার্মিক হোক না কেন, কুরআন তাকে প্রত্যাখ্যান করতে বলবে। অর্থাৎ এক আল্লাহর পথ দ্বিধাহীন, নিঃশঙ্ক, সরল ও সত্য পথ। আল্লাহর পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে গিয়ে তাঁর মালিকানাধীন জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। " তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তাঁকেই তুমি কার্য সম্পাদনকারীরূপে গ্রহণ কর"।[২৩] অর্থাৎ অন্য কোনো মাধ্যম ছাড়া একমাত্র তাঁকে অভিভাবক বা উকীল হিসেবে গ্রহণ করলেই তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয়।

শিরক থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে মানুষের নৈতিক জীবনে যে শক্তি আসে সেটি অর্জনই মূলত এখানে লক্ষ্য। একাধিক সত্তার পরিবর্তে একমাত্র সত্তার সামনে দাঁড়ালে মনের ভেতর সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড আশাবাদ। দুঃখ-দুর্দশা বা জীবনের কঠিনতম মুহূর্তে মানুষ তার সবচেয়ে আপন কাউকে অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীকে নিকটে পেয়ে সব কষ্ট ভুলে যেতে পারে। তখন সে তাঁর আশ্বাস বাণীতে নিশ্চিন্ত হতে পারে, তাঁর সন্তোষ অর্জনকে নিজের লক্ষ্য স্থির করে এক পথে দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়। একাধিক মা'বুদকে সমানভাবে কখনো সন্তুষ্ট করা যায় না এবং সেটি সম্ভবও নয়। এজন্য এটিই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ। মানুষ এর মাধ্যমেই নিজের নৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

৩. ২. মানুষের সাথে সুবিচার

মানুষের সাথে সুবিচারের অর্থ হচ্ছে মানুষকে তার প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করে দেওয়া। সাধারণভাবে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সে অধিকারগুলোর বাস্তবায়নই হচ্ছে মানুষের সাথে সুবিচার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর বিশ্বব্যাপী শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠিত হয় এবং ১৯৪৮ সালে প্যারিসে এর তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদিত হয়। ইসলাম পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে যে মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েছে তারই প্রতিফলন এখানে রয়েছে। বরং তার চেয়েও আরো ব্যাপক ধারণা রয়েছে ইসলামী মানবাধিকারে। মানবাধিকারের প্রতি সম্মান রেখে মানুষের জন্য ন্যায় ভিত্তিক আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের প্রতি সুবিচার করা হয়। এক্ষেত্রে ইসলামী সুবিচারের যে ধরন রয়েছে তার একটি প্রচেষ্টা এখানে বিশ্লেষণ করা হবে। মানুষের সাথে সুবিচারের ক্ষেত্রে ইসলাম সর্বপ্রথম নিজ ব্যক্তিসত্তার প্রতি সুবিচার থেকে শুরু করতে চায়। এরপর তার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র আইন অর্থব্যবস্থাসহ সব ক্ষেত্রে সুবিচারের নির্দেশনা দেয়।

৩.২.১. নিজের প্রতি সুবিচার

মানুষকে আল্লাহ যে সুন্দর দেহ ও মন দিয়েছেন প্রথমত সেগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। নিজের দেহের কোনো যন্ত্রকে অকারণে নষ্ট করা বা নষ্ট হতে দেওয়াকে কুরআন নিষেধ করেছে। "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না"; (৪: ২৯) "তোমাদের হাতগুলোকে ধ্বংস করো না;"(২: ১৯৫)। নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনে দেহ ও মনের মারাত্মক ক্ষতি হয় বিধায় এগুলোকে কুরআন নিষিদ্ধ করেছে; (৫: ৯০)। খাবার খাওয়ার ব্যাপারে শর্ত দিয়েছে হালাল ও পবিত্র হওয়া যেন এগুলো দৈহিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ না হয়। অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেওয়ার আদেশ কেবল সুন্নাত নয় বরং এটা আবশ্যকীয়, এই অর্থে যে, অসুস্থ থাকলে অন্যের উপর কষ্ট বাড়ে এবং নামায, রোযা ও স্বাভাবিক ইবাদতকর্ম বাধাগ্রস্ত হয়। নিজের ওজন ঠিক রেখে, নিয়মিত খাদ্যবিধি মেনে চলে, সময় মত ও প্রয়োজন মত ঘুম ও বিশ্রাম নিয়ে এবং শরীর চর্চার মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করে নিজের প্রতি সুবিচার করতে হয়। কেবল কুরআন ও হাদীসের অনুসরণেই মানব দেহের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ সম্ভব। এর দৃষ্টান্ত মহানবী (স.) এর যুগ। মহানবী (স.) আমাদের শিখিয়েছেন খাবার খাওয়ার পদ্ধতি, খাবার সংরক্ষণের পদ্ধতি, নিজের পরিধেয় কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখার নিয়ম, পায়খানা-প্রস্রাবের নিয়ম ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন। এগুলো সবই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য। এর কারণ আমাদের দেহের মালিক আমরা নিজেরা নই, এগুলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও আমানত। আল্লাহ বিচার দিবসে হাত-পা-চোখ-চামড়াকে কথা বলার শক্তি দেবেন; যেই উদ্দেশ্যে এগুলো মানুষকে দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে কি না। কুরআনে এসেছে,

> শেষ পর্যন্ত যখন তারা জাহান্নামের নিকটে পৌঁছবে, তখন তারা যা করত সে সম্পর্কে তাদের কান, তাদের চোখ আর তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আর তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে,

'কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে'? তারা বলবে, 'আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন; তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমরা কিছুই গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখসমূহ ও চামড়াসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না, বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তার অনেক কিছুই জানেন না'।[২৪]

এখানে মানুষের নৈতিক জবাবদিহিতার কথা প্রকাশ পেলেও মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গকে মানুষের অপকর্মের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দেহের আরাম ও শান্তির জন্য অপরাধীরা এসব অপকর্ম করলেও আসলে তারা দেহের ক্ষতি সাধনই করেছে। সুতরাং মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গের সাথে সুবিচার করতে হবে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে। আমরা এগুলোর মাধ্যমে উপকার গ্রহণ করি, তাই এগুলোর অপব্যবহার করা হলে এগুলোর ক্ষতি করা হয়।

মদ্যপান ইসলামে নিষিদ্ধ। এর কারণ: **প্রথমত**, এটি সেবনকারীর দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি করে, দ্বিতীয়ত, এর ফলে অন্যের অধিকার নষ্ট হয় এবং সর্বশেষ কেউ নেশাগ্রস্ত হয়ে গেলে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই ক্ষতির বিরাট প্রভাব পড়ে; চিকিৎসা ব্যবস্থায় অহেতুক চাপ পড়ে। এখানে প্রথমটি নিজের ক্ষতি সাধন, যা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। ধূমপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন বা যে কোনো খারাপ জিনিস যা দেহ ও মনকে ক্ষতি করবে-কুরআন তার কোনোটিকেই সমর্থন করে না। ইসলাম সামান্য পরিমাণ মদপানকেও নিষেধ করেছে এমনকি মদের বোতলে কোনো কিছু রাখাকেও হাদীসে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের মাধ্যমে যুবসমাজের চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়। হত্যা, ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়। কারণ, মদ্যপ অবস্থায় এসব কাজ করা তার জন্য সহজ হয়ে পড়ে। কুরআন মাদক গ্রহণের সামাজিক ক্ষতি হিসেবে উল্লেখ করেছে, 'পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি' (৪: ৯১)। অর্থাৎ মাদক সামাজিক কলহ-বিবাদ-হানাহানির জন্য দায়ী; সামাজিক সংহতির পরিবর্তে ঘরে ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করে।

একই সাথে, প্রতিটি মানুষ যেহেতু জীবজগতের সদস্য তাই জৈবিক কাজ সমূহকে বাদ না দিয়ে বরং সেগুলোকে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। খাবার পানীয়ের মত যৌনবিধির অনুসরণ করে নিজেকে সুস্থ রাখাটাও তার দায়িত্ব। বিবাহ ও পরিবার ছাড়া বৈরাগ্য জীবন ইসলামে নিষিদ্ধ। নিজেকে সৎ রাখার জন্য যৌনশক্তিকে নষ্ট করা বা ক্রমাগত রোযা রাখা মহানবী (স.) নিষেধ করে দিয়েছেন। অত্যধিক ইবাদত না করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। মহানবী বলেছেন, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার হক আছে, তোমার চোখের, তোমার দেহের, বিভিন্ন অঙ্গের প্রতি তোমার দায়িত্ব আছে।[২৫] নিজের পরিবার গঠন করার মাধ্যমে স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি জৈবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালন কুরআনের নির্দেশ।

নিজের প্রতি সুবিচারের আরেকটি অর্থ হচ্ছে নিজেকে গড়ে তোলার দায়িত্বপালন। একটি মানবশিশু কমপক্ষে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত মা-বাবার কাছ থেকে ভালোবাসা স্নেহ ও বাল্য শিক্ষা পাওয়ার অধিকার

ভোগ করে। এ সময় সন্তানের প্রতি তাদের সুবিচার মানেই হলো সন্তানকে সঠিকভাবে দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর প্রত্যেকের নিজ দায়িত্ব ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসময় সে পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পরিকল্পনা করতে ও সেই অনুযায়ী কাজ করতে শিখবে। তাকে অনুপ্রাণিত করা ও লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হতে সহায়তা করা শিক্ষকের দায়িত্ব হলেও যেহেতু তাকেই সভ্য ও সুশিক্ষিত আদর্শ মানুষ হতে হবে তাই তার জীবন গঠনের দায়িত্ব তাকেই নিতে হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মহামানবই শৈশবে বাবা অথবা মাকে হারিয়ে কঠিন জীবন সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন। নিজেকে এভাবে বড় করা মানেই হলো নিজের প্রতি সুবিচার। একজন ছাত্র যদি অলসতা করে দিন কাটায়, শিক্ষক, বাবা-মা এবং বড়দের উপদেশের প্রতি মনোযোগী না হয়ে নিজের খেয়াল খুশি মত চলে, সময়ের অপচয় করে তাহলে নিঃসন্দেহে এটি নিজের প্রতি অবিচার। নিজের প্রতি সুবিচারের অর্থই হচ্ছে নিজের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো, নিজের পাঠ্যপুস্তক সময় মত অধ্যয়ন করা, ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলতে অভ্যস্ত হওয়া, ভালো বন্ধুর সাহচর্য নিয়ে নিজেকে ধীরে ধীরে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা।

কুরআন মানুষের ব্যক্তিগত অবহেলাকে নিজের প্রতি যুলম বা অবিচার হিসেবে উল্লেখ করেছে যেন মানুষ এই যুলম পরিত্যাগ করে নিজের প্রতি সুবিচারের পথ বেছে নেয়। নিজ কর্মের কারণে অধঃপতনের শিকার মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ ডেকে বলবেন,

> তোমরা অবস্থান করছিলে সেসব লোকদের বাড়ি ঘরে, যারা নিজদের উপর যুলম করত এবং তোমাদের নিকট এটি সুস্পষ্ট যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ করেছি এবং আমি তোমাদের জন্য অসংখ্য উপমা বর্ণনা করেছি"।[২৬]

এখানে, বসত বাড়ির একটি অর্থ হতে পারে তাদের পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া ভ্রান্ত মতাদর্শ। এই মতাদর্শের উপরই তাদের জীবন গড়ে উঠেছিল, যা এখন তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যস্থানে এসব বসত বাড়িকে মাকড়সার জালের মত ঠুনকো আখ্যা দেওয়া হয়েছে (২৯: ৪১)। অর্থাৎ মানুষের সামনে সত্য বিষয় উপস্থাপনের পরও যখন সে মিথ্যাকে, ব্যর্থতার পথকে, ক্ষণিক তৃপ্তির লোভে তুচ্ছ জিনিসকে গ্রহণ করে তখন সে নিজের প্রতিই চরম অবিচার করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে নিজের প্রতি সুবিচার থেকেই অন্যের প্রতি সুবিচারের দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়। যে নিজের সম্মান, অভাব ও প্রয়োজন বোঝে না সে কখনো অন্যের সম্মান, অভাব ও প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে না। এজন্য ইসলামী নীতিদর্শন সুবিচার প্রসঙ্গে সবার আগে নিজের প্রতি সুবিচারের কথা বলে।

৩.২.২. শিশুর প্রতি সুবিচার

আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সুবিচার মানেই হচ্ছে প্রাপ্য বা অধিকার আদায় করে দেওয়া। জন্মের পর একটা শিশু কখনো নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। বাবা-মা তাকে প্রথম স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তার প্রতি দায়িত্বপালন করতে শুরু করেন। শিশুর প্রতি সুবিচারের অর্থ হলো তার প্রাপ্য অধিকারসমূহ

তাকে সঠিকভাবে প্রদান করা। শিশুদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির জন্য বর্তমানে ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়, অথচ ইসলামে বহু আগেই সেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তবে এর নিশ্চয়তা দেবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। এগুলোর সাথে যখন ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে তখন একজন শিশু সত্যিকার মানবিকতা ও ইসলামী চেতনায় বেড়ে উঠতে সক্ষম হবে। মানুষের নৈতিকতার জন্য শৈশব থেকে যে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয় তা ইসলাম শিখিয়েছে।

(ক) সৎ সন্তানের জন্য কামনা: বাবা-মা পরিচিতি পাওয়ার আগেই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে নেক সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করতে শিখিয়েছে: "হে আমার রব, আমাকে উত্তম সন্তান দান করো"(৩৭: ১০০); "হে আমার রব, আমাকে একাকী (সন্তানহীন) রেখো না, তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী"(২১: ৮৯)। তবে সব শিশুই পৃথিবীতে নিষ্পাপ হয়ে আসে, কিন্তু পরিবেশই তাকে পরবর্তীতে মন্দের পথে নিয়ে যায়। এজন্য বাবা-মাকে আদর্শ বাবা-মা হওয়ার চেষ্টা সন্তান গর্ভে আসার আগে থেকেই করতে হয় যেন উত্তম বাবা-মায়ের মাধ্যমে উত্তম শিশুর জন্ম হতে পারে। দার্শনিক প্লেটোর ইচ্ছা ছিল, যদি কেবল ভালো লোকেরা সন্তান উৎপাদন করত তাহলে দেশে সুনাগরিক জন্ম হতো। প্রকৃতপক্ষে এটি চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। তাঁর এই ধারণাকে কেউ সমর্থন না করলেও সুসন্তানের জন্য আদর্শ ও দায়িত্বসচেতন বাবা-মা'র ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(খ) বেঁচে থাকার অধিকার: ভ্রুণ অবস্থা থেকে ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত এবং এর পরের সময়টুকুতে কোনো বাবা-মায়ের এমন অধিকার নেই যে সন্তানকে ধ্বংস করবে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে কন্যা সন্তানের ভ্রুণ নষ্ট করার দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যা ইসলাম পূর্ব যুগের জাহিলী সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবৈধ সম্পর্কের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান হত্যা করে বা পরিত্যাক্ত অবস্থায় রাস্তায় বা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া চরম অমানবিক। এধরনের কাজ শিশুদের প্রতি অবিচার। "যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে"।[২৭] কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন দৃষ্টান্তে এটিকে মহাপাপ (১৭: ৩১) এবং এর জন্য অবশ্যই জবাবদিহিতার (৮১: ৮-৯) মুখোমুখি হতে হবে বলে সাবধান করা হয়েছে।

(গ) নবজাতকের অধিকার: সন্তান পৃথিবীতে আসার পর সন্তানের কানে আযান ও ইকামত দিতে হয়, যার উদ্দেশ্য তাকে তাওহীদের বাণী শোনানো এবং কল্যাণের পথে আসার আহ্বান, যদিও এগুলোর কোনো উপলব্ধি নবজাতকের ভেতর থাকে না, কিন্তু এর তাৎপর্য ও মনস্তাত্ত্বিক দিক গভীর। জন লক নবজাতকের মস্তিষ্ককে সাদা কাগজের সাথে তুলনা করেন, যা মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে কালো অক্ষরে অঙ্কিত হয়। নবজাতকের পক্ষে কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ থাকে। ঐসময় তার দুই কানে সালাত ও কল্যাণের বাণী শোনানো হলে এগুলো হয় তার প্রথম অভিজ্ঞতা। এরপর শিশুকে তাহনীক বা মিষ্টি মুখ করাতে হয়। চর্বিত খেজুরের কিছু অংশ নবজাতকের মুখে লাগানো হলে এটিও তার ভবিষ্যৎ চরিত্রে প্রভাব ফেলে। মহানবীর যুগে সাহাবীদের সন্তান হলে নবীজী তাহনীক করে তাদের জন্য দোআ করতেন। শিশুকে মায়ের প্রথম দুধ পান করানোর কথাও হাদীসে এসেছে। জন্মের পর সপ্তম দিন আকীকা ও নামকরণ শিশুর অধিকার। তার

জন্য আকীকার অনুষ্ঠান করে আল্লাহর কাছে সুস্থতা, উত্তম জীবন এবং স্বচ্চরিত্রের জন্য দোআ করতে হয়। সুন্দর ও অর্থবহ নাম তার চরিত্রে প্রভাব ফেলে। একজন লোকের নাম ছিল হাযন বা দুশ্চিন্তা। মহানবী (স.) তাকে এ নাম পরিবর্তন করতে বললেও সে তা আমলে নেয়নি। পরে দেখা যায় তার নিজের এবং পরিবারের লোকেরা অধিকাংশ সময় হতাশা ও দুশ্চিন্তায় কাটাত।[২৮] সুতরাং সুন্দর নামকরণ সন্তানের প্রতি মা-বাবার সুবিচারের অংশ।

(ঘ) পারিবারিক পরিবেশে শিক্ষা: শিশু বেড়ে ওঠার সাথে মা-বাবার করণীয় হচ্ছে তাদেরকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়া। মহানবী (স.) বলেছেন, "কোনো পিতা তার সন্তানকে শিষ্টাচারের চেয়ে অধিকতর উত্তম কিছু দান করে না।[২৯]শিশুরা অনুকরণ-প্রিয়, অনুসরণ করেই তারা শেখে। তারা মা-বাবা এবং পরিবারের সদস্যদের আচরণ ও কাজ কর্ম দেখে সেগুলো অনুসরণের চেষ্টা করে। সুতরাং প্রত্যেকের পারিবারিক পরিবেশ হওয়া উচিত শিশুর বিকাশের জন্য সহায়ক। যে পরিবারে ঝগড়া-কলহ লেগে থাকে সেখান থেকে সন্তান হতাশা নিয়ে বড় হয় যা বিভিন্ন অপরাধের দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

৩.২.৩. পিতা-মাতা, আত্মীয় ও অন্যদের প্রতি সুবিচার

কুরআনের প্রধান নৈতিক আদেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় আদেশ মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ। আল্লাহর প্রতি দায়িত্বপালন বা তাঁর ইবাদতের পরই তাঁদের সাথে সদয় আচরণ করতে বলা হয়েছে। এর কারণও ব্যাখ্যা করেছে- যেহেতু মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে সন্তানকে গর্ভধারণ করেন, তারপর দুই বছর দুগ্ধ পান করান এবং লালনপালন করে বড় করেন।[৩০] বিশেষ করে বার্ধক্যে যখন তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়েন তখন তাঁদেরকে ছেড়ে না যাওয়া এবং তাঁদের জন্য ব্যয় করা সন্তানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। মা-বাবার জন্য অর্থ ব্যয়, উপহার প্রদান, অসুস্থতার সময় সেবা এতই মর্যাদাপূর্ণ ও উত্তম কাজ যার প্রতিফল প্রকৃতি সাথে সাথে প্রদান করে। এবং একই সাথে তাঁদের সাথে অন্যায় আচরণের ফল পেতেও দেরি হয় না। মহানবী (স.) এর বাণীসমূহে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ও কঠোর আদেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারাই তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।[৩১] অর্থাৎ তাঁদের সাথে উত্তম আচরণ করে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে আল্লাহ সন্তানকে জান্নাত দেবেন আর তাঁদের কষ্ট দিলে জাহান্নাম দেবেন।

প্রায়োগিক দর্শনে পিতা-মাতার অধিকার নিয়ে যে আলোচনা করা হয় তার সাথে ইসলামী নীতিদর্শনের মিল রয়েছে। পিতা-মাতাকে যেমন সন্তানের চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে হয় তেমনি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানেরই সবচেয়ে প্রধান দায়িত্ব পালন করতে হয়। কুরআন সাধারণত এক্ষেত্রে 'ইহসান' শব্দটির প্রয়োগ করেছে। ইহসান বলতে বোঝানো হয় প্রাপ্যের চেয়ে বেশি প্রদান করা। অর্থাৎ তাঁদের প্রতি ইহসান করার অর্থ হচ্ছে তাঁদের প্রাপ্য বা অধিকারসমূহের বাইরেও সর্বোত্তম কিছু প্রদান করা। পিতা-মাতার অধিকার আইনের সাথেও জড়িত। পিতা-মাতা যদি উপার্জনে সক্ষম না হন এবং বার্ধক্য, অসুস্থতা বা অন্য কারণে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েন তাহলে তাঁদেরকে দেখাশোনা ও পরিচর্যা কে করবে? এই

দায়িত্ব নিঃসন্দেহে সন্তানের। এক্ষেত্রে সন্তান যদি দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তা হবে তাঁদের প্রতি চরম অবিচার, অমানবিক ও নিষ্ঠুরতা। আইনগতভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পিতা-মাতার অধিকার আদায়ে সন্তানকে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছাড়া সেটির কোনো মূল্য নেই, এমনকি আইনের মাধ্যমে বাবা-মা'র ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করলে সেটি আরেক ধরনের অসম্মানজনক আচরণ হয়। কিন্তু আইন এক্ষেত্রে সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। মা-বাবার সাথে সদাচরণ ও দায়িত্ব পালন সন্তানের জীবনের প্রথম দায়িত্ব এবং বাবা-মা'র মৃত্যু পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়। শুধু তাই নয় তাঁদের মৃত্যুর পরও দায়িত্ব শেষ হয় না, তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করতে হয় এবং তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হয়।

পৃথিবীর মহামানবদের বড় হওয়ার পেছনে তাঁদের মায়েদের ভূমিকার কথা তাঁরা অকপটে স্বীকার করেন। আবদুল কাদের জিলানী শৈশবে সত্যবাদিতার প্রশিক্ষণ মায়ের কাছেই পেয়েছেন, মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্বার্থে তিনি যখন ডাকাতদের কাছে সব বলে দেন, তখন তারা সবাই অবাক হয়ে গেল এবং খারাপ পথ ছেড়ে ভালো পথ ধরল। এর মানে যারা মা-বাবাকে সম্মান করে, তাদের আদেশ নিষেধ মেনে চলে, তারা সমাজের কাছেও মর্যাদাপূর্ণ আসন অর্জন করেন।

মা-বাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন একটা ছোট শিশুর প্রকৃতিগত দায়িত্ব। এজন্য শিশুরা তাদের বাবা-মা'র কষ্ট দেখলে কাঁদে এবং কেউ তাদেরকে কষ্ট দিতে চাইলে তারা যেভাবেই হোক সেটি প্রতিহত করতে চায়। একইভাবে ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নান-নানি অর্থাৎ বড়দের প্রতি ছোটদের দায়িত্বের চেতনা পরিবার থেকেই সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য সমাজ মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে স্বীকৃতি দেয়। বরং এটি এমন এক বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক বোধ যা সব মানুষের মধ্য বিদ্যমান থাকে। মা-বাবা অসুস্থ বা তাঁদের দেখা-শোনার কেউ না থাকলে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধানেও ছাড় দেওয়া হয়েছে। হজ্জ করতে নিষেধ করা হয়েছে, বৃদ্ধ বাবা-মাকে একা রেখে। তাঁদের অনুমতি ছাড়া জিহাদে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং তাঁদের প্রতি আনুগত্যের, ভালোবাসার, সম্মানের ব্যত্যয় ঘটানো কোনো সন্তানের জন্য কাম্য হতে পারে না। মা-বাবার সাথে সুবিচার ও ইহসানের এই স্বীকৃতি ইসলামের সর্বজনীন মানবতাবাদেরও প্রমাণ।

মা-বাবার পর আত্মীয় স্বজনরা উত্তম আচরণ ও সুবিচারের বেশি হকদার। "যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন" (৪৭: ২২-২৪)। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে মহানবী (স.) জাহান্নামী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কুরআন তাদের প্রতি সুবিচারকে মানুষের জন্য আবশ্যকীয় করে দিয়েছে। বিশেষত রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তার ব্যাপারে বলা হয়েছে, তাদের অভাব ও প্রয়োজনে উপস্থিত থাকতে। মহানবী (স.) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে বংশ সম্পর্কে জানতে বলেছেন। "তোমরা নিজ বংশ সম্পর্কে এতটুকু জানবে যাতে তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে পার"।[৩২] "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দীর্ঘ হায়াত ও প্রশস্ত জীবিকা চাও তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো।"[৩৩] মহানবীকে জিজ্ঞেস করা হয় সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, "আত্মীয়তার

সম্পর্ক বজায় রাখো তার সঙ্গে যে তোমার সঙ্গে সেই সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান করো এবং যে তোমার উপর যুলম করেছে তাকে ক্ষমা করো।[৩৪] মহানবী (স.) আরো বলেন,

> দুটি গুনাহ ছাড়া এমন কোনো গুনাহ নেই যে গুনাহগারের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই দেবেন এবং তা দেওয়া উচিত; উপরন্তু তার জন্য আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। গুনাহ দুটি হচ্ছে: অত্যাচার করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।[৩৫]

আত্মীয়তার সম্পর্ককে ইসলামের এত গুরুত্ব দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, মানুষের বংশ রক্ষা ও পারস্পরিক ভালোবাসার ভিত্তি গড়ে তোলা। মানুষের মধ্যে যত প্রকার বন্ধন সৃষ্টি হয় সেগুলো ক্ষণস্থায়ী হতে পারে বা দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে; কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে স্থায়ী সম্পর্ক। মানবকল্যাণের কাজের সূচনা আত্মীয়দের মাধ্যমেই করতে হয়। আবার এর অর্থ এই নয় যে, স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অন্যদের উপর যুলম করা। যখন কেউ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকে বা সামষ্টিক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়, তখন আচরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সমতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রযোজ্য হবে। চাকুরিতে কারো নিয়োগ বা পদোন্নতি কোনোভাবেই আত্মীয়তার উপর নির্ভর করবে না। যদি কারো কোনো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান থাকে সেখানে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা বেশি যোগ্য তাদেরকে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে আত্মীয় ও প্রতিবেশীর প্রতি সুবিচার করা যেতে পারে।

প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্বপালনের ব্যাপারে কুরআনের আদেশ: কাছের প্রতিবেশী, দূরের প্রতিবেশী সবার হক আদায় করতে হবে; (৪: ৩৬)। মহানবী (স.) বলেছেন, "জিব্রাইল আমাকে প্রতিবেশীর খোঁজ রাখার ব্যাপারে এতবেশি তাকিদ করতেন যে, আমার মনে হত আল্লাহ প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী করে দেন কি না"।[৩৬] যে নিজে পেটপুরে খায় আর প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে মহানবী (স.) তাকে ঈমানদার বলতে চাননি। প্রতিবেশীর ব্যাপারে তিনি আরো বলেন,

> আল্লাহর শপথ, সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ, সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ, সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (স.), কে সেই ব্যক্তি? তিনি বলেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।[৩৭]

তাঁর সামনে এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো:

> অমুক মহিলা অধিক সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং দান-সদকা করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে; তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। আবার বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (স.), অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সিয়াম পালন করে, দান সদকাও কম করে এবং সালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী'।[৩৮]

সুতরাং প্রতিবেশীর ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের এই বাণীসমূহ প্রমাণ করে, ইসলাম শুধু তাদের সাথে সুবিচারপূর্ণ সম্পর্ক চায় না, বরং এমন এক নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যা বিশ্বমানবতাবাদের সহায়ক।

মেহমানদের প্রতি সুবিচার করতেও ইসলাম নির্দেশ দেয়। এটি এমন একটি মানবিক বিষয় যা ইসলামী নৈতিকতায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পরস্পরের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একজন মুসলিম অন্যদেরকে দাওয়াত করলে অথবা মানুষ যে কোনো প্রয়োজনে যখন অন্য একজনের কাছে যায় তখন তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করাকে ঈমানের মাপকাঠিতে পরিণত করা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে"।[৩৯] একজন মেহমান হিসেবে মেযবানের কাছ থেকে সম্মানজনক আচরণ পাওয়াটা তার অধিকার। তাকে অসম্মান করা হলে বা আপ্যায়ন করা না হলে তার প্রতি অবিচার করা হয়। তবে মেহমানেরও কর্তব্য আছে: মেযবানের উপর চাপ পড়ে এমন কাজ না করা। কুরআনে এটি এসেছে এভাবে,

> হে মুমিনগণ, নবীর ঘরে (অনুমতি ছাড়া) প্রবেশ করো না। অবশ্য তোমাদেরকে আহার্যের জন্য আসার অনুমতি দেওয়া হলে ভিন্ন কথা। তখন এভাবে আসবে যে, তোমরা তা প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকবে না। যখন তোমাদেরকে দাওয়াত করা হয় তখন যাবে। তারপর যখন তোমাদের খাওয়া হয়ে যাবে তখন আপন-আপন পথ ধরবে; কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। (৩৩: ৫৩)

এখানে মহানবীর ঘরকে একটি আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মেহমানের প্রতি সুবিচার করার সাথে সাথে মেযবানের প্রতিও সুবিচার করাটাকে ইসলাম কতটা গুরুত্ব দিয়েছে এবং ভারসাম্য রক্ষা করেছে এই নির্দেশনা তারই প্রমাণ।

৩.২.৪. অমুসলিমদের প্রতি সুবিচার

কুরআন মানুষকে ঈমান গ্রহণের আদেশ করেছে। কিন্তু কেউ যদি সে আদেশ পালন না করে তাহলে তাকে ঈমান গ্রহণের জন্য বলপ্রয়োগ বা বাধ্য করা যাবে না। আর যে ঈমান আনবে না, তার উপর ইসলামী শরীয়তের বিধি-নিষেধও কার্যকর হবে না। তারা মানুষ হিসেবে সবাই আল্লাহর বান্দা। তাদের সাথে কোনো অন্যায় আচরণ ইসলামে বৈধ নয়। মহানবী (স.) অমুসলিমদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয়, নিজে সেটি করে শিখিয়েছেন। একজন অমুসলিম মুসলিমদের অসম্মান করে খোদ মসজিদে নববীতে এসে নবী ও সাহাবীদের সামনে পেশাব করা শুরু করল। সবাই যখন তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল নবী (স.) তখন সবাইকে নিবৃত্ত করে বললেন, তাকে উত্তমরূপে পেশাব সম্পন্ন করতে দাও। সে লোকটি পেশাব শেষ করার পর নবীজী তাকে বললেন, একটু পানি ঢেলে পরিষ্কার করে যাও। লোকটি তাই করে নিরাপদে চলে গেল। কোনো অমুসলিম একজন মুসলিমের কাছে সাহায্য, আশ্রয় কিংবা নিরাপত্তা চাইলে তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যও কুরআন আদেশ করেছে।[৪০] আর তাদের কাউকে নিরাপত্তা দেওয়ার পর সে কোনোভাবেই মুসলিমদের কাছ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করতে পারবে না। কুরআন এমনকি তাদের দেবদেবীদের গালি দিতেও নিষেধ করেছে।

তাদের মন্দির-প্যাগোডার কিংবা পূজা উপাসনার নিরাপত্তা দেওয়া মহানবী (স.)এর আদেশ। তাদের সম্পদ, সম্মান, অধিকার রক্ষা করা মুসলিমদের কর্তব্য। নিজের মা যদি অমুসলিম হয়ে থাকেন, তাঁর সাথে

সামান্য পরিমাণ অসদাচরণ করা যাবে না (৩১: ১৫)। কুরআন তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে মানতে নিষেধ করেছে মূলত ধর্মীয় কারণে (৩: ২৮)। কিন্তু তাদের সাথে স্বাভাবিক সমাজিক সম্পর্ক রাখতে কোথাও নিষেধ করা হয়নি। বরং প্রতিবেশী হিসেবে একজন অমুসলিম একজন মুসলিমের মতই অধিকার ভোগ করবে। কুরআন তাদের অধিকার দিয়ে বলেছে, "তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তারা উপাসনা করে, তাহলে তারা অজ্ঞতার কারণে ধৃষ্টতাবশত আল্লাহকে গালি দেবে;" (৬: ১০৮)। অর্থাৎ অন্য ধর্মের মানুষের সাথে মানবীয় সদাচরণই শুধু নয়, তাদের ধর্ম ও প্রতিমাদেরকেও কটাক্ষ করে কিছু বলা যাবে না। কুরআনে মানুষের সভ্যতার বিবর্তনকে স্বীকার করা হয়েছে। "আমি মানব সভ্যতায় যুগের আবর্তন ঘটাই"(৩: ১৪০)-এ কথার অর্থই হচ্ছে সব সভ্যতার অবদানকে স্বীকার করা। মুসলিম সভ্যতার পরিবর্তে বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ আবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলাম মুসলিমদেরকে তাদের অনুসরণ করতে বা প্রভাবিত হতে বলে না, বরং পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার যে বিশ্বজনীন মূলনীতি কুরআন দিয়েছে, সেগুলোর পূর্ণ অনুসরণ করতে বলে।

৩.৩. সামাজিক সুবিচার

আমরা শুরুতেই বলেছিলাম, নৈতিক আচরণ প্রধানত সামাজিক আচরণ। অর্থাৎ মানুষ তার চারপাশের অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখবে, কোনো অপরাধে জড়িত হলে তার সমাধান করবে কিংবা অসহায় মানুষ দুবেলা খাবার খেতে না পারলে তার ব্যবস্থা করবে- এটিই হচ্ছে ইসলাম। এটি করতে গেলেই সামাজিক সুবিচারের বিষয়টি আসে। ইসলাম সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতাকে সবার আগে দেখে; ব্যক্তি তার আত্মার ক্রমাগত উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করবে আর সমাজের অন্য মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা প্রধানত তিনটি জিনিসের উপর নির্ভর করে:[৪১] ১. আত্মার অবাধ স্বাধীনতা ও পূর্ণ মুক্তি ২. সামাজিক সাম্য এবং ৩. স্থায়ী ও সুষ্ঠু সামাজিক বণ্টন।

আত্মার স্বাধীনতা মানে হচ্ছে মানুষের মৌলিক চেতনার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বলতে বোঝায়, মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, যা সঠিক, বৈধ ও সর্বজনীন আইনের বিপরীতে যাবে না। কোনো প্রকার পার্থিব, ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী জিনিসের মুখাপেক্ষী না হয়ে কেবল আল্লাহর সামনে নিজেকে সমর্পণ করার নামই ইসলামে স্বাধীনতা। পৃথিবীর কোনো রাজা-মহারাজা ও শক্তিধরের কাছে মাথা নত না করে একমাত্র পরম সত্তার নিকট নত হওয়ার মাধ্যমে ইসলামে আত্মার স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করা হয়। সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এভাবে নিজের শক্তিতে বলীয়ান হতে হয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সামাজিক সাম্য। সমতা অর্থে সুবিচার হচ্ছে, মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা আর সাম্য মানুষকে যথার্থ কাজের পথ দেখায়। কুরআনে যে নৈতিক নির্দেশনা আছে, তাতে মানুষের মাঝ থেকে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে যেখানে থাকবে না খারাপ আচরণ, অহঙ্কার ও অন্যের ক্ষতি। এই অর্থে কুরআন সামাজিক সাম্যকে বলেছে, 'মীযান' বা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার নীতি। মানুষকে কুরআন এক আদমের বংশধর হিসেবে এক দৃষ্টিতে

দেখে। বিভিন্ন বংশ-গোত্র-বর্ণ কেবল পরস্পর পরিচিতির মাধ্যম। "হে মানব গোষ্ঠী, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও"(৪৯: ১৩), "আদম-সন্তানকে আমি সম্মানিত করেছি" (১৭: ৭০) -এখানে সমগ্র মানব জাতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন শুধু মুসলিম জাতির স্বার্থের কথা বলেনি, বরং সমগ্র মানব জাতিকে এক দৃষ্টিতে দেখেছে 'আদম-সন্তান' নামে অভিহিত করার মাধ্যমে। ইসলাম বলে না, যে ঈমান আনবে সে জান্নাত লাভ করবে, বরং বলেছে, যে ঈমানের সাথে সৎ আমল করবে সেই কেবল জান্নাত লাভ করবে। মহানবীর একটি প্রসিদ্ধ বাণী,

> তোমরা সবাই আদমের বংশধর, আর আদম মাটির তৈরি; অনারবের উপর আরবের, কিংবা আরবের উপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর কিংবা কালোর উপর সাদার কোনো প্রাধান্য নেই; মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ হয় কে আল্লাহকে বেশি ভয় করে তার উপর।[৪২]

ইসলামের মূল বাণীই হচ্ছে মানবজাতির গঠনমূলক ও কল্যাণকর সমস্ত চিন্তাকে সম্মান করার মাধ্যমে সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং এভাবে ভাষা-গোত্র-বর্ণ ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। এজন্য প্রাথমিক কাজটি হচ্ছে সমতার দৃষ্টিতে মানব জাতিকে মূল্যায়ন করা।[৪৩]মহানবীর জীবনে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না, যেখানে তিনি নিজের শত্রু বা কোনো অমুসলিমের উপর সামান্যতম অবিচার করেছেন। "যার কথা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ সেই হচ্ছে মুসলিম;"-এর মাধ্যমে তিনি একজন মুসলিমের পরিচয় হিসেবে শর্ত দিয়েছেন, কথা দিয়ে বা আঘাত করে অন্য মুসলিমের উপর অবিচার না করা। এখানে উদ্দেশ্য কেবল মুসলিম নয়; বরং সব মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর সামনে উপস্থিত মুসলিমদের সামনে এটি ব্যক্ত করেছেন বলেই মুসলিম শব্দটির উল্লেখ করছেন।

নারীদেরকে ইসলাম যে মর্যাদা দিয়েছে তাতে কোনো প্রকার বৈষম্য রাখা হয়নি। বরং বিভিন্ন গোত্রীয় প্রথার কারণে ইসলামের এ সংক্রান্ত উন্নত বিধান প্রয়োগে বিভিন্ন সময় বাধার সৃষ্টি হয়েছে। নারীর মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের উক্তিগুলোর প্রতি গভীরভাবে তাকালে সেখানে এমন এক সুবিচার ভিত্তিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে যা তাদের অধিকারকে আরো উচ্চকিত করেছে। সাম্প্রতিক কয়েক দশক আগ থেকে কিংবা বলা যায় বিংশ শতাব্দীতে এসে আমেরিকা ইউরোপে নারীদের ভোটাধিকার, কর্মক্ষেত্রে সমান মজুরি পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কুরআন তাদের সমান উপার্জনের স্বাধীনতা আগেই দিয়ে রেখেছে। "পুরুষ যা উপার্জন করবে তা তার আর নারী যা উপার্জন করবে সেটি তার"। অর্থাৎ নারীর উপার্জন সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। একই শব্দ ও বাক্যে নারী-পুরুষের উপার্জন সম্পর্কে বলার উদ্দেশ্য তাদের আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না, একই কাজে নারী ও পুরুষ একই মজুরির মালিক হবে। তাদের রাজনৈতিক মতামতের গুরুত্ব নবীর যুগ থেকেই স্বীকৃত ছিল।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে সামাজিক বণ্টনে সুবিচার। ইসলাম মানুষের সবার প্রয়োজন পূরণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে সুবিচারের প্রয়োগ ঘটাতে নির্দেশ করে। একথা সত্য, আল্লাহ মানুষের সাথে সুবিচার

ও সাম্যনীতির ভিত্তিতে চলতে বলেছেন। কিন্তু জগতে আমরা অসংখ্য উঁচু-নিচু কিংবা বৈষম্য দেখতে পাই। সৃষ্টিগতভাবে যে পার্থক্য থাকে তার সমাধানে মানুষকে বিভিন্ন কাজ করতে হয়। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক সুবিচার। এটিও ব্যাপক বিষয়। ইসলাম বিভিন্নভাবে সমাজের অসহায় মানুষকে সাহায্য করার পথ দেখিয়েছে। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদে মানুষের অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন চেষ্টা থাকলেও কোনোটিই মানুষের অভাব ও সমস্যা দূর করতে বাস্তবসম্মত ভূমিকা রাখতে পারেনি। উপার্জনের ক্ষেত্রে সমান সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান, বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি না করা, শ্রমিকের সম্মানজনক মজুরির নিশ্চয়তা এবং তাদের প্রাপ্য নিয়ে অযথা বিলম্ব না করে বরং ঘাম শুকোনোর আগেই মজুরি প্রদান- এভাবে ইসলাম সামাজিক সুষ্ঠু বণ্টনের নিশ্চয়তা দেয়। যাকাত ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে ধনীর উপর নির্দিষ্ট অর্থ গরীবদেরকে দেওয়া আবশ্যক করা হয়েছে; আবার সাধারণ দানের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যেন সমাজের কেউ বঞ্চিত না থাকে।

৩.৪. বিচার কার্যক্রমে সুবিচার

সুবিচার বলতে প্রধানত বিচার কার্যক্রমে ন্যায়ভিত্তিক রায় প্রদানকেই নির্দেশ করা হয়। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে বিচার ব্যবস্থা নেই। প্রতিটি দেশের বিচার ব্যবস্থায় সুবিচার বা জাস্টিস প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে সাধারণ মূলনীতি। বিচার ব্যবস্থায় কীভাবে পূর্ণ সুবিচার সম্ভব তা ইসলাম দেখিয়েছে। বিচার কার্যক্রমে সুবিচারের জন্য কমপক্ষে দুটি বিষয় আবশ্যক: ন্যায় ভিত্তিক আইন রচনা ও ন্যায় ভিত্তিক বিচারব্যবস্থা। মহানবী (স.) ছিলেন ন্যায়বিচারের বাস্তব দৃষ্টান্ত, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আইনপ্রণেতা। কুরআন ও হাদীসে যে সব আইন এসেছে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নিজেদের প্রয়োজনে এর বাইরে অনেক আইন তৈরি করতে হয়। কিন্তু আইন তৈরির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সর্বজনীনতা। মহানবী (স.) মদীনা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে সংবিধান বা আইন তৈরি করেছেন তা ছিল এতই ভারসাম্যমূলক ও প্রয়োজনীয় যে, সবাই সেটি সানন্দ চিত্তে মেনে নেয়। তিনি এরপর দশ বছরে রাষ্ট্রের পরিধি, সংহতি, শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন এমনকি তাঁর অনুসারীগণ শুধু একটি অঙ্গুলি হেলনের অপেক্ষায় থাকতেন, কখন নেতা আদেশ করেন। এ অবস্থায় তিনি চাইলে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে অথবা মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যে কোনো আইন রচনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি করেননি। নিজে তিনি বিচারকের আসনে বসে কারো প্রতি সামান্য অবিচার করেননি, বরং চেষ্টা করেছেন ইহসান করার।

ইসলামী নীতিদর্শনে সুবিচারের আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আল্লাহকে ভয় করে, গভীর অনুভূতির মাধ্যমে মানুষের নিজস্ব মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুবিচারকে অনুসরণের বোধ জাগ্রত করা। কাউকে শাস্তি দেওয়া, দণ্ড দেওয়া বিচার বিভাগের কাজ, কিন্তু বিচারের রায় মেনে নেওয়া বড় কঠিন কাজ। এজন্য শুরুতেই মানুষকে অপরাধ স্বীকারের অনুভূতি সৃষ্টি করতে হয়। সে বিশ্বাস করবে, এই পার্থিব শাস্তির মাধ্যমে সে পরকালীন শাস্তি থেকে বেঁচে যেতে পারবে। এজন্য নিজের

অপরাধ স্বীকারকারী ব্যভিচারী নারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর মহানবী নিজেই কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, এই নারী জান্নাত ক্রয় করে ফেলেছে। বিচার কার্যক্রমে সুবিচার প্রতিষ্ঠার আগে যে আইনের ভিত্তিতে বিচার করা হয় সেই আইন বিশ্বজনীন কি না তা যাচাই করতে হয়। যে কোনো সংকীর্ণ আইন দ্বারা বিচার কার্যক্রমে মানুষের মধ্যে সুবিচারের পরিবর্তে যুলম করা হয়।

৩.৪.১. ইসলামী আইনের বিশ্বজনীনতা

ইসলাম যে আইনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই আইনের উপর সামান্য আলোকপাত করা যায়।

ক. উত্তরাধিকার আইন: ইসলামের উত্তরাধিকার আইন নিয়ে পাশ্চাতের সাম্যবাদী ও নারীবাদীদের অনেকে প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু গভীরভাবে তাকালে দেখা যায় পৃথিবীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যত আইন আছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যৌক্তিক ও কল্যাণকর আইন ইসলামী উত্তরাধিকার আইন। এখানে শুরুতেই বলা আছে, মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তার সমস্ত সম্পত্তি বা তার অর্ধাংশ কাউকে দান করে দিতে পারেন না। সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ তিনি জনকল্যাণমূলক কাজে দান করতে পারেন। বাকী দুই তৃতীয়াংশ নিজের উত্তরাধিকারীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে রাখতেই হবে। তবে দান করাটাও তার জন্য অপরিহার্য নয়।

মৃত ব্যক্তির সম্পদের উপর প্রথম কাজ, সম্পদ বণ্টনের আগেই তার সম্পদ থেকে কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা, তারপর ঋণ পরিশোধ এবং অসিয়ত পূরণ। এই তিনটি কাজের পরই বাকী সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন হয়ে থাকে। পুত্র-কন্যার মধ্যে পার্থ্যকের কারণ স্পষ্ট। যখন কন্যা সন্তানগণ বিবাহের মাধ্যমে স্বামীর কাছে যাবে তখন সেখান থেকেও তারা অংশ পায়। কোনো স্ত্রীর পক্ষে উত্তরাধিকার, মোহর বা অন্যভাবে উপার্জিত সামান্য সম্পদও তার স্বামী বা সন্তানদের জন্য ব্যয় করা আবশ্যক নয়। অথচ একজন পুরুষের জন্য পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদ থেকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য ব্যয় করা আবশ্যকীয়। সব মিলে দেখা যায় নারীর অংশ কোনোভাবেই কম থাকে না। বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য থাকলেও সার্বিকভাবে এটা তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সুবিচার। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার সম্পদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এভাবে সমান করতে গেলে প্রকৃতপক্ষে তারাই বঞ্চিত হয়। কারণ স্বামীর সাথে সংসার করার সময় তার সম্পদ তখন মূলত স্বামীই ভোগ করে। অর্থাৎ ভাইদের পরিবর্তে স্বামীর হাতে সম্পদ চলে যায়।

তবে আইনগত বিষয়ের পরিবর্তে আমরা নৈতিক দিকটি বিশ্লেষণ করতে চাই। এই আইনের মাধ্যমে সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখার সুযোগ থাকে না। সন্তান যদি একজন থাকে, কিংবা কোনো সন্তানই না থাকে তাহলে সে সম্পত্তি বিভিন্নজনের মধ্যে বণ্টন হয়ে মূলত সামাজিক সুবিচারের ও সামাজিক নিরাপত্তার সম্ভাবনাই বৃদ্ধি করে। যদি উত্তরাধিকার না থাকে তাহলে সে সম্পদ রাষ্ট্রের অধীনে চলে যাবে। অর্থাৎ ইসলামী উত্তরাধিকার আইন একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ আইন। এই আইনের ভিত্তিতে যখন এ সংক্রান্ত

বিচার কার্যক্রম চলবে সেখানে বাদী ও বিবাদী উভয়ে সুবিচারের কল্যাণ ভোগ করবে। আবদুল হাকীম বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন,

> উত্তরাধিকার আইনে বেশি সংখ্যক ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগের একটা তুলনামূলক সমতা সৃষ্টির মাধ্যমে পুঁজি ছড়িয়ে পড়ার একটা অন্যতম উপায় তৈরি হয়। উত্তরাধিকার ব্যবস্থা দ্বারা সম্পত্তি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার ফলে বৃহৎ জমিদারী প্রথাও গড়ে উঠতে পারে না।[৪৪]

অর্থাৎ তিনি যথার্থভাবেই বিষয়টিকে তুলে ধরতে পেরেছেন যে, ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনের বাস্তবায়ন হলে সমাজে পুঁজিবাদী প্রথাও পেতে পারে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কেউ জীবিত অবস্থায় সন্তানদেরকে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চাইলে কিন্তু পুত্র ও কন্যাদেরকে সমান ভাগ দিতে হবে। এখানে উত্তরাধিকার আইন প্রযোজ্য হবে না। বরং সমান ভাগে ভাগ না করা হলে এটি হবে সন্তানদের প্রতি অবিচার। নু'মান ইবন বশীরের ঘটনাটি বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও এসেছে, তাঁর মা তাঁর বাবার কাছ থেকে তাঁর জন্য একটু বেশি সম্পদ আদায় করে রাসূল (স.)কে সাক্ষী করতে চাইলেন। রাসূল (স.) অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলেন, "আমি যুলমের সাক্ষী হতে পারি না।"[৪৫] এরপর নু'মানের বাড়তি অংশ ফেরত নেওয়া হয়। সুতরাং ইসলামী উত্তরাধিকারী আইন এক বিশ্বজনীন কল্যাণকর ব্যবস্থা।

খ. ইসলামী দণ্ডবিধি: ইসলামী আইনে সর্বোচ্চ দণ্ড হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। আধুনিক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, এগুলো মধ্যযুগীয় বর্বর আইন। অথচ কুরআনে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের ব্যাপারে দণ্ডবিধির বর্ণনা এসেছে। অন্যসব প্রয়োজনীয় আইন আইন-বিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই শর্তে যে, তাতে কুরআন ও হাদীসের বিরোধিতা করা হবে না এবং একইসাথে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ ও পূর্ব থেকে প্রচলিত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহানবী (স.) তাঁর নিজের, পরবর্তী যুগ খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীদের যুগের দৃষ্টান্তকে সামনে রাখতে বলেছেন।

যে কয়টি বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের প্রথম পূর্বশর্ত হচ্ছে আইনের সমান প্রয়োগের নিশ্চয়তা। যদি ক্ষমতাশালীদের কোনো আপনজন একটি অপরাধ করে মুক্তি পেয়ে যায় তাহলে সেই অপরাধে সাধারণ জনগণ বা বিরোধী পক্ষের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না, সেটি যত বড় অপরাধই হোক। দ্বিতীয়ত, দণ্ড প্রয়োগের আগে অবশ্যই বাদী পক্ষের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে সে ক্ষমা করতে প্রস্তুত কি না। কারণ ক্ষমা করে দেওয়াকে ইসলাম অত্যন্ত কল্যাণকর বলে আখ্যায়িত করেছে। যদি সে ক্ষমা করে দেয় তাহলে বিচারক তাকে নিজ বিবেচনায় লঘু শাস্তি দিতে পারেন। তবে বিচারের রায়

চূড়ান্ত ঘোষণার পর ক্ষমা করার আর সুযোগ থাকে না। মহানবী (স.) এর যুগে এমনি একটি চুরির ঘটনায় যখন মহানবী রায় ঘোষণা করলেন, তখন বাদী পক্ষ ক্ষমার ঘোষণা নিয়ে এসেছে। মহানবী তাকে প্রত্যাখ্যান করেন, কেন সে আগে তাকে ক্ষমা করেনি। তৃতীয়ত, কোন পরিস্থিতিতে সে অপরাধ করেছে সেটিকেও বিচারক বিবেচনা করবেন। যদি অভাবের তাড়নায় চুরি করে তাহলে তাকে হাত কাটা থেকে রেহাই দিয়ে অন্য শাস্তি দেওয়া যায়। এভাবে যদি সে ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করে তাহলে সেটির প্রমাণ হলে তাকে দণ্ড দেওয়া যাবে না। চতুর্থত, উপযুক্ত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আবশ্যকীয় যোগ্যতাও ইসলামে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। হযরত উমরের সময় একটি ঘটনায় এক ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি তাকে জেরা করেন:

উমর : তুমি কি তোমার প্রতিবেশীর ভেতর বাহির জান?

সাক্ষী : না।

উমর : সফরে থাকলে চরিত্র সম্পর্কে একটি ধারণা হয়, তার সাথে কি কখনো সফর করেছ?

সাক্ষী : না।

উমর : লেনদেনের মাধ্যমে মানুষের তাকওয়ার প্রকাশ ঘটে। তুমি কি তার সাথে কোনো লেনদেন করেছ?

সাক্ষী : না।

উমর : তুমি কি শুধু তাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ?

সাক্ষী : হ্যাঁ।[৪৬]

উমর তাকে বিদায় করে দেন।

এসব মৌলিক পূর্বশর্তের পর ইসলামী আইনসমূহের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করা যেতে পারে। কুরআনে ইহুদীদেরকে তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকেও এধরনের বিধান দেওয়া হয়েছিল,

> আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা বিচার ফায়সালা করবে না তারাই যালিম। (৫: ৪৫)

এর মানে হচ্ছে হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা, চোখের পরিবর্তে চোখ, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত- এই বিধানটি ছিল তাওরাতের বিধান। একইভাবে হত্যার ক্ষতি সম্পর্কেও বলা হয়েছে, "যে কেউ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে জীবন রক্ষা করল সে যেন সবার জীবন রক্ষা করল;"(৫: ৩২)। আল্লাহ তাওরাতের রেফারেন্স দিয়ে কুরআনেও একই বিধান চালু রেখেছেন। তালমুদে একই ভাষায় কথাটি এসেছে, "যে একটিমাত্র জীবন রক্ষা করল সে সম্পূর্ণ জগতকে রক্ষা করল"। "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন ব্যক্তি হিসেবে যেন সে আমাদের শেখায়, যে একটিমাত্র জীবনকে ধ্বংস করল সে

যেন সমগ্র জগতকে ধ্বংস করল"।[৪৭] অর্থাৎ তাওরাতের বিধানের সাথে কুরআনের বিধানের এখানে পার্থক্য নেই।

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে, বিশেষত মনোবিজ্ঞানে মানুষের অপরাধ সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তাতে মানুষের মধ্যে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ফ্রয়েড সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ করে দেখান, অপরাধী ব্যক্তি যৌন জটিলতার শিকার; আর সমাজ, ধর্ম, নৈতিকতা ও ঐতিহ্য কর্তৃক মানুষের যৌন-প্রবৃত্তি অবদমিত হবার ফলেই এই যৌন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।[৪৮] তবে অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীগণ এটিকে অপরাধের একমাত্র কারণ বলেননি। তাঁরা মনে করেন, যে পরিবেশে সে লালিত পালিত হয়েছে সেই পরিবেশে থেকেই সে অপরাধী হয়, একারণে তার নিজের নয়, বরং পরিবেশই এখানে দায়ী। অন্য দিকে সমাজবাদীগণ মনে করেন, যে সমাজে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য বিদ্যমান সেখানে মানবীয় গুণের বিকাশ সম্ভব নয়। আর সমাজবাদী রাষ্ট্র পবিত্র সংঘ। যারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তাদের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড, কঠোর শাস্তি।[৪৯] ইসলাম এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই সামনে রাখে। অর্থনৈতিক সমস্যা ও পরিবেশের প্রভাব এবং একই সাথে বিকৃত যৌন কামনা থেকে অপরাধের সৃষ্টি হতে পারে। অপরাধ যেভাবেই সংঘটিত হোক তার প্রতিবিধানে একটি সিদ্ধান্তসূচক ও চূড়ান্ত মীমাংসা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে জগতের সব সংঘ, প্রাজ্ঞ, বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী ও আইনজ্ঞের একতা সম্ভব নয়। বরং এসব ক্ষেত্রে যে অনন্ত বিতর্কের সূচনা ঘটে তাতে বিচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া কিছু করার থাকে না। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক বা সার্বভৌম সরকারের পক্ষে জনগণের নিরাপত্তা দেওয়া তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী দায়িত্ব। সেজন্য প্রয়োজনে দ্রুত আইন তৈরি করা কিংবা আইন তৈরি করার আগেই অপরাধীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আইন তৈরি হয়। চোরের শাস্তি কী হওয়া উচিত তাতেও কেউ একমত হতে পারবে না। এজন্যই বিশ্বজাহানের রবের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার মধ্যেই সব যুক্তি ও তর্কের অবসান হতে পারে। তবে কোন পরিস্থিতিতে একটি হত্যার বা একাধিক হত্যার কিংবা গণহত্যার জন্য একজন ব্যক্তির উপর সর্বোচ্চ দণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা যাবে তা যথেষ্ট বিশ্লেষণের বিষয়। এক্ষেত্রে ইসলামের আইন বিশেষজ্ঞগণ যথেষ্ট গবেষণা করে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। কিসাসের ব্যাপারে কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে, "যে ক্ষমা করে সে পাপ মুক্ত হয়ে যায়;"(৫: ৪৫)। কিন্তু পিতৃহত্যার, সন্তান হত্যার, স্ত্রীকে হত্যার খুনিকে কীভাবে ক্ষমা করা যায়? এটিই নৈতিকতার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যদি স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমা করে দেন, তবুও বিচারকের দায়িত্ব শেষ হয় না। হয়ত হত্যার খুনিকে নিহতের উত্তরাধিকারীগণ আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু সমাজের অপরাধপ্রবণতা তাতে কমবে না। এজন্য বিচারক অন্যভাবে তাকে দণ্ড দিতে পারেন। শাস্তি দুই ধরনের: i. হদ্দ ও ii. তা'যিরাত।

i. হদ্দ: এটি হচ্ছে ইসলামী দণ্ডবিধানের সর্বোচ্চ দণ্ড। এটি সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। মাত্র চারটি বিষয়ে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে : ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচারের অপবাদ ও ব্যভিচার। হাদীসের মাধ্যমে, পঞ্চমটি হচ্ছে মদ্যপান। ডাকাতির শাস্তি চার ধরনের (৫: ৩৩): ক) মৃত্যুদণ্ড খ) অথবা শুলীতে

চড়ানো গ) অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেওয়া ঘ.) অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা। চুরির শাস্তি উভয় হাত কেটে দেওয়া (৫: ৩৮)। ব্যভিচারের শাস্তি: একশত বেত্রাঘাত (২৪: ২), বিবাহিত হলে পাথর মেরে হত্যা। ব্যভিচারের অপবাদ: আশি বেত্রাঘাত (২৪: ৪) মদ্যপান: চল্লিশ বেত্রাঘাত।

এই শাস্তিগুলোর প্রথমটিতে চারটি বিকল্প রাখা হয়েছে। এমন নয় যে ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথেই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, বরং বিচারক সার্বিক দিক বিবেচনা করার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া সাক্ষীদের সততার, ন্যায়পরায়ণতার বিষয় তো থাকছেই। দ্বিতীয় বিষয়টি, চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটার বিধান। এখানেও পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচারক রায় দেবেন। সর্বনিম্ন কত পরিমাণ দ্রব্য চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেওয়া যাবে সেটি হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। উমর (রা.) এর কাছে অভিযোগ আসে, হাতিব ইবনে আবি বালতা (রা.) এর কিছু ভৃত্য অন্য গোত্রের এক ব্যক্তির উট চুরি করেছে। আসামীগণ চুরির কথা স্বীকার করলে তিনি হাত কাটার আদেশ দেন। কিন্তু পরক্ষণে তিনি আবার স্থগিত করেন। কারণ তিনি শুনতে পেলেন, ভৃত্যদেরকে অনাহারে কষ্ট দেওয়া হয়। এমন সময় তিনি রায় দিলেন ভৃত্যদের নয় বরং ভৃত্যদের মালিককে, উটের দ্বিগুণ টাকা জরিমানা দিতে হবে। সুতরাং ইসলামী আইনে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ কেমন করে আরোপ করা যেতে পারে? ইতিহাসের সাক্ষী, মহানবীর যুগ থেকে পরবর্তী চারশত বছরে চুরির দায়ে মাত্র ছয়জন লোকের হাত কাটা হয়েছিল।[৫০]

তৃতীয় বিষয়টি, ব্যভিচারের শাস্তি। এটিকেই পাশ্চাত্যে সবচেয়ে ঘৃণ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়। যৌন প্রবৃত্তির স্বাভাবিক গুরুত্বকে ইসলাম স্বীকার করে। একারণেই মহানবী (স.) প্রাপ্তবয়স্ক হলে ছেলে মেয়েদের দ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা করতে বলেন। কিন্তু যদি অর্থনৈতিক সামর্থ্য না থাকে তাহলে রোযা রেখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন তিনি। এরপরও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ দিয়ে বিবাহের ব্যবস্থাও করতে বলা হয়েছে। নারী পুরুষকে চলা ফেরার নির্দিষ্ট পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে। অশ্লীল গান বাজনার মূলোৎপাটন করতে বলা হয়েছে। অবসর সময় আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে (৯৪: ৮)। এভাবে ইসলাম প্রথমত অপরাধের সব রাস্তা বন্ধ করবে। এসব রাস্তা বন্ধ না করে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়ে হঠাৎ দণ্ডবিধি কার্যকর শুরু করা ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। তদুপরি যদি রাষ্ট্রব্যবস্থা নড়বড়ে থাকে, শাসকগণ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত থাকেন তাহলে সেখানে এমন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা ইসলামের সুবিচার নীতির বিরোধী। সবধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি কোনো ধরনের লজ্জার চিন্তা না করে চারজন লোকের সামনে কেউ এমন অপরাধ করে, যারা তাদের বিরুদ্ধে ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতে পারবে, তখনই কেবল এই অপরাধের দণ্ডস্বরূপ একশত বেত্রাঘাত কিংবা বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। স্বাভাবিক একটু চিন্তা করলেও বোঝা যায় আসলে এভাবে ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়া সম্ভবই নয়। ইসলামের লক্ষ্য যে শাস্তি প্রদান নয়, তাই এখানে প্রকাশ পায়। ইসলাম মানুষের অন্তরে এমন নৈতিক অনুভূতি ও তাকওয়া সৃষ্টি করতে চায় যার ফলে ব্যক্তি সব ধরনের নির্লজ্জ কাজ বর্জন করতে পারে। কেবল ভীতি প্রদর্শনই এখানে মূল লক্ষ্য, যেন পার্থিব শাস্তির ভয়াবহতার

কথা চিন্তা করে তার মস্তিষ্কে পরকালীন শাস্তির ভয় আসতে পারে। মানুষকে বিবাহ থেকে বিরত রাখে এমন দারিদ্র্য বা প্রতিবন্ধকতা দূর করা রাষ্ট্রের বড় দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন না করে মানুষের অপরাধের বিচারে আল্লাহর নাম নেওয়ার অর্থ হয় না।

চতুর্থ বিষয়টি আরো কঠিন। যদি একজন নারী ব্যভিচারকে অস্বীকার করে, কিন্তু তিনজন সাক্ষী বলেছে সে ব্যভিচার করেছে, চতুর্থ সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে ঐ নারীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। তার উপর যেহেতু তারা চতুর্থ ব্যক্তিকে উপস্থিত করতে পারেনি তাই তাদেরকে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগে আশিটি করে বেত্রাঘাত করতে হবে। অর্থাৎ যে কোনো অন্যায় দেখলেই সাথে সাথে সেটির বিচারের জন্য আদালতে যাওয়ার চেয়ে মানুষকে নৈতিক সংশোধনের চেষ্টার প্রতি ইসলাম বেশি উৎসাহ দেয়।

পঞ্চম বিষয়টি হচ্ছে মদ্যপান। এটি আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু। এর মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়। তবে কম পরিমাণ পান করলে বুদ্ধি লোপ পায় না, এই যুক্তিতে মদ্যপানের কোনো বৈধতা ইসলামে নেই। মদ্যপানের এই শাস্তির বিধান প্রবর্তনের আগে মহানবীর যুগে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে মানুষ এমনিতেই মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছে। হযরত উমরের ছেলে একদিন মদ পান করেন। এই অবস্থায় তাকে উমর নিজ হাতে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু গভীর রাতে তিনি একদিন একটি ঘর থেকে মদের গন্ধ পেয়ে দেয়াল টপকে আকস্মিক ঘরে প্রবেশ করে মদপানরত ব্যক্তিকে হাতেনাতে পেয়ে যান। সেই লোকটি উমরকে বলল, "আমার ঘরে গোয়েন্দাগিরি করে আপনি অপরাধ করেছেন, অনুমতি ছাড়া পেছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন, সালাম না দিয়ে এসেছেন; আমি একটি অপরাধ করেছি আর আপনি তিনটি অপরাধ করেছেন"। উমর নিজের ভুল বুঝতে পেরে তার কাছে ক্ষমা চান। তিনি তাকে মদ পানের শাস্তি দিতে পারলেন না, কিন্তু তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, সে ভবিষ্যতে আর মদ পান করবে না। তিনি শাস্তি না দিয়ে তাকে সংশোধনের পথ দেখালেন। এই পরিচিত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় মদপানের শাস্তির মত শাস্তিও রহিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম প্রকাশ্য পাপকে নিষিদ্ধ করতে চায়। মানুষের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে কে কী অপরাধ করছে গোপনে সেগুলোর অনুসন্ধান ইসলামের কাজ নয়।

ইসলাম ত্যাগকারী বা মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হবে কি না এ ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ নেই। প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ মুসলিম আইনজ্ঞ মনে করেন, তাদের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। এই নিয়ে অমুসলিমদের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা রয়েছে। যারা ইসলামের নামে বিভিন্ন বোমা হামলা ও সন্ত্রাসী কাজে জড়িত হয় তারা অন্যদেরকে 'ইসলাম ত্যাগকারী' যুক্তি দেখিয়ে তাদের এই অপরাধকে বৈধ করার চেষ্টা করে। ইসলামের সুবিচারনীতি সাধারণভাবে মুরতাদের এ ধরনের শাস্তির সমর্থন করে না। কারণ, ইসলাম গ্রহণ মানেই হচ্ছে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ। যারা না বুঝে ইসলামে প্রবেশ করেছে বলে দাবি করে, আল্লাহ তাদেরকে ঈমানদার বলতে নিষেধ করেন (৪৯: ১৪)। মহানবী (স.) তাঁর নিকটবর্তী মুনাফিকদের ভালো করেই জানতেন, অথচ তারা তাঁর সাথে নামায

পড়ত, জিহাদেও মাঝে মাঝে অংশ নিত। তিনি তাদের কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেননি। কারণ এরা মুসলিম সমাজের অংশ হিসেবে পরিচিত থাকলেও তিনি জানতেন, এরা আসলে ইসলামই গ্রহণ করেনি। মহানবী (স.) এর যে সব হাদীসকে তাঁরা মৃত্যুদণ্ডের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন, এটি বড় জোর অনুমোদন, এটি আবশ্যক নয়। পরবর্তীতে খারেজীরা (যারা নিজেদেরকে সত্যিকার মুসলিম মনে করত) এমনকি হযরত আলী (রা.)কেও মুরতাদ আখ্যা দিয়ে হত্যা করে ফেলে। সুতরাং এই আইনের মারাত্মক অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে যখন পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আদর্শের উপর একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডও বিদ্যমান নেই তখন এই ধরনের আইনের আলোচনা অর্থহীন। শুরুতেই বলা হয়েছে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোনোভাবেই আইন প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। মুসলিম হওয়ার জন্য নৈতিকতা সম্পন্ন হওয়া ছিল প্রথম শর্ত, যার প্রশিক্ষণের জন্য নবীদের আগমন; বাস্তবে সেই প্রশিক্ষণের কাজ বর্তমানে অত্যন্ত সীমিত বলেই মুসলিমের সন্তান হয়ে মুসলিম হওয়া যাচ্ছে না। কেউ এদের ধর্মবিরোধিতার অজুহাতে যদি মেরে ফেলার আইন খোঁজ করতে নামে তাহলে মহানবী (স.) এরও উচিত ছিল তায়েফের কাফেরদেরকে সমূলে ধ্বংস করার অনুমোদন দেওয়া। মানবতার নবী সেদিন বলেছিলেন, 'এরা ধ্বংস হয়ে গেলে আমি কার কাছে ইসলামের কথা বলব'? সব কিছুর পর যখন একটি রাষ্ট্র তার নিরাপত্তার জন্য কাউকে হুমকি মনে করবে, তখন নিজের ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাণিজ্যিক স্বার্থ ইত্যাদির পরিপূর্ণ মূল্যায়ন শেষে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে না কি কারাদণ্ড দেবে।

ii. তা'যিরাত: ইসলামের দ্বিতীয় প্রকারের শাস্তিকে বলা হয় তা'যিরাত। এগুলো হচ্ছে সতর্কতামূলক বা অন্যায় থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনে সৃষ্ট আইনবিধি। এগুলো কুরআন হাদীসে সরাসরি উল্লেখ নেই। কিন্তু মানুষের, রাষ্ট্রের বা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে 'উলিল আমর' বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যায়পরায়ণ শাসক বা আলেম সমাজ কর্তৃক রচিত ও প্রবর্তিত যা কোনোভাবেই কুরআন ও হাদীসের সুবিচারনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। যখনই কোনো সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় তখনই তা বাতিল হয়ে যাবে। আবু বুরদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "কাউকে যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধের নির্দিষ্ট হদ্দ (দণ্ড) ব্যতীত দশ বেত্রাঘাতের বেশি বেত্রাঘাত করা না হয়"।[৫১]

এই ছিল ইসলামী আইন ও দণ্ডবিধির বিশ্বজনীন কল্যাণমুখী ও বাস্তবধর্মী বৈশিষ্ট্যের সামান্য বিশ্লেষণ। এই আইনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল নৈতিকতার এমন সংশোধন ও উন্নয়ন যে, অপরাধীকে ধরার জন্য পুলিশের প্রয়োজন হবে না, বরং অপরাধী নিজেই এসে শাস্তির জন্য নিজেকে পেশ করবে। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্তও আছে। এসব আইন বাস্তবে প্রয়োগ হয়েছে এবং বাস্তবায়নের সুফল মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে।

৩.৪.২. সুবিচার বাস্তবায়ন

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু ন্যায় ভিত্তিক রায় প্রদানই যথেষ্ট নয়। সেটির বাস্তবায়নে যদি সরকারের সদিচ্ছা না থাকে তাহলে আদৌ সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বরং রাষ্ট্র আইন বাস্তবায়নে এটর্নি জেনারেল কর্তৃক বাধা সৃষ্টি করবে এবং কালক্ষেপণ করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিচারপ্রাপ্তিতে গড়িমসি করবে। এজন্য প্রকৃতপক্ষে সুবিচার প্রতিষ্ঠার পেছনে ন্যায়পরায়ণ শাসকের ভূমিকা বড় হয়ে দেখা দেয়। অনেক সময় আন্তর্জাতিক চাপ, বিদেশি বিনিয়োগের ভয়, নিষেধাজ্ঞা বা অবরোধের আশঙ্কা, আন্তর্জাতিক নিন্দা ইত্যাদির বিবেচনা করে রাষ্ট্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। যদি অপরাধী কোনো উন্নত রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকেন, তাহলে বিচারের রায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হলেও তাকে সে রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিতে হয়, কিংবা তার উল্টোও ঘটে থাকে অর্থাৎ কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি নিজ দেশের সরকারের সাথে ভিন্ন মতের কারণে তাকে গ্রেফতার করে সে দেশে হস্তান্তর করতে হয়। এভাবে বিবিধ কারণে ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

এজন্যই আল্লাহ রাষ্ট্রশক্তিকে দৃঢ় করার নির্দেশ দেন যেন অশুভ শক্তিকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখা যায়। কুরআনে এসেছে,

> আর তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর (এজন্য) তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে, তোমাদের উপর যুলম করা হবে না। (৮: ৬০)

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল মদীনা কেন্দ্রিক নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র একবছর পর। অর্থাৎ একটি শিশু রাষ্ট্রের দুর্বলতার কথা স্বীকার করে এর শক্তি অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সামান্য উপলব্ধি যদি কোনো নতুন রাষ্ট্রের বা নতুন সরকারের কর্ণধারদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তারা অবশ্য নিজের শক্তি অর্জন পর্যন্ত নিজেদের বিচার ফায়সালাসহ সবকিছুর বাস্তবায়নে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। আবার এর অর্থ এই নয় যে শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করে শত্রুর আদর্শকেই আত্তীকরণ করবে। এভাবে ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত কোনো নতুন রাষ্ট্র কিছুতেই ইসলামী আদর্শের অনুসরণ বা বাস্তবায়ন করতে পারবে না যদি তারা শক্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। একদিকে অর্থনৈতিক সামর্থ্য বাড়াতে হবে যেন মানুষের মধ্যে অভাবের কারণে অপরাধ প্ররণতা, অনৈতিকতা ও বিদ্রোহ সৃষ্টি না হয়; অন্যদিকে বহির্বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে যেন আন্তর্জাতিক শক্তির বিরুদ্ধে কৌশলগত সম্পর্ক রাখা যায় বা পরাশক্তির চাপে রাষ্ট্রের কাঠামো ধ্বসে না পড়ে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে যুক্ত থাকা যায়। মক্কার কুরাইশরা সিরিয়ায় বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল; এ কারণে সবসময় তারা সিরিয়দের সাথে সম্মানজনক আচরণ করত। অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ও পারস্পরিক স্বার্থ সব সময়ই প্রাসঙ্গিক ছিল।

সুবিচার বাস্তবায়নের অনেক দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায়। একজন নারী নিজে ব্যভিচারের শাস্তির কঠোরতা জেনেও নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নিজের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। মহানবী তাকে

বললেন, তোমার গর্ভের সন্তান জন্মের পর এসো। তিনি এলে ফিরিয়ে দিলেন; বললেন, দুধ পানের পিরিয়ড শেষ করে এসো। দুই বছর পর এলেন সন্তানকে কোলে নিয়ে। এরপর দণ্ড প্রয়োগ করা হলো। তাকে যখন পাথর মেরে হত্যা করা হচ্ছিল, তিনি তখন ছুটে যেতে চাইলে তাকে যেতে দেওয়া হয়নি। মহানবীর কাছে খবর গেলে তিনি বললেন, আহা! কেন তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না? সে যে তাওবা করেছে জান্নাতে যাওয়ার জন্য সেটিই যথেষ্ট ছিল।[৫২]অন্য একটি ঘটনায়, একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারী চুরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগের সিদ্ধান্ত দেন নবীজী। এমন সময় সুপারিশ আসল, তার দণ্ড লঘু করার জন্য, কারণ সে উচ্চ বংশীয়। মহানবী (স.) বললেন, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমা দোষী সাব্যস্ত হতো অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম। কুরআনে এ কথাটি এসেছে বিভিন্ন স্থানে,

> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাক, এতে তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয় প্রিয়জনদের ক্ষতি হলেও। কেউ ধনী বা দরিদ্র হলে মনে রাখ আল্লাহ তোমাদের চেয়ে তাদের বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে তোমাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত।[৫৩]
>
> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাক এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করবে না। তোমরা সুবিচার করো, এটি তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী। (৫: ৮)

এই আয়াতগুলোতে প্রথমত বলা হয়েছে, বিবাদ-মীমাংসায় সুবিচার করতে হবে; দ্বিতীয়ত, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় অটল অবিচল থাকতে হবে যেন কোনো কিছুই তার বাধা না হয়; তৃতীয়ত সুবিচারের জন্য দুটি প্রধান বাধার ইঙ্গিত এসেছে: নিজের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং কারো সাথে শত্রুতার কারণে সীমালঙ্ঘন। আবার যেহেতু সব মুমিনকে লক্ষ্য করে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে তাই এটি শুধু সরকার বা বিচার বিভাগের দায়িত্ব নয়, বরং জনগণের প্রত্যেকের দায়িত্ব- ব্যক্তি জীবনে ও নিজস্ব ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিমণ্ডলে সুবিচার বা ন্যায়নীতির অনুসরণ করা। আবার, এখানে সুবিচারকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা জাতির নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়ে নয় বরং সর্বজনীন সুবিচারের কথা এসেছে। মহানবী (সা.) এর জীবনে এসব আয়াতের সবচেয়ে বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।[৫৪]

ন্যায়পরায়ণ নেতা বা বিচারক মানুষের মাঝে সুবিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করেন। কুরআন বিচারের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের কথা শুনে তারপর রায় দিতে বলেছে যেন কোনো পক্ষের প্রতি সামান্য অবিচার না হয়। দাউদ (আ.) একটি মামলায় এক পক্ষের অভিযোগ শুনেই রায় প্রদান করে সাথে সাথে নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। কুরআনে এসেছে (৩৮: ২৩-২৪), একজন লোক তাঁর কাছে অভিযোগ করল, তার মাত্র একটি দুম্বা অথচ প্রতিপক্ষের নিরানব্বইটি এবং সেই লোকটি তার একটিকেও দখলে নিতে চায়। দাউদ (আ.) এটিকে অন্যায় বলে রায় দেন, অথচ হতে পারে সেই একটি দুম্বা সে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ বিচারে উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনলে সুবিচার করা সম্ভব নয়। আলী (রা.) শাসক

থাকাকালীন তিনি নিজের চুরি হওয়া লৌহবর্মটি একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তির কাছে দেখলেন, সাথে সাথে তা দাবি করলেন। কিন্তু খ্রিষ্টান লোকটি অস্বীকার করলে তাকে তিনি বিচারকের দরবারে নিয়ে যান। বিচারক কাযী শুরাইহ আলীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে বলেন। কিন্তু আলীর কাছে নিজের সন্তানের সাক্ষ্য ছাড়া আর কোনো সাক্ষ্য ছিল না। পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য ইসলামে অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় কাযী খ্রিষ্টান ব্যক্তির পক্ষে রায় দেন। আর আলী মাথা নিচু করে বিচার মেনে নেন। এই ছিল অর্ধ পৃথিবীর শাসকের বিরুদ্ধে রায়ের 'প্রতিক্রিয়া'। সেই লোকটি কিছুক্ষণ পরে আলীর কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এটি নবীদের বিচার। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ। আলীকে সে তখন তা ফেরত দিলে, আলী সেই লোকটিকে তা উপহার হিসেবে ফিরিয়ে দেন। ইসলাম কীভাবে সর্বজনীন সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সহজ কথায় বিচারকার্যক্রমে সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ বিচারকের প্রয়োজন। বিচারকের চরিত্র কেমন হবে তাও স্পষ্টভাবে জানা যায়। বিচারক হবেন কুরআন ও হাদীসের এবং ইসলামী আইন সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানী ও সচেতন এবং সুস্থ। বিচারকের বাদী ও বিবাদী উভয়ের বক্তব্য শোনার মত ধৈর্য, সহনশীলতা ও আগ্রহ থাকতে হয়। রাষ্ট্র, সমাজ, আন্তর্জাতিক নিয়মরীতি ইত্যাদি সামনে রেখে তিনি রায় দেবেন। কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ রেখে কোনো রায় দেবেন না, বরং সবাইকে সমান দৃষ্টিতে বিবেচনা করে রায় দেবেন।

৩.৫. অর্থনৈতিক সুবিচার

অর্থনৈতিক সুবিচারের অভাবে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়। ধনী-গরীব, পুঁজিপতি-সর্বহারা ইত্যাদি বৈষম্য অর্থনৈতিক কারণে। কুরআন এই বৈষম্য নিরসন করতে **প্রথমত**, ধনীদের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত ফরয করেছে এবং দান-সদকার ব্যাপারে উৎসাহ ও তাকিদ দিয়েছে। **দ্বিতীয়ত**, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে কাজ দেওয়ার কথা বলেছে। **তৃতীয়ত**, হালাল রিযক অন্বেষণ করা ফরয করে দিয়েছে। **চতুর্থত**, কর্মহীন, বিকলাঙ্গ, অক্ষম, অসুস্থ-পীড়িতদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে বলেছে।

অর্থব্যবস্থা মানুষের জীবনের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শাস্ত্র। সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ে সততার গুরুত্ব যেমন রয়েছে তেমনি অর্থনীতিতে অবিচার বা শোষণমূলক পদ্ধতিগুলোরও অবসান প্রয়োজন। ইসলাম এজন্যই মানবিক সাম্য ও সুবিচার ভিত্তিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। মানুষের জন্য শোষণ নিপীড়নের কারণ হবে এমন কোনো উপার্জন মাধ্যমকে ইসলাম বৈধতা দেয় না। জুয়া খেলা, কালোবাজারী, দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া, ঘুসের মাধ্যমে বাড়তি উপার্জন ইত্যাদি অর্থনৈতিক সুবিচারের বড় বাধা। সুদকে ইসলাম আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার সাথে তুলনা করেছে।

সুদের মাধ্যমে মানুষ তাৎক্ষণিক কিছু উপকার পেলেও আসলে সুদ দরিদ্র মানুষকে তিলে তিলে শেষ করে দেয়। আর বিপরীতক্রমে ধনীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উন্নয়নে সুদ বড় ভূমিকা রেখেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিলোপ সাধনে তাদের সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার অবদানও রয়েছে। ইসলাম নৈতিক কারণেই এই পদ্ধতিকে নিকৃষ্ট পদ্ধতি বলে। সাধারণত সুদ মানে হলো দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর কাছ থেকে কিছু ঋণ নেবে যার বিনিময়ে তাকে শতকরা দশ বা বিশ ভাগ কিংবা আরো অনেক বেশি অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হয়। ইসলাম এক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে উৎসাহ দেয় বিনাশর্তে, কোনো অতিরিক্ত অংশ নেওয়া যায় না। তবে ঋণ প্রদানের সময় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মনে করলে কোনো কিছু তার কাছ থেকে বন্ধক রাখতে পারে। মানুষের কাছ থেকে একটি পয়সাও অন্যায়ভাবে আদায় করা যাবে না। মানুষের বিপদে ধনীদের সাহায্য করা যে আবশ্যকীয় কর্তব্য ইসলাম সেটিকেই বড় করে দেখে। সুদের মাধ্যমে যে যান্ত্রিক লেনদেন সংঘটিত হয় তা বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা নয়। তবে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বড় বড় কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যও শিল্পপতিগণ ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে সুদকে কেউ কেউ বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেন, কারণ এতে দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষতি হয় না, বরং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উপকার হয়। কিন্তু এই যুক্তিতে ইসলাম সুদের বৈধতা দেবে না। বরং ব্যাংকগুলো বড় বিনিয়োগের জন্য সুদের উপর নির্ভর না করে ব্যবসায়িক লাভের চিন্তা করলেই সহজে সমাধান হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। একটা অবৈধ বিষয়কে কোনোভাবে একবার বৈধতা দেওয়া গেলে সম্পূর্ণ অবৈধ জিনিসটাই বৈধ হয়ে যায়। কুরআন সুস্পষ্টভাবে যা নিষেধ করেছে, তা যুক্তির বেড়াজাল দিয়ে বৈধকরণের চেষ্টা আসলে ইসলামের প্রতি অজ্ঞতা ও অনাস্থারই প্রকাশ।

ইতিহাসের পাতায় এ প্রসঙ্গে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহানবী (স.) এবং তাঁর পরবর্তীতে মুসলিম শাসকগণ রাষ্ট্রীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদের আশ্রয় নেননি। মহানবী (স.) এর বিদায় হজ্জের সময় চূড়ান্তভাবে সুদ নিষিদ্ধ করে দেন। কুরআন সুদের বিভিন্ন কুফলের কথা বলে এটিকে নিষিদ্ধ করেছে। স্বচ্ছলতা প্রতিষ্ঠার জন্য সুদ অথবা যেকোনো প্রকারের অবৈধ ব্যবসাকে সমর্থন না করেই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব। আরবের তৎকালীন সমাজে ইহুদীরা ছিল বিশাল সম্পদের মালিক। তারা সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে কমপক্ষে দুটো উপায়ে: সুদের কারবার এবং গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ লাগিয়ে অস্ত্র ও মাদকের ব্যবসা করে। মহানবী (স.) মার্জিত পন্থায় এবং দৃঢ়তার সাথে এসব অমানবিক পন্থার বিলোপ সাধন করে ইসলামের সুশীতল পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

সুদের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক প্রাসাদ গড়ে উঠে তার মূল এক অমানবিক প্রক্রিয়া। ইউরোপে রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে যে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, সে সভ্যতার কর্ণধারগণ ইউরোপের বাইরে এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। নিজেদের উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তা, প্রযুক্তির আবিষ্কার, নতুন নতুন অস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তারা বহির্বিশ্বকে প্রতারণা, জোরপূর্বক ও মিথ্যাবাদিতার মাধ্যমে খুব সহজে আয়ত্বে নেন। তাদের মাধ্যমেই আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। মানুষ

সুদের ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে বিনিয়োগের সুযোগ পায়। এভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে আর সেখানে উদ্ভব ঘটে অনেক বিত্তশালীর। এশিয়া আফ্রিকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষগুলোকে তারা নিজেদের কারখানায় দাসের মতো খাটিয়ে নিজেদের দেশকে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধার দেশে পরিণত করে। ইউরোপ ও আমেরিকা দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। অথচ ইসলাম পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের সাথে সমআচরণ করতে বলে; এ কারণে সুদের মাধ্যমে ব্যবসা এবং এধরনের অমানবিক প্রক্রিয়ায় মানুষকে খাটানো কোনোটিকেই ইসলাম সমর্থন করেনি।

জুয়া খেলাকে ইসলাম বৈধতা দেয়নি। কারণ এর মাধ্যমে একটি পক্ষ সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে। বর্তমানে ধনিক শ্রেণি তাদের অর্থবিনিয়োগের জন্য জুয়া খেলার মত নিকৃষ্ট খেলায় রাস্তায় নামে। এতে খেলার আয়োজকগণ বিভিন্ন উন্নত যন্ত্রপাতির আমদানি করে। যারা খেলায় অংশ নেয় তাদের কাছ থেকে বিরাট অর্থ হাতিয়ে নেয়। এধরনের ব্যবস্থা ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজেও ছিল। এই খেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। এজন্যই কুরআন ইসলামী অর্থব্যবস্থায় জুয়াকে শয়তানের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এছাড়া প্রতারণমূলক বিভিন্ন ব্যবসায়ের মাধ্যমে কোটি টাকা হাতে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উপার্জনের চেষ্টা করা মানুষের উপর অবিচারের প্রকাশ।

আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ কিছু ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত থাকে। তারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের চাহিদা ব্যয় সব কিছুই তাদের অদৃশ্য হাতে। যে জিনিসটি মানুষের প্রয়োজন নেই বা তাদের জন্য অতিরিক্ত সেই জিনিসটি বিক্রয়ে অধিক মুনাফা হয়। এজন্য তারা চটকদার বিজ্ঞাপনে এমনভাবে সেটিকে ফুটিয়ে তোলেন যে, মানুষ সেটি না কিনে আর পারে না। আবার ঘরের পুরাতন জিনিস নষ্ট করার জন্য তাঁরা আরেকটি প্রচারণার আশ্রয় নেন, যাতে দেখানো হয়, স্মার্ট ও বুদ্ধিমানগণ দূষিত জিনিস দিয়ে ঘর ভর্তি করে রাখেন না। ফলাফল খুব দ্রুত হয়। মানুষ পুরাতন জিনিস ফেলে দেয়, নতুন জিনিস কেনার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। অত্যন্ত মযবুত সামগ্রীও এরই ভেতর খুঁইয়ে যায়। আর্থার ওকুন বলেন, "পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দরিদ্র ঘরের সন্তানের মুখে এক মুঠো ভাতের ব্যবস্থার চাইতে ধনীর ঘরের পোষা কুকুরের মাংসের ব্যবস্থা করাকে অগ্রাধিকার দেয়"।[৫৫]তাঁর মতে, এই ব্যবস্থায় মানুষের সম্পদের বণ্টনব্যবস্থা খুব নিষ্ঠুর। এখানে আয়ের ক্ষেত্রে যেমন প্রতারণা থাকে তেমনি ব্যয়েও থাকে বৈষম্য।

প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মানুষের জীবনে বিভিন্ন দুর্ঘটনা, মৃত্যু, রোগব্যাধি প্রতিনিয়ত ঘটে, যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কখনোই সম্ভব নয়। বিপদগ্রস্ত যে কাউকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। রাষ্ট্র প্রয়োজনে ধনীদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে অথবা বাধ্যতামূলক কর আদায়ের মাধ্যমে মানবিক বিপর্যয় রোধ করতে পারে। তবে শাসকদের বিলাসিতার জন্য এসব অর্থ আদায় কোনোভাবেই বৈধ নয়। কোনো অন্যায় উপার্জনকেই ইসলাম বৈধতা দেয় না। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে প্রক্রিয়ায় লেনদেন করে তা সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতি নয়। এটিকে কেউ ইসলামের সৌন্দর্য মনে করলে ভুল হবে। তারা চেষ্টা করছে, কিন্তু সফলতা সম্ভব হচ্ছে না। বিনিয়োগকারীগণ যখন মিথ্যার আশ্রয়

নেন কিংবা রাজনৈতিক শক্তি যখন চাপ প্রয়োগ করে অর্থ ঋণ নিতে চায়, যার বৈধতা ব্যাংকগুলোতে নেই, তখন বাধ্য হয়ে অন্যায় পদ্ধতির মুখে পড়তে হয়। আবার ব্যাংকের কর্মচারীদের মধ্যে কারো যদি সততার অভাব থাকে তখন সেখানেও বড় জালিয়াতি ঘটে যায়।

বাস্তবতা হলো অর্থনৈতিক সুবিচারের জন্য নৈতিকতার বিকল্প নেই। নৈতিক অনুভূতি যত বৃদ্ধি পাবে এখানে তত বেশি সফলতা অর্জিত হবে। আর এই নৈতিকতার দাবি তখনই বাস্তবায়ন হতে পারে যখন মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া সৃষ্টি হবে। যে অন্যের দৃষ্টির ভয় না করে ইসলাম-নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করতে সক্ষম তার পক্ষে অর্থনীতিতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা কঠিন নয়।

৩.৬. রাজনৈতিক সুবিচার

রাজনীতি ছাড়া কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং টিকেও থাকতে পারে না। এজন্য স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও সৎ রাজনীতি প্রয়োজন। আধুনিক বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিশেষত ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনীতিতে যতটুকু সুবিচার রয়েছে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে তা নেই।

আল-মাওয়ারদী বলেন[৫৬], মানুষ তার নৈতিক দুর্বলতার কারণে অহঙ্কারী হয়ে উঠে, যা তাকে আল্লাহর আদেশ পালনে বাধা দেয়। এ সময় মানুষের *আকল*, কাণ্ডজ্ঞান বা ধর্ম কোনোটিই সফল হতে পারে না। মানুষের বিচিত্র অবস্থা বা কামনার কারণে দুনিয়ার কল্যাণ অর্জনও কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে তিনি একটি সফল রাষ্ট্রের জন্য ছয়টি শর্তের আলোচনা করেন-

(১) একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম: এটি মানুষের কামনা নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং তাকে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা দেয়।

(২) একজন শক্তিশালী শাসক: যিনি শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত। মানুষের অন্যায় অবিচার বন্ধে ধর্ম বা প্রজ্ঞাই যথেষ্ঠ নয়, যতক্ষণ না তারা একজন শক্তিশালী শাসকের উৎকৃষ্টতর কর্তৃত্বের অধীন হয়।

(৩) সুবিচার ও নিরাপত্তা: পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চতর পদের অধিকারীদের আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন বিশ্বজনীন সুবিচার এবং রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও শাসকের নিরাপত্তা।

(৪) আইন বাস্তবায়ন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা: এটি হবে সর্বজনীন নিরাপত্তার স্বার্থে, সামাজিক অস্তিত্বকে অসম্ভব করার জন্য নয়।

(৫) অর্থনৈতিক উন্নয়ন: রাষ্ট্রের সম্পত্তির সদ্ব্যবহার ও রাজস্বের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা।

(৬) সামগ্রিক কল্যাণে রাষ্ট্রের ভূমিকা: সভ্যতার ক্রমবর্ধমান বিকাশ, কল্যাণ ও প্রগতির স্বার্থে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম ও প্রচেষ্টার পেছনে রাষ্ট্রকেই ভূমিকা নিতে হবে।

আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণ ও সরকারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। রাষ্ট্র তার সব নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান চোখে দেখবে। রাষ্ট্রের কর্মকর্তাগণ প্রাথমিকভাবে তাদের উচ্চতর অথবা বিধিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন এবং চূড়ান্তভাবে জনগণের নিকট তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে মুখোমুখি হতে হয়। অন্যদিকে, জনগণকে তাদের দেওয়া রাষ্ট্রীয়

অধিকারের বিপরীতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব দায়িত্বের মধ্যে আছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট না করা, রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার-নির্ধারিত বিভিন্ন কর প্রদান, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা, নৈতিকতা ও সমাজ বিরোধী কোনো কাজে জড়িয়ে পড়লে বিচারের মুখোমুখি হওয়া, সংবিধান ও বিভিন্ন আইনবিধি মেনে চলা। কুরআন এসব দায়িত্বপালনকে একজন নাগরিকের জন্য পালনীয় আদেশ মনে করে। যেহেতু রাষ্ট্র তাকে নিরাপত্তা ও অধিকার দিয়েছে, তাই রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘনকে ইসলাম বিদ্রোহের সাথে তুলনা করেছে। তবে রাষ্ট্রীয় কোনো আইন যদি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী বা সাংঘর্ষিক হয় তাহলে সেটির অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আধুনিক গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ব্যাপকভাবে সুবিচার বাস্তবায়ন সম্ভব। অন্যসব সুবিচারের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা রাষ্ট্রই প্রদান করতে পারে। কোথাও কোনো যুলম বা অবিচার হলে রাষ্ট্রই তা থেকে জনগণকে রক্ষা করে। ইসলাম এক্ষেত্রে উপস্থাপন করেছে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের নীতি। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ যখন সততার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তখনই রাষ্ট্রীয় সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। রাষ্ট্রীয় সুবিচারের সাথে রাষ্ট্রীয় অবিচার বা যুলম কথাটিও প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে। বরং একথাই সব সময় বেশি আলোচিত হয়।

রাষ্ট্রীয় সুবিচার বলতে প্লেটো বুঝিয়েছেন রাষ্ট্রের তিনটি অংশের (দার্শনিক, যোদ্ধা ও উৎপাদক শ্রেণির) সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন। তাঁর এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হচ্ছে, এখানে যে শ্রেণিগুলো ভাগ করা হয়েছে, তা পূর্ব-নির্ধারণ করে দেওয়া। অথাৎ যোদ্ধাগণ কিংবা উৎপাদক শ্রেণি রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে কখনো অংশ নিতে পারবে না। তবে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ নিজ দায়িত্ব সততার সাথে পালন করলে সাধারণ মানুষ যুলম বা অবিচারের শিকার হতে পারে না। এক্ষেত্রে ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে **'ইমামুন আদিলুন'** বা ন্যায়পরায়ণ নেতা। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত এবং কিয়ামত দিবসে বিচারের সময় সর্বপ্রথম মর্যাদাপূর্ণ আশ্রয় বা আরশের ছায়ায় অবস্থান করবেন ন্যায়পরায়ণ নেতা বা ইমাম। আল্লাহর নবীদের মধ্যে ইমামুন আদিলুন হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করতে পেরেছিলেন নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), ইসহাক (আ.), ইউসুফ (আ.), দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), মূসা (আ.) প্রমুখ। তবে সুলাইমান (আ.) আল্লাহর কাছে চেয়েছেন এমন এক রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব যা পৃথিবীর অন্য কেউ পারেননি বা পারবে না। সব নবীর দায়িত্ব ছিল আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সর্বোচ্চ নমুনা উপস্থাপন করা। কিন্তু সবাই তাৎক্ষণিক সফল না হলেও তাঁদের চিন্তাধারার আলোকে পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন ঈসা (আ.) এর প্রস্থানের প্রায় শত বছর পর রোমান সাম্রাজ্যের মাধ্যমে খ্রিষ্ট ধর্ম রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের সুযোগ গ্রহণ করে। তবে সঙ্গত কারণেই বিশ্বরাজনীতিতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নেতৃত্ব ও প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তাঁর নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব হিসেবে মানুষের মধ্যে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। দাউদ (আ.) রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করলে আল্লাহ জানিয়ে দেন, "তোমার কাজ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা"। মহানবী (স.) কে আল্লাহ

আদেশ করেছেন এই কথা বলার জন্য, "আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে সুবিচার করতে"। একইভাবে অবিচারকারী যালেম বাদশাহ হিসেবে শীর্ষস্থানে ছিল ফেরআউন। এছাড়া নমরুদ, জালূত প্রমুখের বিবরণও আছে। এদের যুলমের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল মানুষকে তাদের দাসে পরিণত করা, ব্যাপক হত্যা, গুম এবং আল্লাহর আদর্শের আনুসারীদের উপর হত্যা ও চরম নির্যাতন।

পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য-প্রভাবিত দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গণতন্ত্রের যথাসম্ভব বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে তারা নিজ দেশে মানুষের যাবতীয় কর্মপন্থা নির্ধারণে সুবিচারের অনুসরণ করেন। ইসলাম সাধারণভাবে এই ধরনের মতকে সমর্থন করে। তবে ইসলামী গণতন্ত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে নিরঙ্কুশভাবে স্বীকার করা হয়েছে এবং একই সাথে জনগণের নিকট জবাবদিহিতাকে আবশ্যকীয় করা হয়েছে। এজন্যই ইসলামে সুবিচার মানে হচ্ছে আল্লাহ ও মানুষের নিকট জবাবদিহিতা।

রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি অংশের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়: আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ। এই তিনটি বিভাগে যখন সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যাবে, তখনই রাষ্ট্রীয় সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইতোপূর্বে আমরা আইন ও বিচার কার্যক্রমে সুবিচারের একটা সামান্য চিত্র তুলে ধরেছি। এখানে শাসন বিভাগের আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

একটি রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের কাজ হচ্ছে আইন ও সুবিচারের ভিত্তিতে যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের পরিচালনা নীতি বা আইনের প্রধান উৎস, জনগণ এবং সরকারের জন্য চূড়ান্ত প্রমাণ। রাষ্ট্রীয় সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা দেওয়া। মানুষের অধিকারগুলো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত: রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকার প্রভৃতি। রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে আছে: নেতা নির্বাচন, ভোট দান, মত প্রকাশ, চলাফেরা, বিদেশে যাওয়া প্রভৃতির অধিকার। এই অধিকারগুলো সর্বজনস্বীকৃত অধিকার। ইসলাম এগুলোর প্রত্যেকটির পক্ষে কথা বলে। সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের অধিকারকে সরকার যদি মেনে নিতে না পারে, তাহলে সেই সরকারের পক্ষে সুবিচার সম্ভব নয়। জোরপূর্বক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। জনগণের উপর এমনকি ইসলামী আইনও জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করা যাবে না। বরং আগে সেই আইন মেনে চলার মত তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক সুবিচারের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকরের (রা.) ভাষণটি এক ঐতিহাসিক প্রমাণ:

> হে লোক সকল, আমাকে তোমাদের শাসক নির্বাচিত করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্য উত্তম লোক নই। আমি যদি ভালো কাজ করি তবে আমার সহায়তা করবে। আর যদি মন্দ পথে চলি, তবে আমাকে সোজা পথে চালিত করবে। সততাই আমানত, আর মিথ্যাই খেয়ানত। তোমাদের মধ্যে দুর্বলতম ব্যক্তি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান; আমি তার নিকট তার হক পৌঁছিয়ে দেব, ইনশা আল্লাহ। আর তোমাদের শক্তিধর ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল। কাজেই আমি তার থেকেও হক আদায় করে ছাড়ব ইনশা আল্লাহ। যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দেয় সে জাতির উপর আল্লাহ

লাঞ্ছনা ও অবমাননা চাপিয়ে দেন। যদি কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার করে তবে আল্লাহ তাদেরকে সাধারণ বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও আমার আনুগত্য করবে। আর যদি আমি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হই, তবে এক্ষেত্রে তোমাদের আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়"।[৫৭]

এখানে, প্রথম যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে গর্ব অহংকার মুক্ত হয়ে রাষ্ট্রনায়ককে বিনয়ের সাথে জনগণের সামনে দাঁড়াতে হবে। যদিও সবাই তাকে নেতা নির্বাচন করেছেন, কিন্তু তিনি নিজেকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করবেন না, বরং তাঁর যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ ভালো কাজে নিয়োগ করবেন। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রনায়কের প্রধান কাজ হচ্ছে: ভালো কাজের বাস্তবায়ন এবং জনগণের দায়িত্ব সেই কাজে সহযোগিতা। আর সরকার অন্যায় পথে অগ্রসর হতে চাইলে জনগণের দায়িত্ব সরকারকে সঠিক পথে চলতে চাপ দেওয়া। সরকারের দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ নীতি হবে সততা; রাষ্ট্র এবং জনগণের সাথে মিথ্যা ও প্রতারণা নিষিদ্ধ। মিথ্যা কথা ও কাজ হচ্ছে আমানতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। রাষ্ট্রের মৌলিক একটি কাজ হচ্ছে: মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোনো বৈষম্য না করা; দুর্বল বা সবল হিসেবে নয়, বরং মানুষ হিসেবে মানুষকে তার প্রাপ্য প্রদান করা। জিহাদ বলতে মানুষকে সত্যের দাওয়াত এবং নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনা উভয়ই প্রযোজ্য। কোনো একটিকে বাদ দিলেই সেখানে মানুষ অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হবে। বিশেষভাবে এখানে বলা হয়েছে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটলে মানুষ সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের শিকার হবে। সুতরাং কোনো রাষ্ট্র তার নিজ স্বার্থেই প্রকাশ্য অনাচার ব্যভিচারকে সমর্থন দিতে পারে না। সবশেষে এখানে এসেছে, মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা তখনই শেষ হয়ে যায়, যখন তিনি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে অলসতা করেন।

মহানবী (স.) এর কয়েকটি হাদীস থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং নিকটে উপবেশনকারী মানুষ হল ন্যায়নিষ্ঠ শাসক। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য ও দূরবর্তী হল অত্যাচারী শাসক"।[৫৮] অন্যদিকে, প্রতিটি মানুষই যেহেতু রাষ্ট্রের অধীন বিভিন্ন অধিকার ভোগ করে, সে জন্য রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকেও অবহেলা করা যাবে না। অর্থাৎ জনগণের যেমন রাষ্ট্রের নিকট অধিকার আছে তেমনি জনগণের কাছ থেকে রাষ্ট্রের অধিকার আছে। রাষ্ট্রের কাজে সহযোগিতা করা তাদের রাষ্ট্রের প্রতি সুবিচারের প্রকাশ।

রাজনৈতিক সুবিচারের জন্য কুরআনে পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলতে বলা হয়েছে, যেখানে থাকবে মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণে নেতা-নির্বাচনের বিধান। মহানবী (স.) তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী নেতা বা শাসক মনোনয়ন দেওয়ার জন্য যদি কারো নাম বলে যেতেন তাহলে এতে কেউ দ্বিমত করতেন না। কিন্তু তিনি এই কাজটি সবার উপর ছেড়ে যান যেন সবাই পরামর্শের ভিত্তিতে এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাদের নেতা নির্বাচন করতে পারেন। স্বজন-প্রীতি, অযোগ্য লোকদের ক্ষমতায়ন, ক্ষমতার অপব্যবহার- এগুলোকে কুরআন যুলম বা অবিচার হিসেবে বর্ণনা করেছে। মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া এবং এক্ষেত্রে বৈষম্য না করা,

মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া, সরকারের দোষ-ত্রুটির সমালোচনাকে ইতিবাচকভাবে নেওয়া রাজনৈতিক সুবিচারের অংশ। ইসলাম রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা দিয়েছে, যা মহানবী (স.) ও তাঁর পরবর্তী চারজন খলীফার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এজিদী শাসন ব্যবস্থায় যুলম, অবিচার ও অনৈতিকতাকে যে রাজতান্ত্রিক নীতি সমর্থন করেছিল, সেই নীতির বিরুদ্ধে তখন ইসলামের মুখপাত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন ইমাম হোসাইন (রা.)। যুলম-নিপীড়ন ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি নিজ পরিবারসহ কারবালার ময়দানে জীবনোৎসর্গ করে দেখিয়েছেন ইসলাম অন্যায়কে সমর্থন করে না। যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল তার মূল চেতনা উমাইয়া-আব্বাসীয়দের অপশাসনে ম্লান হয়ে যায়। অথচ ইসলামে নেতৃত্বের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চারজন খলীফার প্রত্যেকেই বারবার মানুষের উদ্দেশ্যে বলতেন, "যতক্ষণ তোমরা আমাকে কুরআন ও মহানবীর আদর্শের ভিত্তিতে চলতে দেখবে ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে, অন্যথায় তোমাদের উপর আনুগত্যের কোনো দাবি আমি করতে পারব না"।

সহজ কথায় সুবিচার বা ন্যায়নীতি সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনায় যে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বোঝানো হয়েছে, তা হচ্ছে এটি পৃথিবীতে পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড, যেখানে কোনো ধর্ম, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে সব মানুষ অন্তর্ভুক্ত। যা একদিকে মানুষের ন্যায্য পাওনা আদায়ে শর্তহীনভাবে সমর্থন করছে অন্যদিকে তার আবেগ অনুভূতিকেও যথাযথ সম্মান করছে। সমাজ ও রাষ্ট্র মানুষের জীবনকে বেশি প্রভাবিত করে। এজন্য এগুলোর প্রতি দায়িত্বও অনেক। মানুষের নিরাপত্তা, শান্তি বা উন্নতি রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব নয়। এজন্য রাষ্ট্রের আইনবিধি মেনে চলা কুরআনের নির্দেশ। "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত বা নেতা তাদের আনুগত্য করো;" (৪: ৫৮)। এখানে একজন নাগরিক হিসেবে দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর সাথে ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতসমূহের খেয়ানত করো না (৮: ২৭)। এ দুটি আয়াতে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলার আদেশ করেছে এবং একই সময় লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় আল্লাহর আদেশ ও রাসূলের আদেশ মেনে চলাটা যেমন মুমিনের দায়িত্ব তেমনি শাসকদেরও আনুগত্য করতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, যতক্ষণ শাসক বা নেতৃবৃন্দ কুরআন ও হাদীসের বিপরীত আদেশ করবেন না। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের শাসক ও নেতাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন মানুষকে নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নৈতিক উন্নতি ঘটায় এবং সমাজে ভালো কাজের প্রতিষ্ঠা করে ও খারাপ কাজ প্রতিরোধ করে। এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন।

৩.৬.১. পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত

রাষ্ট্রপ্রধান পরামর্শ বা মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে তাদের মাধ্যমে জনগণের মতামত নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। দৈনন্দিন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে জনগণের বাস্তব অবস্থা সামনে রাখলে সুবিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর চেয়ে নিজ সাথীসঙ্গীদের সাথে অধিক

পরামর্শকারী কাউকে দেখিনি"।[৫৯]পবিত্র কুরআন নেতাদেরকে অধীনস্তদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে (৪২: ৩৮; ৩: ১৫৯)। তবে পরামর্শের ভিত্তিতে সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। নেতা অবশ্যই দেখবেন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেখান থেকে যেন ফিরে আসার মত পরিস্থিতি না হয়, অর্থাৎ গৃহীত সিদ্ধান্ত সুবিচার ভিত্তিক হলে বাস্তবায়নে সবাই সহযোগিতা করবে।

৩.৬.২. কর্মচারী নিয়োগ ও পদন্নোতিতে সুবিচার

রাষ্ট্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সৎ ও যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ, তাদের নিয়মিত পদোন্নতির ব্যবস্থা, তাদের সাথে সুবিচারপূর্ণ আচরণ, উপযুক্ত বেতন ভাতা প্রদান প্রভৃতি আবশ্যক। কর্মচারী নিয়োগ কেবল যোগ্যতার মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং কোনো প্রকার ঘুস দুর্নীতির আশ্রয় না নিয়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার অবলম্বন রাষ্ট্রীয় সুবিচারের জন্য প্রয়োজন। মহানবী (স.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

> আমি কাউকে রাষ্ট্রের কোনো প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ করলে অবশ্যই তার জীবিকার ব্যবস্থা করব। এর থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা হবে খিয়ানত।[৬০]

অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানকে কর্মচারীদের বেতন ভাতায় যেমন সুবিচার নিশ্চিত করতে হয় তেমনি কর্মচারীকে দায়িত্বপালনে সততায় অবিচল থাকতে হয়। কর্মচারী অতিরিক্ত কোনো প্রাপ্য কামনা করলে, বিলাসী জীবন যাপন করলে সে রাষ্ট্রের উপর যুলম করল।

৩.৬.৩. রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণ

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য জনগণের নিরাপত্তা ও কল্যাণ। এই উদ্দেশ্য অর্জনে রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে সবসময় ব্যস্ত থাকতে হয়। জনগণের সামগ্রিক কল্যাণের পরিবর্তে যদি কেবল নিজের বা নিজ দলের লোকদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে সেখানে অন্যদের উপর যুলম করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রে দেখা যায়, বিনা কারণে সন্দেহবশত ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করা হয়। এর ফলে একটা দেশের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনগণ ধীরে ধীরে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে থাকেন। ইসলামী চিন্তাধারায় এগুলো যুলমের দৃষ্টান্ত।

সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কুরআন মানুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছে। মানুষের উপর এমনকি নিজের উপর যুলম হয় এমন কিছু করা থেকে বেঁচে থাকতে বলেছে। বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে, ইসলাম সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে তাকে, যে তার নিজের উপর অবিচার করে, তারপর তার নিকটতম ব্যক্তিদের, তারপর সব মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীদের উপর অবিচার করে।[৬১]অর্থাৎ মানুষের প্রথম করণীয় হচ্ছে নিজের উপর সুবিচার কায়েম করা। সমস্ত প্রকার অন্যায় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মনকে পবিত্র রাখাই হচ্ছে নিজের উপর সুবিচার। মহানবী (স.) সালাতের মধ্যে দোআ করতে শিখিয়েছেন, "হে আল্লাহ আমি নিজের উপর অসংখ্য অবিচার করেছি।" এখান থেকে

বেঝা যায়, নিজের উপর অবিচার মানে হলো পাপের কাজে যুক্ত হওয়া। অন্যান্য মানুষের সাথে সুবিচার মানে সবার প্রাপ্য যথাযথভাবে প্রদান: কারো সম্পদ, সম্মান, বা যে কোনো অধিকার বা প্রাপ্য হরণ না করা। কুরআন অন্যান্য প্রাণী ও সৃষ্টিজগতের প্রতি সুবিচারের কথা এজন্য বলেছে যে, এগুলো থেকে আমরা প্রতি মুহূর্তে বিভিন্নভাবে উপকার গ্রহণ করছি এবং শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সবার প্রতি যত্নবান হওয়টাও প্রাকৃতিক দায়িত্ব। সুতরাং বলা যায় সুবিচার মানুষের সামগ্রিক দায়িত্বের অংশ। তবে তিনটি ক্ষেত্রে সুবিচার খুব গুরুত্বপূর্ণ: সম্পদ বণ্টনে, লেনদেন ও বেচাকেনায় এবং কোনো ক্ষতি না করে প্রাপ্য অনুযায়ী যার যার হক বণ্টনে।[৬২]এসব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান মেনে চলার মাধ্যমে ন্যায় বা সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সুবিচারকে সবকিছুর আদর্শ ঐকতান হিসেবেও বর্ণনা করা যায়। যেমন, যখন তা দেহে প্রকাশ পায় তখন তা হয় আদর্শ তাপমাত্রা, সঙ্গীতের ভাষায় হলে আদর্শ সুর, বাহ্যিক প্রকাশে দয়া, ভাষায় মার্জিত, দৈহিক হলে দৈহিক সৌন্দর্য, আর আত্মায় প্রকাশ পেলে হয় বাস্তব সুবিচার।[৬৩] সুবিচার সংরক্ষণের সর্বোচ্চ মানদণ্ড হচ্ছে শরীয়া আইন, তারপর ন্যায়পরায়ন শাসক, সর্বশেষে অর্থ। এর প্রমাণ, কুরআনের একটি আয়াত (৫৭: ২৫): ".. ..আমি অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার।" এখান থেকে তিনটি মানদণ্ডের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিতাব হচ্ছে শরীয়া আইন, অর্থসহ সবকিছুর পরিমাপের জন্য পাল্লা (মীযান) আর লৌহ হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা শাসক।[৬৪]এই তিন প্রকার সুবিচারের বিপরীতে তিন প্রকার যুলম বা অবিচার রয়েছে: ক) যে শরীয়া আইন লঙ্ঘন করে- কুফরী; খ) যে শাসককে অমান্য করে- বিদ্রোহ বা সীমালঙ্ঘন এবং গ) যে অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে- চুরি বা খেয়ানত। এতে আরো স্পষ্ট হয় প্রধানত সুবিচার তিন ধরনের: আইনপ্রয়োগ ও বিচারের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার।

এ আলোচনায় রাজনৈতিক সুবিচারের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কুরআন হাদীস ও পূর্ববর্তী ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণের বক্তব্যে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে। আমরা সেগুলোর সাথে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৪. প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি সুবিচার

ইসলামে প্রকৃতির জগতের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কুরআনে বিশ্বজগৎ নিয়ে চিন্তা করাকে ঈমানের মৌলিক একটি বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

> নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে যারা দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে; আর বলে, "হে আমাদের রব, আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম। অতএব আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন"। (৩: ১৯১-৯২)

এভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত এসেছে। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পরিচয় লাভ। আল্লাহ এগুলোকে তাঁর পরিচয়ের জন্য নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এগুলো নিয়ে চিন্তা মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে। যেহেতু আল্লাহকে চেনার জন্যই তাঁর সৃষ্টিকর্ম উপস্থাপিত হয়েছে, তাই এগুলোর সংরক্ষণ, পরিচর্যা, অধিকতর বিকাশের ব্যবস্থা করা মানুষের প্রতি বিশাল দায়িত্ব। প্রাণী, উদ্ভিদ ও সমস্ত প্রকৃতি জগৎ মানুষের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট আচরণ আশা করে। এই আশা পূরণের অর্থই হচ্ছে তাদের সাথে সুবিচার। এভাবে প্রকৃতির প্রতি সুবিচার অন্যান্য সুবিচারের মতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আল্লাহ যেহেতু মানুষকে তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ব পরিচালনা ও আবাদ করার দায়িত্ব দিয়েছেন সেকারণেই মানুষের নিজেদের প্রতি দায়িত্বের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণী ও জড় প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। একটি বিড়ালকে অকারণে কষ্ট দেওয়ায় জাহান্নামে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা হাদীস থেকে জানা যায়। অকারণে একটি গাছের পাতাও কাটতে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী (স.) ওযু করার সময় পানির অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। একটি সাপকে চলে যাওয়ার সময়, যেহেতু এটি কারো ক্ষতি করতে চায়নি তাই মহানবী (স.) এটিকে ছেড়ে দিতে বলেন। সাপটি চলে গেলে তিনি বলেন, তোমরা তার ক্ষতি থেকে বেঁচে গেলে আর সেও তোমাদের ক্ষতি থেকে বেঁচে গেল। তবে তিনি ক্ষতিকর পোকা মাকড়, ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া মারতে আবার নিষেধ করেননি। বরং মানুষের জীবনের জন্য হুমকি ও ক্ষতির কারণ হলে সেগুলোকে নষ্ট করা যায়। নদী-ভরাট বা পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করতে কিংবা বদ্ধ পুকুরে ময়লা ফেলতে নিষেধ করেন। পাহাড় কাটতে নিষেধ করেন যেগুলোকে জমীনের মজবুতির জন্য আল্লাহ পেরেক স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্র-দূষণের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংস করা কোনোভাবেই ইসলাম সমর্থন করে না। এক কথায় আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে তাঁর পরিবার স্বরূপ আখ্যা দিয়ে সৃষ্টিজগতের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইসলাম অনুসারে, প্রকৃতির নিজস্ব মূল্যের কারণেই ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচার অধিকার আছে, যেমন মানুষের আছে।

আধুনিক পরিবেশ নীতিবিদ্যা পরিবেশের স্বতঃমূল্য বা পরতঃমূল্যের ধারণা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। উভয় দৃষ্টিকোণকেই ইসলাম সমর্থন করে। পরিবেশের নিজস্ব মূল্যের কারণ পরিবেশ আল্লাহর পরিবার সদৃশ। সুতরাং এর ক্ষতি করা মানে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা। আবার পরতঃমূল্যের দৃষ্টিতে এ জন্য মূল্যবান যে, আল্লাহ এগুলোকে মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন; (২: ২৯)। সুতরাং যেহেতু এগুলো মানুষের কল্যাণে সব সময় নিবেদিত তাই এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যই প্রয়োজন। বিশ্বজগতের ভবিষ্যতে টিকে থাকার জন্য বর্তমান পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষা করা মানুষের দায়িত্বের অংশ। হোসাইন নসর মনে করেন, ইসলাম প্রকৃতি ও পরিবেশকে দেখে আধ্যাত্মিক উপাদান হিসেবে। আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে, মুহীত যার শাব্দিক অর্থ পরিবেষ্টনকারী। তিনি এর অর্থ করেন পরিবেশ। সুতরাং পরিবেশের বিপর্যয় রোধ করা মানুষের আবশ্যকীয় দায়িত্ব।[৬৫]

সহজ কথায় ইসলামী দর্শনে প্রাকৃতিক জগৎ এক আধ্যাত্মিক উপাদন। সুতরাং প্রাকৃতিক জগতের সংরক্ষণ, সেবা ও পরিচর্যা মানুষের মৌলিক একটি দায়িত্ব। ইসলাম প্রকৃতির প্রতি যথাযথ আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছে। একটা বাঘের আক্রমণ থেকে হরিণের বেঁচে থাকার চেষ্টা প্রকৃতিই করে রেখেছে। কেউ যদি বাঘের মুখ থেকে হরিণকে ছাড়িয়ে আনে সেটি বাঘের উপর অবিচার করার শামিল। মহানবী(স.) এর এই এই দিক নির্দেশনা থেকে অনুমান করা যায় প্রাকৃতিক জগতের প্রতি কীভাবে সুবিচার করতে হয়। ইসলাম কীভাবে প্রাকৃতিক জগতের প্রতি সুবিচার করতে বলে তার কয়েকটি দিক নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

৪.১. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ: ইসলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে আল্লাহর উপর ঈমানের অংশ বলে মনে করে। "তোমার পোশাক-পরিচ্ছদকে তুমি পবিত্র রাখো"। ইসলামে পবিত্রতার পরিভাষা "তাহারাত"; এটি "নাযাফাত" এর চেয়ে বেশি বিস্তৃত। *নাযাফত* অর্থ শুধু পরিচ্ছন্নতা, কিন্তু *তাহারাত* পরিচ্ছন্নতা ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা উভয়কে নির্দেশ করে। কেউ গোসল করে একবার পরিচ্ছন্ন হতে পারে কিন্তু সামান্য একটু তন্দ্রায় তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়; তাকে আবার অযু করতে হয়, যদিও তার হাতে পায়ে কোনো অপরিচ্ছন্নতা না থাকে। এভাবে মানুষের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার সাথে সাথে নিজের ঘর, রাস্তা, আঙিনা ও চারপাশকে পরিচ্ছন্ন রাখা ইসলামের নির্দেশ। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা কীভাবে অর্জন করতে হয় সেটি মহানবী (স.) কঠোরভাবে দেখিয়েছেন। পেশাব পায়খানার পর পানির ব্যবহার না করলে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পোশাকের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট হয়। এতে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের জীবাণু। এভাবে দৈহিক কোনো বিশেষ অঙ্গের ক্ষতি থেকে অন্যান্য অঙ্গেও তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। কুরআনে এজন্যই বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী বা তাওবাকারীদরে ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরও ভালোবাসেন। প্রতদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের আগে অজু করাকে আবশ্যক করার কারণ মানুষকে সুস্থ রাখা। বিশেষ ক্ষেত্রে গোসলের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখা দেহ ও মনের উভয়ের প্রশান্তির জন্য দায়ী। অযুর অঙ্গগুলো ধৌত করার মধ্যে স্বাস্থ্যগত কল্যাণ বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারাও প্রমাণিত।

মহানবী (স.) ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করে মসজিদে যেতে বলেছেন। কারণ এতে অন্য মানুষের কষ্ট হয়। এজন্য প্রত্যেক নামাযের আগে মিসওয়াক করার তাগিদ দিয়েছেন তিনি। ঘুম থেকে উঠে তিনি নিজে পরিচ্ছন্ন হয়ে, মিসওয়াক করে তারপর জায়নামাযে দাঁড়াতেন। কারণ আল্লাহ অপরিচ্ছন্নতা ও দুর্গন্ধকে পছন্দ করেন না। মানুষের নিজের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা থেকেই পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করতে হয়। এর পর তার আশপাশের পরিবেশ, গাছপালা ও পশুপাখির প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়।

৪.২. উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজির প্রতি সুবিচার

মানুষ গাছ পালা থেকে সৃষ্ট অক্সিজেনের মাধ্যমে বেঁচে থাকে। কুরআন বৃক্ষের উপকারিতার কথা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছে। আল্লাহর স্মরণে তাদের নত হওয়া, মানুষের বিচিত্র কাজে বৃক্ষের ব্যবহার, কৃষি ও ফলজ পণ্য উৎপাদনে এগুলোর ভূমিকা নিয়েও কুরআনে আলোচনা এসেছে।

তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি তা উৎপন্ন কর, না আমিই উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছে করলে তাকে অবশ্যই খড়কুটা করে দিতে পারি, তখন তোমরা হয়ে যাবে বিস্ময়ে হতবাক। (আর বলবে যে,) 'আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়লাম, বরং আমরা হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? বৃষ্টিভরা মেঘ থেকে তোমরা কি তা বর্ষণ কর, না আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী? আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করে দেখেছ? তোমরাই কি এর (লাকড়ির গাছ) উৎপাদন কর, না আমি করি? আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু। সুতরাং তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (৫৬: ৬৩-৭০)

এখানে, বৃষ্টি, বৃক্ষ আগুন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এগুলো বলার উদ্দেশ্য মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করা, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আল্লাহর এসব নিয়ামতের প্রতি মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে এগুলোর উপকার সম্পর্কে চিন্তা করা। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা মানুষ নয়, বরং তিনি মানুষকে দিয়েছেন; মানুষ যদি এগুলোর যত্ন নেয় তাহলে এগুলো মানুষের জন্যই কাজে লাগবে। উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজির ব্যাপারে মহানবী (স.) এর হাদীসেও স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

৪.৩. পাহাড় ও বনাঞ্চল রক্ষা

কুরআন পাহাড়কে পেরেক সদৃশ উল্লেখ করেছে। পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য পাহাড় সৃষ্টি করা হয়েছে। পাহাড় পর্বতের কারণে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে আসতে বাধা সৃষ্টি করে। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে, পাহাড়ে আছে তোমাদের জন্য বিবিধ কল্যাণ ও জীবনোপকরণ। সুতরাং সভ্যতার উন্নয়নে পাহাড় পর্বত সমান করে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত নয় । ইসলাম এ কারণে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে ধ্বংস করতে বলে না, বরং এগুলোর মাধ্যমে ইতিবাচক উপকার গ্রহণ করতে বলে।

৫. সুবিচার ও অবিচার

সুবিচারের সাথে অবিচার বা যুলমের প্রসঙ্গ চলে আসে। নঞর্থক দৃষ্টিতে, যেখানে অবিচার বা যুলম নেই সেখানে সুবিচার থাকবে। ইসলাম মানুষের উপর যুলম হয় এমন সব বিষয়কে নিষিদ্ধ করেছে। একদিকে আইনের মাধ্যমে তার বাস্তবায়নের পথ দেখিয়েছে, অন্যদিকে নৈতিক চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে বিবেকের ভেতর আঘাত সৃষ্টি করে। মহানবী (স.) বিভিন্ন ধরনের অবিচারের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন,

আল্লাহর সেই বান্দা নিকৃষ্ট, যে নিজেকে অপরের চেয়ে ভালো মনে করে, অহংকার করে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায়। সেই বান্দা নিকৃষ্ট, যে মানুষের ওপর যুলম-অত্যাচার করে, সীমালঙ্ঘন করে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভুলে যায়। সেই বান্দা নিকৃষ্ট, যে দীনের কাজ ভুলে যায়, দুনিয়ার কাজে মত্ত হয়ে থাকে এবং কবরস্থানের কথা ও শরীর পঁচে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। সেই বান্দা নিকৃষ্ট, যে ঝগড়া-বিবাদ বাধিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, অবাধ্য হয় এবং নিজের প্রথম ও শেষ ভুলে যায়। সেই বান্দা

নিকৃষ্ট, যে দুনিয়াবাসীকে 'দীন' দ্বারা ধোঁকা দেয়। সেই বান্দা নিকৃষ্ট, যে সন্দেহ করে ধর্মকে খারাপ করে দেয়। সেই বান্দা নিকৃষ্ট, যাকে দুনিয়ার লোভ-লালসার দিকে এবং দুনিয়ার পূজারীদের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। সেই বান্দা নিকৃষ্ট, যাকে দুনিয়ার লোভ-লালসা ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, অসম্মানিত ও হেয় করে। [তিরমিযী ও বায়হাক্বী]

এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে মানুষ বিভিন্নভাবে নিজের উপর যুলম করে, অপরের উপর যুলম করে, অন্যকে প্রতারণা করে, ধোঁকা দেয় সে নিকৃষ্ট মানুষ। মহানবী (স.) এ ধরনের প্রতিটি যুলমের কাজকে নিকৃষ্ট বলে সাব্যস্ত করেছেন। পার্থিব শাস্তি এদের উপর প্রয়োগ করা না গেলেও পরকালীন শাস্তির ভয়বহতা থেকে তারা রক্ষা পাবে না। প্রধান দুটি যুলম সম্পর্কে সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হলো:

৫.১. হত্যা: আল্লাহর সাথে শিরক করার পর মানবীয় দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় যুলম হচ্ছে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। সবাই এটিকে একটি বস্তুনিষ্ঠ মন্দ বলেন যা সব যুগে ও সব মানুষের কাছেই নয় বরং নিজস্ব গুণেই নিন্দনীয় ও অপরাধ। এর কারণ মানুষের জীবন সবচেয়ে পবিত্র। এই জীবনের মালিক আমরা নিজেরা নই, কিন্তু এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের। বেঁচে থাকার অধিকার সবচেয়ে বড় অধিকার। নিজেকে হত্যা করা যেমন সবচেয়ে বড় কাপুরুষতা ও ঘৃণ্য কাজ তেমনি অন্যকে হত্যা করাও সবচেয়ে বড় ঘৃণ্য কাজ। মানবেতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ড ছিল আদম (আ.) এর পুত্র কাবিল কর্তৃক তার ছোট ভাই হাবিলকে হত্যা। কাবিল নিজেও এ কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু সে প্রথম হত্যাকাণ্ডের মত জঘন্য একটি পাপ প্রচলন করল এ জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সব হত্যাকাণ্ডের একটি পাপ তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। কুরআন বলেছে, "যে কোনো মানুষকে হত্যা করল সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করল;"(৫: ৩২)। এখানে কোনো ধর্মের বা বর্ণের কথা বলা হয়নি। যে কোনো মানুষ হত্যা অপরাধ। তবে হত্যাকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ কি না সেটি নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কুরআন এটিকে বলেছে কিসাস অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যা করা। এটিকে কুরআন আবশ্যকীয় করেছে এবং এর কারণ হিসেবে বলেছে, এর মাধ্যমে জীবন আছে। অর্থাৎ হত্যাকারীকে যদি সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে সে এ ধরনের আরো কাজ করবে। কিন্তু কুরআনের যে বিষয়টি বর্তমানে আলোচনা হয় না সেটি হচ্ছে সুবিচার, সাম্য, সাক্ষ্য ও ক্ষমার ধারণাটি। যদি নিহতের উত্তরাধিকারী হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ এটিকে অধিকতর কল্যাণকর বলেছেন; (৫: ৪৫)।

কুরআন আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ কৃপাহত্যাকে আইনগত বৈধতা দিয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি মনে করেন, তার বেঁচে থাকা অন্যের কষ্ট বৃদ্ধি করবে কিংবা নিজের মারাত্মক অসুস্থতার কারণে বাকী জীবনে বেঁচে থাকার বা স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ হয় তাহলে তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে জীবন হরণ করার অনুমতি দিতে পারবেন। কিন্তু কুরআন বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখে। ইসলামের দৃষ্টিতে, নিজের যত কষ্টই হোক নিজেকে হত্যা করার অনুমোদন দেওয়া যায় না। তবে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য না থাকলে এবং যদি রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোনো উপায়ও না থাকে এবং এই অবস্থায় মৃত্যু হয় তাহলে তাকে কৃপা হত্যা বলা যায় না।

৫.২. সন্ত্রাস ও ফেতনা: পবিত্র কুরআন হত্যার পর যে কাজটিকে মানুষের উপর অবিচার বা যুলম হিসেবে বর্ণনা করেছে সেটি হচ্ছে ফেতনা সৃষ্টি বা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম। এটিকে বরং হত্যার চেয়েও জঘন্য হিসেবে উল্লেখ করেছে। হত্যাকাণ্ড একবারেই ঘটে, কিন্তু সন্ত্রাস ও ফেতনা বিভিন্নভাবে ঘটে। লুণ্ঠন, ডাকাতি, বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ এসবই সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত। প্রায়োগিক দর্শনে সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে,

> সন্ত্রাস হচ্ছে যে কোনো সংগঠিত সহিংসতা যার উদ্দেশ্য হতাশা ও ভীতিকর আবহ তৈরি করা, স্বাভাবিকভাবে যারা নিরাপত্তা দিয়ে থাকে সেই কর্তৃপক্ষের কাঠামোকে ধ্বংস করার মাধ্যমে অর্থাৎ সরকার ও তার প্রতিনিধিদের ব্যাপারে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে অথবা যে সরকারের জনপ্রিয়তা নড়বড়ে সেই সরকার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড, সহিংসতা সৃষ্টি করে থাকে।[৬৬]

এখানে সন্ত্রাসের সাধারণ একটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাস রাষ্ট্র ও সমাজকে অস্থিতিশীল করার জন্য যেমন হতে পারে তেমনি রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মাধ্যমেও সংঘটিত হতে পারে। রাষ্ট্র যখন নিজেই এই পথ বেছে নেয় তখন সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব হয় না। সন্ত্রাস নির্মূলে রাষ্ট্রকে সুবিচারের ভিত্তিতে কঠোর ভূমিকার অনুমোদন কুরআনে দেওয়া হয়েছে,

> আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো এবং ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন। (৪৯: ৯)

অর্থাৎ রাষ্ট্রের বা সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে সাধারণ মানুষের চলা ফেরায় ব্যাঘাত ঘটে। এজন্যই প্রথমে তাদেরকে সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করতে বলা হয়েছে। এতে কাজ না হলে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে; কিন্তু যখন তারা পরাজিত হবে তখন তাদেরকে আবার বিদ্রোহের জন্য ঢালাওভাবে অভিযুক্ত করে দণ্ড দেওয়া যাবে না, বরং সুবিচারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একটা সমাজের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য রাষ্ট্রকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রের সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হলে মানুষ যুলমের শিকার হবে।

মন্তব্য

ইসলামী নীতিদর্শনে সুবিচারের ধরাণা সম্পর্কে এতক্ষণের আলোচনায় আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি, এটি শুধু মানবীয় গুণ নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টিজগতের সমস্ত শৃঙ্খলা এই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুবিচার নীতি যখন মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তখন এটি আল্লাহর সেই গুণে গুণান্বিত হওয়াকেই ইঙ্গিত করে। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক নিজে যেমন সত্য ও ন্যায়ের পূর্ণ অনুসারী তেমনি রাজ্য ও মানুষ পরিচালনায় তিনি ন্যায়ের অনুসরণ করেন। তাঁর এই ভূমিকার কারণে তিনি হাশরের বিচারে আল্লাহর আরশের ছায়ার সর্বোচ্চ

স্থানে অবস্থান করবেন। শুধু শাসক হিসেবে নয় প্রতিটি মানুষ এই গুণের অধিকারী হতে পারে, যখন সে তার নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে এবং নিজের পরিবার ও অধীনস্তদেরকে সেভাবে পরিচালনা করবে।

সুবিচারের ধারণা মানুষের নিজস্ব পরিমণ্ডলের বাইরেও বিস্তৃত। আল্লাহর সৃষ্টি জগতের যা কিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত আকাশ, বাতাস, বৃক্ষ-নদী পরিবেশ সব কিছুই মানুষের কাছ থেকে সুবিচার পাওয়ার অধিকার রাখে। একটা কুকুর যখন পানির অভাবে কারো সামনে কষ্ট পায় তখন সেই কুকুরকে পানি দেওয়াও মানুষের দায়িত্ব।

তথ্যনির্দেশ

১. Abul Fadl Jamal al-Din Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Sadr, 1992), p.153.

২. আল-কুরআন, ৫০: ২৯।

৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা* (প্রথম খণ্ড), অনু. আহমদ মানযুরুল মাওলা (ঢাকা: ফেরদৌস পাবলিকেশন্স, ১৯৭৮), পৃ. ১৪২।

৪. আল-কুরআন, ১৬: ৯০ (اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ)।

৫. Arnold Brecht, *Political Theory: The Foundation of Twentieth-Century Political Thought* (Princeton: Princeton University Press, 1967), p. 396.

৬. আল- কুরআন, ৪: ১৩৫।

৭. Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1965), pp.102-117.

৮. আল- কুরআন ,৭:২৩।

৯. প্রাগুক্ত, ৩৮:২৬।

১০. প্রাগুক্ত, ১৮:৮৬-৮৭।

১১. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ], অনু. প্রদীপ রায় (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন,২০০০), পৃ. ১৮৬।

১২. *বুখারী*: ২৮৫৬।

১৩. আল-কুরআন, ৪: ৩৬।

১৪. প্রাগুক্ত, ১০৯:৬।

১৫. প্রাগুক্ত, ৩১: ১৩।

১৬. Abul Fadl Jamal al-Din Ibn Manzur, *Ibid.*, p. 2305.

১৭. আল-কুরআন, ১৪: ৩৪।

১৮. প্রাগুক্ত, ২৭: ১৯।

১৯. *বুখারী*: ৪৮৩৬।

২০. আল-কুরআন, ৭: ১৭-১৮।

২১. প্রাগুক্ত, ১৪: ৭।

২২. আবুল হাশিম, "সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ", *ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬), পৃ. ৪০-৪১।

২৩. আল-কুরআন, ৭৩: ৯।

২৪. প্রাগুক্ত, ৪১: ২১-২২।

২৫. *বুখারী*: ১৯৭৫; *মুসলিম*: ১১৫৯।

২৬. আল-কুরআন, ১৪: ৪৫।

২৭. প্রাগুক্ত, ৬: ১৪০।

২৮. *বুখারী*: ৬১৯০।

২৯. *তিরমিযী*: ১৯৫২।

৩০. আল-কুরআন, ৩১: ১৪।

৩১. *তিরমিযী* : ২০২২।

৩২. *বুখারী*: ৫৯৮৩।

৩৩. *বুখারী*: ৫৯৮৫।

৩৪. *মুসনাদে আহমাদ:* ১৭৩৩৪।

৩৫. *ইবন মাজাহ* : ৪২১১।

৩৬. *বুখারী*: ৬০১৪।

৩৭. *বুখারী*: ৬০১৬।

৩৮. *আহমাদ:* ৯৬৭৫।

৩৯. *বুখারী*: ৬১৩৬।

৪০. আল-কুরআন, ৯: ৬।

৪১. সাইয়েদ কুতুব, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, অনু. আকরাম ফারুক (ঢাকা: স্মৃতি প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ২৫।

৪২. *তিরমিযী* : ৩৯৫২; *বায়হাকী*: ৫১৩৭।

৪৩. Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2009), p. 280.

৪৪. খলীফা আবদুল হাকীম, "ইসলামী সমাজ: সাম্য", *ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬), পৃ. ৭৫।

৪৫. *বুখারী*: ২৬৫০; *মুসলিম*: ১৬২৩।

৪৬. সাইয়েদ কুতুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০।

৪৭. Brenda Almond & Donald Hill (ed.), *Applied Philosophy* (London: Routledge, 1991), p.158.

৪৮. মুহাম্মদ কুতুব, *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম*, অনু. হাসান জামান (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১১৫।

৪৯. *প্রাগুক্ত*।

৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯।

৫১. *মুসলিম*: ৪৫৫৭।

৫২. সাইয়েদ কুতুব, *ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি*, অনু. আকরাম ফারুক (ঢাকা: স্মৃতি প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১৬-১৭।

৫৩. আল- কুরআন, ৪: ১৩৫ ।

৫৪. Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam* (London: One world Publications, 2008), p. 111.

৫৫. A. M. Okun, *Equality and Efficiency: The Big Trade off* (Washington, DC: The Brookings Institute, 1975), p. 11.

৫৬. Abul Hasan al-Mawardi, *Kitab Adab al- Dunya wa`l-Din* (Istambul: Qastantina, 1999), p.130.

৫৭. সম্পাদনা বোর্ড, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামীক ফাউন্ডেশন,২০০৯), পৃ. ৫৫৫ ।

৫৮. *তিরমিযী*: ১৩৩৩ ।

৫৯. *প্রাগুক্ত :* ১৭১৪ ।

৬০. *আবু দাউদ:* ২৯৪৩ ।

৬১. Ahmad ibn-Muhammad Miskawayh, *Tahdhib al-Akhlaq,* tr. Constantine K. Zurayk (Beirut: American Univesity of Beirut, 1968), p.111.

৬২. *Ibid.*, p. 93.

৬৩. Jalal al-Din Dawwani, *Akhlaq-i Jalali*, eng. tr. W. F. Thompson (Calcutta: Habl-ul-Matin Press, 1911), p.122.

৬৪. *Ibid*., p.129.

৬৫. Hossein Nasr, *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* (Harvard: Divinity School, 2003), pp. 85-87.

৬৬. Brenda Almond & Donald Hill (ed.), *Ibid*., p.114.

৪র্থ অধ্যায়

পরার্থপরতা

মানুষের ভেতর যে চেতনাটি তাকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে, তা হচ্ছে অন্যের জন্য কাজ করা। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের অর্থও হচ্ছে অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। সব নবী-রাসূল ছিলেন মানুষের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। নবীজীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন, "আমি তোমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত বা দয়া স্বরূপ পাঠিয়েছি"।[১] নবীর অনুসারী মুসলিম জাতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে,

> তোমরা সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে...।[২]

অর্থাৎ সর্বশেষ নবী ও সেই নবীর অনুসারীদের মূল পরিচয় তাঁরা হবেন মানবতার সবচেয়ে কল্যাণকামী। প্রকৃতপক্ষে নবী ও তাঁর নিকটতম সাহাবী বা অনুসারীগণ যথার্থভাবেই সেই কাজ করে গিয়েছেন। কুরআনে এ কাজের যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে *ইহসান*, *ঈছার* (অন্যকে অগ্রাধিকার), *হুব্বু ফিল্লাহ* (আল্লাহর জন্য ভালোবাসা) প্রভৃতি। সহজ কথায় *ইহসান* হচ্ছে, অন্যের জন্য কল্যাণসাধন যা স্বাভাবিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি করা হয়। প্রধানত এ শব্দটির দুটি অর্থ: (১) পূর্ণতা বা উৎকর্ষতা এবং (২) পরোপকার। প্রথম অর্থটি পরের অধ্যায়ের আলোচনায় আসবে। এখানে আমরা পরোপকার অর্থে এটিকে গ্রহণ করব। কুরআনের বাণীতে এভাবে এসেছে,

> আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তদ্বারা পরকালের কল্যাণ সন্ধান করো আর দুনিয়ায় তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না, পরোপকার করো যেমন আল্লাহ তোমার উপকার করেছেন।[৩]
>
> পরোপকারের প্রতিদান পরোপকার ছাড়া আর কি হতে পারে?[৪]

এখানে ইহসান শব্দের মাধ্যমে পরোপকারকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর দয়া আমাদের প্রতি সীমাহীন-সেটিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন আমরাও যেন মানুষের প্রতি দয়া দেখাই।

আল্লাহ আমাদের জন্য যে দয়া দেখাচ্ছেন এর বিনিময়ে আল্লাহর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। আমরা বরং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে তাঁর ভালোবাসা অর্জন করতে পারি। তিনি আমাদের কাছ থেকে আশা করেন আমরা যেন তাঁর অসহায় বান্দাদের জন্য সদয় হই। প্রকৃতপক্ষে, কোনো সমাজই দয়া, ভালোবাসা ছাড়া টিকতে পারে না। কুরআন মানুষের মধ্যে এমনই ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করতে চায় যা দেশ-কাল, ধর্ম-বর্ণ সবকিছু ছাড়িয়ে যায়। ইকবাল এজন্যই বলেছেন, "চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা/ মুসলিম হেঁয় হাম ওয়াতান হায়, সারা জাহাঁ হামারা"। অর্থাৎ আমরা মুসলিম; চীন, আরব, হিন্দুস্তান

আমাদের দেশ, সারা পৃথিবী আমাদের। এই অধ্যায়ে আমরা পরার্থপরতার ধারণা, এর ভিত্তি, ইসলামী নীতিদর্শনে এর ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুটা বিশ্লেষণ করব।

১. পরার্থপরতার ধারণা

নিজের কল্যাণের চেয়ে সবসময় অপরের কল্যাণে নিবেদিত থাকা এবং নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার নামই হচ্ছে পরার্থপরতা বা *আল্ট্রুইজম*। ইসলামী নীতিদর্শনে এটি ইহসান নামে পরিচিত। ইহ*সান* এর সমার্থক হিসেবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে *ঈছার* বা অগ্রাধিকার শব্দটিকেও ব্যবহার করা হয়েছে; বরং এটি ইহসানকে আরো স্পষ্ট করেছে। যেমন,

> আর মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।[৫]

এখানে মদীনার আনসার সাহাবীদের অতুলনীয় ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মানবেতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁরা মক্কা থেকে আগত মুসলিম মুহাজির ভাই-বোনদেরকে নিজেদের সহায়-সম্পদ, পরিবার ও সন্তানদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁদের সম্মানেই কুরআনে *ঈছার* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে যার অর্থ 'নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া'। ইসলামে এটিকে ঈমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিক দর্শন ও সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে পরার্থপরতার ধারণাটি প্রথম সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে অগাস্ট কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) আলোচনায়। কিন্তু তিনি ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে মানবতার জয়গান গাইতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই মানবতাবাদের মূলনীতি ছিল ভালোবাসা ও দয়া আর ভিত্তি ছিল শৃঙ্খলা।[৬] এই মতবাদের সমালোচনা থাকলেও তিনি পরার্থবাদী চিন্তার যে সূচনা করেছিলেন তা পাশ্চাত্য দর্শনে ভূমিকা রাখে। এডাম স্মিথের (১৭২৩-৯০) *মোরাল সেন্টিমেন্টস* গ্রন্থে সমাজের মানুষের কল্যাণে মানুষের কাজের প্রশংসা থাকলেও পরবর্তীতে *ওয়েলথ অব নেশনস* গ্রন্থে তিনি মানুষকে স্বার্থপর হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ মানুষ একই সময় পরার্থপর আবার স্বার্থপর। ডেভিড হিউমের মাধ্যমে এর সমাধান হয়, মানুষ নিজেকে ভালোবাসে এবং শত্রু ছাড়া অন্যদেরকেও ভালোবাসে।[৭] তবে কোঁতের আলোচনায় ভালোবাসার ভিত্তিতে নতুন মানবতাবাদী ধর্মের প্রস্তাবনা ছিল। পরবর্তীতে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকা ও ইউরোপে মানবতাবাদের নতুন আলোচনা আসে। এর মূল কথা হচ্ছে, ধর্ম নয়, মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাই তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। মানুষের প্রতিদিনকার সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষই যথেষ্ট, এর জন্য কোনো অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই।[৮] তবে পরার্থবাদ এই অর্থে প্রচলিত মানবতাবাদের চেয়ে ভিন্ন। আধুনিক পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পরার্থবাদী অর্থনীতির মানে হচ্ছে দান-খয়রাতের অর্থনীতি, যা খ্রিষ্টধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মে উৎসাহিত করা হয়।[৯] ইসলাম যে পরার্থপরতার ব্যাখ্যা দেয় সেটি এক অর্থে এক

ধরনের আত্মপরতা অন্য অর্থে সর্বোচ্চ মানবতাবাদী চিন্তা। আত্মপরতা বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে, ইসলাম মানুষকে অনর্থক কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছে এবং হিসেবের বিবেচনায় কাজের পরকালীন মূল্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। পরকালীন কল্যাণের চিন্তা ছাড়া যে কোনো কাজ ইসলামে মূল্যহীন। পৃথিবীর সব নবী-রাসূল বিনা পারিশ্রমিকে মানবতার কল্যাণে নিজেদের সব বিলিয়ে দিয়েছেন, এমনকি কোনো সামান্য উত্তরাধিকারী সম্পত্তিও তাঁরা রেখে যাননি, কিন্তু তাঁরা পরকালে এর বিনিময়ে সর্বোচ্চ জান্নাতের সুবিধা ভোগ করবেন। আবার সর্বোচ্চ মানবতাবাদী এ কারণে যে, এখানে মানুষের উপকার করা আবশ্যক, এমনকি জীবন দিয়ে হলেও অন্যকে রক্ষা করা তার জন্য আবশ্যক; বিনিময়ে সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধেরও আশা করা যাবে না। সম্পূর্ণ স্বার্থহীন মানব কল্যাণই হচ্ছে ইসলামী পরার্থবাদিতার মূল কথা।

২. পরার্থপরতার মৌলিক ভিত্তি

পরোপকার কেন করা উচিত- এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর থেকে পরোপকারের প্রাথমিক ভিত্তি উদ্ঘাটন করা সম্ভব। ইসলাম সেটিকে সবার আগে তুলে ধরেছে। সেটি হচ্ছে- **প্রথমত**, মানুষের সম্পদ ও রিযকের ক্ষণস্থায়ী মালিকানা। মানুষ তার সম্পদ ভোগ করার জন্য খুব অল্প সময় পায়। আদম (আ.) এর আগমনের পরে পৃথিবীর যাবতীয় সবকিছু তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তিনি প্রায় একহাজার বছরের জীবনে ইচ্ছে মতো এর উপকার ভোগ করেছেন। এভাবে তাঁর মৃত্যুর পর এ সম্পদের ভোগ দখল পরবর্তী হাজার বছর ধরে পর্যায়ক্রমে চলে আসছে। এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের নিজস্ব সম্পদ বলে আসলে কিছু নেই, সব মানুষের মৃত্যু হয়ে গেলে সব সম্পদ রয়ে যাবে এবং সরাসরি আল্লাহর মালিকানায় আবার চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এই সম্পদ মানুষ যা নিজে উপার্জন করে এবং যা উত্তরাধিকার সূত্রে পায় ইসলামী মতে, সবই আল্লাহর দান। আল্লাহ যাকে চান অল্প কিছু সময় এর ভোগ দখলের সুযোগ দেন। "আল্লাহ যাকে চান রিযক বৃদ্ধি করেন, যাকে চান রিযক সংকুচিত করে দেন"।[১০] এজন্য আল্লাহ তাঁর এই সম্পদের ব্যাপারে মানুষের কাছ থেকে জবাবদিহিতা চাইতেই পারেন। আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম *মান্নান* (অনুগ্রহের খোঁটাদানকারী)। এটি কেবল তাঁর জন্যই প্রযোজ্য, অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করতে পারবে না। বরং একজন মানুষ কেন অপরের জন্য কাজ করবে না, এটা বোঝানোর জন্য বারবার তিনি মানুষের উপর তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। "এরপরও তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে মিথ্যা বলবে?"[১১]

> তোমরা যে বীয বপন কর, সেটি সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তার উৎপন্ন কর, নাকি আমি তার উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছে করলে তাকে খড়-কুটো করে দিতে পারি, তখন তোমরা আশ্চর্যবোধ করবে। বলবে, আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম; বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে গেলাম।[১২]

> যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর। তখন অবিশ্বাসীরা ঈমানদারদের বলে, ইচ্ছে করলেই আল্লাহ যাকে খাওয়াতে পারেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াব? তোমরাই বরং স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছ।[১৩]

এভাবে, আল্লাহ মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন আসলে যা কিছু নিয়ে তারা গর্ব করে বেড়াচ্ছে এগুলোর প্রকৃত মালিক তারা নয়। নিজের মালিকানাধীন সম্পদ বলে অহংকার করার বা অন্যকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ তার নেই। কিন্তু তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের মনের পরীক্ষা নিতে, আমরা কি সত্যিই অন্যকে ভালোবেসে তা করছি, না কি কোনো নিজস্ব স্বার্থে করছি, না কি আদৌ করছি না। আবার, আল্লাহ কাকে কতটুকু রিযক দেবেন সেটাও তিনিই নির্ধারণ করেন।

> তারা কি তোমার রবের রহমত বণ্টন করে? আমি তাদের জন্য পার্থিব জীবনের রিযক বণ্টন করেছি এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করে।[১৪]

আল্লাহ সবাইকে সমান রিযক দেন না। মানুষ চাইলেই অনেক উপার্জন করতে পারে না আবার ইচ্ছেমত ভোগও করতে পারে না। এর কারণ তিনি এখানে বর্ণনা করেন, যেন মানুষ পরস্পরের কাজে লাগে এবং পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে একারণেই সামাজিক সব প্রতিষ্ঠান একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পার্থিব মর্যাদার একটি মাধ্যমও সম্পদশালী হওয়া। কিন্তু এই সম্পদকে যারা অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করে এবং অপচয় ও অপব্যায় না করে সীমিত পরিমাণে নিজেদের প্রয়োজন মেটায় এই মর্যাদাটা সম্পদের মাধ্যমে তারাই অর্জন করতে পারে। ব্যক্তি এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যও অর্জন করতে পারে।[১৫]

দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি পরোপকারের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে সেটি হচ্ছে সীমিত পরিমাণ হলেও সম্পদের ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকার। অর্থাৎ অপরকে কোনো কিছু দিতে হলে সেটির নিজস্ব মালিকানা থেকেই দিতে হবে। অন্যের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া আরেকজনকে দেওয়ার অধিকার কারো নেই। কুরআন এটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে যা দান করেছেন অথবা তারা যা নিজ হাতে উপার্জন করে মালিক হয়েছে মানুষ সেখান থেকেই কেবল নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্য ব্যয় করতে পারবে।

> আমি যে জীবনোপকরণ তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে"।[১৬]

> তারা কি দেখে না যে আমার হাতে সৃষ্ট জিনিসগুলোর মধ্যে আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত পশু আর এখন তারা এগুলোর মালিক, আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে এগুলোর কতক তাদের বাহন, আর এদের কতকগুলো তারা খায়। তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকার আর পানীয় দ্রব্য। তবুও তারা কেন শুকরিয়া আদায় করে না?"[১৭]

অর্থাৎ বিশ্বজগতের যাবতীয় সম্পদের মালিকানা আল্লাহর অধীনে থাকলেও তিনি মানুষকে এগুলোর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন, সেখান থেকেই অন্যের জন্য ব্যয় করতে হবে। সম্পদের ব্যক্তি-মালিকানা না থাকলে এবং সবকিছু রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে ছেড়ে দিলে মানুষ তার আত্মীয়-স্বজন বা আপনজনকে কোনো কিছু উপহার দিতে পারবে না; কারো ব্যক্তিগত এমন প্রয়োজন থাকতে পারে যা রাষ্ট্রের কাছে বলা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে

গোপনে কেউ যদি কারো সাহায্য করতে চায়, সেটিও পারবে না। তবে উপার্জনের জন্য কুরআন বৈধ পন্থায় বৈধ সম্পদ অন্বেষণ করতে বলেছে। "তোমরা হালাল ও পবিত্র জিনিস খাও, শয়তানের পদচিহ্নের অনুসরণ করো না"।[১৮]বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জনের জন্য ক্ষতিকর বা উপকারী জিনিসের পার্থক্য করা হয় না, বরং যার মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায় সেটিই বৈধ। এ কারণেই, মানুষ বিভিন্ন অনৈতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যেও লিপ্ত হয়। সরকার তাদের অনুমোদন দেয়, কারণ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সেখান থেকে অর্জিত হয়। কুরআন সম্পদের মালিকানাকে এক ধরনের পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছে। "নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ"।[১৯] এই সম্পদ উৎসর্গ করার মাধ্যমে কে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে সেটি শেখানোই কুরআনের লক্ষ্য। "তোমরা কখনো পুণ্যের অধিকারী হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস থেকে তোমরা ব্যয় করবে"।[২০] এর মানে শুধু দান নয়, বরং উৎসর্গ করতে হবে সবচেয়ে সুন্দর ও প্রিয় জিনিসকে। এই উৎসর্গ হতে পারে অসহায়দের সাহায্যের জন্য, রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য, ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কিংবা যে কোনো ভালো কাজের জন্য। এটিকে কোনো বিনিয়োগ মনে করা যাবে না, যার বিনিময়ে বার্ষিক লভ্যাংশ মেলবে। এটিকেই অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কোন জিনিস তারা ব্যয় করবে? তুমি বলে দাও: অতিরিক্ত অংশ"।[২১] অতিরিক্ত অংশের ব্যাখ্যায় আপেক্ষিকতার আশ্রয় নেওয়া যাবে না, বরং মহানবীর মহান সাহাবীরা এবং পরবর্তীকালের মহান ব্যক্তিগণ যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার অনুসরণ করতে হবে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর পরীক্ষা, কে সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ভালোবেসে ব্যয় করে, আর কে বোঝা মনে করে সামাজিক চাপে ব্যয় করে, কিংবা কৃপণতা করে সম্পদের পাহাড় বানায়- তিনি তা দেখবেন।

৩. পরার্থপরতার গৌণ ভিত্তি

পরার্থপরতার যেসব ভিত্তি সর্বজনীন চিন্তার উপর নির্ভরশীল সেগুলোকে আমরা এখানে আলোচনা করব। প্রধানত তিনটি বিষয়কে আমরা এখানে স্থান দিতে চাই: বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব। মানুষের মাঝে একে অপরের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠার পেছনে এই উপাদানগুলো সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। ইসলাম তার আধিবিদ্যক ধারণাসমূহের মাধ্যমে এগুলোর পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে চায়। এ কারণে আল্লাহর উপর প্রবল বিশ্বাস থেকে যে বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে তা পার্থিব নিঃস্বার্থতার চাইতে বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে।

ক. পারস্পরিক বন্ধন

মানুষের পারস্পরিক বন্ধন অন্যের প্রতি দায়িত্বপালন বা অন্যের উপকারের প্রাথমিক ভিত্তি। যান্ত্রিক বন্ধন আর মানবিক বন্ধনের পার্থক্য মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক কারণে। যন্ত্র কখনো অন্য যন্ত্রের উপকার করতে পারে না, কিন্তু ইতর প্রাণী সীমিত পরিমাণে এবং একমাত্র মানুষই যথার্থভাবে অন্যের উপকার করতে পারে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানুষের বন্ধন প্রধানত তিন ধরনের হয়।[২২](১) জৈবিক ও প্রাকৃতিক বন্ধন: অর্থাৎ পরিবার গঠনের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান ও আত্মীয়তার বন্ধন। (২) কৃত্রিম বা প্রয়োজন

ভিত্তিক বন্ধন: যেমন, চাকুরি, ব্যবসায় বা পেশাগত কারণে সৃষ্ট বন্ধন। (৩) সামাজিক এবং ঐচ্ছিক বন্ধন: যেমন, সেবামূলক কাজের জন্য সৃষ্ট সম্পর্ক বা বন্ধন। তবে তিনটি শক্তিশালী উপাদান আছে যা মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে দৃঢ় করে: পরিবার, ধর্ম ও রাজনীতি।

(১) পারিবারিক বন্ধন: ইসলামী নীতিদর্শন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক কল্যাণ বা উপকারের যে গভীরতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। এটি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সবচেয়ে বড় ভিত্তি। স্টোয়িক মতাদর্শ ও বিভিন্ন ধর্মের বৈরাগ্য সাধনা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যে ত্যাগের কথা বলে ইসলামে এ ধরনের বৈরাগ্য সাধনা নেই। বরং একজন পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে পরিবার গড়ে তোলাই হচ্ছে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। মহানবী (স.) নির্দ্বিধায় সেটি ব্যক্ত করেছেন, "পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে আমার স্ত্রী"; সুতরাং যে তাঁর এই আদর্শ গ্রহণ করবে না সে মহানবীর দলভুক্ত হবে না। পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। আমরা সুবিচার অধ্যায়ে এ সম্পর্কে দায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি । অর্থাৎ পরিবার বা আত্মীয়তার অধিকারসমূহ সঠিকভাবে পালন না করলে তাদের সাথে অবিচার করা হয়। এখানে আমরা বলতে চাই, এই বন্ধনগুলো এত দৃঢ় বন্ধন যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ঘটে। আমাদের নিজের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে ভালোবাসা বা শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকবে এবং তাদের সমস্যা ও অসুবিধায় আমরা যেভাবে সাড়া দেব সেটি অন্যদের সাথে আচরণেও প্রভাব ফেলবে। যে পরিবারের ভেতর এই সুসম্পর্ক বজায় থাকে সেই পরিবারে শ্রদ্ধা, সহমর্মিতার মত নৈতিক মূল্যবোধগুলোর অনুশীলন হয়ে থাকে বেশি। প্রত্যেকে যদি তার পরিবার ও আত্মীয়দের এভাবে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে পারে, তাহলে সমাজের ভেতর শান্তি ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, অন্যের জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক বিশ্বে ধর্মের প্রভাব কমে যাওয়ায়, বিশেষত পাশ্চাত্যে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় সেখানে পরিবারেব প্রতি একধরনের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষদের অযাচিত কর্তৃত্ব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিগত শতকে নারীবাদ বড় ভূমিকা রাখে। এদের মধ্যে বিবাহের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। তবে তাদের একটি ধারা নারী স্বাধীনতার পক্ষে হলেও পরিবার বা কোনো আবেগমূলক সম্পর্ককে নষ্ট করতে না-রাজ। তাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক সাম্য ও সুযোগের সমতা, ইচ্ছার স্বাধীনতার বাস্তবায়ন বা স্বীকৃতি প্রভৃতি। এদের মধ্যে ম্যারি ওলস্টোনক্রাফট, হেরিয়েট টেইলর প্রমুখ অন্যতম। তবে পারিবারিক ভাঙন রোধে ইউরোপের চেষ্টা কমতি ছিল না। টি. এস. এলিয়ট তাঁর *ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন* নাটকে বলেন,

"তুমি যদি জানতে চাও কেন আমি কখনো উইশউডকে ত্যাগ করব না
সেটির কারণ, আমি উইশউডকে জীবিত রাখতে চাই
আমি আমার পরিবারকে জীবিত রাখতে চাই, সবাই একসাথে থাকতে চাই
আমাকে জীবিত রাখতে; এবং তাদেরকে নিয়েই আমি বেঁচে থাকি।"[২৩]

অর্থাৎ স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করার মাধ্যমে তিনি নিজের পরিবারকে নষ্ট হতে দিতে চান না। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে এলিয়টের স্ত্রীর জটিল অসুস্থতার কারণে সংসার সুখের হয়নি, তবুও এখানে তিনি যে সত্যবাণী উচ্চারণ করেছেন তা বিগত শতকের ষাটের দশকের পরিবার বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মগুলো পরিবারকে মানব সভ্যতার স্বাভাবিক বংশধারা বজায় রাখার একমাত্র বৈধ মাধ্যম মনে করে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। মহানবী (স.) যে ইসলামী সমাজের আদর্শ উপস্থাপন করেছেন সেখানে আছে নারী পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনের পরস্পরের স্নেহ মমতা, অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা। মহানবী (স.) এর পরিবার ছিল আদর্শ পরিবার। নিজ সন্তানকে কীভাবে স্নেহ করতে হয় তাঁর পুত্র কন্যাদের সাথে আচরণে তিনি তা দেখিয়েছেন। তাঁর তিনজন পুত্রসন্তান শৈশবেই মারা যান। তিনি সন্তানের মৃত্যুতে ডুকরে কেঁদে উঠেন, চোখের পানিতে তাঁর বুক ভেসে যায়, নিজ হাতে তাদের শেষ স্নেহ দিয়ে কবরে শায়িত করেন। কন্যা সন্তানদের মধেও কেউ দীর্ঘ জীবন পাননি। হযরত ফাতিমার মৃত্যু হয়েছে তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই। তিনি নিজ কন্যাদের সাথে মধুরতর স্নেহের সম্পর্ক দেখিয়েছেন এবং তাঁদেরকে আদব শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। একমাত্র ফাতিমার দুই সন্তান হাসান ও হোসাইন ছিলেন তাঁর বংশের জীবিত ধারা; তিনি তাঁদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কিন্তু ইসলামের শিক্ষা দিতে কখনো ত্রুটি করেননি । ইসলাম এই আবেগের সম্পর্ককে অনেক বড় করে দেখে। যদিও এর মাধ্যম যৌন সম্পর্ক বা বিবাহ, কিন্তু এই সম্পর্কই মানুষের সামাজিক সম্পর্কের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি।

ইসলাম মানবশিশুকে স্বাভাবিকভাবে গড়ে তোলার জন্য এবং দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য এর কোনো বিকল্প রাখেনি। হযরত আদম (আ.) এর সময় থেকে শেষ নবী পর্যন্ত কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। পারিবারিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর হক সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে। সুস্থ একটি পরিবারের সন্তানদের চরিত্র মা-বাবার চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান সন্তানের চরিত্র গঠনে মা-বাবার বড় ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। ইসলাম এই বিধানকে মানবজাতির জন্য আগেই অবহিত করেছে। সন্তানের ভেতর সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার দায়িত্বানুভূতি মা-বাবার, দাদা-দাদির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। সন্তানের প্রতি পিতৃ ও মাতৃ দায়িত্বে অবহেলার কারণে সন্তান উগ্র স্বভাববিশিষ্ট হয় এবং এক পর্যায়ে বাবা-মা এর অবাধ্যতার মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পারিবারিক অস্থিরতার প্রভাব পড়ে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতায়।

ইসলামী পরার্থপরতার শিক্ষা কেন্দ্র প্রধানত পরিবার এবং এরপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সুতরাং পরিবারে বাবা-মা যখন সন্তানের জন্য আদর্শ হবেন তখন সন্তানের চরিত্র সেভাবেই গড়ে উঠবে। একজন আদর্শ বাবা সন্তানকে পড়ালেখা শেখানোর সাথে সাথে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবেন। শিষ্টাচার মানেই হলো অন্যের সাথে শিষ্ট আচরণ। এক্ষেত্রে বাবা-মা ইসলামের বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে সন্তানের জন্য আদর্শ হবেন। সন্তান যেন বুঝতে পারে তার বাবা-মায়ের ক্ষমতা, সামর্থ্য খুব সীমিত, কেবল আল্লাহই আমাদের কর্মের

প্রতিদান দিতে পারেন। অভাবের সংসারে সন্তান যখন বুঝবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট, তখন সে সন্তান বাবা-মায়ের কাছে অন্য শিশুদের মত দামি জিনিসের আবদার করবে না। আল্লাহর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার এবং পরকালীন ভয় সৃষ্টির মাধ্যমে সন্তানকে মন্দ কাজে বাধা দিতে হবে। মহানবী (স.) যখন কোনো সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন হাসান হোসাইনের জন্য অল্প হলেও কিছু উপহার নিয়ে আসতেন। সন্তান এভাবে সন্তুষ্ট থাকে এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। তিনি ওদের একজনকে একদিন সদকার খেজুর খেতে দেখে বললেন, "এগুলো তোমাদের নয়, এগুলো তোমরা খাবে না, ফেলে দাও"। অর্থাৎ অন্যায় কাজের চেতনা ছোটবেলা থেকেই প্রবেশ করাতে হয়। দশ বছর বয়সে সন্তানকে নামাযের জন্য প্রয়োজনে প্রহার বা শাসন করতে বলা হয়েছে। তবে এর মানে ইচ্ছে মত পেটানো নয়, বরং স্নেহের সাথে শাসন করা। সর্বোপরি নিজেকে আদর্শ উপস্থাপন করে আল্লাহর নিকট দোআ করা। মিশরিয় কবি আহমদ শাওকী বলেন,

> ঐ শিশু ইয়াতীম নয় যার বাবা-মা মারা গিয়েছেন সন্তানকে দুর্দশা ও দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে, বরং ঐ শিশুই ইয়াতীম যার মা তাকে নিয়ে উদাসীন থাকেন অথবা বাবা থাকেন ব্যস্ত।[১৪]

অর্থাৎ সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন না করলে বাবা-মা থেকেও না থাকার মত। ইয়াতীম হওয়ার কারণে সন্তানের জীবনের যে কঠিন দুর্দশা ও হতাশা সৃষ্টি হয় প্রকৃত শিক্ষা ও নৈতিকতার অভাবে তার চেয়েও বেশি বিপদগ্রস্ত হতে হয়। এ কারণেই বাবা-মাকে সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল হতে হয়।

পরিবারে বাবা-মায়ের সাহচর্যে মৌলিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে যে মানব শিশু সমাজের সাথে মিশবে সে সমাজের মানুষের উপকারে কেন চিন্তা করবে না? অন্যের অধিকার সম্পর্কে সে নিশ্চয় সচেতন থাকবে এবং মানবতার প্রতি তার ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। সুতরাং পরিবারের এই আবেগের বন্ধন কেবল ব্যক্তিগত ভালোবাসার কেন্দ্রই নয় বরং বিশ্বমানবতার জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও বটে।

(২) কৃত্রিম বা প্রয়োজন ভিত্তিক বন্ধন: মানুষের কৃত্রিম বন্ধন হিসেবে চাকুরি বা ব্যবসায় বাণিজ্যকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমেও মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এটি বরং সমাজ সভ্যতার উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখে। কর্মক্ষেত্রে মানুষ পরস্পরের প্রয়োজনে সহযোগিতা না করলে সেখানে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। যদিও এই সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের মত নয় তবুও এটি মাঝে মাঝে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। একজনের বিপদে বা সমস্যায় অন্য একজন সহকর্মীর এগিয়ে আসতে হয়। এক্ষেত্রে মানুষের নৈতিক বোধের গুরুত্ব অপরিসীম। যদি স্বার্থহীনভাবে অপরের বিপদে অংশ নেওয়া যায়, তাহলে সে সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় হয় এবং এতে সমাজের ভেতর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ব্যবসায়ীগণ মানুষের সাথে যদি কেবল ব্যবসায়িক লাভের সাথে সাথে পরোপকারের মন নিয়েও আচরণ করেন, তাহলে তাদের ব্যবসায় লাভও বেশি আসতে পারে, বরং তখন তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে সমাজের ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষায়

তাঁদের সমন্বয়কারীর ভূমিকা হিসেবে। কারণ ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রয় করেন সবার জন্য; এখানে ধর্ম গোত্রের বা দলীয় বিবেচনা অর্থহীন। সুতরাং তাঁরা নিঃস্বার্থ হলে সমাজের সবাই সেই উপকার ভোগ করতে পারে।

দেশ পরিচালনায় অংশ নেওয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের কর্মচারীগণ যদিও পৃথকভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত নন, কিন্তু চাকুরিতে নিযুক্তির পর সৈনিক, নিরাপত্তায় নিয়োজিত বা অন্য যে কোনো কর্মচারী একটি পরিবারে রূপ নেয়। এজন্য একজন সৈনিক বিপদগ্রস্ত হলে তাকে অন্যরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। এখানেও আমরা বলতে পারি, চাকুরিবিধি অনুযায়ী পরস্পরকে সহযোগিতা করার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে নৈতিক অনভূতিই সত্যিকারভাবে অপরকে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

(৩) সামাজিক এবং ঐচ্ছিক বন্ধন: মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করতে গিয়েও পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যারা এ কাজে অংশ নেন, তারা পরস্পরে মিলিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে সে কাজ করেন। আমরা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বন্ধনকেও এ পর্যায়ে ফেলতে পারি। রাজনৈতিক দলসমূহের ভেতর একে অপরকে সহযোগিতার ভিত্তিতেই পদায়ন হয়ে থাকে। প্রতিটি ধর্মেই তাদের অনুসারীদের মাধ্যমে সৃষ্ট ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকে। এগুলোর উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার, মানবকল্যাণ বা আধ্যাত্মিক সাধনা। এছাড়া ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাও সৃষ্টি হয়। এভাবে দেখা যায় ধর্মের মাধ্যমে মানুষে মানুষে একটি বন্ধন বা সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই বন্ধন থেকে অপরের জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করার চেতনা তৈরি হয়।

খ. ভ্রাতৃত্ব

পরের জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধ অন্যতম ভিত্তি। পৃথিবীর সব মানুষ আদমের সন্তান হিসেবে সবাই ভাই ভাই। পবিত্র কুরআন এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষকে সম্বোধন করে। পৃথিবীর সব ধর্মের অথবা ধর্ম-নিরপেক্ষ মহামানবদের প্রায় সবাই এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই মানবতার জন্য কাজ করে গিয়েছেন। মহানবী (স.) কোনো মানুষকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, "আমি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে আবু বকরকেই আমি গ্রহণ করতাম"।[২৫] কিন্তু তিনি মানুষের মাঝে সৃষ্টি করেছেন ভ্রাতৃত্ব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধুত্বের চেয়েও গভীর। বন্ধু হওয়ার জন্য সাহচর্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু ভ্রাতৃত্বের কারণে পৃথিবীর একপ্রান্তের লোক অন্য প্রান্তের মানুষকে আদমের সন্তান হিসেবে সম্মান করবে; মুসলিম হিসেবে এক মুসলিম অপর মুসলিমের দুঃখ বা আনন্দে অংশ নেবে। ইসলাম বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেনি। বরং এর প্রয়োজনও অপরিসীম।

পবিত্র কুরআনে মুমিনদেরকে পরস্পর ভাই হিসেবে উল্লেখ করে বলেছে, ভাইয়ের দায়িত্ব ভাইকে সংশোধন করে দেওয়া, দোষ অন্বেষণ নয়। সূরা *আসরে* বিশ্বজনীন মানব ভ্রাতৃত্বের কথা এসেছে অন্যকে বিপদে সাহায্য করার অংশ হিসেবে। এখানে ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং সমগ্র মানবজাতির ব্যথায় ব্যথিত হতে বলা হয়েছে। যে কোনো নীতিদর্শনের জন্যই এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, এর অনুসারীদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ব থাকবে। ইসলামী নীতিদর্শন প্রতিটি মানুষকে মানুষ হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, "যে যুবক কোনো বৃদ্ধকে বার্ধক্যের কারণে সম্মান করবে,

নিশ্চয় আল্লাহ তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নিয়োজিত করবেন যে তার সম্মান করবে"।[২৬] সব বয়সের ও পেশার মানুষকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে নিজেরই সম্মান অর্জিত হয় আর এভাবে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গঠিত হয়। তিনি আরো বলেন,

> বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান করা, এমন কুরআন সংরক্ষণকারীকে সম্মান করা- যে তাতে বাড়াবাড়ি করে না আবার এর হক আদায়েও ত্রুটি করে না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত।[২৭]

এখানে সমাজের কয়েক ধরনের মানুষের বর্ণনা এসেছে, যাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বয়স্ক শ্রেণি। অন্যান্যরা হচ্ছেন জ্ঞানী ও শাসক শ্রেণি; তবে বৃদ্ধদের প্রসঙ্গ নবীজী আগে নিয়ে এসেছেন। বর্তমান সভ্যতায় সমাজের বয়স্কদের যে কষ্টকর জীবন কাটাতে হয়, তার পরিবর্তে ইসলাম এমন পথ দেখিয়েছে যেন, বৃদ্ধদের বোঝা হয়ে থাকার অবস্থা না হয়। বৃদ্ধাশ্রমের মাধ্যমে যদিও এই কষ্ট খানিকটা লাঘবের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এটি হচ্ছে মানবতার সর্বশেষ অবলম্বন। আগেই উল্লেখ করেছি, পরস্পর ভ্রাতৃত্বের প্রথম প্রশিক্ষণ পরিবার থেকেই শুরু হয়। কুরআন এটিকে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে,

> হে মানব জাতি, তোমাদের পালনকর্তাকে তোমরা ভয় কর, যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, তাদের উভয়ের মাধ্যমে অসংখ্য নারী-পুরুষকে বিস্তার করেছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর আর আত্মীয়তার ব্যাপারে সতর্ক হও। নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।[২৮]

অর্থাৎ গোটা মানব জাতিকে এখানে সম্বোধন করে বলা হয়েছে তারা যেন আল্লাহকে মেনে চলে এবং নিজেদের আপনজন, বাবা-মা, আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসে, তাদের অধিকার নষ্ট না করে এবং তাদের ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকে। এই নির্দেশনায় ইসলামের মূল বাণী 'সকল মানুষ ভাই ভাই' তত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে। তাওহীদেরও মূল শিক্ষা এক আল্লাহর অনুসরণে এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা।

ইসলাম ভ্রাতৃত্ব, দয়া ও ভালোবাসার আদর্শ হিসেবে মহানবী (স.)কে উপস্থাপন করেছে। কুরআনে এসেছে,

> তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্টে তিনি বিচলিত হন। তোমাদের কল্যাণ বিধানে তিনি অতি আগ্রহী, মুমিনদের জন্য অত্যন্ত মেহেরবান, অতি দয়াময়"।[২৯]
>
> এটা আল্লাহর বড় মেহেরবানী যে, আপনি তাদের জন্য কোমলপ্রাণ। যদি আপনি কঠোর আচরণ ও পাষাণ হৃদয়ের অনুসারী হতেন তাহলে এরা আপনার চারপাশ থেকে চলে যেত। তাই আপনি তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন"।[৩০]

অর্থাৎ কুরআন ইসলামের নবীকে ভালোবাসা ও কোমলতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি কীভাবে মানুষকে ভালোবাসবেন সেই পন্থাও আল্লাহ তাঁকে শিখিয়ে দেন, অর্থাৎ সবাইকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করা এবং তাদের মতামতকে সম্মান করা। মহানবীর এই গুণ তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে,

'আত্বা ইবনু ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আস (রা.) -এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বললাম, "তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর যে গুণ বর্ণিত আছে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন"। তিনি বললেন, হাঁ, আল্লাহর শপথ, কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলিসহ তাওরাতে তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে- "হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী হিসেবে এবং উম্মতের রক্ষাকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মুতাওয়াক্কিল বা ভরসাকারী, তুমি রূঢ় বা কঠোর হৃদয় এবং বাজারে তর্ককারী ও হৈ-হুল্লোড়কারী নও।" তিনি কোনো মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করবেন না, বরং তিনি এদেরকে মার্জনা করে দেবেন এবং মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেবেন না, বক্রপথে চালিত জাতিকে যতদিন তাঁর দ্বারা সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত না করবেন । অর্থাৎ যতক্ষণ লোকজন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর উপর বিশ্বাসী না হয় এবং তার দ্বারা অন্ধ চোখ, বধির কান এবং বদ্ধ অন্তর উন্মুক্ত হয়ে না যায়।[৩১]

এখানে, মহানবী (স.) এর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তিনি প্রকৃতপক্ষে তার চেয়েও সুন্দর ছিলেন। তিনি শুধু অন্যের সাথে উত্তম আচরণের কথাই বলেননি, বরং নিজের আত্মসম্মান রেখে চলার কথাও বলেছেন। কেউ যখন নিজের অপরাধের কথা প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়, তখন আসলে তার ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু থাকে না। এভাবে নিজেকে হাসির পাত্র বানাতে ইসলাম নিষেধ করে। আবার এতে অপরাধের প্রকাশ্য রূপ নেওয়ারও শংকা সৃষ্টি হয়। সুতরাং নবী ও মু'মিনদের আদর্শই হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন।

গ. বন্ধুত্ব

বন্ধুত্ব হচ্ছে পরস্পরকে ভালোবাসার নাম। মানুষ যখন অপর মানুষকে তার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তখন বন্ধুত্ব রক্ষায় বন্ধুর জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হয়। একারণেই পরার্থপরতার এটি একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আল-গাযালী ভালোবাসার ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষের নিকট সব জিনিস তিন ধরনের: প্রিয়, অপ্রিয়, নিরপেক্ষ।[৩২] তবে তা অর্জনের প্রথম শর্ত হচ্ছে জানা বা অভিজ্ঞতা লাভ। মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ সর্বপ্রথম মানুষকে জানতে সাহায্য করে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের কাজ ভিন্ন, সেকারণে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দেয় এবং আনন্দ দেয়। চোখের আনন্দ দেখার বস্তুতে, কানের আনন্দ হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত ও মিষ্ট কণ্ঠস্বরে, নাকের আনন্দ উৎকৃষ্ট সুগন্ধিতে, জিহ্বার আনন্দ সুস্বাদু খাবারে, ত্বকের আনন্দ কোমল স্পর্শে। কিন্তু এসব বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের উর্ধ্বে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যাকে তিনি বুদ্ধি, অন্তর বা নূর বলেন সেটিই একটি পশুর আনন্দ থেকে মানুষের আনন্দকে পৃথক করে। তিনি আরো বলেন, মানুষ পাঁচটি কারণে কোনো কিছুকে ভালোবাসে–(ক) নিজের অস্তিত্বের স্থায়িত্ব বা পূর্ণতার কারণে, (খ) অনুগ্রহের কারণে, (গ) কোনো বস্তুর সত্তার কারণে, (ঘ) রূপ-সৌন্দর্যের কারণে ও (ঙ) আত্মিক মিলের কারণে। এই পাঁচটি কারণ একসাথে পাওয়া গেলে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এগুলোর সবকটি একসাথে পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র তিনি একই সাথে পাঁচটি গুণের অধিকারী। এজন্য আমাদের

সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। তিনি এটিকে "মানুষের মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দেন" কথাটির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে মানুষের আত্মিক মিল থাকার প্রমাণ করেন।[৩৩]

আল্লাহর সাথে মানুষের এই প্রেমের সম্পর্কের প্রকাশ কীভাবে ঘটাতে হবে-সেটিই হচ্ছে নৈতিকতার প্রশ্ন। কুরআন সেটি বলে দিয়েছে,

> বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো, তবে তিনি তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৩: ১২৩)

এর অর্থ হচ্ছে আমরা আল্লাহকে দেখি না এবং তাঁর স্বরূপ মানবিক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করতে পারি না, এজন্যই তাঁর প্রতিনিধি হযরত মুহাম্মদ (স.)কে তিনি সর্বোত্তম চরিত্র দিয়ে সুগঠিত করেছেন যেন মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন হতে পারে। তাঁকে অনুসরণ করলেই আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়। আবার আল্লাহর ভালোবাসার আরেকটি অনিবার্য দাবি হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসা। মহানবী (স.) বলেছেন, "মুমিন ব্যক্তি ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল। সেই ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যে অন্যকে ভালোবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালোবাসে না।[৩৪] তিনি আরো বলেন, "কোনো ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না সে কেবল কোনো মানুষকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে"।[৩৫] অর্থাৎ ইসলাম মানব সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার এমন সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে যার ফলে একে অন্যের উপকারে সব সময় তৎপর থাকবে।

মহানবী (স.) বলেছেন, "মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর থাকে; সুতরাং কার সাথে বন্ধুত্ব করবে তা ভেবে দেখবে;"।[৩৬] অর্থাৎ বন্ধু যে আদর্শের হয় সেটি তার চরিত্রে প্রভাব পড়ে। অসৎ বন্ধু অসৎ স্বভাবসম্পন্ন মানুষে পরিণত করে; আবার সৎ বন্ধু তাকে সততা শেখায়। আরেকটি হাদীসে এসেছে,

> সৎ ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল আতর-ওয়ালা ও কামারের মত। আতর-ওয়ালা তোমাকে তার আতর উপহার দেবে, নতুবা তুমি তার নিকট থেকে আতর ক্রয় করবে, নচেৎ এমনিতেই তার নিকট থেকে সুবাস পাবে। আর কামার হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে, না হয় তুমি তার নিকট থেকে পাবে দুর্গন্ধ।"[৩৭]

অর্থাৎ, মানুষ না বুঝে বা তুচ্ছ মনে করে মন্দ লোকদের সাথে যখন চলা ফেরা শুরু করে তখন ধীরে ধীরে বন্ধুর মন্দ স্বভাবগুলো সংক্রমিত হতে থাকে। অন্যদিকে ভালো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব একজন ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে উৎকৃষ্ট স্বভাববিশিষ্ট মানুষে পরিণত করে। মহানবী (স.) এর পরম প্রিয় চাচা আবু তালিব জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাঁর পুরোনো মন্দ বন্ধুদের প্রভাবে প্রভাবিত হন এবং নিজেকে জাহান্নামের উপযুক্ত করে ফেলেন। আল গাযালী ইমাম জাফর সাদিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

> পাঁচ প্রকার ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না: (১) মিথ্যাবাদী। সে তোমাকে ধোঁকা দেবে। দূরবর্তীকে সে নিকটতর করবে আর নিকটবর্তীকে দূরে ঠেলে দেবে। (২) নির্বোধ। এদের কাছ থেকে তুমি কোনো উপকার পাবে না, বরং উপকার করতে গিয়ে তোমার ক্ষতি করে ফেলবে। (৩) কৃপণ। এরা তোমার

কঠিন অভাবের সময় তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। (৪) ভীরু। এরা বিপদের সময় শত্রুর হাতে তোমাকে রেখে পলায়ন করবে। (৫) পাপী। এরা তোমাকে সামান্য তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়েও বিক্রয় করে ফেলবে।[৩৮]

বন্ধু নির্বাচনে এই বিষয়গুলোকে যারা মূল্যায়ন করবে তারা সৎ বন্ধুত্বের সুফল পার্থিব ও পরকালীন উভয় জগতে পেতে পারে। এই বন্ধুত্বের উপরই ইসলামী পরার্থপরতা নির্ভরশীল। বৈষয়িক প্রয়োজনের বন্ধুত্ব প্রয়োজন পূরণ হলেই শেষ হয়ে যায়; কিন্তু আধ্যাত্মিক কারণে সৃষ্ট বন্ধুত্ব বিপদে ও সুখে, প্রয়োজনের সময় এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও টিকে থাকে।

৪. পরার্থপরতার ধরন

ইসলামী নীতিদর্শনে পরার্থপরতার বাস্তব পদ্ধতি বা ধরন সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা এসেছে। প্রচলিত নৈতিকতায় অন্যের বিপদে সাহায্য করলেই তাকে পরার্থপরতা বলা হয়। কিন্তু ইসলামী নৈতিকতায় সামান্য ভালো কথা, রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ প্রভৃতিকেও এই সীমা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তবে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি ধরন নিয়ে আলোচনা করছি।

ক. সাহায্য ও দান

অসহায়, বিপদগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত কাউকে সাহায্য করা বা তাদের প্রয়োজনে নিঃস্বার্থভাবে দান করা সবচেয়ে বড় পরার্থপরতা। অসহায়দের সাহায্য করার দায়িত্বকে কুরআন দুই পর্যায়ে রেখেছেঃ আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক। আবশ্যিক দান হচ্ছে যাকাত-ফিতরা প্রভৃতি। কুরআন যাকাত আদায়কে ইসলামের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাকাত প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলব যে, অসহায় মানবতার জন্য সদকা বা দান নয়, বরং অত্যন্ত আবশ্যকীয় ধর্মীয় একটি বিধান হচ্ছে যাকাত। কারো উপর যাকাত ফরয হওয়ার পর তিনি যদি তা আদায় না করেন তাহলে তাকে মুসলিম বলা যায় না। তবে সরকারি ট্যাক্সের মত নয় যে, এর বিনিময় নেই; বরং এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। ইসলামী পরার্থপরতা কেবল দান সদকার উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের উপকারে এত কঠোর ব্যয় পদ্ধতি অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদে নেই।

অন্যদিকে, যে কোনো অবস্থায় অসহায়কে সাহায্য করা ঐচ্ছিক। কিন্তু এটিকেই কুরআন মানুষের ঈমানের মূল মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন, কেউ নিজে পেট পুরে খেল কিন্তু তার প্রতিবেশী অভূক্ত-ইসলাম তাকে মুসলিম মনে করে না। একজন মেহমান আসলে যদি তাকে সম্মান-আপ্যায়ন না করা হয়, তাকে আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দান বা পরোপকারকে ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহানবীকে আল্লাহ সরাসরি আদেশ করেন,

> তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথ হারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবে না। সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবে না।[৩৯]

অর্থাৎ দান সদকার প্রশিক্ষণ সর্বপ্রথম আল্লাহ তাঁর নবীকেই দিলেন। মহানবীর গোটা জীবন দেখলে বোঝা যায় তিনি কোনো সম্পদ একদিনের জন্য ও জমা রাখতেন না। নিজের ঘরে প্রতিদিন রান্না হতো না। সারা জীবন অন্যের সাহায্য করেছেন। *সূরা আল-মাঊনে*, যারা ইয়াতীমদের গলাধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেয়, খাবার দেয় না ও খাবার প্রদানে উৎসাহ দেয় না তাদের তিরস্কার করা হয়েছে। কুরআনে কারুনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পদ কুক্ষিগতকারীদের তিরস্কার করা। বাগান মালিকদের বর্ণনা এসেছে *সূরা আল-কাহফ* ও *সূরা আল-ক্বলম* এ। *সূরা কাহফে* (১৮: ৩২-৪২), দুইজন বাগান মালিকের বর্ণনা এসেছে যাদের একজন দুটি বাগানের মালিক ছিল এবং সম্পদ কুক্ষিগত করত আরো বাগান ক্রয়ের জন্য। তার অপর বন্ধুর একটি বাগান থাকায় তাকে সে তিরস্কার করছিল এবং নিজে অহংকার করল। একদিন হঠাৎ দেখল রাতের অন্ধকারে তার বাগান দুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। *সূরা ক্বলমে* এসেছে (৬৮: ১৭-৩৩), বাগানের মালিকেরা রাতে পরিকল্পনা করে, খুব সকালে ফসল কাটবে যেন, কোনো ফকীর মিসকীন আসার আগেই তারা সেগুলোকে ঘরে নিয়ে যেতে পারে। খুব সকালে তারা গিয়ে দেখে, তাদের বাগান ফসলসহ প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাসে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইল পরকালীন ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য। তাদের এই স্বীকারোক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। তারা আল্লাহর কাছে আশা করছিল, আল্লাহ পরকালে এর বিনিময়ে আরো সুন্দর বাগান দেবেন। এভাবে একদিকে অসহায়দের সাহায্যের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে যারা কৃপণতা করেছে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ উদারতা ও দানশীলতাকে পছন্দ করেন এবং কৃপণতাকে নিন্দা করেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এবিষয়ে বক্তব্য এসেছে। যেমন,

> যারা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে কৃপণতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে, তাদের এ কাজ তাদের জন্য মঙ্গলজনক, বরং প্রকৃতপক্ষে এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। (৩: ১৮০)

মহানবী (স.) কৃপণদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরবর্তী ও জাহান্নামের নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেন। দানশীলতাকে তিনি তুলনা করেছেন *বুরহান* বা প্রমাণ হিসেবে। একজন মুমিনকে বিশ্বাস করতে হয় তার হস্তগত সম্পদের মালিক সে নয়, বরং আল্লাহ। কিন্তু যদি সে, যাকে আল্লাহ সম্পদ দেননি বা বিপদগ্রস্ত করেছেন তাকে সেখান থেকে না দেয় তাহলে তার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ করা যায় না। এজন্যই সদকাহকে তার ঈমানের প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে সাহায্য করলে আল্লাহর কাছ থেকে এবং মানুষের কাছ থেকেও সম্মান পাওয়া যায়। একটি হাদীসে এসেছে, মহানবী (স.) বলেন,

> যে তার ভাইয়ের প্রয়োজনে নিয়োজিত থাকবে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে নিয়োজিত থাকবেন। যে (দুনিয়ায়) কোনো মুসলিমের সামান্য একটি কষ্টও দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বড় বিপদের মধ্যে একটি বিপদ দূর করে দেবেন।[৪০]

অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন পূরণ বা বিপদে সাহায্য করা বড়ই পূণ্যের কাজ। বিশেষত বিচার দিবসে যখন মানুষ প্রচণ্ড ভীতবিহবল থাকবে তখন আল্লাহ যদি কারো বিপদ দূর করে দেন তাহলে তার চেয়ে বড় কোনো উপকার আর হতে পারে না। মহানবী (স.) বলেন,

> এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই; সে তার উপর যুলম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করবে না এবং তাকে অপদস্থ করবে না। নিজের অন্তরের দিকে ইশারা করে তিন বার তিনি বলেন, 'তাকওয়া এখানে'। কোনো লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। প্রতিটি মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম বা সম্মানের জিনিস।[৪১]

এখানে বিপদে সাহায্যের জন্য মুসলিমদের পরস্পরের দায়িত্বকে স্পষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, অন্য ধর্মের মানুষকে উপকার করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না অথবা অমুসলিমদের সাহায্যের কথা না বলার কারণে একথা তাদেরকে সাহায্য করতে অস্বীকার বা নিষেধের প্রমাণ বহন করে। বরং একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে মহানবী (স.) তাঁর সামনে উপস্থিত সঙ্গীদের সংশোধনের জন্য এধরনের কথা বলেন, এখানে সমগ্র মানুষের উল্লেখ না করে তিনি ভুল করেননি। নবী (স.) এমনকি ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হিসেবে রাস্তায় চলা-ফেরায় কষ্টদায়ক জিনিসকে অপসারণ করতে বলেন। পবিত্র কুরআনে দানের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে মানুষের মধ্যে স্বাধীন দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টির জন্য।

> যারা আমার প্রদত্ত রিযক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের আশা করতে পারে, যাতে কোনোক্রমেই লোকসানের আশঙ্কা নেই। আল্লাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে পুরোপুরি ফল প্রদান করবেন বরং মেহেরবানী করে তাদেরকে কিছু বেশি দেবেন।[৪২]

আল্লাহর পথে দান করাকে এখানে ব্যবসায়ে বিনিয়োগের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তার মালিকানা থেকে মানুষকে দান করেছেন, সুতরাং মানুষের উচিত অন্য অসহায় মানুষকে দান করা। কারণ, কোনো মানুষকে আল্লাহ হত-দরিদ্র রাখেন, কাউকে অসুস্থ করে রাখেন, কেউ আকস্মিক দুর্ঘটনার মাধ্যমে উপার্জনক্ষম হয়ে যায়। হতে পারে এরা আত্মীয়-স্বজন অথবা দূরের কেউ। কিন্তু তাদের প্রতি দায়িত্ব সবার। তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে না আসলে তারা মানবেতর জীবনযাপন করবে।

শুধু উপকার করা নয় বরং অন্যকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া ঈমানের বড় পরিচয়। কুরআন বলেছে, "যাদের অন্তর সংকীর্ণতামুক্ত তারা অবশ্যই সফল"(৫৯: ৯)। এর অর্থ হচ্ছে, অন্তরকে প্রশস্ত করতে পারলে সফলতা অনিবার্য- চাই দুনিয়ার সফলতা কিংবা পরকালীন সফলতা। "নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়" (৫৯: ৯)। মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহর শপথ, সে ব্যক্তি কখনো মুমিন নয় যে তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্য ভাইয়ের জন্য তা করে না"।[৪৩] ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুমূর্ষু তিনজন সৈনিক জীবনের শেষ মুহূর্তে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন মানবতার ইতিহাস তাদের সামনে ম্লান হয়ে যায়। তিনজনই পানির জন্য হাহাকার করছিলেন। যিনি সবচেয়ে বেশি গুরুতর তার কাছে পানি দেওয়া হলে, তিনি অপরজনকে দেখিয়ে বললেন, "তাঁকে আগে দাও", তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন, "আমি

ভালো আছি প্রথম ব্যক্তিকে দাও"। প্রথম ব্যক্তির কাছে গেলে তিনি ততক্ষণে চলে গেছেন আল্লাহর নিকট, দৌড়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে এলে তিনিও চলে গেলেন; এরপর শেষ ব্যক্তির কাছে যেতে যেতে তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[৪৪] কারো পক্ষে শেষ বারের মত পানি পানের সুযোগ হলো না। কারণ, তাঁরা প্রত্যেকে নিজের চেয়ে অন্যকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এজিদী বাহিনীর কাছে অবরুদ্ধ স্বল্প সংখ্যক নারী-শিশু ও সঙ্গীসহ মহানবীর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.) কারবালার যে ময়দানে অবস্থান করছিলেন, প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর অথচ অদূরে অবস্থিত ফোরাতের পানি পানের জন্য যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ। অসীম সাহসী হোসাইন শত্রু নিধন করতে করতে নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে হস্তদ্বয়ে পানি উত্তোলন করলেন পান করার জন্য, কিন্তু মনে পড়ে গেল, "আমি সবার আগে খাব আর বেঁচে যাব? অন্যরা না খেয়ে মরবে?" নিজে সেই পানি ছুঁড়ে ফেলে, চলে গেলেন সবার মাঝে।[৪৫] সবার আগে জীবন দেওয়ার জন্য তিনি নিজেকে উপস্থাপন করলেন। এই হলো কুরআনের শিক্ষা- অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

খ. রোগীর সেবা ও চিকিৎসা

ইসলাম যে মানবতাবাদ ও পরার্থবাদিতা শিক্ষা দেয় তার মধ্যে অসহায়, দুস্থ ও রোগীর সেবা ও পরিচর্যা অন্যতম। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিষয়টি এতবেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যার ফলে মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানীগণ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিরাট অবদান রাখেন। কুরআনে রোগ ব্যাধিকে *মারাদ*, *বা'স*, *দ্বরার*, *মুসীবত* প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। সরাসরি *মারাদ* শব্দটি অর্থ হচ্ছে রোগ, অন্যগুলোর অর্থ কষ্ট, বিপদ, যন্ত্রণা। মারদ শব্দটি দ্বারা দুই ধরনের ব্যাধির কথা বলা হয়েছে: অন্তরের রোগ ও দৈহিক রোগ। দেহের রোগের চেয়ে অন্তরের রোগকে কুরআনে বেশি ভয়ংকর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার চিকিৎসার জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে। "আমি কুরআন নাযিল করেছি, যাতে মুমিনদের জন্য রোগমুক্তি ও রহমত রয়েছে" (১৭: ৮২)। আর অন্যের দৈহিক রোগ-ব্যাধি ও বিপদ আপদে সাহায্য করাকে মানুষের নিজের মহাক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (১০৩: ৩)। অন্তরের রোগ বলতে বোঝানো হয়েছে আল্লাহর হেদায়াতকে চেনার মত উপলব্ধি জ্ঞান না থাকা। "তাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, আল্লাহ তাদের অপরাধের ও কৃত কর্মের দরুন এই ব্যাধিগুলো আরো বৃদ্ধি করে দেন।" অর্থাৎ মানুষের অন্যায় কাজের দরুন তারা মনের দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই অসুস্থতা আবার মানসিক রোগী নয়। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো আধুনিক পণ্ডিত ধর্মের অনুসারীদেরকে আক্রোশবশত মনোদৈহিক রোগী হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৪৬] এমনকি মহানবী (স.) কে পর্যন্ত এধরনের মানসিক বিকৃতিজনিত রোগী হিসেবে অভিযুক্ত করেন। কুরআনে তাদের এই অভিযোগের উল্লেখ থাকলেও এসবের কোনো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। ইকবাল এদের উদ্দেশ্যে বলেন, মহানবী (স.) এর মত একজন ব্যক্তিত্বের যদি এই ধরনের রোগ হয়ে থাকে, তাহলে মনোবিজ্ঞানের উচিত এটা খুঁজে বের করা যে, কীভাবে একজন বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের পক্ষে বিগত দেড় হাজার বছরে একটি সভ্যতা সৃষ্টিসহ অসংখ্য কল্যাণকর জিনিস বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন।[৪৭] ইসলাম মানুষের অন্তরের রোগীদের জন্য যেমন চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করতে বলেছে,

তেমনি সাধারণ অর্থে রোগব্যাধি বলতে যা বোঝায় তারও সেবা শুশ্রুষা করতে বলেছে। মানবতার কল্যাণে উভয় চিকিৎসা সমান অবদান রাখলেও এই আলোচনায় কেবল শারীরিক অসুস্থতার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হবে।

প্রথমত, ইসলাম চায় মানুষের রোগব্যাধি যেন না হয় বা খুব কম হয়। এজন্য পবিত্র খাবার, পরিচ্ছন্ন পরিবেশের এবং সমস্ত প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আবশ্যকীয় বিধিবিধান মেনে চলার আদেশ করে। মহানবী (স.) নিজে তা করেছেন এবং তাঁর সাহাবাদের মধ্যে সেটির বাস্তব প্রয়োগ করেছেন। একারণেই তাঁদের মধ্যে অসুস্থতার হার ছিল অনেক কম। **দ্বিতীয়ত,** রোগের চিকিৎসায় বা যুদ্ধে আহত ও জখমে আক্রান্তদের জন্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। **তৃতীয়ত,** সরাসরি রোগীর সেবা, রোগীকে দেখতে গিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া কিংবা রোগীর জন্য অর্থ ব্যয় করার মর্যাদা, এমনকি রোগীর জন্য নামায কাযা করার অবকাশও ইসলামে দেওয়া হয়েছে। কোনো মানুষ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসায় ধর্মকে বিবেচনায় রাখা হয়নি, কিংবা অগ্রাধিকারও দেওয়া হয়নি। অগ্রাধিকার রাখা হয়েছে রোগের তীব্রতাকে। আশা করি এই তিনটি বিষয়ের আলোচনায় ইসলামী পরার্থবাদী চেতনা আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সুস্থতা আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ জন্ম থেকেই অসুস্থ থাকে, কেউ অযত্নে নিজের দেহকে ধ্বংস করে, কেউ দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন রোগ ব্যাধির শিকার হয়। এই অবস্থায় কিছু স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে মানুষ নিজ চেষ্টায় অধিকাংশ রোগ ব্যাধি থেক নিরাপদ থাকতে পারে। মহানবী (সা.) মানুষের নিজের প্রতি সুবিচারের অংশ হিসেবে সুস্থ থাকার জন্য যে সব দিক নিদের্শনা দিয়েছেন, আধুনিক যুগের সর্বশেষ জ্ঞানসমৃদ্ধ কোনো ডাক্তারও সেটিকে অবহেলা করতে পারবেন না। ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে মানুষ যেন নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করতে পারে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যেন কারো কাছে তাদের সাহায্য চাইতে না হয় এমন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় ইসলাম। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি মহানবী (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন সেটি হচ্ছে পরিচ্ছন্ন ঘুম, রাতে আগে ঘুমানো এবং সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠা। আধুনিক গবেষণায় মহানবীর ঘুমের বিজ্ঞানসম্মত উপকারের কথা প্রমাণিত হয়েছে। মহানবী (সা.)কে আল্লাহ স্নেহের স্বরে ভালোবাসা নিয়ে ডাকেন, "হে কম্বলাবৃত, উঠো, রাতের কিছু অংশ বাকী থাকতে"। শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর কাছে দোআ ও প্রার্থনার মাধ্যমে যে নিজের দিনের সূচনা করতে পারে তার পক্ষে সুস্থ থাকা সহজ। সকালবেলা না ঘুমিয়ে শরীর চর্চা ও প্রাতঃরাশ করার অভ্যাসও মহানবীর জীবনে দেখা যায়। এভাবে শরীর ও মন উভয়ই সতেজ হয়ে উঠে যা দিনের বাকী সময়ের জন্য এক ধরনের জীবনী শক্তি সঞ্চয় করার মত। প্রকৃতির দিনরাতের সাথে নিজের ঘুম ও দিন রাতের কাজগুলো মিলিয়ে নিতে পারলে প্রকৃতি আমাদেরকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। মহানবী (স.) দুপুরে খাবারের পর কিছু সময় বিশ্রামের জন্য (কুরআনে ইংগিত অনুযায়ী) বরাদ্দ রাখতেন। রাতে এশার নামায শেষে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অন্যের ঘরে যেতে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। ফজর থেকে শুরু করে এশা পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদেরকে দৈনন্দিন সময়ের সাথে স্বাস্থ্যবিধির অনুসরণে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, পানাহারে সতর্কতা। মহানবী (স.) পেটের এক-তৃতীয়াংশ খালি রেখে খাবার শেষ করতে উপদেশ দেন। মদপান, ধূমপানসহ ক্ষতিকর সমস্ত খাবার-পানীয় নিষেধ করা হয়। দাঁড়িয়ে পানীয় পান করতে নিষেধ করেছেন তিনি। এর কারণ বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে- কিডনিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি খাওয়া শেষ হলে খাবারের পাত্র ঢেকে রাখতে বলেন যেন পোকা-মাকড়, জীবাণু খাবারের ক্ষতি না করে। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, রোযার মাধ্যমে পাকস্থলীর বিশ্রাম দেওয়া ও অতিরিক্ত চর্বি বা মেদকে দেহের উপকারে কাজে লাগাতে সাহায্য করা। এরপর যেটি প্রয়োজন তা হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের জন্য কোন খাবারে কী উপকার বা চলা ফেরায় কোন পন্থা মেনে চলা উচিত সে সম্বন্ধে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। বাস্তবে, ইসলামের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কারণে মহানবীর যুগের মুসলিমদের মধ্যে রোগব্যাধির প্রকোপ অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে।

মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এসব নির্দেশনার ফলে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, ডাক্তারিবিদ্যা ইসলামে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী (স.) যখন উহুদের যুদ্ধে মারাত্মক জখমের শিকার হলেন, তখন সাহাবীদের মধ্যে চরম দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়। এধরনের জখমের চিকিৎসার ব্যাপারে সাহাবীগণ সচেতন ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে আহত ও জখমের শিকার ব্যক্তিদের উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এজন্যই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করা হয়, যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে।

ইসলামে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার প্রস্তুতি গ্রহণ। "যে কাউকে জীবন দান করল সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে জীবন দান করল"- এই নীতি শুধু হত্যাকাণ্ড না ঘটানোর জন্যই নয়, বরং চিকিৎসার মাধ্যমে সেবা প্রদান করে মৃত্যুর হার কমানোও উদ্দেশ্য। সুতরাং শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য যারা এই বিদ্যা শিক্ষা করেন তারা মানবতার বন্ধু হিসেবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারেন না। একজন আল্লাহভীরু ডাক্তারকে মানুষ যে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে সে সম্মান অন্য পেশায় পাওয়া যায় না।

রোগব্যাধি আল্লাহর পক্ষ থেকে হোক আর নিজের অসচেতনতার কারণে হোক সর্বাবস্থায় চিকিৎসা নেওয়াটা আল্লাহর আদেশ। "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না"- এর দ্বারাই এটি প্রমাণিত হয়। কেউ কেউ চিকিৎসা গ্রহণকে নবীর সুন্নাত হিসেবে বর্ণনা করেন; আর বলেন, রোগের মুক্তিদাতা আল্লাহর ইচ্ছা হলেই ওষুধ কাজ করবে, সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছাই এখানে বড়। ইসলামের আইনগত বিধান হিসেবে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল চারটি ভাগ আছে। কিন্তু মহানবী (স.) "আমার সুন্নাত" বলতে যা বুঝিয়েছেন তা আইনগত দৃষ্টিতে তৃতীয় প্রকারের বৈধ বিষয় নয়, বরং এই সুন্নাত কখনো অবশ্য করণীয় ফরযকে নির্দেশ করে, কখনো ওয়াজিবকে নির্দেশ করে এবং তৃতীয় বিষয় হিসেবে সুন্নাতকেও কখনো নির্দেশ করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে নফলকেও নির্দেশ করে। চিকিৎসা গ্রহণ সব সময় এক স্তরের আবশ্যকীয়তা বহন করে না, বরং পরিস্থিতির ভিন্নতায় এটি নামায রোযার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এর কারণ মানুষের জীবন রক্ষা

করা। আল্লাহর দেওয়া দৈহিক সুস্থতার নিয়ামতের ক্ষতি করার অধিকার মানুষকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছায় সব সেরে যাবে বলে চিকিৎসায় অলসতা করা বা চিকিৎসা না নেওয়া আদৌ নবীর আদর্শ নয়। কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা দেওয়া নবীর আদেশ। "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, অসুস্থদের সেবা কর, আর বন্দীদেরকে মুক্ত করে দাও"।[৪৮] হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে হাদীসে কুদসিতে বর্ণিত আছে। রাসূল (স.) বলেন,

> কিয়ামতের দিন মহান রাব্বুল 'আলামীন আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলবেন। হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। বান্দা বলবে, আপনি তো বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আমি আপনাকে কীভাবে দেখতে যেতে পারি? আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল। তুমি তাকে দেখতে গেলে তার কাছে আমাকে পেতে।[৪৯]

এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের অন্তরে এমন এক অনুভূতি জাগ্রত করা যার ফলে সে নিজের চেয়ে অন্য একজন অসহায় বা অসুস্থ মানুষের সেবায় বেশি তৎপর থাকে। কারণ মানব জাতি এমন বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ বলে ইসলাম দাবি করে যার এক অংশ সব সময় অন্য অংশের সহযোগিতা করবে। যারা সামর্থ্যবান তারা অসহায়কে, যারা জ্ঞানী তারা সাধারণ মানুষকে, যারা নেতৃত্ব দেবেন তারা অধীনস্তদেরকে এবং সর্বোপরি যারা সুস্থ তারা অসুস্থদেরকে সাহায্য করবেন। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাই হবে এই সহায়তার মূল লক্ষ্য। এভাবেই পাওয়া যায় আল্লাহর সাক্ষাৎ।

অসুস্থদের সুস্থ করার মাধ্যমে কেউ তাঁর পারিশ্রমিক হিসেবে কিংবা ঔষধের মূল্য হিসেবে অর্থগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সেই অর্থগ্রহণ অবশ্যই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে হবে। একজন খ্যাতিমান ডাক্তার একদিনে রোগী দেখে লক্ষ টাকা উপার্জনও করে থাকেন। মানুষের আবশ্যকীয় প্রয়োজনের বাইরে কিংবা অতিরিক্ত উপার্জন থেকে যদি বৃহত্তর মানবতার স্বার্থে কেউ ব্যয় করেন তাহলে তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হবে। যদি অতিরিক্ত উপার্জনের উদ্দেশ্য হয় বিলাসিতা ও অন্যের সাথে সম্পদের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন তাহলে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। তাছাড়া চিকিৎসা বা সেবার মাধ্যমে মানুষের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইসলামের প্রথম যুগে মহানবী (স.) একবার আহত হলে আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন, যিনি তখন কাফেরদের নেতা। মহানবী (স.) মক্কা বিজয়ের দিন সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জানালেন, এই ঘোষণার মাধ্যমে যে, "তোমাদের কেউ যদি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিয়ে থাক, তাহলে সে নিরাপদ।" অর্থাৎ সামান্য উপকারের কৃতজ্ঞতা জানানোর কাজটি প্রায় পনের বছর পরও মহানবী ভুলে যাননি। সুতরাং অসুস্থতার সময় যারা সেবা করবেন বা চিকিৎসা দেবেন তাদের প্রতি গভীর সম্মান ও কৃতজ্ঞতার মানসিকতাও থাকতে হবে।

ইসলাম রোগীর সেবার মাধ্যমে যে নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের নির্দেশনা দিয়েছে, তা ইসলামী পরার্থপরতার মতবাদকে শক্তিশালী করেছে। মানুষকে সেবার মাধ্যমে তার উগ্র আচরণ, লোভ, অহংকারের মত নিকৃষ্ট স্বভাবগুলোও সহজে তিরোহিত হতে পারে এবং সেই স্থানে আল্লাহর প্রেম প্রতিস্থাপিত হতে পারে।

গ. সুন্দর আচরণ

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিটি হাদীস গ্রন্থের বড় একটি অংশ জুড়েই আলোচনা করা হয়েছে *আদব* বা শিষ্টাচার নিয়ে। আদব একটি ইসলামী পরিভাষা। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আচরণ বা চরিত্র। উত্তম আচরণের আরেকটি পরিভাষা *তাহযীব*। প্রশংসনীয় আচরণের অনুসরণ ও নিন্দনীয় আচরণ থেকে বিরত থাকার নাম আদব।[৫০] এই বিষয়ের উপরই ইসলামী নীতিদর্শনের আদি স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। শিষ্টাচারের ভেতর এমন এক মানবীয় রূপ প্রকাশ পায় যা দান সদকা বা পরের উপকার করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ইসলাম যে পরার্থপরতার শিক্ষা দেয় তার শুরুটাই হচ্ছে উত্তম আচরণ। দান-সদকা করার সামর্থ্য না থাকলেও উত্তম আচরণ দিয়ে একজন অভাবগ্রস্ত মানুষের উপকার করা যায়। আল্লাহ তাঁর নবীকে এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন, "আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি কোমলপ্রাণের অধিকারী, যদি তুমি কঠোর হতে তাহলে লোকেরা তোমার পাশ থেকে চলে যেত"(৩: ১৫৯)। নবীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ ছোট দুটি কথায় প্রকাশ করেছেন যে, কোমলপ্রাণ মানুষকে সবাই ভালোবাসে আর কঠোরতাকে সবাই ভয় পায়। মু'মিনদের সবাইকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, "তোমরা মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বল"(২: ৮৩)। মানুষের উপকার করে খোঁটা দেওয়া হলে তার উপকারের প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায়। যে সদকা বা দানের পর খোঁটা দেওয়া হয়, সেই সদকার চেয়ে সুন্দর কথাবার্তা বেশি উত্তম (২: ২৬৩)। মহানবী (স.) আকস্মিক আক্রমণে যখন মক্কা বিজয় করলেন, তখন তাঁর সব শত্রু, যারা তাঁকে হত্যার জন্য ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং নিজের বাড়ি-ঘর, ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত করে দেয় তিনি তাদের সবাইকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেন, "আমি আমার ভাই ইউসুফের মতই বলছি, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই তিনি সবচেয়ে বড় দয়ালু "(১২: ৯২)। তাঁর এই ঘোষণায় সবাই আবেগ আপ্লুত হয়ে ইসলাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে।[৫১] ইসলাম জোরপূর্বক কাউকে মুসলিম বানাতে চায় না, তলোয়ার দিয়ে প্রচার হয় না; ভালোবাসা, দয়া আর উত্তম আচরণ দিয়ে, মানবতার সেবার মাধ্যমে প্রচার করতে হয়- মহানবী (স.) বিশ্ববাসীকে তা দেখিয়ে গেলেন। সদাচরণকে মহানবী (স.) সদকা বা দান হিসেবে উল্লেখ করেন। উত্তম আচরণের কিছু দৃষ্টান্ত নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

(১) সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়: সালাম মানে হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা। একজন ব্যক্তির সাথে আরেকজন ব্যক্তির সাক্ষাতে প্রথম কাজটিই হচ্ছে সালাম দেওয়া। সালামের পরের কাজটি হচ্ছে মুসাফাহা বা করমর্দন এবং এর পর মু'আনাকা বা আলিঙ্গন করার রীতি ইসলামী জীবনের প্রারম্ভিক নিয়ম। পবিত্র কুরআনে অভিবাদনের রীতি হিসেবে সালামের প্রচলন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দৃষ্টান্তেও এসেছে। অন্যের ঘরে প্রবেশের আগে সালাম দিয়ে অনুমতি নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, ইসলামের ভেতর দুটি জিনিস সর্বোত্তম: একটি হচ্ছে অপরকে খাবার খাওয়ানো এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে: চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেওয়া।[৫২] অর্থাৎ খাবার বা উপহার প্রদান এবং অন্যকে সালাম দেওয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ

দুটি বিষয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের প্রথম করণীয় হচ্ছে সমাজের মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন। আর এর সর্বোত্তম সূচনা হয় সালামের মাধ্যমে।

পবিত্র কুরআন শুধু সালাম দেওয়ার বিষয়েই বলেনি, সালামের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারেও বলেছে। বরং জবাবটা হতে হবে আরো সুন্দর কিংবা অনুরূপ শব্দে এবং আচরণে। ইসলামে সালামের গুরুত্বের কারণ, সালামের মাধ্যমে মানুষের ভেতরের মনোমালিন্য দূর হয়, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ ঘটে। মহানবী (স.) বলেছেন, যে আগে সালাম দেবে সে অহংকারমুক্ত। তিনি নিজে সব সময় সবার আগে সালাম দিতেন; এমনকি শিশুদেরকেও তিনি সবসময় আগে সালাম দিতেন। সমাজ জীবনের মূল কথাই হচ্ছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান, স্নেহ ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি না হলে শিশুর চরিত্র গঠনে যেমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তেমনি কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বপালনে ফাঁকি দেওয়া, অন্যের ক্ষতি করা বা দায়িত্বে অবহেলার ভাব সৃষ্টি হয়। পরস্পরের বিবাদে একটি সফল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং যে কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এ কারণে শুরুতেই ইসলাম এ ধরনের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে চায়। বর্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায়ের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইসলাম নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয় প্রক্রিয়ায় সেই কাজটি করতে চায়। পারস্পরিক সালাম বিনিময়, হাত মেলানো এবং আলিঙ্গনের মতো কাজগুলো একদিকে যেমন পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তেমনি সৃষ্টি করে মানসিক শক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধ। আবার একথার অর্থ এই নয় যে, কর্মকর্তার মর্যাদা ইসলাম হ্রাস করেছে। বরং নেতৃত্বের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং সিনিয়রকে সম্মান করা ও জুনিয়রকে স্নেহ করার গুরুত্ব এতই বেশি দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী এই গুণটিকে তাঁর উম্মত হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। "সে আমার উম্মত নয় যে বড়দের সম্মান করে না ও ছোটদের স্নেহ করে না"।[৫৩]

(২) কল্যাণ কামনা: ইসলাম মানেই হচ্ছে অন্যের কল্যাণ কামনা করা।[৫৪] অর্থাৎ কল্যাণ কামনা শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণ কামনার নামই হচ্ছে ইসলাম। কুরআনে অন্য নবীদের প্রধান বক্তব্য হিসেবেও এসেছে, "আমি তোমাদের সবচেয়ে কল্যাণকামী" (৭: ৬২, ৬৮)। একারণে অপরের প্রতি কুধারণা ত্যাগ করে ভালো ধারণাকেও উত্তম ইবাদত হিসেবে উল্লেখ করেছেন মহানবী (স.)।

মহানবী (স.) নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন কীভাবে মানুষকে ভালোবাসতে হয়। তাঁর কাছে কেউ যখন অন্য কারো নামে নেতিবাচক কথা বলত তখন তিনি তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। বরং নিজের সীমাহীন কষ্ট সত্ত্বেও অন্যকে সেটি বুঝতে দেননি। কয়েকটি হাদীসের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে,

- আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর দেহে ছিল মোটা পাড়ের একখানা নাজরানী চাদর, একজন বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে জোরে টান দিল। টানের চোটে নবী (স.) উক্ত বেদুইনের বক্ষের কাছে এসে পড়লেন।" আনাস

(রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাঁধের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, সে জোরে টানার কারণে তাঁর কাঁধে চাদরের ডোরার ছাপ পড়ে গেছে"। অতঃপর বেদুঈনটি বলল, "হে মুহাম্মাদ, আল্লাহ তা'আলার যে সকল ধন-সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা হতে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিন"। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স.) তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। এরপর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দান করলেন।[৫৫]

- জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে যখনই কোনো জিনিস চাওয়া হয়েছে, তিনি কখনো না বলেননি।[৫৬]
- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) -এর কাছে প্রস্তাব করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল, কাফির মুশরিকদের উপর অভিসম্পাত করুন"। উত্তরে তিনি (স.) বললেন, "আমাকে অভিসম্পাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি, বরং আমাকে রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে"।[৫৭]
- আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের কোনো ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেউ যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেলত, তখন আল্লাহর লক্ষ্যে তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।[৫৮]

মহানবীর বাস্তব জীবনের এই ছবিগুলো প্রমাণ করে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে দয়া ও ভালোবাসার কত বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। তিনি এটিই তাঁর অনুসারীদেরকে শিক্ষা দেন। ইসলাম মানবতার কল্যাণ ছাড়া আর কোনো কিছুকে তার লক্ষ্য করেনি। ব্যক্তিগত কারণে কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে অনুৎসাহিত করেছে, বরং ক্ষমা ও দয়ার কথা বলেছে। আর যদি প্রতিশোধ নিতেই হয়, তবে ঠিক ততটুকু নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যতটুকু তার উপর যুলম করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এভাবে হিসেব করে প্রতিশোধ নেওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার। একারণেই ইসলামের ইতিহাসে ইসলামের খাতিরে প্রতিশোধ নেওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল।

ঘ. করযে হাসানা

করযে হাসানা অর্থ উত্তম ঋণ। এটিও স্বতন্ত্র একটি ইসলামী ধারণা। মানুষের বিপদে বা অভাবে কোনো বিনিময় বা লাভ ছাড়া কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঋণ দেওয়া যে, সে যখন সক্ষম হবে তখনই ঋণের দ্রব্য ফেরত দিতে পারবে। মানুষের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে বা অভাবের সময় ঋণ বা *করযে হাসানা* দিতে কুরআন উৎসাহ দিয়েছে। সবার পক্ষে সব সময় দান করা সম্ভব হয় না এবং এর প্রয়োজনও নেই। কারণ দানগ্রহীতার এতে সম্মান নষ্ট হতে পারে। এই অবস্থায় সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্য বিনা সূদে ঋণ দেওয়ার কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। মানুষ অভাবগ্রস্ত হলে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ করতে পারে। কিন্তু ঋণদাতা যদি দয়ার পরিচয় দিতে না পারেন, তাহলে ঋণগ্রহীতার কষ্ট বৃদ্ধি পায়। এজন্য ঋণ দিতে হয় কেবল আল্লাহর সন্তোষকে সামনে রেখে। "যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন, এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন"; (৬৪: ১৭)। "এমন

কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন?"(২: ২৪৫)। এসব আয়াত মানুষের সাহায্যের জন্য ঋণ দিতে উৎসাহ দেয়।

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় সূদকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ এটি মানুষের তাৎক্ষণিক কিছু উপকার করলেও পরিণামে মানুষের শোষণ করে। এর বিপরীতে যদি মানুষের কল্যাণে করযে হাসানা চালু করা যেত তাহলে তাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেমন হত তেমনি মানবতাও রক্ষা পেত।

ঙ. জীবন রক্ষা

জীবন রক্ষার চেয়ে বড় আর কোনো উপকার মানুষের জন্য হতে পারে না। কুরআন মানুষকে নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে অন্যকে বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বলেছে।

> যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কেননা তারা মযলুম এবং আল্লাহ তাআ'লা অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা বলেছিল, "আল্লাহ আমাদের রব"। যদি আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা না রাখতেন, তাহলে যেখানে আল্লাহর নাম বেশি উচ্চারিত হয় সেসব আশ্রম, গীর্জা, ইবাদাতখানা ও মসজিদ ধ্বংস করে ফেলা হত। আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ তা'আলা বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। (২২: ৩৯-৪০)

এখানে দেখা যাচ্ছে, কুরআন উৎপীড়িত মানবতার জন্য প্রয়োজনে লড়াই করার অনুমোদন দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কখনো তুচ্ছ বিষয় ছিল না। বরং রাষ্ট্রের সামগ্রিক নিরাপত্তা নির্ভর করে সামরিক বাহিনীর উন্নত প্রশিক্ষণ ও সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রের মজুদের উপর। মহানবী (স.) আল্লাহর অনুমতিতে যতগুলো যুদ্ধ করেছেন সব যুদ্ধ ছিল উন্নত ধরনের সামরিক কৌশলে পূর্ণ। বলা যায় এক ধরনের বিনা রক্তপাতে যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়। বিশ্ববাসী এর আগে জানত বিজয়ীরা ইচ্ছেমত বিজিতদের মূলোৎপাটন, বাড়িঘর ধ্বংস, নিরপরাধ নারী শিশুকে বন্দী হত্যা বা নির্যাতনের মাধ্যমে এক বিকৃত আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠত। কিন্তু ইসলাম এসে তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়। ইসলামে যুদ্ধের অনুমোদন কেবল মানবতার স্বার্থে। যেখানে অসহায় নিপীড়িতের রক্তপাত, ক্রন্দন কোনোভাবেই বন্ধ করা যায় না সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া বিকল্প থাকতে পারে না। কুরআনে এসেছে,

> তোমাদের কি হল! তোমরা কি সেই দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, যারা বলে, "হে আমাদের রব, এই যালিম-অধ্যুষিত জনপদ থেকে আমাদের মুক্তি দাও আর আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠাও?" (৪: ৭৫)

অর্থাৎ যুদ্ধ কেবল অসহায় মানুষের উপর নিপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য; জীবন ধ্বংসের জন্য নয়। বর্তমানে যারা নির্বিচারে বোমা হামলা করে মানুষকে হত্যা করে ইসলাম এধরনের যুদ্ধকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না। অসহায় মানুষের জীবন রক্ষা, যুদ্ধের কারণে শরণার্থীদের আশ্রয়দান, সমূলে নিধনের হাত থেকে বাঁচতে যারা দেশ ছেড়ে মানবেতর জীবন যাপন করে তাদের বাঁচাতে সাহায্য করার দায়িত্বও এখান থেকে প্রমাণিত

হয়। মহানবী (স.) কমপক্ষে তিনটি বড় ধরনের বিজয় অর্জন করেছেন বলা যায় সম্পূর্ণ রক্তপাতবিহীন। একটি খন্দকের বিজয়, যা ছিল মদীনার চারপাশ গভীর পরিখা খননের মাধ্যমে সুরক্ষা। দ্বিতীয়টি মক্কা বিজয় আর তৃতীয়টি সবচেয়ে বড় বিজয় তাবুকের অভিযান- দুই লক্ষের উপরের বিশাল রোমান বাহিনী মাত্র ত্রিশ হাজারের মুসলিম বাহিনীর সাহসিকতার সামনে যুদ্ধ না করেই ময়দান ত্যাগ করে।

চ. সৎকাজের পথ দেখানো

সৎকাজের পথ দেখানো মানুষের জন্য একটি বড় উপকার। মানুষকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে সঠিক পথ প্রদর্শন করা কুরআনের আদেশ। কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া। আল্লাহ তৎকালীন মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বিশেষত আনসার সাহাবীদেরকে বলেন,

> সেই নিয়ামতের কথা তোমরা স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, এর পর আল্লাহ তোমাদের মনে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন, ফলে এখন তোমরা ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় অবস্থান করছিলে, অতঃপর তিনিই তোমাদের সেখান থেকে উদ্ধার করেন। (৩:১০৩)।

অর্থাৎ যারা সঠিক পথ থেকে দূরে তাদের জীবন প্রকৃতপক্ষে আগুনের গর্তের কিনারাতেই; যে কোনো সময় তারা হেঁটে কিংবা দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সেখানে। আগুনের উত্তাপ হয়ত বাইরে আসছে না, কিন্তু ভেতরে যে আগুন রয়েছে তা মুহূর্তের মধ্যে মানবদেহকে শেষ করে দেবে। একমাত্র সত্যের আলো তাদেরকে আলোকিত করতে পারে। এজন্য মানুষকে সত্যের পথে আহবান করা হচ্ছে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় উপকার। আল্লাহ মানুষের জন্য যে কাজগুলোর মর্যাদা সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে এটি একটি। এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে কোনো বিনিময় নেওয়াকে আল্লাহ নিষেধ করে দেন। "তোমরা এমন সব লোকের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে এর বিনিময় কামনা করে না।" এই বিষয়টি ইসলামী নীতিদর্শনের সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট। মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে এমন এক উন্নত জীবনের দিকে পথ প্রদর্শন করা যা তাদের পার্থিব ও পরকালীন উভয় জগতের সফলতার মাধ্যম হিসেবে গণ্য। যারা মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কর্মসংস্থানের পথ দেখায়, নিরক্ষরতা দূর করতে শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখে, উন্নত অবকাঠামোর জন্য মানুষকে নিয়োগ করে- এসব কাজ নিঃসন্দেহে ভালো কাজ। কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে মানুষের যে বৈষয়িক উন্নতি আসে, তার চেয়েও বেশি উন্নতি আসে ভালো কাজের পথ দেখানোর মাধ্যমে। কারণ বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে নৈতিক উন্নতি না থাকলে যে কোনো সময় সেই উন্নতি ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

মানুষকে নৈতিকভাবে কাজ করার জন্য যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন, তাঁদের জীবন ছিল মানবতার জন্য নিবেদিত। সক্রেটিস কোনো অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দিতেন না, মানুষকে তিনি অধিক উপার্জনের জন্য কোনো পথ দেখাননি, কিন্তু সৎভাবে জীবন যাপনের পথ দেখিয়েছেন। সত্যবাদিতার, প্রতিশ্রুতি রক্ষার, অপদেবতার পূজা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথ দেখান। বিনিময়ে যদিও তাঁকে জীবন

উৎসর্গ করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর এই নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের কারণে হাজার বছর ধরে তাঁকে মানুষ সম্মানের আসনে রেখেছে। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈশ্বরের উপর ভরসা করে গিয়েছেন এবং অন্য কারো কাছে প্রাণ ভিক্ষা করেননি।

নূহ (আ.) যখন মানুষের সামনে কল্যাণের কথা বলতেন, তারা তখন কানে আঙুল দিয়ে রাখত, মুখ ঢেকে রাখত কাপড় দিয়ে। কিন্তু তিনি থেমে যাননি। তিনি মানুষের নিশ্চিত অধঃপতন দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু কাউকে সেটি বোঝাতে পারছিলেন না এবং বিশ্বাস করাতে পারছিলেন না। অবশেষে ভয়ানক মহাপ্লাবন এসে সব ধ্বংস করে দিল। তাঁর অবাধ্য সন্তান পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তাঁর হৃদয় সন্তানের জন্য হাহাকার করে উঠে। তাকে রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে নিবেদন করেন। আল্লাহ তখন বলেন, "আমার কাছে এমন জিনিস তুমি চেয়ো না যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই।" তিনি সাথে সাথে ক্ষমা চাইলেন, "হে আল্লাহ আমাকে তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত করো না।" এর তাৎপর্য হচ্ছে মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে সৎ পথের দিকে ডাকতে হবে। কিন্তু যদি সে ডাক না শোনে এবং নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে চায় তাহলে তাকে রক্ষার দায়িত্ব আহ্বানকারীর নয়। জীবনের দীর্ঘ সময় নিঃস্বার্থভাবে মানবতার জন্য উৎসর্গ করেছেন বলেই আজও নূহ (আ.)মানব জাতির নিকট সম্মানের পাত্র হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। যদি তিনি এটিকে তাঁর জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতেন তাহলে অন্যসব কোটি কোটি মানুষের মত তিনিও হারিয়ে যেতেন। যারা সমাজে অনাচার করে বেড়ায়, মানুষের অধিকার কেড়ে খায়, নারী নির্যাতন করে, কিংবা হত্যা রাহাজানি করে সমাজকে অস্থিতিশীল করে তোলে তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর অর্থই হচ্ছে সমগ্র মানবতাকে রক্ষা করা। ইসলাম এই কাজটিকে এজন্যই সবচেয়ে উত্তম কথা ও কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছে। কুরআনের ভাষায়,

> তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করে, ভালো কাজ করে এবং বলে আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। ভালো ও মন্দ কখনো এক হতে পারে না, তুমি মন্দকে ভালো কাজের মাধ্যমে প্রতিহত করো, তাহলে তোমার ও তার মাঝে যে শত্রুতা তা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে রূপ নেবে। (৪১: ৩৩-৩৪)

সুতরাং মানবজাতির পরস্পর সম্পর্ককে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় রূপ দিতে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বানের এই কাজ করতে হয়।

মহানবী (স.) নিজেকে এই কাজের সর্বোত্তম নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "তোমাদের সাথে আমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তোমরা পোকা-মাকড়ের মত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছ, আর আমি তোমাদেরকে টেনে ধরছি"।[৫৯] অর্থাৎ মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধকার গলি পথে ছুটে বেড়ায়, আল্লাহর সুনির্মল পথে আসতে চায় না। আর মহানবী (স.) তাদেরকে পরম স্নেহভরে আলোর পথে আলোর মাশাল নিয়ে ডাকছেন। একই কারণে তাঁর সঙ্গী সাথীগণ শত কষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জন্মভূমি ছেড়ে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন শুধু মানব জাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে এবং তাদেরকে ধ্বংসের পথ

থেকে রক্ষা করার জন্য। মহানবী (স.) রাস্তায় বসে অকারণে সময় কাটাতে নিষেধ করেন। কিন্তু যদি সেখানে অপেক্ষার কারণে কাউকে সঠিক পথ দেখানো যায় তাহলে সেটিকে তিনি অনুমোদন দেন।

ছ. মানবতার কল্যাণে জ্ঞান সাধনা

ইসলাম মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা ও চর্চা করতে বলেছে যা তার জন্য উপকারী; এমনকি তার মৃত্যুর পরও সেটি উপকার দেবে। যে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মানুষের বৈষয়িক উন্নতি ঘটবে এবং একই সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে সেই জ্ঞান অর্জন করা এবং নিঃস্বার্থভাবে তা মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইসলাম দিকনির্দেশনা দেয়। আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

> আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'পাত্র 'ইলম আয়ত্ত করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি এমন যে, প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেওয়া হবে।[৮০]

এখানে যে ইলমের কথা বলা হয়েছে তা জনসাধারণের কোনো কাজে লাগবে না বলেই তিনি তা এমনকি প্রকাশও করলেন না; অথচ তিনি সেটি মহানবীর কাছ থেকেই শিখলেন। সুতরাং যে জ্ঞান সাধারণ মানুষের জন্য উপকারী সেটির প্রচারেই কাজ করতে হবে। বর্তমানে কোটি কোটি পয়সা খরচ করে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ানো এবং অকারণে মহাকাশ বিজ্ঞানের চর্চা এক ধরনের অপচয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। শুধু নিজেদেরকে বড় ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য এসব কাজের মহড়া হয় । উন্নত রাষ্ট্রগুলো যদি এই ধরনের প্রতিয়োগিতা না করে বিশ্বের অসহায়-দরিদ্রদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে খরচ করত তাহলে পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটত না, খাবারের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণের অপেক্ষা করতে হত না। মানুষ দু'পয়সা উপার্জনের জন্য শহরে এসে ভীড় করছে। নিদারুন কষ্ট করে যা হাতে আসছে সেগুলো দিয়ে এক কক্ষে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে রাত কাটায়। হঠাৎ অসুস্থতা বা কোনো দুর্ঘটনায় তারা পথের ভিখারীতে পরিণত হয়, অথচ রাস্তার অপর পার্শ্বে বিশাল গগণচুম্বী অট্টালিকায় আরাম কেদারায় বসে আরেকটি শ্রেণি ইউরোপ আমেরিকায় প্রমোদ ভ্রমণের জন্য কোটি কোটি পয়সা দিয়ে বিমান ও হোটেল বুকিং দিচ্ছেন।

ইসলাম এই পাতকী সভ্যতার ঘোর বিরোধী। এজন্য যে জ্ঞান অসহায় মানুষের দুঃখ দূর করতে সাহায্য করবে সেই প্রায়োগিক জ্ঞানই তার শেখা প্রয়োজন। কুরআন এটিকে বলেছে,

> মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া ঠিক নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না যাতে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানের অনুশীলন করতে পারে এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা (অসদাচরণ) থেকে বিরত হয়? (৯: ১২২)।

অর্থাৎ সবার পক্ষ থেকে কিছু লোককে জ্ঞান সাধনার জন্য অবশ্যই আত্মনিয়োগ করতে হবে। এখানে দীনের গভীর জ্ঞান বলতে শুধু নামায-রোযার মাসআলা বা আইন শাস্ত্রের নীতিমালাই নয়, বরং ইসলাম যে নৈতিক সততা ও পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে পৃথিবীকে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর পন্থায় সাজাতে চায়- তার পরিপূর্ণ নির্দেশিকাও এখানে থাকবে। মহানবী (স.) আল্লাহর কাছে বলতেন, "আমি এমন জ্ঞান থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই,

যা উপকারী নয়।" "আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান চাই।" একজন আধুনিক ডাক্তার, স্থপতি, ব্যবসায়ী, কৃষিবিদ বা আইন-বিশেষজ্ঞের যে জ্ঞান থাকা দরকার সেটি মহানবী (স.) এর মধ্যে ছিল না এমনটা কেউ বলতে পারবেন না। তিনি যদি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার এই গভীর জ্ঞান আরো বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন, তাহলে অন্যদের সেই জ্ঞান অনুসন্ধান করা তো দোষের নয়, বরং এটি তাঁরই অনুসরণ। মানুষের ক্ষতি করার কোনো জ্ঞান তিনি রপ্ত করেননি, বরং সেগুলো কোনোভাবে যেন তাঁর ভেতর প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চেয়েছেন।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে অংশ মানব কল্যাণে জড়িত, সেই অংশের সাথে ইসলাম সম্পূর্ণ একমত। মানবতার কল্যাণকামী যে কোনো জ্ঞানকে ইসলাম ছড়িয়ে দিতে উৎসাহ দেয় ও সাহায্য করে। তবে পার্থিব জ্ঞানের জন্য বিনিময় নিতে ইসলাম নিষেধ করে না। যারা মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য ঔষধ আবিষ্কার করে, মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে মানবতার কল্যাণে সীমাহীন অবদান রাখেন তাদের জন্য সামান্য বিনিময় গ্রহণ খুব বড় নয়। ইসলাম এদেরকে পরকালীন সীমাহীন প্রতিদানও দিতে চায়। কিন্তু তাঁরা সেগুলো গ্রহণের পরিবর্তে পার্থিব সামান্য সাফল্যকে নিয়েই সন্তুষ্ট। "যারা পার্থিব সাধনায় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছে এবং মনে করছে তারা খুব ভালো কাজ করছে; আসলে তা নয় বরং এরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত; কারণ এরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে" (১৮: ১০৪-৫)। অর্থাৎ পৃথিবীর সব মহৎ কাজের পেছনে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত থাকে তাহলে সেই কাজের বিনিময়ে পার্থিব ও পরকালীন উভয় সফলতা নিহিত থাকে; কিন্তু যদি কেবল পার্থিব খ্যাতি ও অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে হয় তাহলে এসব কাজের প্রকৃত মূল্য আল্লাহর কাছে নেই, সে সব কাজ যতই কল্যাণকর হোক না কেন।

জ. মানবতাবাদী সাহিত্য রচনা

ইসলাম যে মানবতার বাণী প্রচার করে তার একটি বড় বাহন ভাষা ও সাহিত্য। ভাষা মানুষের আবেগ প্রকাশের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। মানুষ কবিতা, গান, ছন্দ, গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধ রচনা করে একে অপরকে সভ্যতা-সংস্কৃতি শেখায়, উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, কাজে কর্মে গতি সঞ্চার করে, এমনকি কোনো আদর্শ ও মূল্যবোধ রক্ষায় জীবন উৎসর্গের জন্যও প্রস্তুত করে। দর্শনের গূঢ় সত্য কাব্যের রূপক শব্দে প্রকাশ করার মাধ্যমে দর্শন শিখতে সাহায্য করে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা প্রকাশে কাব্য, গান, গল্প বড় ভূমিকা রাখে। এজন্য ইসলাম মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছে আবেগময়ী ভাষা। কুরআনে যেমন আছে দার্শনিক তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক নিদর্শন তেমনি আছে রূপময় শব্দঝঙ্কার। এই কাব্যিক অলঙ্কারের উদ্দেশ্য মানুষের মনের ভেতর এমন এক প্রেমের ভূবন তৈরি যেখানে বৈষয়িক প্রেমের পরিবর্তে ঐশ্বরিক প্রেমের প্রবল চেতনা সৃষ্টি হয়। যারা মহানবীর যুগে কুরআনকে অস্বীকার করত, তারাও রাতের গভীরে সেই ছন্দময় সাহিত্য শুনতে মহানবীর ঘরের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকত। হিজরতের সময় মহানবীকে যারা হত্যা

করতে এসেছিল, তারা মহানবীর কণ্ঠের মধুর ধ্বনিতে শ্রুত কুরআন শুনে এতই অভিভূত হয়ে পড়ে যে, তারা তলোয়ার ফেলে নবীর দন্ত মুবারক চুম্বনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের ভেতর আল্লাহর প্রতি, দেশের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, মা-বাবার প্রতি সর্বোপরি নিখিল মানবতার প্রতি নিখুঁত ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করা সহজ। জর্জ বার্নাড শ বলেছেন, যুদ্ধ মানবজাতির জন্য যতই ক্ষতিকর হোক না কেন, যুদ্ধ না থাকলে সাহিত্য, গল্প সৃষ্টি হত না। অসহায় মানুষের কান্নার দৃশ্য যদি কাব্যে রচিত হয় তাহলে হাজার বছর ধরে সে কান্নার আওয়াজ মানুষ শুনতে পায়। যখনই তা পড়বে তখনই তার ভেতর অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে।

১৯৪৩ সালে ঘটে যাওয়া বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল মূলত পুঁজিবাদী ও সমাজবাদীদের দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশ যুদ্ধের দুই প্রতিপক্ষের মাঝামাঝিতে পড়ে ভয়াবহ মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের শিকার হয়। এসময় আমেরিকা ও রাশিয়ায় প্রচুর গমের ফলন হয়েছিল, অথচ আমেরিকা বাজারের ভারসাম্য রক্ষার অজুহাতে আর রাশিয়া ধনতান্ত্রিকদের আরো সম্পদশালী হওয়া ঠেকাতে কোটি কোটি টন গমের মজুদ সমুদ্রে ফেলে দেয়। এই নৃশংস যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে, কাব্য-গান লিখে তৈরি হয় মানবতাবাদী সাহিত্য। বিশ্বের গুটি কয়েক পুঁজিপতি ও নিষ্ঠুর ক্ষমতাধরদের হাতে বেশিরভাগ সময় সম্পদ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকায় এ ধরনের দুর্ভিক্ষ ও অমানবিক দৃশ্য প্রায়ই বিশ্ব মঞ্চে দেখা যায়। ইসলাম যে বাস্তবধর্মী ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক মানবতাবাদের কথা বলে তা এসব অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ করে। ফররুখ আহমদ 'লাশ' কবিতায় লিখেছেন,

এ কোন্ সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে
করে পরিহাস ?
কোন্ ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে
করে পরিহাস ?
কোন্ আজাজিল আজ লাথি মারে মানুষের শবে?
ভিজায়ে কুৎসিত দেহ শোণিত আসবে
কোন্ প্রেত অট্টহাসি হাসে?
মানুষের আর্তনাদ জেগে ওঠে আকাশে আকাশে।[৬]

পাঞ্জেরী কবিতায় তিনি সেই মানবতার কথাই লিখেছেন,

ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন ধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।
ওকি বাতাসের হাহাকার,-ওকি
রোনাজার ক্ষুধিতের-!
ওকি দারিয়ার গর্জন,-ওকি বেদনা মজলুমের!
ওকি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী!
পাঞ্জেরী!

জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি;
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি!
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী!![৬২]

এধরনের মানবতাবাদী সাহিত্য ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকেই লক্ষ করা যায়। হযরত আলী (রা.) কাব্যের মাধ্যমে মানুষকে নৈতিক উপদেশ দিয়েছেন। হাসসান বিন সাবিত ইসলামের মর্মবাণীকে মানুষের সামনে পেশ করতে কাব্যের আশ্রয় নেন। উমর খৈয়াম, জালালুদ্দীন রুমী, শেখ সাদী এঁরা একদিকে তাসাওউফের মর্মবাণী কাব্যের আকারে ব্যক্ত করেছেন অন্যদিকে মানবতার কল্যাণে, মানব সেবার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। শেখ সাদীর অমর কবিতা,

খোদা-প্রাপ্তি পথ রয়েছে লুকানো
মানব সেবার মাঝে।
পাবে নাকো তাকে আলখেল্লা আর
তস্‌বীহ ও জায়নামাযে ॥[৬৩]

ইসলামের নৈতিক বাণীও কবিদের কাব্যে এবং গল্প-উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে। মার্কসবাদ যেমন সাহিত্যের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ইসলামী মানবতাবাদও সাহিত্যের কল্যাণে প্রসারিত হয়। নজরুলের কবিতায় ইসলামের সেই আহ্বান এসেছে এভাবে,

বেলাল! বেলাল! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আসমানে,
লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন্ মরুর গোরস্তানে!
হের ঈদগাহে চলিছে কৃষক যেন প্রেত-কঙ্কাল
কসাইখানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গরুর পাল?
জীবনে যাদের হর্‌রোজ্ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু-পাঁজরের হাড়?[৬৪]

অর্থাৎ নিরন্ন অসহায় মানুষের মুখে খাবারের ব্যবস্থা না করে ঈদের অনুষ্ঠানে যাওয়া অমানবিক। নিজের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মধ্যে এবং সমাজের যারা এ ধরনের চরম কষ্টে নিপতিত তাদেরকে বাদ দিয়ে ঈদের আনন্দ করা সত্যিই অর্থহীন। ইসলামে ঈদের প্রচলন এই উদ্দেশ্যে হয়নি। ইসলাম চায় সবার আগে মানুষের বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। ইসলামী পরার্থপরতার এ এক কঠিন শিক্ষা যে, নিজে আনন্দ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার চারপাশের অসহায় বুভুক্ষু মানুষের দুঃখ দূর করবে।

ঝ. দারিদ্র্য বিমোচন

ইসলাম যে মানবতাবাদী ও কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছে তার মূল লক্ষ্য মানুষের অভাব ও দারিদ্র্য দূর করা। মানুষকে মানুষের গোলাম না করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত করতে প্রয়োজন মানুষকে নিজের পায়ে চলতে শেখানো। শুধু দান, সদকা করে এর স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পরার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি হচ্ছে মানুষকে স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দেওয়া। ইসলামে দরিদ্রতা বোঝাতে ফকীর ও মিসকীন নামে দুটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ফকীর: যার জীবিকা নির্বাহের উপকরণ নেই, সে কারণে মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। মিসকীন: যার জীবনোপকরণ এতই সীমিত যে, যে কোনো মুহূর্তে অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে যেতে হবে, কিন্তু সাহায্য চায় না। তৃতীয় প্রকারের দরিদ্র হচ্ছে ঐসব ব্যক্তি যাদের উপর যাকাত ফরয হয়নি, অর্থাৎ তারা নিজস্ব স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, কিন্তু তাদের কোনো উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ থাকে না। স্বাভাবিক বা মৌলিক প্রয়োজনকে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন: (১) আকীদা বা নিজস্ব বিশ্বাস ও ধর্ম রক্ষা (২) নফস বা জীবন রক্ষা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানীয় প্রভৃতি (৩) নসল বা নিজ বংশ রক্ষা অর্থাৎ পরিবার গঠনের অধিকার(৪) আকল বা শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের অধিকার(৫) মাল বা ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ থাকা (৬) হুররিয়াত বা স্বাধীনতা থাকা।[৬৫]

মহানবী (স.) দারিদ্র্য থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন। কারণ এটিকে তিনি কুফরের নিকটবর্তী বলেছেন- "হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে দারিদ্র্য ও কুফরি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" কুরআনেও এসেছে দারিদ্র্য অন্তরকে কঠোর করে দেয়-

> আর আমি তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি, আমি তাদের প্রতি ক্ষুধা, দরিদ্রতা ও রোগ ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা নম্রতা প্রকাশ করে আমার সামনে নতি স্বীকার করে। সুতরাং তারা কেন বিনীত হয়নি, যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা করত, শয়তান তাদের জন্য তা শোভিত করেছে।[৬৬]

অর্থাৎ তাদের অনৈতিকতা, বিলাসিতা বা পথভ্রষ্টতার কারণে তারা অঢেল সম্পদের মালিকানা ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব হারিয়ে এখন দারিদ্র্যে জর্জরিত। দারিদ্র্যের কারণে তাদের বিনীতভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এদের অন্তর আরো কঠোর হয়ে গেল। এর মানে দরিদ্রতা অনেককে কুফরির দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রতা দূর করার সাথে সাথে প্রয়োজন সুন্দর জীবনপদ্ধতির অনুসরণ। সেকারণেই কুরআন ইসলামের অনুসরণ ও আল্লাহর পথে চলার পার্থিব উপকার হিসেবে উল্লেখ করেছে- "আসমান ও যমিনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া (৭: ৯৬)। "যে তাকওয়া অবলম্বন করবে আমি তার জন্য সম্মানজনক রিযকের ব্যবস্থা করে দেব"(৬৫: ৩)। অর্থাৎ ইসলাম মানুষকে দরিদ্র রাখতে চায় না, বরং হালাল উপার্জনের মাধ্যমে দরিদ্রতা দূর করতে চায়। তবে সম্পদশালী হওয়া এবং দারিদ্র্য জীবন যাপন না করার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইসলাম মানুষকে সম্পদের সঞ্চয় করতে ও পাহাড় বানাতে

উৎসাহ দেয় না। মহানবী (স.) এজন্যই দারিদ্র্য জীবন পছন্দ করেছেন এবং দরিদ্রদের মতই মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেন।[৬৭] তবে বৈধ পন্থায় কেউ যদি বিরাট সম্পদের মালিক হয়ে যায় তখন সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের প্রতি তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। আল্লাহ এই পৃথিবীর শৃঙ্খলা ও সুবিচারের জন্যই কিছু লোককে অঢেল সম্পদ দান করেন আর কাউকে তা দেন না। যাদের সম্পদ কম, তারা যেন বেশি সম্পদশালীকে দেখে লোভী না হয়, এটিও কুরআনে বলা হয়েছে; (৬: ১৩৫)। আর যারা সামান্য সম্পদের বেশি অর্জন করতে পারে না তাদেরকে অল্পে তুষ্ট থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নিচে দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামের কিছু কর্মসূচির উল্লেখ করছি।

(১) চাহিদার সংকোচন: ইসলাম দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেয় অন্তরের সংকীর্ণতা দূর করতে। যারা সংকীর্ণ চিন্তার অধিকারী তারা অন্যের সম্পদ, অর্থবিত্ত দেখে লোভাতুর হয়ে কামনা করে- "আমারও যদি এত বাড়ি গাড়ি সম্পদ থাকত।" এই কামনা তাকে অস্থির করে তোলে। মহানবী (স.) এজন্যই বলেন, "তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে কম সম্পদের অধিকারীর দিকে তাকাও আর অপার্থিব বা পরকালীন মর্যাদার জন্য তোমার চেয়ে বেশি তাকওয়াবানদের দিকে দৃষ্টি দাও।"[৬৮]অর্থাৎ চাহিদাকে অনন্ত চাহিদায় পরিণত না করে বরং নিজেকে সংযমী হতে উৎসাহ দিয়েছেন তিনি। নিজের প্রয়োজনকে সীমিত রাখতে পারলেই পার্থিব জীবনে বেশি সুখে থাকা যায়।

পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষের অস্থিরতা, এমনকি স্বাভাবিক জীবন যাপনেও বাধা সৃষ্টি করে। এজন্য বৈধ বা অবৈধ পন্থায় কোটিপতি হওয়ার সার্বক্ষণিক চিন্তা তাকে ভালো কাজ করতে সময় দেয় না। আদম সন্তান একটি স্বর্ণের পাহাড় পেলে আরেকটি পাহাড় কামনা করে। কুরআন বরং এদেরকে তিরস্কার করেছে। আবার দারিদ্র্য সত্ত্বেও যারা মেহমানকে সম্মান করেছেন, নিজেদেরকে ও সন্তানদের অভুক্ত রেখে অপর ভাইকে আপ্যায়ন করিয়েছেন, এমন ব্যক্তিদের কর্মকে পছন্দ করে কুরআনের আয়াতও নাযিল হয়েছে।

(২) কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা: মহানবী (স.) নিজে ছাগল চরিয়েছেন, ব্যবসায় পরিচালনা করেছেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকেও শ্রমের মাধ্যমে উপার্জনের শিক্ষা দেন। কুরআনে এসেছে, "আমি মানুষকে কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করেছি; (৯০: ৩-৪)। অর্থাৎ কর্ম ও শ্রমের মাধ্যমে কষ্ট করে তাকে উপার্জন করতে হয়। "মানুষ ততটুকুই পায় যার জন্য সে চেষ্টা করে"; (৫৩: ৩৯)। মহানবী (স.) একজন ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দেন কাজ করে খাওয়ার জন্য। পনের দিন পর সেই লোক এসে মহানবীর সাথে দেখা করে বলল, "আমার এরই মধ্যে দশ দেরহাম উপার্জন হয়েছে।[৬৯] ব্যবসায় বাণিজ্যের উৎসাহ প্রদান করে মহানবী (স.) বলেছেন, "সৎ বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন নবী-সিদ্দীক-শহীদদের সাথে একসাথে অবস্থান করবে"।[৭০]

সরকারি চাকুরিতে মহানবী (স.) যাদেরকে নিয়োগ দিতেন তাদের ভরণ-পোষণের যাবতীয় খরচ মেটানোর জন্য মাসিক বেতন ধার্য করে দিতেন; আর বলে দিতেন এর চেয়ে বেশি কেউ নিতে চাইলে তা তার জন্য অবৈধ হবে। হাদীসে এসেছে,

> যে ব্যক্তি আমাদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োজিত হবে সে বিয়ে করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বায়তুল মাল থেকে লাভ করবে। খাদিম বা চাকর না থাকলে বায়তুল মালের পয়সা দিয়ে খাদিম রাখবে, বাড়ি ঘর না থাকলে বাড়ি ঘরের ব্যবস্থা করবে। অন্য বর্ণনা মতে, এর অতিরিক্ত গ্রহণ করলে সে হবে খিয়ানতকারী।[৬]

যাকাত বিভাগে যারা কাজ করতেন তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সেখানেই ছিল। ইসলামী বিধান অনুযায়ী এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের বেতন ভাতার ব্যবস্থা যাকাত থেকেই করা হয়। অর্থাৎ সরকারি কাজে লোক নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

(৩) ভোগবিলাস অপনোদন: কুরআনে এসেছে, "আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন সেগুলোর মাধ্যমে আখিরাতের বাসস্থান সংগ্রহ কর;" (২৮: ৭৭)। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পদ অন্যদেরকে প্রদানের মাধ্যমে নেকী অর্জন করতে বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কিন্তু নিজের স্বার্থকেই উদ্ধার করা। অসহায় আত্মীয়-প্রতিবেশী ও বিপদগ্রস্ত পথিকদের জন্য ধনসম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে নিজের পারলৌকিক ও স্থায়ী কল্যাণের পথ তৈরি করা সহজ । অথচ অধিকাংশ সম্পদশালী তাদের সম্পদের ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্যই তৎপর থাকেন। সম্পদ ব্যবহারে বিলাসিতা ও কৃপণতা কোনোটিই করা যাবে না। প্রকৃতির নিয়মের কারণেই দেখা যায় কিছু লোক খুব অল্প আয়াসে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যান। এটি মূলত তাদের উপর প্রকৃতি প্রদত্ত সম্মান ও দায়িত্ব। মহানবী (স.) সম্পদশালীর সম্মানের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। ইসলাম জোরপূর্বক মানুষের সম্পদ কেড়ে নিতে বলে না। খুব সামান্য (বার্ষিক মাত্র ২.৫%) যাকাত দেওয়া সম্পদশালীর জন্য একেবারে তুচ্ছ ব্যাপারের মত। শুধু এতটুকুই তার জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু তার সমানে পৃথিবীর অসংখ্য করুণ চেহারা দৃশ্যমান থাকে। তাদের অভাব দারিদ্র্য অপুষ্টি দূর করার বিরাট দায়িত্ব সম্পদশালীর উপর প্রকৃতি প্রদত্ত দায়িত্ব।

সম্পদশালীগণ বিনা সূদে ঋণ দিয়ে বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন, এতে তাদের সম্পদের বরং আরো বৃদ্ধি ঘটতে পারে। উসমান (রা.) এবং আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.) সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলেন। তাঁরা কখনো সম্পদের জন্য লালায়িত ছিলেন না। যেখানে তাঁরা সম্পদ বিনিয়োগ করেছেন, সেখানেই মুনাফা পেয়েছেন। তাঁদের জীবনে বিলাসিতা ছিল না। উসমান (রা.) এর সম্পদ ইসলামের প্রথম যুগে মহানবীর ইসলাম প্রচারে সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছিল।

ঞ. ইয়াতীম ও দুঃস্থদের প্রতি আচরণ

মহানবী(স.)কে আল্লাহ বাবা-হারা ইয়াতীম করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। অল্প বয়সে মা'কে হারিয়েছেন এবং প্রিয়জনদের মধ্যে একমাত্র চাচা আবু তালিব ছাড়া রাসূলের আশ্রয় দাতা তেমন আর কেউ ছিলেন না। এই

অসহায় অবস্থায় তাঁকে বড় করার পেছনে আল্লাহ তা'আলার মহা পরিকল্পনা ছিল: তিনি যেন নিখিল বিশ্বের অসহায় মানুষের দুঃখ কষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন। নজরুলের ভাষায়,

সকলের তরে এসেছে যে জন, তার তরে
পিতার মাতার স্নেহ নাই, ঠাঁই নাই ঘরে।
নিখিল ব্যথিত জনের বেদনা বুঝিবে সে,
তাই তারে লীলা-রসিক পাঠাল দীন বেশে।
আশ্রয়হারা সম্বলহীন জনগণে
সে দেখিবে চির আপন করিয়া কায় মনে-
বেদনার পর বেদনা হানিয়া তাই তারে
ভিখারী সাজায়ে পাঠাল বিশ্ব-দরবারে।[৭২]

বিশ্বজগতে মানুষের বা জীবের মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর যে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন সে জন্য কেউ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে দোষারোপ করে না; কারণ দোষারোপ করলে কারো সামন্যতম কষ্টও লাঘব হয় না, বরং ধৈর্যের অভাবে কষ্ট বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন বিশ্বে কত শিশু ইয়াতীম হয়ে যাচ্ছে, কত লোক অসুস্থতা রোগ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, কত মহামানব অকালে চলে যাচ্ছেন। পরম দয়ালু আল্লাহ এগুলো কেন সংগঠিত করেন? এর উত্তর একটাই তিনি সব কিছু তাঁর সুবিচার নীতির আলোকে করেন, আমাদের উপলব্ধিতে না আসলেও। তবে এতটুকু আমরা বুঝতে পারি, এসবের মাধ্যমে তিনি মানুষের ভেতর এমন আবেগ সৃষ্টি করতে চান যার ফলে মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি, অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তিনি যাকে দিয়ে বিশ্ব মানবের দুঃখ দূর করতে চান তাকেও ভীষণ কষ্টের মধ্যে রেখে তার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেন। ইসলামের নবী এজন্য বিশ্ব জগতের মানুষের কষ্ট সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছেন। দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করা আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার একটি প্রমাণ। আল্লাহ স্পষ্ট করে দেন, যারা ইসলামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা বলে তাদের পক্ষে ইয়াতীমদের গলা ধাক্কা মেরে, দুঃস্থ ব্যক্তিদের খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দিতে হয়ত বিবেক বাধে না (১০৭: ১-৩) কিন্তু মুসলিমের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

মক্কী জীবনে নাযিল হওয়া সূরাসমূহে নৈতিক চরিত্র গঠনের কাজকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসময় অসহায় মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে মহানবী (স.) ও নতুন মুসলিমগণ অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া ও ব্যবসায়-লব্ধ অর্থসম্পদ মহানবী (স.) দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

> আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। একজন লোক নবী (স.)এর কাছে এতগুলো বকরি চাইল, যাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তিনি (স.) তাকে সে পরিমাণ বকরিই দিয়ে দিলেন। অতঃপর লোকটি নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকসকল, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা মুহাম্মাদ (স.) এত বেশি পরিমাণে দান করেন যে, তিনি অভাবকে ভয় করেন না।[৭৩]

আবু বকর (রা.) নিজে বিলাল, আম্মারসহ অনেক দাস মুক্ত করে দেন। এরা কাফের নেতাদের নির্যাতনে চরম অমানবিক অবস্থার শিকার হয়েছিলেন।

৫. পরোপকার হবে নিঃস্বার্থ

মানুষের জন্য উপকারের এই কাজ যতই মহত্তর হোক না কেন কুরআন এই কাজটির মূল্যায়নে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেছে। কোনো প্রকার ক্ষুদ্র ও বৈষয়িক স্বার্থকে দানের পেছনে যদি লুকায়িত রাখা হয় মানব সভ্যতার কোনো বিবেকবান ব্যক্তিও তাকে ভালো কাজ বলবেন না। উদ্দেশ্যমূলক দান বা উপকার আসলে কোনো দান নয়। মানুষের বিপদে কিছু মানুষ তাদেরকে কেনা বেচার চেষ্টা করে নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য। এগুলোকে এক ধরনের ঘুষ বলা যায় কিংবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট কিছু। কুরআন দানের উদ্দেশ্যকে প্রথমত ভালোবাসা বা শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে দেখে। "তোমরা উপহার দাও, তাহলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।"[৭৪] "তোমরা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনো, তোমরা কখনো ঈমান আনতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে.. .."।[৭৫] হাদীস দুটিতে যা বলা হলো তা হচ্ছে, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া কারো পক্ষে মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়। এই ভালোবাসা শুধু মুখের উক্তি নয়, বরং উপহার, সম্মান, শ্রদ্ধা, উপকার, মেহমানদারি অথবা যে কোনো সদকা বা দানের মাধ্যমে হতে পারে। ইসলামের সব কাজের শেষ ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা। আল্লাহ বিশেষভাবে যে কাজগুলো তাঁর হক হিসেবে মূল্যায়ন করবেন সেগুলো বাদেও মানব সমাজের পারস্পরিক স্বার্থের কাজগুলোকেও স্বার্থের সাথে বিবেচনা না করে যখন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হবে তখন এগুলোতে এক ধরনের পরমানন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যাবে। "আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের খাবার দিচ্ছি, তোমাদের কাছ থেকে কোনো ধরনের প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা আশা করি না;" (৭৬: ৮-৯)। অর্থাৎ উপকার করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষকে সামনে রেখে। অসহায় ব্যক্তির কাছ থেকে সামান্য প্রতিদান এমনি কৃতজ্ঞতাবোধেরও আশা করা যাবে না। এখান থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআন দানের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় করেছে: প্রথমত, দান হবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, বিনিময়ে কারো কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিদান, এমনকি কৃতজ্ঞতাও কামনা করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, অধিক পাওয়ার আশায় নিজের উদারতা বা দানশীলতার প্রমাণ দেওয়া যাবে না (৭৪: ৬)। তৃতীয়ত, এটা দানগ্রহীতার অধিকার হিসেবে আদায় করতে হবে। কারণ, কুরআন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হাতে রাখতে নিষেধ করেছে,(২: ২১৯); এবং অসহায়দের এর উপর অধিকারের ঘোষণা দিয়েছে, (৭০: ২৪-২৫)। এজন্য মহানবী (স.) যে সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় রাখবেন বলে জানিয়েছেন, তাদের অন্যতম, গোপনে দান-সদকাকারী, যে ডান হাতে দান করবে অথচ তার বাম হাত জানবে না। অর্থাৎ যখন অতি গোপনে দান করা হবে তখন সেখানে দানগ্রহীতার সম্মান রক্ষা পাবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই কেবল অবলম্বন করা হবে।

যে দান সদকা বা অর্থব্যয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানানো হয় না, সেগুলোর মর্যাদা খুব সামান্য। আল্লাহ বলেন,

> বলো, আমি কি তোমাদেরকে সে সব লোকের সংবাদ দেব যারা কাজে কর্মে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব লোক যারা পার্থিব উদ্দেশ্যে তাদের কঠোর শ্রমে হারিয়ে যায়, আর মনে করে, তারা খুব ভালো কাজ করছে। (১৮: ১০৩-৪)

এই অর্থে যারা পরকালকে অস্বীকার করে, তাদের ভালো কাজের মূল্য নেই, বিষয়টি এমন নয়। বরং, যারা যতটুকু ভালো কাজ করবে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। পরকালে যারা দৃঢ় বিশ্বাস করবে আল্লাহ তাদেরকে পরকালে নিশ্চিতভাবে প্রতিদান দেবেন, দুনিয়াতেও তাদের দেবেন, তবে এটা অনিবার্য নয়; বরং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদেরকে তিনি দুনিয়াতে তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে সম্মান মর্যাদা সম্পদ ও কর্তৃত্বও দান করবেন। তবে আল্লাহর উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আল্লাহ সবকিছু তাঁর ন্যায় ভিত্তিক মহাপরিকল্পনার আলোকে পরিচালনা করেন।

আধুনিক পুজিঁবাদী পরিভাষায় দান নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর কারণ, পুঁজিপতিরা তাদের নিজস্ব স্বার্থে গরীবদেরকে দান করেন যেন তারা আরো গরীব হয়ে যায়। এডাম স্মিথের ভাষায়,

> আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতা হেতু আমাদের আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, বরং তাদের স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।[৭৬]

অর্থাৎ তিনি বলতে চান, কৃষক শ্রমিকরা তাদের প্রয়োজনে কাজ করে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করছে। তারা আমাদের জন্য নয়, বরং নিজের জন্যই ফসল ফলায়। বলা যায় সবকিছুকেই তিনি পারস্পরিক স্বার্থের দিক থেকে বিবেচনা করেন। ইসলাম এটি চায় না, বরং মানুষের প্রতিটি ভালো কাজকে যথার্থভাবে স্বীকৃতি দিতে চায়।

৬. মন্তব্য

এখানে আমরা দেখাতে চেয়েছি পরার্থপরতার যে দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম উপস্থাপন করেছে তা প্রচলিত অন্যান্য নীতিদর্শনের চেয়ে উন্নততর। মানুষকে উপায় হিসেবে না দেখে বরং তার প্রকৃত মর্যাদা অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করতে শিখিয়েছে ইসলাম। কেবলমাত্র অপার্থিব লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ যখন মানুষের উপকার করে তখন সেটিই হয় তার জন্য প্রকৃত উপকার। কান্ট কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সম্পাদন তত্ত্বের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন; কিন্তু এর সাথে যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি যুক্ত হবে তখন সেই কর্তব্য সম্পাদনেও সৃষ্টি হয় মনের আনন্দ। ইসলামী পরার্থবাদিতা শুধু মানুষেরই কল্যাণের নির্দেশ দেয় না, বরং সৃষ্টিজগতের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানায়।

তথ্যনির্দেশ

১. আল-কুরআন, ২১: ১০৭ (وَ مَا اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ) ।

২. প্রাগুক্ত, ৩: ১১০।

৩. প্রাগুক্ত, ২৮: ৭৭।

৪. প্রাগুক্ত, ৫৫: ৬০।

৫. প্রাগুক্ত, ৫৯: ৯।

৬. Auguste Comte, *A General View of Positivism* [1848] (London: Routledge & Sons, 1908), p. 368-74.

৭. আকবর আলি খান, *পরার্থপরতার অর্থনীতি* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ২০০০), পৃ. ৪।

৮. Hector Hawton, *The Humanist Revolution* (London: Pemberton, 1963), p. 18.

৯. আকবর আলি খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।

১০. আল-কুরআন, ১৩: ২৬।

১১. প্রাগুক্ত, ৫৫: ১৩।

১২. প্রাগুক্ত, ৫৬: ৬৩-৬৭।

১৩. প্রাগুক্ত, ৩৬: ৪৭।

১৪. প্রাগুক্ত, ৪৩: ৩২।

১৫. মুহাম্মদ শফী, *মাআরেফুল কোরআন* (সংক্ষিপ্ত), অনু. মুহিউদ্দীন খান (মদীনা মোনাওয়ারা: বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৯৯২), পৃ. ১২২৮।

১৬. আল-কুরআন, ২: ৩।

১৭. প্রাগুক্ত, ৩৬: ৭১-৭৩।

১৮. প্রাগুক্ত, ২: ১৬৮।

১৯. প্রাগুক্ত, ৮: ২৮।

২০. প্রাগুক্ত, ৩: ৯২।

২১. প্রাগুক্ত, ২: ২১৯।

২২. Brenda Almond, & Donald Hill (ed.), *Applied Philosophy* (London: Routledge, 1991), pp. 65-68.

২৩. *Ibid.*, p. 68.

২৪. Nada Yousuf Al-Rifai, 'Wisdom in the poetry of Ahmad Shawqi', *Advances in Social Sciences Research Journal*, (United Kingdom, ASSRJ), Vol. 4, Issue 11 June-2017, p. 237.

২৫. *বুখারী:* ৩৬৫৬।

২৬. *তিরমিযী:* ২০২২।

২৭. *আবু দাউদ*: ৪৮৪৩।

২৮. আল-কুরআন, ৪: ১।

২৯. প্রাগুক্ত, ৯: ১২৮।

৩০. প্রাগুক্ত, ৩: ১৫৯।

৩১. *বুখারী*: ২১২৫।

৩২. আল গাযালী, *এহইয়াউ উলূমুদ্দীন*, (৬ষ্ঠ খণ্ড) অনু. এম. এমদাদুল্লাহ (ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানি লি., ২০০১), পৃ. ১২০-২৪।

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৯০।

৩৪. *আহমাদ*: ৯১৯৮; *বায়হাকী*: ২১০৯৭।

৩৫. *বুখারী*: ৬০৪১।

৩৬. *তিরমিযী*: ২৩৭৮।

৩৭. *বুখারী*: ২১০১।

৩৮. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২১।

৩৯. আল-কুরআন, ৯৩: ৬-১০।

৪০. *বুখারী*: ২৪৪২।

৪১. *মুসলিম*: ২৫৬৪।

৪২. আল-কুরআন, ৩৫: ২৯-৩০।

৪৩. *বুখারী*: ১৩।

৪৪. আবদুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮), পৃ. ২০৮।

৪৫. Ibn Jarir al-Tabari, *The History of al Tabari*, tr. I. K. A. Howard (New York: State University of New York Press, 1985), pp. 119-20.

৪৬. D. F. Pears, (ed.), *The Nature of Metaphysics* (London: Macmillan, 1957), p. 40.

৪৭. মুহাম্মদ ইকবাল, *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন* (ঢাকা: আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০৫), পৃ. ১৭০।

৪৮. *বুখারী*: ৫৩৭৩।

৪৯. *মুসলিম*: ৬৭২১।

৫০. Abul Fadl Jamal al-Din Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Sadr, 1992), p.43.

৫১. ইবনে হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, অনু. আকরাম ফারুক (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১), পৃ. ২৭৩।

৫২. *বুখারী*: ৬২৩৬; *মুসলিম*: ১৬৯ ।

৫৩. *তিরমিযী*: ১৯২৯; *আবু দাউদ*: ৪৯৪৩।

৫৪. *মুসলিম*: ৫৫ ।

৫৫. *বুখারী*: ৩১৪৯।

৫৬. *প্রাগুক্ত*: ৬০৩৪।

৫৭. *মুসলিম*: ২৫৯৯।

৫৮. *বুখারী*: ৩৫৬০।

৫৯. *মুসলিম*: ২২৮৪।

৬০. *বুখারী*: ১২০।

৬১. আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম.), *কবিতাসমগ্র: ফররুখ আহমদ* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৯), পৃ.৬৫।

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।

৬৩. শায়খ সাদী, *গুলিস্তাঁ*, অনু. মোহাম্মদ মোবারক আলী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩), পৃ. চৌদ্দ।

৬৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম.), *শ্রেষ্ঠ নজরুল* (ঢাকা: অবসর, ২০০৭), পৃ. ১৫৭।

৬৫. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২১।

৬৬. আল-কুরআন, ৬: ৪২-৪৩।

৬৭. *তিরমিযী*: ২৩৫২।

৬৮. *মুসলিম*: ২৯৬৩।

৬৯. *আবু দাউদ:* ১৬৪১।

৭০. *তিরমিযী*: ১২০৯।

৭১. *আবু দাউদ:* ২৯৪৫।

৭২. কাজী নজরুল ইসলাম, *মরু-ভাস্কর* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮১), পৃ. ৩৩।

৭৩. *মুসলিম*: ২৩১২।

৭৪. *মালিক:* ১৬।

৭৫. *মুসলিম*: ৫৪।

৭৬. আকবর আলি খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।

৫ম অধ্যায়

ইসলামী নীতিদর্শনের পূর্ণাঙ্গতা

ইসলামী নীতিদর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিদর্শন। পূর্ণাঙ্গতা বোঝাতে কুরআন প্রধানত দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে: *কামাল* ও *তামাম*। মহান আল্লাহ বলছেন,

> আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন-ব্যবস্থা বা দীনকে পূর্ণতা (*কামাল*) দান করেছি এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম (*তামাম*) আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।[১]

এর অর্থ জীবনের জন্য যে সব নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক বিষয়ের প্রয়োজন সবকিছুর পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা কুরআনে এসেছে। কুরআনে আরো বলা হয়েছে, "সত্যতা ও ইনসাফের দিক থেকে তোমার রবের কথা পূর্ণাঙ্গ, তাঁর বাক্যের কোনো পরিবর্তনকারী নেই"।[২] এই বক্তব্যে ইসলামী নীতিদর্শনের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়: পূর্ণ সত্য ও পূর্ণ সুষম। এ কথাটি আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলেছেন- "আমি সবকিছু দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করেছি"।[৩]"আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং কেউ কি আছে যে উপদেশ গ্রহণ করবে?" [৪] অর্থাৎ এখানে জীবন সমস্যার যাবতীয় খুঁটিনাটির যেমন বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি কীভাবে এসব সমস্যার সমাধান করা যায় তারও সহজ পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যে কেউ এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

কামাল বা *তামাম* শব্দের চেয়ে ব্যাপকতর অর্থসম্পন্ন আরেকটি শব্দকে কুরআন পূর্ণতার অর্থে ব্যবহার করেছে; তা হলো *ইহসান*। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। পূর্ণতা অর্থে এটি ইসলামী নৈতিকতার চূড়ান্ত স্তর। হাদীসে জিবরীল নামে পরিচিত একটি হাদীসে জিবরীল (আ.) মানুষের ছদ্মবেশে মহানবীকে (স.) বিভিন্ন প্রশ্ন করেন; তন্মধ্যে একটি ছিল *ইহসান* কী? মহানবী বলেন,

> এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তাহলে (মনে করবে), তিনি তোমাকে দেখছেন।[৫]

জিবরীল তখন মহানবীর সত্যায়ন করলেন। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এই অর্থে *ইহসান* শব্দের ব্যবহার হয়েছে। "*মুহসিন*দের জন্য রয়েছে সীমাহীন প্রতিদান"।[৬] *ইহসান* শব্দটির মূল অর্থ সৌন্দর্য প্রদান। কোনো কিছুর সুন্দর হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সেই জিনিসের প্রতিটি উপাদান জিনিসটিতে বিদ্যমান থাকা এবং উদ্দেশ্য পূরণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হওয়া।[৭] অর্থাৎ সুন্দরের পূর্বশর্তই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গতা। তবে এটি সুন্দরের

নিম্নতম সীমা, সুন্দরের সর্বোচ্চ সীমা নেই। পৃথিবীর সব মানুষ এবং নবী-রাসূলদের মধ্যে এই সুন্দরের বা পূর্ণতার চরমে পৌঁছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)।

ইসলামী নীতিদর্শনের পূর্ণতার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আমরা এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি অন্যসব নীতিদর্শনের চাইতে এই নীতিদর্শন অধিকতর পূর্ণাঙ্গ এবং এর ভেতর এমন সব অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মৌলিক উপাদান আছে যা অন্য দর্শনে নেই। অভ্যন্তরীণ দিকটি মানুষের আত্মার উপলব্ধি বা নিজের অন্তঃস্থ গুণ ও যোগ্যতার সাথে যুক্ত। ইসলামী তাসাওউফ শাস্ত্র এই দিকটির বেশি আলোচনা করে থাকে; এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগ সাধিত হতে পারে। বাহ্যিক দিকটি ইসলামী ভাবধারার সাথে যুক্ত প্রতিটি সামাজিক কাজ ও আনুষ্ঠানিকতায় প্রকাশ পায়। সামগ্রিকভাবে এসব বিষয় নিয়েই এই অধ্যায়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

১. পূর্ণতার ধারণা

নঞর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অপূর্ণতা বা ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার নামই হচ্ছে পূর্ণতা। এই অর্থে মানুষের নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে স্বয়ং মহান আল্লাহ কুরআনের পূর্ণতার দাবিকে যাচাই করতে বলেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ মানুষকে আহ্বান করেছেন, মানুষ কুরআনের মত অনুরূপ কিছু রচনা করতে সক্ষম হলে তা প্রদর্শন করুক। কিন্তু কেউ সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে আসেনি।

> আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য সাক্ষীদেরকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা না কর আর (বাস্তব কথা হচ্ছে) কখনো করবেও না...”।[৮]

আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য তখনকার আরবী কবি সাহিত্যিকদের কেউ এগিয়ে আসেননি। পরবর্তীতে হাজার বছর পার হলেও সেই পদক্ষেপ নিতে কাউকে দেখা যায়নি। এখানে শর্ত দেওয়া হয়েছে, যদি তারা তাদের দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী হয়। অর্থাৎ যেহেতু তারা সেই চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে, তাই বোঝা যায়, তাদের এমন সন্দেহ বাস্তব ভিত্তিক ছিল না।

> করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো ত্রুটি খুঁজে পাবে না, আবার দৃষ্টি ফেরাও কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ- তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।[৯]

অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের কোথাও কেউ ত্রুটি বিচ্যুতি পাবে না। তবে প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকা বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞ, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি এ কথার প্রমাণ করে না যে, কোনো অপূর্ণতার কারণে তা ঘটছে, বরং এর অর্থ তাঁর সৃষ্টিকর্ম অব্যাহত রয়েছে। একটি ঘটনাকে তিনি অপর ঘটনার সাথে যুক্ত করেই শেষ করেন না, বরং সেখান থেকে আরেকটি ঘটনার উদ্ভব ঘটান। সামগ্রিকভাবে এটা বাস্তব সত্য যে, মহাবিশ্ব যেভাবে

ছিল সেভাবেই আছে। লক্ষ বছরের বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ এর বিপরীত কিছু প্রমাণ করে না। একইভাবে মানুষকেও তিনি যে ত্রুটিবিহীন অবয়ব এবং সুন্দরতম গঠন দিয়ে সৃষ্টি করেন সেটিও বিভিন্ন স্থানে এসেছে,

> যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেন। অতঃপর তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। তারপর তিনি তাকে সুষমামণ্ডিত করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদের দেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তকরণ.. ..।[১০]
>
> আমি অবশ্যই মানুষকে সর্বোত্তম গঠন-আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।[১১]

এখানে বিশেষত মানুষের গঠনগত পূর্ণতার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। আবার কোনো কিছুর গঠন থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, এর দ্বারা কী কাজ সম্পন্ন হতে পারে। তবে কেবল মানুষের দৈহিক অবয়বই নয় তার মন বা আত্মারও তিনি সুষম গঠন দান করেন।[১২] মানুষ সৃষ্টিজগতে একমাত্র প্রজাতি যাদেরকে আল্লাহ চক্ষু, কর্ণ, অন্তর ও বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন যেন সে ভাবতে পারে এবং নিজের করণীয় বের করতে পারে। অর্থাৎ মানুষ দেহ ও মনের দিক থেকে সৃষ্টিজগতে এমনই অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা অন্য কোনো সৃষ্টিতে নেই। তার এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যেখানে কোনো অপূর্ণতা নেই বলে তিনি ঘোষণা দেন। একটি অট্টালিকার পূর্ণতার জন্য কমপক্ষে দুটি দিক মূল্যায়ন করা হয়- এর অভ্যন্তরীণ ভিত্তি ও মজবুতি এবং বাইরের কাঠামো। আমরা ইসলামী নীতিদর্শনকে এই অর্থে চিন্তা করলে দেখব এর ভেতরের দিকটি হচ্ছে আত্মার উপলব্ধি ও সৌন্দর্য, বাইরের দিকটি হচ্ছে ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক পূর্ণতা।

২. ইসলামী নীতিদর্শনের পূর্ণতার প্রমাণ

প্রচলিত নীতিদর্শনে পূর্ণতাবাদ বা *পারফেকশনিজম* বলতে বোঝায় আত্মার সঠিক উপলব্ধিকে। সক্রেটিসের 'নিজেকে জানো'- এই সূত্র ধরেই পূর্ণতাবাদের আদি স্তরের গঠন হয়। সক্রেটিস জ্ঞান বলতে বুঝিয়েছেন শুভ সম্বন্ধে মানুষের উপলব্ধি। এই উপলব্ধি আসে মনের ভেতর থেকে। সুতরাং মন বা আত্মার যথার্থ উপলব্ধি থেকেই মানুষের ভালো-মন্দের উপলব্ধি আসে যার মাধ্যমে সে নিজেকে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে। প্লেটো তাঁর দর্শনের মূল বিবেচ্য বিষয় হিসেবে সুবিচারের ব্যাখ্যা দেন, যার অধিষ্ঠান প্রথমত আত্মায় পরে আদর্শ রাষ্ট্রে। আত্মায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা না হলে বাইরের জগতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এরিস্টটল তাঁর নীতিদর্শনের মূল কেন্দ্র হিসেবে ইউডাইমোনিয়া (eudaimonia) শব্দটির প্রয়োগ করেন, যার অর্থ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন। জীবনের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর পরিপূরণ অর্থে প্রাচীন গ্রিসে এই শব্দটির ব্যবহার হত। তিনি এটিকেই নৈতিকতার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। আত্মার মাধ্যমে এই সমৃদ্ধি আসে বলে তিনি আত্মার উপলব্ধিকে নৈতিকতার জন্য আবশ্যক মনে করেন। আধুনিক যুগে হেগেল পূর্ণতাবাদের ব্যাখ্যা দেন পরম আত্মার মাধ্যমে। এই বিশ্বজগতের সবকিছু পরম আত্মার অংশ। এজন্য আত্মার উপলব্ধিই মানুষের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ তিনি মনে করেন আত্মোপলব্ধিই হচ্ছে

নৈতিক পূর্ণতা। স্যামুয়েল আলেকজান্ডার নৈতিক পূর্ণতার জন্য আত্মোপলব্ধিকে যথার্থ মনে করেন না। তাঁর মতে, এটিকে যদি মধ্যম পন্থা বলা যায় তাহলে অধিকতর শুদ্ধ হতে পারে। তবে তিনি আইন অনুসারে কাজ করাকে পূর্ণতার জন্য প্রধান শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।[১৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণতার অর্থ হচ্ছে প্রথমত, পরিপূর্ণভাবে ঐশী জ্ঞান লাভের চেষ্টা যার মাধ্যমে নিজের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো কার্যে বাস্তবায়ন করা যায়। দ্বিতীয়ত, নিজেকে সবসময় পরকালীন বিপদের ঝুঁকির সম্মুখীন মনে করে মন্দ ও অশুভ কাজ থেকে বিরত থাকা।[১৪]আল্লাহ সব সময় দেখছেন এই চিন্তা লালন করে যখন কেউ কোনো দায়িত্ব পালন করে, তখন তাতে অলসতা, অসতর্কতা বা দুর্নীতি সৃষ্টি হতে পারে না। বর্তমান যুগে সামান্য ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার কারণে অনেক অপরাধ কমে আসছে। কিন্তু এই যন্ত্রের ক্ষমতা খুব সংকীর্ণ ও সীমিত। অন্যদিকে আল্লাহর পর্যবেক্ষণ সবচেয়ে নিখুঁত ও অব্যর্থ। সে দৃষ্টি ফাঁকি দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। "যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী সম্যক জ্ঞাত"(৬৭: ১৪)।

গভীরভাবে তাকালে দেখা যায়, আত্মার রহস্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে যতই চিন্তা করা হয় ততই মানুষের মধ্যে নতুন নতুন উপলব্ধি আসে। পৃথিবীর নতুন নতুন যত উদ্ভাবন, আবিষ্কার, সৃজনশীলতা সবকিছু প্রথমে কারো অন্তরে সৃষ্টি হয়। এমনিতেই সেটি সৃষ্টি হয় না, বরং ক্রমাগত চিন্তা ও গবেষণা থেকে ধীরে ধীরে সেটি আসে। মহানবী (স.) হেরা গুহায় মানবজাতির মুক্তির জন্য রাতদিন যেভাবে ধ্যান মগ্ন থাকতেন, তিনি যদি নবী না হতেন তবুও মানবজাতির জন্য অনেক কিছুই করতে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের আত্মা বা মনের এই গভীর অনুশীলন থেকে মানুষ নিজেই তার ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। একারণেই কুরআন নৈতিক উন্নয়নে মানুষের অভ্যন্তরীণ দিকটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। চরিত্র মানেই মানুষের আত্মিক উন্নয়ন, সৌন্দর্য ও দৃঢ়তা যা একই সময় সমাজের সংহতি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও উৎকর্ষতার জন্য প্রয়োজন। কুরআনের ভাষায়,

> শপথ আত্মার (নফস) এবং যিনি এটিকে সুগঠিত করেছেন তাঁর, তিনি নাফসের মধ্যে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দেন। যে একে পরিশুদ্ধ করবে সে সফল আর যে একে কলুষিত করবে সে ব্যর্থ হবে।[১৫]

প্রকৃতপক্ষে ভালো-মন্দের এই বোধ আল্লাহ সবার আত্মায় এমনভাবে স্থাপন করেছেন যেন মানুষ সহজে তার ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের পথ খুঁজে নিতে পারে। নফসের মধ্যে সবসময় ভালো মন্দের লড়াই চলতে থাকে। আত্মাকে সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য এর কাজ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। দেহের প্রতিটি অঙ্গ আত্মার নির্দেশে চলে। এজন্যই আত্মাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে আত্মা ও দেহ উভয়ই সফলতা অর্জন করে। নিজ আত্মাকে যথার্থভাবে চেনার কারণেই হযরত আদম (আ.) নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন। ইবরাহীম (আ.) নিজের স্রষ্টার সন্ধানে নেমেছিলেন কেবল আত্মার তৃপ্তির জন্য।

কুরআন মানুষকে আত্মোপলব্ধির সাথে সাথে বিশ্বজগৎ ও আল্লাহর উপলব্ধির আহ্বান জানায়। কারণ, নিজেকে যে চিনেছে সে স্বভাবতই নিজের অস্তিত্বের কারণ, সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা, সফলতা ও ব্যর্থতার

সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে বুঝতে পারে। এর ফলে সে তার স্রষ্টার অনুসন্ধানে নেমে পড়ে। আর বাহ্যিক এই জগতের সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখে সে শেখার চেষ্টা করে এগুলো কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামী দর্শন ও চিন্তার জগৎ যে বাস্তব জীবন ভিত্তিক এটি তার প্রধান প্রমাণ। এ জগতের সৃষ্টি-কর্ম, আকাশের মত বিশাল খুঁটিবিহীন ছাদ, পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত-সমুদ্র, সমতল ভূমি, বন-জঙ্গল, মরুভূমির উট ইত্যাদি থেকে শেখার জন্য কুরআন বিভিন্ন স্থানে বলেছে। এজন্য বিশ্বজগতকে *'আল-কিতাবুল মানশূর'* (বিস্তীর্ণ গ্রন্থ) বলা হয় যেখানে কুরআন হচ্ছে *'আল-কিতাবুল মাস্‌তূর* (লিখিত গ্রন্থ)।[১৬] লিখিত গ্রন্থ পড়ে যেমন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়, তেমনি বিশ্বজগতের চিন্তা মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম করে। কুরআনের বাণী:

> আমি আকাশ, যমীন আর এতদুভয়ের মাঝে যা আছে সে সব খেল-তামাশার ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এ দু'টোকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[১৭]

এভাবে বিশ্বজগতের উপলব্ধি থেকে প্রথম যে শিক্ষাটি মানুষ অর্জন করে কুরআনের ভাষায় তা হচ্ছে: "হে আমাদের রব, আপনি এসব কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেননি"।[১৮] অর্থাৎ এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহকে স্বতস্ফূর্তভাবে স্বীকৃতি দেওয়া আর এই বিশ্বাস করা যে, কোনোকিছুই তিনি অপ্রয়োজনে বা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি, নিশ্চয়ই এগুলোতে মানুষের জন্য কল্যাণ ও শিক্ষা রয়েছে। মানুষ এমন কোনো প্রাণী নয় যে, সে জগতের সুশৃঙ্খল নিয়মনীতির বাইরে চলবে। বরং এই বিশ্ব-জাহানের সব কিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত। সুতরাং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সবার প্রতি। এটিই হচ্ছে বিশ্বজগতের উপলব্ধি।

আত্মজ্ঞান ও বিশ্ব-জ্ঞান লাভের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে সহজে বুঝতে পারে। আল্লাহর উপলব্ধি চিন্তাজগতে মানুষকে যে চেতনা দেয় তা হচ্ছে: আল্লাহর প্রতি, নিজের প্রতি এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতি দায়িত্বপালন। আরো প্রমাণ হবে, আমরা বাস্তবে কেউ আল্লাহর আদেশের বাইরে যেতে পারি না।

> আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, সবাই আল্লাহর আনুগত্য করে, আর সবাইকে তারই দিকে ফিরে যেতে হবে।[১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর উপলব্ধি মানুষের মধ্যে এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, সে এই পৃথিবীতে যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব হিসেবে অন্যের নিকট দায়বদ্ধ, তেমনি বিশ্বজগতের আলো-বাতাস, মাটি-পানিসহ অসংখ্য উপকরণ ভোগের কারণে এগুলোর মালিকের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, কুরআনি নীতিদর্শনের মধ্যে তিন ধরনের উপলব্ধিই রয়েছে: আত্মা, বিশ্বজগৎ ও আল্লাহ; তাই পূর্ণতার প্রথম দাবিতে এটি উত্তীর্ণ।

পূর্ণতার জন্য দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল ব্যবহারিক দিক থেকে পূর্ণতা। ইসলামী নীতিদর্শনের এটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটিকে জিবরীল (আ.) *ইহসান* বলেছেন, যা নৈতিকতার চূড়ান্ত পূর্ণতা। মহানবী (স.)এর অর্থ করেছেন, আল্লাহকে সরাসরি মনের গহীন থেকে প্রত্যক্ষ করা অথবা আল্লাহ আমাকে সরাসরি দেখছেন এমন সত্য উপলব্ধি হওয়া। এটিই হচ্ছে ইবাদতের সর্বোচ্চ স্তর। মানুষের জীবনের কোনো একটি কাজও

ইবাদতের বাইরে নেই; অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের এই অনুভূতি থাকতে হবে যে, আমরা আল্লাহর সামনে থেকেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করছি অথবা তিনি আমাদের সব প্রত্যক্ষ করছেন। এই স্তরে উপনীত হতে পারলেই কেবল পূর্ণতা অর্জন সম্ভব।

সুন্দরতম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের আদর্শ হিসেবে কুরআন যা বলেছে তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে মহানবীর জীবনে। পবিত্র কুরআনে মহানবীকে (স.) আল্লাহ সমগ্র মানবতার জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেন: "তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ"।[২০] আর মহানবী (স.) সব কাজে আমাদেরকে ইহসানের অনুসরণ করতে বলেছেন, এমনকি পশু যবেহর সময়ও যেন পশুর অতিরিক্ত কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে তিনি নির্দেশনা দেন। কুরআন মানবীয় আচরণের পূর্ণতার জন্য লোকমান (আ.) এর দৃষ্টান্তকেও উপস্থাপন করেছে। তিনি নিজের সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা আল্লাহ পছন্দ করেছেন।[২১] যেমন, ১. আল্লাহর সাথে শিরক না করা; ২. মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ এবং আনুগত্য; ৩. এমন বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ সবচেয়ে সূক্ষ্ম জিনিসও দেখেন; এজন্য (বিশেষত কোনো অন্যায় কাজ করার ব্যাপারে) তাঁর দৃষ্টিকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না; ৪. সালাত কায়েম; ৫. সৎকাজের আদেশ; ৬. মন্দ কাজের নিষেধ; ৭. বিপদে ধৈর্যধারণ; ৮. মানুষের সাথে অহংকার না করা; ৯. গর্বভরে পদচারণা না করা; ১০. চলা ফেরায় মধ্যমপন্থার অনুসরণ; ১১. কণ্ঠস্বর সংযত রাখা। এধরনের আরো উপদেশ রয়েছে সূরা বনী ইসরাঈল, আল ফুরকানসহ বিভিন্ন সূরায়, যেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানবীয় উন্নত নৈতিকতার উচ্চতম আদর্শ এখানে দেওয়া আছে। কুরআন মানুষের প্রতিটি আচরণেও সর্বোচ্চ সুন্দরের অনুসরণের কথা বলেছে। যেমন, সালামের উত্তরে এরচেয়ে উত্তম জবাব দেওয়ার জন্য অথবা কমপক্ষে অনুরূপ জবাব দিতে বলা হয়েছে"।[২২]"যারা সর্বোত্তম কর্ম (*ইহসান*) করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশি"।[২৩] "আল্লাহ সৎকর্ম-সম্পাদনকারীদের (মুহসিন) ভালোবাসেন,"(৫: ৯৩)। এখানে সাধারণ পরিভাষা *আমলে সলেহ* বা সৎ কর্ম না বলে *ইহসান* বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ইহসানের অনুসরণে সৎকাজের মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে কুরআন মানুষের আত্মপরিচয়ের সাথে সাথে কর্মে সুন্দর হওয়াকে পূর্ণ মানব হওয়ার শর্ত দিয়েছে।[২৪]আল্লাহ দেখতে চান, "তোমাদের মধ্যে কে কর্মের দিক থেকে সুন্দর;"(৬৭: ২)। কর্ম বলতে ইসলাম বুঝিয়েছে পরকালকে সামনে রেখে নিজের যাবতীয় কথা, কাজ ও চিন্তনকে পরিচালনা করা। অন্যভাবে বলা যায়, পৃথিবী হচ্ছে পরকালের শস্যক্ষেত্র; এই শস্যক্ষেত্রে উত্তম ফসল ফলাতে হয়, যার মাধ্যম হচ্ছে সৎকর্ম।

ইহসান উচ্চতম পথ হলেও এর আগে কিছু স্তর আছে যেগুলোর অতিক্রম না করলে সে স্তরে উপনীত হওয়া যায় না। ইসলামী নৈতিকতার প্রথম স্তর হচ্ছে *ঈমান*। এটি নৈতিকতার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রারম্ভিক স্তর। ঈমানের সাথে সাথে কুরআনে যে শব্দটির ব্যবহার হয়েছে সেটি হচ্ছে *আমলে সলেহ* বা সৎ কাজ। অর্থাৎ কেউ ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে সৎ কাজ না করলে তার ঈমানের কোনো অর্থ হয় না। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে *ইসলাম* বা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আল্লাহ যখন যে আদেশ করেন তা সাথে সাথে মেনে নেওয়ার নাম

ইসলাম। তৃতীয় স্তর হচ্ছে *তাকওয়া* বা আল্লাহ ভীতি। এর শাব্দিক অর্থ বেঁচে থাকা। 'আল্লাহর ভয়' শব্দের মাধ্যমে তাকওয়ার ভাবানুবাদ করা হয়। মূলত এই স্তরটি একজন মু'মিনকে ছোট বড় সব মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখতে অত্যন্ত কার্যকরী।

তাকওয়ার পরের স্তরটি *ইহসান*। এর মানে গভীর ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর সমস্ত আদেশ নিষেধের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। আল্লাহর ভয় যেমন মানুষের আত্মাকে উন্নত করে উচ্চতর নৈতিকতার পথ দেখায় তেমনি আল্লাহর *মুহাব্বত* বা প্রেম মানুষকে আরো উন্নত করে। প্রতিটি মুসলিমের জন্য আল্লাহর প্রেম আবশ্যকীয় করা হয়েছে। কুরআনে এসেছে,

> বলো, "যদি তোমাদের বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা- যা লোকসানের আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যা তোমরা পছন্দ কর– আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে সংগ্রাম করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা কর"।[২৫]

এখানে মূলত আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে জীবনের সব প্রিয় জিনিসের চেয়ে অগ্রাধিকারসম্পন্ন ও আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। আল্লাহর ভালোবাসা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সব সময় মানুষের অন্তর অস্থির থাকবে, আর এতে ফল হবে সমস্ত মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং ভালো কাজগুলোর অনুসরণে অতৃপ্ত হওয়া। এর মাধ্যমে মানুষ মূলত সর্বোচ্চ নৈতিকতার স্তরেই উপনীত হয়ে থাকে।

প্রচলিত পূর্ণতাবাদে সুখবাদ ও বুদ্ধিবাদের একটা সমন্বয়ের কথা বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পূর্ণতাবাদের ধারণা এদিক থেকেও পূর্ণাঙ্গ। মুসলিম দার্শনিকগণ এক্ষেত্রে কুরআনের *হায়াতান তয়্যিবাতান* বা উত্তম জীবনের (১৬: ৯৭) ধারণার আলোকে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেন। সুখবাদে সুখকেই নৈতিকতার মানদণ্ড ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনটা সুখের জন্যই নিবেদিত। এজন্য ইসলামে বিভিন্ন বিনোদন মাধ্যমকে অস্বীকার করা হয়নি; বরং সেগুলোর মাধ্যমে একই সময় বিনোদন ও নৈতিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম যে সুখের কথা বলে তা পার্থিব ও পরকালীন উভয় সুখের নিশ্চয়তা দেয়। এজন্য কুরআনে এসেছে *ফালাহ* বা সফলতার ধারণা। যারা ভালো কাজ করবে তারা সফল, অন্যদিকে যারা করবে না তারা মহা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। মহা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম সংক্ষেপে চারটি নীতিমালা দিয়েছে (১০৩: ১-৩): আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস, সৎ কাজ, অন্যকে সৎকাজের উপদেশ এবং অন্যকে বিপদে ধৈর্যধারণের উপদেশ। এই চারটি কাজই সফলতা ও সুখ অর্জনের আবশ্যিক শর্ত। বুদ্ধিবাদে নৈতিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তির কারণেই ভালো কাজের অনুসরণ সবার কর্তব্য। মানুষকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, কোনোভাবেই যেন মানুষ উপায়ে পরিণত না হয়। কর্তব্যের জন্য কর্তব্য পালন বা শর্তহীন আদেশের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে বলেছেন কান্ট। ইসলামে বুদ্ধির চর্চার কথা সবচেয়ে বেশি বলা হয়েছে। কুরআন বোঝার জন্য কেবল বুদ্ধিমানরাই এগিয়ে আসে। অর্থাৎ সুখবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমন্বয় ইসলামী নীতিদর্শনেও এসেছে।

বিভিন্ন ধর্মীয় নীতিদর্শনের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইসলামী নীতিদর্শন সেই দিক থেকেও পূর্ণ। যেমন, হিন্দু ধর্মে পূর্ণতার জন্য তাদের পুনর্জন্ম প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ তাদের প্রথম জীবনে পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়, সেজন্য পুনর্জন্ম প্রয়োজন। ইসলামে যে কেউ আত্মার উন্নতির মাধ্যমে সর্বোচ্চ নৈতিকগুণ অর্জন করতে সক্ষম যদিও তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছানো সম্ভব নয়, তবে পুনর্জন্মের প্রয়োজন নেই। ইহুদী ধর্মে যে দশটি নৈতিক আদেশ রয়েছে, সেগুলোও কুরআনে এসেছে। তাদের দশটি বিধানের প্রথম চারটি একমাত্র ঈশ্বর ও শনিবারের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা, এর পরের আদেশগুলো হচ্ছে- পিতা-মাতার সম্মান করবে, হত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না ও প্রতিবেশীর গৃহে লোভ করবে না। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিষয়গুলো আলোচনা এসেছে। সুতরাং ইহুদী ধর্মের মৌলিক শিক্ষাও ইসলামে বিদ্যমান। আবার খ্রিষ্টধর্মের মূলনীতি হিসেবে এসেছে, ভালোবাসা ও পূর্ণতার অনুসরণ। ভালোবাসা হবে ঈশ্বরের প্রতি, নিজের প্রতি এবং অন্যান্য সমগ্র সৃষ্টির প্রতি। আর ঈশ্বর যেহেতু সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ তাই নৈতিক সততার জন্য সর্বোচ্চ আদর্শ হচ্ছে তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা।[২৬] ইসলামের মধ্যে এই দুইটি বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে ইসলামও চায় ভালোবাসার মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। অর্থাৎ ধর্মীয় বিবেচনাতেও এটি পূর্ণাঙ্গ নীতিদর্শন।

এই তাত্ত্বিক উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের সাথে সাথে ইসলাম একজন মুসলিমকে বাস্তব ও প্রায়োগিক কাজের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণতার স্তরে নিয়ে যেতে চায়। এজন্য যে ভারসাম্যপূর্ণ বা মধ্যম পন্থার নির্দেশ করেছে সেটির মূল কথা হচ্ছে আত্মশুদ্ধি।

৩. আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক পূর্ণতা

ইসলামী নীতিদর্শন মানুষের নৈতিক জীবনের পুনর্গঠনে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় আত্মশুদ্ধি বা *তাযকিয়াহ-এ নাফস* কে। আল্লাহ তাঁর নবীদের আত্মশুদ্ধির জন্য কঠিন পরীক্ষা নিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকেই এর শুরু হয়েছে। আল্লাহর সামান্য একটি আদেশ লংঘনে এবং শয়তানের ধোঁকায় পড়ার কারণে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে তাঁর চেহারায় গর্ত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির ঘোষণা এল। শ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে মহানবী (স.) যখন আল্লাহর পছন্দের বিপরীতে সামান্যতম কোনো কাজও করতেন তখন অহী নাযিল করে আল্লাহর তাঁকে সংশোধন করে দিতেন। স্ত্রীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তিনি একবার মধু পান করবেন না বলে শপথ করায় আল্লাহ তা পছন্দ করেননি এবং এমন শপথের জন্য কাফফারা আদায়েরও নির্দেশ দেন। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে প্রবৃত্তির প্রতি প্রবণতা সবার মধ্যেই আসতে পারে। তাই আত্মশুদ্ধির পথ এক অনন্ত যাত্রা। কুরআনের শুরু থেকেই আমাদেরকে শেখানো হয়েছে, "আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন- যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন তাদের পথ; পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্তদের পথ নয়"। এই পথ অনুসরণ ও এই পথে টিকে থাকার জন্য ইসলামে তাসাওউফ নামে আরেকটি পৃথক শাখার উদ্ভব ঘটে।

মারুফ আল কারখী (রহ.) বলেন, আল্লাহর সত্তার উপলব্ধিই হচ্ছে তাসাওউফ। যাকারিয়া আল আসগারী (রহ.) বলেন,

> তাসাওউফ আত্মার সংশোধনের শিক্ষা দান করে মানুষের নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করে এবং স্থায়ী নিআ'মতের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের জীবনের যাহিরী ও বাতেনী দিক গড়ে তোলে। আত্মার পবিত্রতা বিধানই এর বিষয়বস্তু, এর লক্ষ্য চিরন্তন শান্তি।[২৭]

আর্থৎ তাসাওউফ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে গভীর উপলব্ধির মাধ্যমে নিজের আত্মার উন্নয়ন ঘটানো। তাসাওউফের আলোচনায় পাঁচটি পথ রয়েছে, যেগুলো অতিক্রমের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারে। ফ্রেডরিক নিটশের মতে, মানুষ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেই পূর্ণ মানুষ স্তরে উপনীত হতে পারে। কিন্তু ইসলামে পূর্ণতার স্তরে উপনীত হতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, আল্লাহর সত্তার মা'রিফাত লাভ, সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি এবং সর্বশেষে এক আল্লাহর আদেশ পালনে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেওয়া। আত্মশুদ্ধির জন্য সূফী সাধকগণ যে পদ্ধতি নির্দেশ করেন সংক্ষেপে নিচে এর প্রধান কয়েকটি ধারণার বিশ্লেষণ করা হল।

ক. শরীয়ত

আত্মশুদ্ধির জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে শরীয়ত সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান এবং এর পূর্ণ অনুসরণ। শরীয়ত শব্দটির অর্থ হচ্ছে আইন, বিধান বা পথ। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পাঠনো আইন বিধানকেই শরীয়ত বলা হয়। শরীয়তের বিধান কার্যকর হয় মানুষের দৈহিক বা বাহ্যিক কাঠামোর উপর। অর্থাৎ শরীয়ত বাহ্যিক ক্রিয়ার বিচার করে। বাহ্যিক ক্রিয়াকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়: (১) আল্লাহর হক ও (২) বান্দার হক। আল্লাহর হক হচ্ছে, তাঁর দাসত্ব করা, আনুগত্য করা এবং শিরক না করা। বান্দার হক বলতে মানুষসহ অন্যান্য সকল মাখলূকের প্রতি মানুষের করণীয় কাজকে নির্দেশ করে। শরীয়তের বিধানকে আবার দুই ভাগ করা হয়েছে: আইনসম্মত (ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মুবাহ) এবং আইনবিরোধী (হারাম ও মাকরুহ)। ফরয মানে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক আরোপিত আবশ্যিক কাজ, যা পালন না করলে শাস্তি বা দণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পবিত্রতা ইত্যাদি। ওয়াজিব হচ্ছে, ফরযের তুলনায় কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিক। যেমন, বিতর সালাত আদায়, ঈদের সালাত আদায় ইত্যাদি। সুন্নাত মানে হচ্ছে, মহানবী (স.) যা করেছেন এবং করতে বলেছেন, তবে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়েছেন এমন সব 'আমল। ফরয ওয়াজিব না মানলে কবীরা গুনাহ হয়ে থাকে এবং কেউ অস্বীকার করলে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। কিন্তু সুন্নাত ত্যাগ করলে ছোট গুনাহ বা সগীরা গুনাহ হয়, তবে অস্বীকার করলে কবীরা গুনাহ হয়। যেমন, সুন্নাত নামায সমূহ; ওযু, নামায, রোজা প্রভৃতির সুন্নাতসমূহ। নফল মানে হচ্ছে ঐচ্ছিক ইবাদত, যা পালন করলে অশেষ নেকী পাওয়া যায়, কিন্তু না করলে কোনো পাপ হয় না। যেমন, তাহাজ্জুদের সালাত। মুবাহ হচ্ছে: যা করলে নেকী বা গুনাহ কোনোটিই হয় না, কিন্তু কাজটি বৈধ। যেমন, প্রয়োজনে ভিক্ষা করা। অন্যদিকে শরীয়ত-নিষিদ্ধ কাজগুলো হচ্ছে: হারাম ও মাকরুহ। হারাম হচ্ছে

কুরআন ও হাদীস দ্বারা যা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে। যেমন শিরক, হত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি। আর মাকরুহ হচ্ছে, যা অপছন্দনীয়। অর্থাৎ যেগুলোর কারণে সগীরা গুনাহ হয়। যেমন, বিসমিল্লাহ না বলে খাওয়া শুরু করা, নামাজের ভেতর নড়াচড়া করা ইত্যাদি।

শরীয়তের বিধানকে মানুষের সামনে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য চারটি মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে: হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব। আবার কোনো মাযহাব না মেনে সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে বিধান বের করে অনুসরণকে লা-মাযহাব বলে। এরাও স্বীকৃত। ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে সব কাজকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়: 'ইবাদত, মু'আমালাত ও 'উকুবাত। নামায়, রোযা, হজ্জ, যাকাতকে এখানে সৎকীর্ণ অর্থে ইবাদত বলা হয়, যদিও মু'মিনের সব কাজকেই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। মু'আমালাত হচ্ছে পারস্পরিক অংশগ্রহণ বা লেনদেনের মাধ্যমে যা হয়ে থাকে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাষ্ট্র পরিচালনা, বিবাহ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। 'উকূবাত অর্থ হচ্ছে শাস্তি বা প্রতিফল। অন্যের অধিকার নষ্ট করলে বা শরীয়তের স্পষ্ট আদেশ লংঘন করলে যেসব শাস্তির বিধান আছে সেগুলো এখানে আলোচনা হয়। সংক্ষেপে এই হলো শরীয়ত। নৈতিক পরিশুদ্ধির জন্য একজন ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম শরীয়তের সমস্ত বিধি বিধান মেনে চলতে হয়। বাহ্যিক এই সব আদেশ নিষেধ ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমেই মুসলিম সমাজ, রাষ্ট্র, আইন ও সভ্যতা সৃষ্টি হয়।

খ. তরীকত

তরীকা শব্দের অর্থ হচ্ছে পন্থা বা প্রক্রিয়া। পরিভাষায়, যে প্রক্রিয়া বা পথ অনুসরণ করলে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা যায় তাই তরীকত। এটি আত্মশুদ্ধির দ্বিতীয় স্তর। শরীয়তকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণের পরও মানুষের অপ্রকাশ্য কাজগুলো শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি না এটা শরীয়তের পক্ষে বিচার করা সম্ভব হয় না। যেমন, কেউ মানুষের উপকার করল কিন্তু তার মনের উদ্দেশ্য সুখ্যাতি অর্জন। এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নিয়ত বা ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন, যা ব্যক্তির ভেতর আছে কি না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রমাণ করা যায় না। এজন্যই আধ্যাত্মিক সাধনা বা আল্লাহর ধ্যান ও তাঁর সাথে গভীর প্রেমের সম্পর্ক প্রয়োজন এবং সেটি অর্জনে বিশেষ কিছু পন্থা অবলম্বন করতে হয়। পবিত্র কুরআনে এটি এসেছে এভাবে, "হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার চিকিৎসা"।[২৮] অর্থাৎ অন্তরের চিকিৎসার মাধ্যমেই আল্লাহর উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ততা সৃষ্টি হয়। অন্য একটি আয়াতেও এসেছে, "যারা আমার পথে সাধনা করে (জিহাদ করে) তাদেরকে অবশ্যই আমি পথ দেখাব"।[২৯] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এই পথ হচ্ছে মানুষের মনের দোষ ত্রুটি দূর করে ভালো গুণকে সেখানে প্রতিস্থাপিত করা। ইমাম গাযালী এজন্য দশটি মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করে দশটি সৎ স্বভাব অর্জনের কথা বলেন। সূফী সাধকদের মধ্যে সবাই কমবেশি এই প্রক্রিয়ায় মানুষকে আত্মশুদ্ধির কাজে অনুপ্রাণিত করেন। তবে তরীকতের মূল কথা হচ্ছে *আকলে হালাল* বা হালাল জীবনোপকরণ এবং *সিদকে মাকাল* বা সত্য বচন। মানুষের প্রায় সবকটি ভালো গুণকেই এদুইয়ের মধ্যে নিয়ে আসা যায়।

গ. মা'রিফাত

মা'রিফাত শব্দের অর্থ জানা। কোনো কিছুর উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যকভাবে জানার নাম মা'রিফাত। তবে সূফী পরিভাষায় মা'রিফাত হচ্ছে, আল্লাহর পরিচয়, মানুষের আত্মপরিচয়, আল্লাহর সৃষ্টির রহস্যের পরিচয়, পরকালীন জীবনের রহস্য জানা প্রভৃতি। ইবরাহীম বলখী বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি দু'শ বছর জীবিত থাকে এবং চারটি বিষয়ের মা'রিফাত অর্জিত না হয় তাহলে জাহান্নামের আগুন থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না: (ক) আল্লাহর মা'রিফাত (খ) আত্মপরিচয় (গ) আল্লাহর আদেশ নিষেধের মা'রিফাত এবং (ঘ) আল্লাহ ও আপন শত্রুর মা'রিফাত।[৩০]এ প্রসঙ্গে আমরা শুরুতে কিছুটা আলোকপাত করেছিলাম।

ঘ. হাকীকত

হাকীকত মানে হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। মা'রিফাত লাভের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু হাকীকত লাভের মাধ্যমে আল্লাহর বিভিন্ন গুণসহ সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এস্তরে মানুষ আল্লাহতে বিলীন বা *ফানা* হতে পারে। এটিই হচ্ছে সূফী নৈতিকতার চূড়ান্ত স্তর। মহানবী (স.) ইহসানের যে পরিচয় দিয়েছেন সেই অবস্থায় উপনীত হলেই কেবল মানুষ ভালো কাজে তৃপ্তি পায় এবং মন্দ কাজ বর্জন করে চলে। ইসলামী নীতিদর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য একজন মু'মিন মুসলিমকে এভাবে আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যাওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

> যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমার বান্দা যে সব ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে ঐ 'ইবাদতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কোনো 'ইবাদত নেই, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। বান্দা নফল 'ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার এতটুকু নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যার কারণে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শোনে; আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে দেখে; আমি তার হস্ত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলা ফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি আমার মু'মিন বান্দার প্রাণ বের করতে যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি, অন্য কোনো কাজ করতে গিয়ে ততটা দ্বিধা-সংকোচ করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে দীর্ঘ হায়াত দিয়ে অতি বৃদ্ধ করে কষ্ট দেওয়াকে অপছন্দ করি।[৩১]

এখানে, আল্লাহর সাথে বান্দার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর বান্দার উচ্চ মর্যাদার একটি আবেগময় দৃষ্টান্ত এসেছে। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, এখানে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আবশ্যকীয় বা ফরয কার্যসমূহকে; কিন্তু বান্দা এর মাধ্যমে চূড়ান্ত স্তরে যেতে পারে না। বরং ফরযের পূর্ণ অনুসরণের সাথে সাথে ধীরে ধীরে নফল বা ঐচ্ছিক কাজে তাকে অভ্যস্ত হতে হয়। ফরয 'ইবাদতের মত নফল 'ইবাদতও দুই ধরনের, একটি সরাসরি আল্লাহর জন্য যিকর বা সালাত

আদায় ও বিপদে ত্যাগ স্বীকার, অন্যটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাছের ও দূরের মানুষের এবং সমগ্র জগতের কল্যাণে সর্বদা নিজেকে নিবেদিত রাখা। এই কাজের মাধ্যমে বান্দা উচ্চতর নৈতিকতার যে স্তরে উপনীত হয় সেই স্তরে মানুষের পক্ষে মন্দ কাজ করাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এধরনের উচ্চ স্তরের নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষই আল্লাহর অলী বা বন্ধু। এদের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন।

ঙ. বাই'আত

আত্মশুদ্ধির এই পথে প্রবেশ করতে হয় বাই'আতের মাধ্যমে। বাই'আত শব্দের অর্থ হচ্ছে শপথ করা। কিন্তু শাব্দিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে বিক্রয় করা। এর মানে, মানুষ শপথের মাধ্যমে নিজেকে কর্তৃপক্ষের সাথে এমন চুক্তিতে আবদ্ধ করে যে, সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলতে পারে না বরং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলা তাকে মেনে চলতে হয়। যদি চাকুরি হয় তাহলে নিয়োগকর্তার বিধান তাকে মেনে নিতে হয়। তা না হলে তাকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ ভোগ করেন। আত্মশুদ্ধির জন্য মু'মিন মুসলিমকে তাঁর শায়খ বা গুরুর হাত ধরে শপথ নিতে হয়। এই শপথের মাধ্যমে মূলত একজন ব্যক্তি তার নিজের খেয়াল খুশির স্বাধীনতা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় বিসর্জন দেন। এজন্যই একে বাই'আত বলা হয়।

বাই'আত মহানবী (স.) এর মাধ্যমেই শুরু হয়। মহানবী (স.) নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে আকাবা উপত্যকায় প্রথম তের জন মদীনাবাসী নওমুসলিমকে বাই'আত করান। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

> এসো, আমার নিকট এ কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকেই অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না, হাত পায়ের মাঝে মন গড়া কোনো অপবাদ আনবে না এবং কোনো ভালো কথায় আমাকে অমান্য করবে না। যারা এ সকল কথা মান্য এবং পূর্ণ করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু যারা এগুলোর মধ্যে কোনোটি অমান্য করে বসে এবং তার শাস্তি এখানেই প্রদান করা হয় তবে সেটা তার মুক্তিলাভের কারণ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এসবের মধ্যে কোনো কিছু অমান্য করে বসে এবং আল্লাহ তা গোপন রেখে দেন তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে, চাইলে তিনি শাস্তি দেবেন, নচেৎ ক্ষমা করে দেবেন। উবাদাহ (রা.) বলেছেন এ সব কথার উপরে আমরা নবী (স.)-এর নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।[৩২]

এই বাই'আত ছিল সুস্পষ্টভাবে ঈমানের, সততার, নৈতিকতার এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর। আকাবার দ্বিতীয় বাই'আত হয়েছিল নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে। মহানবী (স.) সত্তর জন মুসলিমের কাছ থেকে বাই'আত নেন। বিষয়গুলো ছিল: ১. ভলোমন্দ সর্বাবস্থায় নবীর কথা শোনবে ও মানবে।২. স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় ধন-সম্পদ ব্যয় করবে। ৩. সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।৪. আল্লাহর পথে কায়েম থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কারো ভয়ভীতি প্রদর্শনে পিছিয়ে যাবে না। ৫. মদীনায় যাওয়ার পর নবীজীকে সাহায্য করবে এবং নিজেদের প্রাণ ও সন্তানদের হেফাযতের মতই নবীজীর হেফাযত করবে। এতে তাঁদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়।[৩৩]এখানেও নৈতিকতার সাথে যুক্ত বিষয়গুলোকে বাই'আতের শর্ত হিসেবে মহানবী (স.) পেশ করেছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সংগঠিত বাই'আতে রিদওয়ান বা আল্লাহর সন্তুষ্টির বাই'আতের কথা কুরআনে এসেছে, "আল্লাহ সেসব মু'মিনের উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা বৃক্ষের নিচে তোমার হাতে সেদিন বাই'আত করেছিল।"[৩৪] এই বাই'আত ছিল একজন নিরপরাধ মানুষ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতবদ্ধ হওয়ার সাহসী সিদ্ধান্ত। প্রকৃতপক্ষে নিপীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা সবচেয়ে বড় নৈতিক কাজ। এছাড়া নারীদেরকেও বাই'আতের কথা বলা হয়েছে। তবে তারা পর্দার আড়ালে থেকে মহানবীর (স.) নিকট বাই'আত করেছিলেন।

> হে নবী, যখন মু'মিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না; তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩৫]

অর্থাৎ একজন আদর্শ নারী হওয়ার জন্য যেসব নৈতিকগুণ অপরিহার্য সেগুলো অর্জনের এবং নিজেদের মধ্যে সব সময় সংরক্ষণের শপথ নেওয়ার কথা এখানে এসেছে যার জন্য নবী রসূলগণেকে প্রেরণ করা হয়েছে। নারী-পুরুষ সবাইকেই সততা ও নৈতিকতা, ভালো কাজে আনুগত্য, চুরি না করা প্রভৃতি গুণ অর্জন করতে হয় ।

বাই'আতের এই ধারাবাহিকতা পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীদের মাধ্যমে চলমান থাকে। সূফী তরীকায় প্রধান চারটির মধ্যে নকশাবন্দী ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকা আবু বকর (রা.) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সাথে যুক্ত হয়েছে, আর অন্য দুটি চিশতীয়া ও কাদেরিয়া তরীকা হযরত আলী (রা.) এর মাধ্যমে মহানবী (স.) এর সাথে মিলিত হয়। পরবর্তীতে হাক্কানী পীর মাশায়েখদের মাধ্যমে সূফীবাদী ধারা বিকশিত হয়েছে। সব যুগেই বাই'আত ছিল অপরিহার্য। বাই'আতকে ইসলামী জামা'আতের আমীর বা নেতার মাধ্যমেও অনুমোদন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে জামা'আতের শর্তের উপর বাই'আত নিতে হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এটিকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হত। সহজ কথায় সৎ কর্মের জন্য বাই'আত ইসলামী জীবনব্যবস্থার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে বাই'আতের বন্ধন ছাড়া মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল"।[৩৬] কুরআনেও এসেছে, "আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে"। এর অর্থ মু'মিনদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর কাছে বিক্রয় করে দিতে হয় এমন শপথের মাধ্যমে যে, "তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, শত্রুর সাথে লড়াইয়ে পরস্পর নিহত হবে, ... তারা হবে তাওবাকারী, 'ইবাদতকারী, কৃতজ্ঞতাপরায়ণ..."।[৩৭]তবে নিঃসন্দেহে শপথ হবে আল্লাহর সাথে। যে কোনো ব্যক্তিই, তিনি যতই সুপরিচিত আল্লাহর অলী হোন না কেন, আল্লাহর দয়া ছাড়া কারো পক্ষেই জান্নাত লাভ সম্ভব নয়। উমর (রা.) বলতেন, "একজন লোককেও যদি আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন, সেই ব্যক্তি উমর হয়ে যায়

কিনা জানি না, তবে আল্লাহর কাছে আমি আশা রাখি তিনি আমাকে দয়া করবেন।" সব যুগেই বাই'আত সরাসরি আল্লাহর সাথে ছিল। আর পীর বা ইমামের আনুগত্য কেবল মাত্র সৎকাজের ক্ষেত্রে হবে, কখনো কোনো অন্যায় কাজ দিয়ে যদি কোনো পীর তাঁর মুরীদের পরীক্ষা নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রেও অন্যায়ের আনুগত্য করা যায় না। এজন্যই শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া আদৌ মা'রিফাতের স্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

চ. ফানা

হাকীকতের স্তরে ফানা ফিল্লাহ বা আল্লাহতে বিলীন হওয়ার সময় ব্যক্তি আত্ম-অহংকার, হিংসা, লোভ, দুনিয়ার আসক্তি প্রভৃতি চিন্তা ত্যাগ করে আল্লাহর গুণাবলি অর্জন করে। সমস্ত পাশবিক চিন্তা লোপ পায় বলে তখন মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাঙ্গীন সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী, সেই প্রকৃত জ্ঞানী"।[৩৮] আর্থৎ অন্যায় কাজ বর্জন এবং ভালো কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজের মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকা জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয়। এখানে ফানা ফিল্লাহর জন্য মৃত্যুর প্রস্তুতিকে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। আল্লাহর জন্য বিলীন হয়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে মৃত্যু ভয় ও আল্লাহর প্রেমের মাধ্যমে সমস্ত অন্যায় দূর করা। তবে আল্লাহর প্রেমের জন্য রাসূলের অনুসরণ আবশ্যক। আবার রাসূলের প্রেমের জন্য নেতার আনুগত্য আবশ্যক। নিজের গুরু বা শায়খের আনুগত্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে নিজেকে ফানা ফিল্লাহর দিকে অগ্রসর করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সরাসরি শিষ্যকে নবীর প্রেম ও আল্লাহ প্রেমের দিকে নিয়ে যাবেন। নবীর মুহাব্বত ছাড়া আল্লাহর মুহাব্বত সম্ভব নয়। আবার নবীর মুহাব্বতের জন্য নবীর পূর্ণ অনুসরণ করতে হয়, তাহলেই আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কেউ যখন আল্লাহকে ভালোবাসেন তখন আল্লাহ এই ভালোবাসা প্রমাণের জন্য বিপদ আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। এ অবস্থায় যারা ধৈর্য ধরতে পারেন কেবল তাদের পক্ষেই ফানা অর্জন সম্ভব হয়। নৈতিক উৎকর্ষতার জন্য এভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়।

তবে সূফী সাধকগণ এই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ তরীকতের স্তরে এসে ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করার কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। প্রথমেই তাঁরা নফসের মন্দ প্রবণতাসমূহ উৎপাটন করতে সচেষ্ট হন এবং সাথে সাথে ভালো গুণগুলোকেও আত্তীকরণের চেষ্টা করেন।

৪. নফসের মন্দ প্রবণতাসমূহ

মানুষের মধ্যে যারা তাদের মন্দ প্রবণতার সাথে নিয়মিত লড়াই করেন তাদের জন্যই আত্মার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে উপযুক্ত চিকিৎসার পথে নিয়ে যেতে হয়। ইমাম গাযালীসহ অন্যান্য সূফী সাধকগণ যেসব ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেন সেখান থেকে কয়েকটি মৌলিক ত্রুটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে-

ক. জিহ্বার অনিষ্ট

মহানবী (স.) বলেছেন, "যে তার দুই চোয়াল এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী জিনিসের হেফাযত করতে পারবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামীনদার হব"।[৩৯] দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস হচ্ছে মানুষের জিহ্বা। এটিই

মানুষকে অসংখ্য ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করে। ইমাম গাযালী জিহ্বার বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট বা ক্ষতির বিবরণ দেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মুখের কথা তার অন্তরের বাহ্যিক প্রকাশ। কেউ অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে চাইলে সেই অনিষ্টগুলো থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা করবে। মহানবী (স.) বলেন, যে পর্যন্ত কোনো লোকের হৃদয় ঠিক না হয় সে পর্যন্ত তার ঈমান ঠিক হয় না এবং যে পর্যন্ত তার রসনা ঠিক হয় না, তার হৃদয় ঠিক হয় না। যে ব্যক্তির অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" রাসূলুল্লাহ (স.)কে প্রশ্ন করা হলো, কোন কর্মটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বলেন, আল্লাহভীতি, সদাচরণ ও উত্তম চরিত্র। আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোন জিনিস সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বলেন, মুখ ও লজ্জাস্থান"।[৪০]

আল গাযালীর মতে, জিহবার **প্রথম** ক্ষতি হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা। মহানবী (স.) বলেন, "কোনো ব্যক্তির ধন সম্পদের মূল বস্তু তার সময়। যখন সে প্রয়োজন ব্যতীত বাক্য ব্যয় করে এবং পরকালের পুণ্য অর্জন ব্যতীত তার সময় অতিবাহিত করে, তখন তার অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে গেল"। তিনি আরো বলেন, "যা কারো জন্য উপকারী নয় তা ত্যাগ করাই দ্বীনের উত্তম কাজ"।[৪১] অর্থাৎ অনাবশ্যক কথা কাজ বর্জন করার নামই হচ্ছে দীন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি এসেছে, "যারা অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকে তারা সফল"(২৩: ২), "যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অহেতুক কাজকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন তারা সসম্মানে স্থান ত্যাগ করে" (২৫: ৭২)। সুতরাং অহেতুক কথা, আড্ডা, বিতর্ক সবই নিন্দনীয়। আল গাযালী এর চিকিৎসায় তিনটি উপায় ব্যক্ত করেন।[৪২] তাঁর মতে, মানুষ তিন কারণে অহেতুক কথা বলে: (১) যে জিনিস জানার প্রয়োজন নেই তা জানার আগ্রহ; (২) ভালোবাসার উদ্দেশ্যে কথাবার্তার আনন্দ লাভ করা; (৩) অপ্রয়োজনীয় কথা দ্বারা সময় ব্যয় করা। এর চিকিৎসা দুই প্রকারের: জ্ঞানমূলক ও অনুষ্ঠানমূলক। জ্ঞানমূলক হচ্ছে: মানুষের বোঝা উচিত মৃত্যু তার সামনে দণ্ডায়মান। প্রত্যেকটি বাক্য সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। অনুষ্ঠানমূলক প্রতিকার হচ্ছে: নির্জনতা অবলম্বন। জিহবার **দ্বিতীয়** ক্ষতি, উপকারী কথা হলেও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বলা। বনু আমের সম্প্রদায়ের কিছু লোক নবীর কাছে এসে নবীর প্রশংসা করলে, নবী বলেন, "তোমাদের মূলকথা বল।"[৪৩] **তৃতীয়** বিপদ: অসত্য বিষয়ে অনর্থক বাক্য ব্যয় করা। যেমন, নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করা, বাদশাহদের নিষ্ঠুরতার আলোচনা করা, ঝগড়া-বিবাদের সময় অযাচিত বাক্য ব্যয়। উমর (রা.) বলেন, "তোমরা তিনটি উদ্দেশ্যে বিদ্যা অর্জন করো না: (১) বিদ্যার দ্বারা তর্ক করা (২) বিদ্যার দ্বারা গৌরব করা (৩) মানুষকে বিদ্যা প্রদর্শন করা"। তিনি আরো বলেন, "তোমরা তিনটি কারণে বিদ্যার্জন থেকে বিরত থেকো না: (১) বিদ্যান্বেষণে লজ্জা করা (২) সংসার বৈরাগ্যের জন্য অবসর পাওয়া এবং (৩) সততায় সন্তুষ্ট থাকা।[৪৪] অর্থাৎ উমর (রা.) জ্ঞান সাধনার জন্য প্রতিবন্ধক হিসেবে লজ্জা করতে নিষেধ করেন। সংসারের ব্যস্ততার কারণে যারা জ্ঞানচর্চা ত্যাগ করতে চায় তাদেরকে নিন্দা করেন; আর সর্বশেষে যারা নিজেদেরকে সৎ মানুষ হিসেবে যথেষ্ট মনে করে পড়া লেখা ত্যাগ করেন তাদেরকেও নিন্দা করেন।

অশ্লীলতা প্রকাশে বাক্য চয়ন জিহবার জন্য বড় বিপদের কারণ। মহানবী (স.) বদর যুদ্ধে নিহত কাফির নেতাদের তিরস্কার করতে নিষেধ করেন। কুরআনে এসেছে, "যারা পছন্দ করে ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না"; (২৪: ১৯)। মানুষের জিহবার ক্ষতি সহজে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না, যতটা দেহের ক্ষতির চিকিৎসা করা যায়। এজন্য বাকসংযম মু'মিনের আত্মশুদ্ধির প্রধান মাধ্যম।

গীবত বা পরনিন্দাও জিহবার সাথে সম্পৃক্ত আপদ। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "যখন তুমি নিজের সঙ্গীর দোষের কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছা কর, তখন নিজের দোষের কথা প্রকাশ কর"। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, "তোমাদের কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের চোখের মধ্যে সামান্য ধূলা পড়লেও দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের কঠিন প্রদাহ রোগও দেখতে পায় না।[৪৫] আল গাযালী পরনিন্দার মনস্তাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এর প্রথম কারণ হচ্ছে: ক্রোধ। যে কারণেই হোক কারো সাথে রাগান্বিত অবস্থায় তার দোষই কেবল চোখে পড়ে। এর চিকিৎসা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করা। মহানবী (স.) বলনে, "যে তার প্রভুকে ভয় পায় তার জিহ্বা সংযত থাকে এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রিত থাকে"। এর অন্য কারণ নিজের দোষ ত্রুটি ঢেকে আত্মগৌরব প্রকাশ করা। অন্যের দোষ বর্ণনা করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য কেউ কেউ বিভিন্ন বড় বড় কথা বলে। অথচ আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় থাকলে তার পক্ষে এমন করা সম্ভব হতো না। অন্যের প্রতি ঈর্ষার কারণেও গীবত করা হয়। কারো ধন সম্পদ, মান সম্মান দেখে অন্য কেউ যখন সেটার কামনা করবে বা হিংসা করবে তখন তার দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে নিজেকে বড় করতে চায়। আলী (রা.) এর নিকট এক ব্যক্তি এসে অন্য এক ব্যক্তির দুর্নাম করছিল। আলী (রা.) বললেন,

> ভাই, তুমি যা বললে আমি তার অনুসন্ধান করব। যদি তুমি সত্য বলে থাক তোমাকে আমরা ঘৃণা করব। আর যদি মিথ্যা বলে থাক, তবে তোমাকে শাস্তি দেব। যদি তুমি ক্ষমা চাও, তোমাকে ক্ষমা করে দেব। লোকটি বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন"।[৪৬]

অর্থাৎ কেউ দোষ ত্রুটি বর্ণনা করলে সেটি বন্ধের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণও জরুরি হয়ে পড়ে। যারা জ্ঞানী এবং সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তি এটি বিশেষত তাঁদের দায়িত্বেরও অংশ।

পরনিন্দা এমন এক সামাজিক অপরাধ যার কারণে সমাজে ও ব্যক্তিতে সন্দেহ ও কলহ চলতে থাকে। পৃথিবীর কোনো ধর্ম বা মতবাদ কখনো এটিকে সমর্থন করেনি। মনস্তাত্ত্বিকভাবে, ব্যর্থতার পেছনে দায়ী করা হয় প্রেষণার ব্যর্থতাকে। মানুষ যা চায় তা অর্জন করতে না পরলেই অন্যের সাফল্য, সম্পদ বা সম্মানের প্রতি ঈর্ষা আসে। যারা এই অপরাধ করে পবিত্র কুরআন তাদেরকে বিনয়ের সাথে ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। মানুষ যখন পরামর্শের দরজা বন্ধ করে দেয় তখনও এই ধরনের মন্দের প্রসার ঘটে। এজন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের কর্তা-ব্যক্তিদের সবসময় জনগণের সাথে স্বচ্ছ আচরণ করতে হয়। মহানবী (স.) একদিন ভোরবেলায় আয়েশা (রা.) কে নিয়ে প্রাতঃরাশ করছিলেন। এমন সময় দূরে কাউকে দেখে তিনি ডেকে বলেন, "আমার সাথে আয়েশা"। অর্থাৎ যদি তিনি এটি না বলে দিতেন, তাহলে হয়ত কেউ

সন্দেহ ও বিদ্বেষবশত পেছনে পেছনে একটি অপবাদ ছড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু মহানবী (স.) সেটি ঘটার পথও বন্ধ করে দিলেন। তবুও কেউ কেউ অভ্যাসবশত পেছনে পেছনে রটনা রটায়। একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া এটি সম্পূর্ণ ত্যাগ করা কঠিন ব্যাপার।

খ. রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা

একজন সাধক সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে তাঁর শিষ্যের যে বিষয়টির সংশোধন করতে চেষ্টা করেন সেটি হচ্ছে লোক দেখানো কাজ। কুরআন এটিকে আমল ধ্বংসের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে, "ঐসব নামাযী ধ্বংস হোক, যারা নামাযে উদাসীন এবং লোক দেখানোর জন্য তা করে থাকে"। আল গাযালী এটিকে প্রবৃত্তির শেষ আপদ এবং গুপ্ত কুমন্ত্রণা হিসেবে উল্লেখ করেন। একে তুলনা করেন ঘোর অন্ধকার রাত্রে মসৃণ পাথরের উপর কালো পিপীলিকার চলাচলের চেয়েও অধিক গুপ্ত হিসেবে।[৪৭]এর মাধ্যমেই প্রকৃত আলিম, ধার্মিক ও ধর্মপথ অনুসন্ধানকারীর পরীক্ষা হয়। এসব লোক নিজ সাধনা, চেষ্টা ও মুজাহাদায় ত্যাগ স্বীকার করে কামনা বাসনা থেকে আত্মাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। বিভিন্নভাবে কঠোর 'ইবাদতের মাধ্যমে দিন যাপন করেন। কিন্তু যখনই মানুষ তাদের এই সাধনার স্বীকৃতি দিতে শুরু করে তখন তারা আনন্দিত হন এবং মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পছন্দ করেন। তাদের লোভ লালসা ত্যাগ, সন্দেহজনক বিষয়ে সতর্কতা, 'ইবাদতে নিষ্ঠা নিয়ে লোকমুখে যত প্রশংসা বৃদ্ধি পায় তারা তত সন্তুষ্ট থাকেন। তারা মজলিসের প্রধান হতে পছন্দ করেন, মানুষ তাদের সম্মানে এগিয়ে আসবে, ব্যয় করবে, উপহার দেবে এগুলো তারা কল্পনা করেন। এই মানসিক অবস্থার নামই হলো রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। উম্মতের ব্যাপারে এটির জন্য মহানবী (স.) বেশি ভয় করতেন। এটিকে তিনি গোপন শিরক হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রকাশ্য শিরকের মূলোৎপাটন করা গেলেও অন্তরের এই গোপন শিরক মূলোৎপাটন করা বড় কঠিন কাজ। রিয়ার মূল অর্থ উত্তম স্বভাব প্রদর্শন করে মানুষের হৃদয়ের ভক্তি আকর্ষণ করা। 'ইবাদতমূলক কাজ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে এই প্রদর্শনের মাধ্যমে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। শুধু 'ইবাদতের মাধ্যমে অন্যের ভক্তি আকর্ষণই হচ্ছে রিয়া।[৪৮]বাহিক্য বেশভূষার মাধ্যমেও কেউ কেউ নিজেকে ধার্মিক প্রমাণের চেষ্টা করেন। রিয়ার মূল কারণ হচ্ছে, মানুষের প্রশংসা প্রীতি, নিন্দার ভয় এবং অন্যের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ। এগুলোর চিকিৎসার প্রধান উপায় হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে সামনে রাখা। মানুষের তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টির কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জিত হলে জাহান্নাম ছাড়া তার গন্তব্য থাকতে পারে না। তাছাড়া কপট আচরণ একদিন মানুষের সামনেও প্রকাশিত হয়ে যায়। তখন দেখা যায় মানুষের সেই সন্তুষ্টি অর্জনও বিফলে যায়। যে নিন্দার ভয়ে সে মানুষের সামনে ছদ্মবেশ ধারণ করেছে, এখন সেই নিন্দাই তার পেছনে শুরু হয়ে যায়। ধন সম্পদের লোভে কেউ ধার্মিক লেবাস ধারণ করলেও, মানুষের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে অধিক উপার্জন সম্ভব হয় না। রিয়ার মাধ্যমে মিথ্যা অবলম্বন মানুষের উপার্জনকেই হারাম করে দেয়। আর হারাম ভক্ষণ তার নিজের ও পরিবারের সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তবে কিছু 'ইবাদত আছে যেগুলো প্রকাশ্যে করতে হয়। যেমন, ফরয 'ইবাদত সমূহ: নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত। এছাড়া দান সদকা গোপনে করলেও উত্তম, প্রকাশ্যে করলেও উত্তম। এসব ক্ষেত্রে মনের নিয়তই আসল, যার বাহ্যিক মূল্যায়ন কঠিন। আবার শাসনকার্য পরিচালনা আরো প্রকাশ্য বিষয়। শাসনকার্যে বরং সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে রাষ্ট্র পরিচালনাই থাকে মূল লক্ষ্য, তা না হলে বিদ্রোহ সৃষ্টি হতে পারে। রাষ্ট্রপ্রধানকে জনগণের সামনে প্রকাশ্যে তার কাজের বিবরণ বা জবাবদিহি করতে হয়। মহানবী (স.) ন্যায়বিচারক শাসনকর্তাকে প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী হিসেবে উল্লেখ করেন।[৪৯] তিনি আরো বলেন, "তিন ব্যক্তির দোআ অগ্রাহ্য হয় না, তাদের মধ্যে প্রথম ন্যায়পরায়ণ শাসক"। তবে এই মর্যাদাপূর্ণ পদের বিপদ সবচেয়ে বেশি। এজন্য শাসককে সব সময় আল্লাহর ভয়ের অনুভূতি নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। শাসনকার্যের সাথে যুক্ত বিচারকদের ব্যাপারেও একই কথা। তাঁরাও কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সবচেয়ে ইনসাফ ভিত্তিক রায় প্রদানের মাধ্যমে মানুষের প্রিয় হতে পারেন এবং প্রশংসা অর্জন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সামনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হিসাব দেওয়ার অনুভূতিই কেবল এ ধরনের ব্যক্তিদের রিয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।

শিক্ষাদান, উপদেশ, গবেষণা ইত্যাদি প্রকাশ্য কাজ। এগুলো গোপনে করা যায় না। ছাত্রদেরকে উত্তমভাবে সঠিক বিষয় শিক্ষা দিতে হয়। মানুষের সামনে স্পষ্ট ও অলংকারপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দিতে হয় যেন মানুষ স্পষ্ট বুঝতে পারে; হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে এটি চেয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে সুনাম, সুখ্যাতি তখনই অর্জিত হয় যখন যথাথভাবে তার প্রয়োগ হয়। হাদীস বর্ণনা ও ব্যাখ্যা, ফিকহী বা সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনায় গভীর জ্ঞান ছাড়া বক্তব্য প্রদান কোনোভাবেই কাম্য নয়। তবে এসবে রিয়ার মূল্যায়ন হয় বিশুদ্ধ নিয়তের ভিত্তিতে। যদি কোনো বিশেষ স্বার্থে মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহলে মানুষের উপকার হলেও ঐ ব্যক্তি পরকালে শাস্তি ভোগ করবে।

গ. আত্মপ্রীতি

মানুষ যখন নিজের বুদ্ধি, শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করতে শুরু করে তখন আল্লাহর পরিবর্তে নিজেকে বেশি ভালোবাসতে চায়। এটি মানুষের হিদায়াতের জন্য বড় প্রতিবন্ধক। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির পর যদি কেউ এই রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে তার সেই সম্পর্ক মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। সূফী সাধনার সময় ফানা ফিল্লাহর আগে নিজের নফসকে বিসর্জন দিতে হয়। নফসের সব চাওয়া পাওয়া বর্জন করে আল্লাহর ভালোবাসাকে সেখানে স্থাপন করতে হয়। মানুষের এই দোষের সংশোধন ছাড়া তার পক্ষে সৎগুণ অর্জন সম্ভব নয়। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে এর প্রকাশ ঘটে। যারা দৈহিক সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও শক্তির অধকারী তারা সেগুলো নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন।

ঘ. গর্ব-অহংকার-লোভ

কুরআন অহঙ্কারকে মানুষের আত্মার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগ হিসেবে বর্ণনা করেছে। অহঙ্কার করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। অহঙ্কার মানে হলো নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় মনে করা এবং সাথে সাথে

অন্যকে তুচ্ছ মনে করা। হাদীসে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে, "সত্যকে অস্বীকার ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা"।[৫০] পৃথিবীতে কোনো মানুষের পক্ষে সবার তুলনায় নিজেকে বড় ও পবিত্র মনে করার যোগ্যতা নেই। মিসকাওয়া বলেন, "প্রকৃতপক্ষে যে নিজেকে জানে সে তার ভেতরকার অসংখ্য দোষ ও অপূর্ণতা জানতে পারে।"[৫১] ইবন হাযম অহঙ্কারের কারণ হিসেবে অজ্ঞতা বা বোকামীকে দায়ী করেন। এর চিকিৎসায় তিনি বলেন, যদি কেউ তার বুদ্ধির কারণে অহঙ্কার করে তাহলে তার উচিত হবে তার মনের সব খারাপ চিন্তার দিকে তাকানো কিংবা তার ভুল মতামতের দিকে ফিরে দেখা তাহলে সে তার বুদ্ধির সংকীর্ণতা দেখতে পাবে। যদি ভালো কাজের কারণে আসে তাহলে তার সীমাবদ্ধতা, ঘাটতি বা বাড়াবাড়িগুলোর দিকে তাকালে বুঝতে পারবে ভালো কাজের তুলনায় তা কত বেশি।[৫২] আবার যদি জ্ঞানের কারণে আসে তাহলে তার চিন্তা করা উচিত, জ্ঞান একটি ঐশী উপহার, আল্লাহ চাইলে যে কোনো দুর্ঘটনা দিয়ে তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারেন।[৫৩] সামাজিক মর্যাদা, সুন্দর চেহারা, সাহস, উচ্চ বংশ- সবই আল্লাহর দান। সঠিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, মানবজীবন সবসময় দারিদ্র্য, অসুস্থতা, রোগব্যাধি, দুর্যোগ ও বার্ধক্যের মুখোমুখি।[৫৪]অর্থাৎ মানুষের অহঙ্কারের কোনো কারণ থাকতে পারে না। গাযালী বলেন, এর চিকিৎসা আল্লাহকে জানা এবং নিজেকে জানা। নিজেকে জানলেই সম্পূর্ণ চিকিৎসা হবে না, বরং এর মাধ্যমে শুরু হবে।[৫৫] কুরআন বারবার অহঙ্কারীদের পতনের কথা বলেছে আর সেখান থেকে শিক্ষা নিতে বলেছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

> অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক লোকদেরকে ভালোবাসেন না। চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর সংযত রাখো। নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধ্বনি হচ্ছে গাধার ধ্বনি"। [৫৬]

"পৃথিবীতে তুমি দম্ভভরে চলবে না, তুমি তো মাটিকে বিদীর্ণ করতে পার না, আর পাহাড়ের মত উঁচু হতে পার না"।[৫৭] অর্থাৎ এটি এমন এক নিকৃষ্ট মানবীয় স্বভাব, যা প্রকৃতপক্ষে একধরনের মিথ্যা দাবি। তবে অহঙ্কারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর পথে লড়াইয়ে।

লোভ মানুষের এমন একটি মানসিক অনুভূতি যা তাকে ক্রমাগত অধিক পাওয়ার জন্য জন্য অস্থির করে তোলে। মহানবী (স.) বলেন,

> আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে পূর্ণ হবে না। তবে যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।[৫৮]

আরেকটি হাদীসে এসেছে, "দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশি ধ্বংসকর নয়, যত না বেশি মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দীনের জন্য ধ্বংসকর"।[৫৯] "মানুষের বার্ধক্য আসলেও দুটি বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ যৌবন থাকে: দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের প্রাচুর্য"। সূরা তাকাছুর এর নামের অর্থই হচ্ছে-

'অধিক আকাঙ্ক্ষা'। আর এ সূরায় মানুষের অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তিরস্কার করা হয়েছে। তবে লোভ যখন ভালো কাজের জন্য হয় তখন সেটি প্রশংসনীয়। মূলত মানুষের এই ইতিবাচক কামনা বা লোভই এক একটি সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। নৈতিকতার উৎকর্ষতার জন্য লোভ না থাকলে নৈতিক উন্নতি করা সম্ভব নয়। যে লোভের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি করা হয়, অন্যের হক নষ্ট করা হয়; এমনকি নিজের স্বাভাবিক সুস্থতার চিন্তা না করে যখন অধিক সম্পদ, সম্মান, কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করা হয় সেই লোভই হয় ক্ষতিকর।

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে যে সব মানবিক ত্রুটি দূর করতে হয় কুরআন স্পষ্টভাবেই তা নির্দেশ করেছে। যেমন,

> হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, হতে পারে এরা ওদের চেয়ে উত্তম আর কোনো নারীও যেন অপর নারীকে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে এরা ওদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না, কাউকে মন্দ নামে ডাকবে না। ঈমানের পর খারাপ কাজ হচ্ছে মন্দ নামে ডাকা। যারা তাওবা করবে না, তারাই হচ্ছে যালিম বা অবিচারকারী। হে ঈমানদারগণ, তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয় কোনো কোনো ধারণা পাপ; আর অপরের পেছনে তোমরা গোয়েন্দাগিরি করবে না, গীবত করবে না। তোমরা কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে? নিশ্চয় তোমরা তা অপছন্দ করবে। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, বড় দয়ালু।[৬০]

এই উক্তিগুলোর মধ্যে যে বিষয়টি কুরআন স্পষ্ট করতে চায় সেটি হচ্ছে, মানুষের অন্তরের পরিচ্ছন্নতা অর্জন। মানুষের নৈতিক উন্নতির জন্য যেভাবে সদগুণাবলি অর্জন করতে হয় তেমনি মন্দ বিষয়গুলো ব্যক্তিগতভাবে ত্যাগ করতে না পারলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন অশান্তিতে ভরে যায়। এক্ষেত্রেও কুরআনের সাধারণ নির্দেশনা হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং তওবা করতে হবে। শুধু আল্লাহর ভয় শেষ কথা নয়; এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে পাপের অনুশোচনা বা তওবা করা। অনুশোচনার মাধ্যমে এক দিকে পাপ মোচন হয়, অন্যদিকে ভবিষ্যতে পাপ থেকে বেঁচে থাকার অনুভূতি বৃদ্ধি পায়।

ঙ. ক্রোধ

এটি মানুষের জন্মগত স্বভাব। আগেই বলা হয়েছে, মানব প্রকৃতিতে এটি থাকার কারণ নিজের দেহকে বা আত্ম মর্যাদাকে রক্ষা করা। কিন্তু এটি যখন অতিমাত্রায় চলে যায় তখন এর মাধ্যমে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, গীবত বা গর্ব সৃষ্টি হয়। এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা ও দয়ার মত মহৎ গুণ সৃষ্টি হয়।[৬১] আল গাযালী বলেন, ক্রোধ মু'মিনের জন্য দ্রুত আসে এবং দ্রুত প্রস্থান করে। কারণ, মু'মিনের সামনে অন্যায় কাজ পড়লে সে ক্রোধান্বিত হবে, আর সেটি বন্ধ হয়ে গেলে মনের ভেতর তা সঞ্চারিত রাখে না। কুরআন এটিকে মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছে, "তারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারী এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়;"(৩: ১৩৪)। মানুষ যখন নিজের প্রিয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হয় কিংবা অপ্রিয় জিনিস তাকে দেওয়া হয় তখনই ক্রোধের সৃষ্টি হয়। তবে এর উৎপত্তিতে ইমাম গাযালী ইয়াহইয়া (আ.)এর উদ্ধৃতি দিয়ে কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেন। সেগুলো হচ্ছে: অহঙ্কার ও গর্ব এবং সম্মান কামনা ও

আত্মমর্যাদাবোধ। ক্রোধ দমনের উপায় হচ্ছে- কুরআন-হাদীসের জ্ঞান, আল্লাহর আযাবের চিন্তা, পার্থিব প্রতিশোধ ও শত্রুতা সৃষ্টির শঙ্কা, অন্যের ক্রোধোন্মত্ত চেহারার চিন্তা প্রভৃতি।[৬২]

চ. হতাশা ও ভীতি

মানুষের এটি একটি স্বাভাবিক প্রবণতা যে, যখন সে তার আশা পূরণ হতে দেখে তখন সে আনন্দিত হয় আর যখন আশা পূরণ হয় না তখন হতাশার সৃষ্টি হয়। মিসকাওয়া বলেন, এটি হচ্ছে আত্মার কষ্ট যা প্রিয় জিনিস নষ্ট হওয়া বা না পাওয়ার কারণে মনে আসে। এর চিকিৎসা হচ্ছে এই জগতকে অস্থায়ী মনে করা। তিনি আরো বলেন, হতাশ হওয়া আল্লাহর নিয়ামতের সাথে কুফরি করা। সুতরাং নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য কমপক্ষে মন ভালো রাখা আবশ্যকীয়।[৬৩] বড় পাপসমূহের একটি হচ্ছে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। কুরআনে এসেছে, "তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন"।[৬৪]

ছ. 'হাওয়া' বা মনের খেয়ালের অনুসরণ

কুরআন এটিকে সত্য গ্রহণে প্রধান বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছে। *হাওয়া* আরবী শব্দটির অর্থ হচ্ছে, "কোনো কিছুর প্রতি মানুষের এমন ভালোবাসা যা তার মনের উপর বিজয়ী হয়"।[৬৫] এটি এমন এক ত্রুটি যা তাকে সত্যপথে চলতে প্রথম বাধার সৃষ্টি করে। এটির স্বরূপ হচ্ছে, কোনো কিছু যা মনে আসে তাই করা। প্রবৃত্তির প্রবণতার কারণে এটি মনে আসে। এজন্য কুরআন সর্বপ্রথম এটিকে বর্জন করতে বলেছে।

> আল্লাহর দেওয়া হিদায়াতের পরিবর্তে যে নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?[৬৬]
>
> যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশিকে নিজের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে, তার কথা কি তুমি ভেবে দেখেছ? তুমি কি তার পাহারাদার হবে? নিশ্চয় এরা পশুর মত, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট।[৬৭]

অর্থাৎ এটি এমন এক অন্ধ ভালোবাসা যার পেছনে কোনো যুক্তির প্রয়োজন হয় না। এটি পৃথিবীর কোনো মানুষকেই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে সাহায্য করে না। ম্যাক্স ভেবার এর কথায় বিষয়টি এসেছে মানুষের এমন কাজের দৃষ্টান্ত হিসেবে যা করার পর মানুষ যুক্তি খোঁজে, করার আগে তার যুক্তি কাজ করে না।[৬৮]এর পরিত্রাণের জন্য কুরআনে বলা হয়েছে, "যে তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পায় এবং নিজের আত্মাকে খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখে তার ঠিকানা হবে জান্নাত"।[৬৯] অর্থাৎ এখানে, আত্মার উন্নতির জন্য যে গুণকে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়, এবং মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণ থেকে বিরত থাকা। "অবশ্যই সে সফল যে পরিশুদ্ধ হয়, তার রবের নাম স্মরণ করে এবং সালাত আদায় করে"।[৭০] এখানে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত আদায়ের মাধ্যমে আত্মার উন্নতির কথা বলা হয়েছে।

যে তাৎক্ষণিক তৃপ্তির জন্য সামান্য কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হয় না, নিজের ভবিষ্যৎ সফলতার চিন্তা করে বর্তমান কষ্টকে স্বীকার করতে বা মেনে নিতে পারে না তার পক্ষে পরকালীন সফলতা দূরের কথা পার্থিব কোনো অর্জনই সম্ভব নয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে খেয়াল-খুশির অনুসরণ সবচেয়ে বড় বাধা। এর চিকিৎসা হচ্ছে মনের মধ্যে আল্লাহর দাসত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করা এবং পৃথিবীর মহামানবদের কঠোর জীবন-শৃঙ্খলার চিন্তা করা।

জ. ইন্দ্রিয় লালসা

ইন্দ্রিয় লালসা পূরণের জন্য মানুষ যে কোনো কঠিন ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে সন্তুষ্ট করার জন্য চূড়ান্ত ভূমিকা থাকে মন বা আত্মার। অথচ কুরআনে এসেছে, আল্লাহ মানুষের চোখ, কান, হাত, পা, চামড়াসহ প্রতিটি অঙ্গকে জিজ্ঞেস করবেন- এই ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে কী কী পাপ সংঘটিত হয়েছে? মহানবী (স.) সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরিচয় দেন: "যে তার নফস বা প্রবৃত্তিকে দমন করে"।

কুরআন সফলতার মাপকাঠি হিসেবে সবচেয়ে মৌলিক ইন্দ্রিয় লজ্জাস্থানের হেফাযতকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছে।

> অবশ্যই মু'মিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত; যারা অহেতুক ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে; আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়; আর যারা তাদের নিজদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী।[৬]

ব্যভিচার হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটিকে নিষিদ্ধ এমনকি এ কাজের প্রারম্ভিক কাজকেও কুরআন নিষেধ করেছে। "তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ"।[৭২] এখানে এটিকে নিষিদ্ধের দুটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে: নির্লজ্জতা ও নিকৃষ্টতা। যত ধরনের নির্লজ্জ কাজ আছে সব নির্লজ্জ কাজের মধ্যে এটি বড়। মহানবী (স.) লজ্জাশীলতাকে ঈমানের অর্ধেক বলেছেন। আর কাজ হিসেবে বস্তুনিষ্ঠভাবে এ কাজ নিকৃষ্ট। পৃথিবীর কোনো ধর্ম একে সমর্থন করেনি। বরং এর অতি প্রসারতার কারণে ভোগবাদী সমাজের বিকাশও থেমে যায়। বিভিন্ন সমাজে এর অনুমোদনের কারণে বা নিয়ন্ত্রণের অভাবে বর্তমানে শুধু ব্যভিচার নয় বরং ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কুরআন এই ধরনের অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য শুরু থেকেই ব্যবস্থা নিয়েছে। মানুষের মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এবং পরকালীন জবাবদিহিতার অনভূতি এ থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে।

মানুষের পরীক্ষার প্রথম বিষয়বস্তু হিসেবে কুরআন নারীর প্রতি আকর্ষণকে উল্লেখ করেছে। "মানুষের নিকট নারীর প্রতি আকর্ষণকে.. . শোভাময় করা হয়েছে"।[৭৩]এজন্যই এটি পরীক্ষার বিষয়। আল-গাযালী বলেন, "একজন পুরুষ যখন নারীর দিকে কামনা নিয়ে তাকায়, তখন তার বিবেক বুদ্ধির দুই তৃতীয়াংশ লোপ পায়"।[৭৪] ইসলাম নারীকে ভোগ্য-পণ্য হিসেবে না দেখে সবচেয়ে সম্মানজনক আচরণ পাওয়ার অধিকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। নারীর চলা-ফেরায় ইসলামী বিধান কোনোভাবেই বাধা সৃষ্টি করেনি। বরং তাকে এত নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী (স.) বলেছেন, "অচিরেই এমন একসময় আসবে

যখন সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত একজন নারী একাকী চলতে পারবে, কেউ তাকে কটু কথা বলবে না"। তবে কুরআন বলেছে, তারা যেন সুসজ্জিত হয়ে বের না হয়।

ঝ. ভ্রান্তি বা ধোঁকায় পতিত হওয়া

মানুষের সৎ পথ থেকে বিভ্রান্তিকে কুরআন "*গুরূরুন*" শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, ধোঁকায় পড়া। "পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকার মধ্যে না ফেলে এবং আল্লাহ সম্পর্কেও যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও।"[৭৫] কুরআনের এই আয়াতটির মাধ্যমেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ে। যে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে চায় সে প্রধানত দুইভাবে ধোঁকায় পড়তে পারে।[৭৬]একটি হচ্ছে, পার্থিব জীবনের চাকচিক্য। মানুষ তার চেয়ে বেশি সম্পদশালী ব্যক্তির উন্নত চাল চালন, আড়ম্বর দেখে নিজেকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। তখন তার কাছে আল্লাহর ইবাদতে তৃপ্তি আসে না, বরং সে অন্য সব লোকের মত সম্পদ উপার্জনের জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তি। অর্থাৎ কেউ যখন নিজের আমলের সৌন্দর্য দেখতে পায়, তখন সে ভাবতে থাকে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন বলেই তার উন্নতি হচ্ছে। এক পর্যায়ে সে নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা মনে করে আত্মপ্রীতিতে ভোগতে আরম্ভ করে। এভাবে সে ধার্মিক হয়েও জাহান্নামের পথে চলে যায়।

প্রথম প্রকারের বিভ্রান্তি যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যেই প্রবল থাকে। মক্কার কাফেরগণ নতুন মুসলিমদের বিপদ আপদ দেখে প্রায়ই বলত, এদের সব ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ তখন এদের সম্পর্কে সান্ত্বনার বাণী নাযিল করেন, "নিশ্চয় মু'মিনগণ সফল হয়েছে"। অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিগণ হচ্ছে ধার্মিক, বিদ্বান ও জাতির নেতৃবৃন্দ। তাঁরা নিজেদেরকে মুসলমানদের আমীর বা মুফতি হিসাবে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন। কিন্তু তাঁরা মাঝে মাঝে নিজেদেরকে বড় মনে করতে শুরু করেন এবং অন্যকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করেন। এভাবে তাঁরা নিজেদেরকে ধোঁকার মধ্যেই নিক্ষেপ করেন।

৫. আত্মার পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় সদগুণাবলি

তরীকতের স্তরে উপনীত হয়ে মানুষের নফসের মন্দ প্রবণতাসমূহ দূর করার সাথে সাথে একজন ব্যক্তিকে যে সব মৌলিক সদগুণ অর্জন করতে হয় তাসাওউফ শাস্ত্রে সেগুলোর বর্ণনাও এসেছে। এখানে আমরা সেসব গুণাবলি থেকে সংক্ষেপে কয়েকটি উপস্থাপনের চেষ্টা করব। বিশেষভাবে সূফী-সাধকগণ তাঁদের শিষ্যদেরকে এগুলো শিক্ষা দিলেও প্রতিটি মুসলিমকেই তার নৈতিক প্রগতির জন্য এই প্রক্রিয়ার অনুসরণ করতে হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসেই এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। মহানবী (স.) আবু যর গিফারী (রা.)কে একদিন কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন; নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতার জন্য এগুলো বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

> আবু যর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমাকে উপদেশ দিন। নবী (স.) বলেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি: তুমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে। কেননা, এটি তোমার সমস্ত কাজকে সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেবে। আবু যর বলেন, "আমাকে আরো উপদেশ দিন"। নবী (স.) বলেন, "তুমি

কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং আল্লাহকে সবসময় স্মরণ করবে। কেননা, এই তিলাওয়াত ও আল্লাহর স্মরণের ফলে আকাশরাজ্যে তোমার নাম উল্লেখ করা হবে এবং পৃথিবীতেও তোমার জন্য তা আলোকবর্তিকাস্বরূপ হবে"। আবু যর বলেন, আমাকে আরো উপদেশ দিন। নবীজী বললেন, অধিকাংশ সময় চুপ থাকার অভ্যাস কর; এটি শয়তান বিতাড়নের কারণ হবে এবং দীনের ব্যাপারে তোমার সাহায্যকারী হবে। আবু যর বলেন, আমাকে আরো উপদেশ দিন। নবীজী বলেন, বেশি হাসবে না, কেননা এটি অন্তরকে হত্যা করে এবং এর কারণে মুখের জ্যোতি বিলীন হয়ে যায়। আবু যর বললেন, আমাকে আরো উপদেশ দিন। নবীজী বললেন, সব সময় সত্য কথা বলবে, লোকদের কাছে তা যতই দুঃসহ ও তিক্ত হোক। আবু যর বলেন, আমাকে আরো উদেশ দিন। নবীজী বলেন, আল্লাহর ব্যাপারে কোনো উৎপীড়কের উৎপীড়নকে আদৌ ভয় পাবে না। আবু যর বললেন, আমাকে আরো উপদেশ দিন। নবীজী বললেন, তোমার নিজের সম্পর্কে যা তুমি জান, তা যেন অন্যের দোষ-ত্রুটি সন্ধানের কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে।[৭৭]

এখানে যে বিষয়গুলোর উল্লেখ এসেছে সেগুলোকে সংক্ষেপে বলা যায়: তাকওয়া, কুরআন আবৃত্তি ও আল্লাহর স্মরণ, অধিক মৌনতা বা বাকসংযম, আনন্দ-ফূর্তি কম করা, সত্য বলা, আল্লাহর ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করা এবং অন্যের দোষ খোঁজ করার আগে নিজের দোষের দিকে তাকানো। নৈতিকতার সবচেয়ে মৌলিক বিষয়গুলো এখানে একসাথে চলে এসেছে। আরেকটি হাদীসে মহানবী (স.) বলেন,

> আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণির লোককে সেই দিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না; তারা হলো: ন্যায়পরায়ণ শাসক, সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহর 'ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে যুক্ত থাকে, সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরই বিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী নারী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।"[৭৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে, সাত শ্রেণির মধ্যে প্রথম স্তরে থাকবেন ন্যায়পরায়ণ নেতা। একজন সুবিচারকারী নেতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাষ্ট্রের কর্ণধার হতে পারেন আর সর্বনিম্ন পর্যায়ে একটি পরিবারের প্রধান বা নেতা হতে পারেন। যে কোনো পর্যায়ের কর্মকর্তাই এক একজন ইমাম। তবে তিনি সুবিচার করবেন আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে, কোনো বৈষয়িক সুখ্যাতি বা স্বার্থের জন্য নয়। এটি নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোচ্চ অবস্থান। আল্লাহ এ ধরনের লোকদেরকে সর্বপ্রথম আশ্রয় দেবেন। বাকী ছয় স্তরের ব্যক্তিদের মূল্যায়নও নৈতিকতাভিত্তিক। এ দুটি হাদীসের মাধ্যমেই মুসলিম ব্যক্তির নৈতিক জীবনের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে, যা মহানবী (স.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিচে সংক্ষেপে কয়েকটি আলোচনা করা হল।

ক. তাকওয়া

আত্মার যে মৌলিক সদগুণটি একজন মুসলিমের সম্পূর্ণ জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে সেটি হচ্ছে তাকওয়া। শব্দটির মূল ধাতু *'ওয়াক্‌য়ুন'* যার অর্থ রক্ষা করা বা ভয় করা। আরবী ভাষায় এ শব্দের ব্যবহার কুরআন নাযিলের আগেও ছিল। কিন্তু কুরআন একে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে। তাকওয়ার অর্থ করা হয় 'আল্লাহর ভয়'; ধার্মিকতা শব্দের মাধ্যমেও তাকওয়ার ভাবানুবাদ করা হয়। আরবী অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে পাপের কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং ভালো কাজের অনুসরণ করা।[৭৯] আল্লাহর পথ (হিদায়াত) খুঁজে পেতে কুরআন তাকওয়াকে প্রথম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে: "যারা তাকওয়ার অধিকারী তাদের জন্য কুরআন হিদায়াতস্বরূপ"।[৮০] আবার এদের পরিচয় প্রসঙ্গে সাথে সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে, এরা হচ্ছে- "অদৃশ্য বিষয়সমূহে বিশ্বাসী, সালাত কায়েমকারী, দান-সদকাকারী" (২: ৩-৪)। অর্থাৎ কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাঁর নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত থাকলেই হবে না, তাকে বাস্তবে সালাত আদায়কারী হতে হবে এবং অভাবীদেরকে দান করতে হবে। মানুষের সম্মান-মর্যাদা তাকওয়ার উপরই নির্ভরশীল। "তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী সে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত"; (৪৯: ১২)। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সামাজিক পদমর্যাদা, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সামরিক শক্তি মর্যাদার মাপকাঠি নয়, বরং তাঁকে যে সবচেয়ে বেশি ভয় করে- সে কুলি, মজুর, ফকীর, মিসকীন হলেও তার মর্যাদা আল্লাহর নিকট বেশি। হাসান বসরী বলেছেন, "তাকওয়ার একটি শস্যদানা এক হাজার ওজনের নামায রোযার চেয়ে উত্তম"।[৮১] অর্থাৎ যে নামায রোযায় তাকওয়া নেই তিনি সেই নামায রোযার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায় তাতে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করা যেতে পারে না। আর অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় থাকে তাহলে কেবল সামান্য ফরয আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ঠ।

একজন অন্ধ ব্যক্তি মহানবীর কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আসলে তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কোরাইশ নেতাদের সাথে কথা বলছিলেন, যারা ইসলামের প্রতি আগ্রহী ছিল না। আল্লাহ এতে মহানবীকে তিরস্কার করে একটি সূরা (আবাসা) নাযিল করেন। এই সূরায় সেই অন্ধের প্রশংসা এসেছে। আর ফিরআউনের দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়েছে, যে আল্লাহর নবী মূসাকে তার ঘরের পালক পুত্র ও দাস বংশীয় মনে করে মেনে নেয়নি এবং নিজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতায় ও সম্মানে গর্বিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে শুধু একটি পানির ঢেউ দিয়ে ধ্বংস করে দেন। যার অন্তরে তাকওয়া আছে তার পক্ষে অহংকার করা, হিংসা করা, অন্যের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ করা সম্ভব নয়। মহানবী (স.) এটিকে সমস্ত কাজের সৌন্দর্যের কারণ বলেছেন। এর অর্থ যে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে সে কোনো অনৈতিক কাজ করতে পারে না, তার পক্ষে মানুষের ক্ষতি করা সম্ভব নয়, দায়িত্বে অলসতা বা অবহেলা তার দ্বারা হতে পারে না, সে যখন আল্লাহর হকসমূহ কৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠার অনুভূতি নিয়ে পালন করে, তখন তার নামায রোযাও হয়ে উঠে সৌন্দর্যমণ্ডিত।

আল্লাহ কুরআনে এটিকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী জ্ঞান পাওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পার্থিব জীবনের সফলতা ও উত্তম জীবনোপকরণের উপলক্ষ্য হিসেবেও তাকওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এর কারণ আল্লাহকে যে না দেখে ভয় পায় সে আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘন করার চিন্তা করতে পারে না, তার পক্ষে মানুষের হক নষ্ট করা সম্ভবপর নয় আর সে কারণে তার বিপদে অন্যরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

খ. অনুশোচনা

আল গাযালী অনুশোচনা বা তাওবাকে আত্মার প্রধান সদগুণ হিসেবে উল্লেখ করেন।[৮২] কোনো পাপ থেকে ফিরে আসার নাম তাওবা। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সব নবী এবং সব সৎ মানুষের এটিই হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। মহানবী (স.) প্রতিদিন কমপক্ষে একশত বার তাওবা করতেন। শুধু অনুশোচনার নাম তাওবা নয়; বরং অনুশোচনার সাথে সাথে ভবিষ্যতে সে কাজ আর ঘটবে না আল্লাহর সাথে এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং কৃত পাপের ক্ষতিপূরণ দেওয়া- অর্থাৎ আল্লাহর হক হলে কাযা সম্পন্ন করা আর বান্দার হক হলে তাদের পাওনা পরিশোধের মাধ্যমে তাওবা করতে হয়। যেহেতু মানুষ মাত্রই ভুল সেজন্য তার ভুলের প্রায়শ্চিত্যের একটি জায়গা থাকা দরকার, প্রকৃতপক্ষে সেই জায়গাটি হচ্ছে তাওবা। কুরআনে এসেছে, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর দিকে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা"।[৮৩] মহানবী (স.) বলেছেন,

> আল্লাহর দিকে কেউ তাওবা করলে এতই খুশি হন, যেমনটি মরুভূমিতে কেউ তার বাহন উট হারিয়ে ফেলার পর ফিরে পেয়ে খুশি হয়ে আনন্দের আতিশয্যে বলে বসে, "হে আল্লাহ আমি তোমার প্রভু, তুমি আমার দাস"।[৮৪]

আল গাযালী তাওবার জন্য তিনটি জিনিসের উল্লেখ করেন: পাপের জ্ঞান, অনুতাপ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে পাপ ত্যাগের সিদ্ধান্ত।[৮৫] প্রকৃতপক্ষে খাঁটি তাওবা মুমিন ব্যক্তিকে নিষ্পাপ করে দেয়। এটি মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় আশার দিক। তবে অন্যের হক নষ্ট করে তাওবা করলে সে তাওবা কবুল হয় না অথবা মৃত্যুর আশঙ্কা তৈরি হলে সেই তাওবাও গ্রহণযোগ্য হয় না, বরং পাপ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই তাওবা করতে হয়। কুরআনে এসেছে,

> নিশ্চয়ই যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে বসে, এরপর দ্রুত তাওবা করে, এরাই তারা যাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়। এমন লোকেদের তাওবা নিস্ফল যারা গুনাহ করতেই থাকে, অতঃপর মৃত্যুর মুখোমুখি হলে বলে, 'আমি এখন তাওবা করছি' এবং তাওবা তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য আমি ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।[৮৬]

অর্থাৎ আল্লাহর এই অফুরন্ত সুযোগ গ্রহণ করতে যারা গড়িমসি করে তাদের জন্য আল্লাহর কোনো দয়া থাকতে পারে না। বরং যখনই মানুষ ভুল করে ফেলে তখনই তার ভুল স্বীকার করা কর্তব্য। তাওবা একদিকে নৈতিক সংশোধনের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি অন্যদিকে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির

প্রথম ধাপ। পার্থিব দৃষ্টিতেও কেউ ভুল করে তার ঊর্ধ্বতনের নিকট দ্রুত ক্ষমা প্রার্থনা করলে বড় শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

গ. আল্লাহর স্মরণ ও প্রার্থনা

মানুষের আত্মা বা মন এতই জটিল জিনিস যে, নিয়মিত এর পরিচর্যা না করলে তাতে বিভিন্ন ব্যাধি সৃষ্টি হয়। এর উৎকর্ষতার মাধ্যম হিসেবে ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে আল্লাহর স্মরণ ও নিয়মিত প্রার্থনাকে। অন্তরের কাঠিন্য দূর করতে, ক্রমাগত নিজেকে আল্লাহর বিনয়ী বান্দা হিসেবে তৈরি করতে এবং নৈতিক প্রগতি, উৎকর্ষতা ও আত্মোন্নয়নের জন্য সব সময় মনে আল্লাহর স্মরণ বা যিকরের প্রয়োজন। প্রতিটি মৌলিক ও ফরয আনুষ্ঠানিক ইবাদতের উদ্দেশ্যও আল্লাহর স্মরণ ও যিকর। কুরআনে বর্ণিত ও মহানবী (স.) এর বিভিন্ন দোআ ও যিকর আমাদেরকে শেখায় আল্লাহর কাছে কী চাইতে হবে এবং কীভাবে চাইতে হবে। দোআ'কে নবী (স.) ইবাদতের সারবস্তু বলেছেন। কারণ, এর মাধ্যমেই মানুষ চূড়ান্তভাবে নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে। তিনি বলেন, আল্লাহর নিকট প্রার্থনার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান আর কিছু নেই।[৮৭] প্রার্থনার মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে, প্রার্থনার মাধ্যমেই মানুষ মানসিক প্রশান্তি অর্জন করতে পারে। যে কোনো বিপদে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মনের শক্তি।

সবচেয়ে উত্তম নফল যিকর হিসেবে মহানবী (স.) কুরআন তিলাওয়াতের নাম বলেন। কারণ কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর কথাগুলো বারবার আমাদের স্মরণে আসে এবং পরকালের চিত্র দেখে অন্তর কেঁদে ওঠে। এতে আমাদের ভেতরের খারাপ চিন্তা ও স্বভাবের পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং ভালো গুণগুলোর অনুসরণে অন্তরে ব্যাকুলতা তৈরি হয়। সামান্য জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে সেটি ঠিক করার জন্যও আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[৮৮] অর্থাৎ ছোট বড় সমস্ত প্রয়োজন বা অভাবের কথা আল্লাহর কাছেই বলতে হবে। যে কাজটি আমাদের নিজেদের একেবারে আয়ত্বের ভেতর সেটিও সম্পাদন সম্ভব নয় যদি হঠাৎ কোনো শারীরিক বা মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। এজন্য সবসময় এবং প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে হয়।

মহানবী (স.) সামান্য আয়নায় চেহারা দেখার সময়ও প্রার্থনা করা শিখিয়েছেন, "হে আল্লাহ তুমি আমার দৈহিক গঠনকে সুন্দর করেছ, সুতরাং আমার চরিত্রকেও সুন্দর করো"।[৮৯] তিনি আল্লাহর কাছে বার বার বলতেন, "হে আল্লাহ আমি আমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে, আমার জিহ্বার অনিষ্ট থেকে, আমার চোখের অনিষ্ট থেকে, আমার কানের অনিষ্ট থেকে, আমার বীর্যের অনিষ্ট আর শয়তানের কুমন্ত্রণা ও উপস্থিতি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই"।[৯০] "হে আল্লাহ আমি আমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের ক্ষতি থেকে, শিরক থেকে, আমার নিজের উপর ক্ষতি করা থেকে অথবা অন্য কোনো মুসলিমকে ক্ষতি করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।[৯১] লক্ষ করার বিষয়, তিনি এসব প্রার্থনার মাধ্যমে সবার আগে নিজের অন্তরের

পরিচ্ছন্নতার জন্য সাহায্য চেয়েছেন যা নৈতিক চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। সূরা আন-নাস এ আল্লাহ মানুষকে এটি সর্বশেষ উপদেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

> তুমি বলো, আমি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের মালিকের, মানুষের ইলাহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি: কুমন্ত্রণাদাতা আত্মগোপনকারীর ক্ষতি থেকে, যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়, জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।

শেষবারের মত এই উপদেশ দেওয়ার অর্থই হচ্ছে মানুষ যেন নিজের অন্তরকে সব সময় মন্দ চিন্তা ও কল্পনা থেকে দূরে রাখতে পারে। মানুষের অন্তরের মধ্যে কুমন্ত্রণা আসলে সর্বপ্রথম আল্লাহর নিকট শরণাপন্ন হতে হয়। এর পর ভালো বন্ধুর সাহচর্য অনুসন্ধান করতে হয়। শয়তান মানুষের চির শত্রু। কিন্তু শয়তানকে কখনো দেখা যায় না। শয়তানের উপর যাদের বিশ্বাস নেই, তারা মানুষের অন্তরের মন্দ প্রবণতার কারণ হিসেবে পারিপার্শ্বিক প্রভাবের কথা বলেন। কুরআন এটিকে বাদ দেয়নি। কারণ মানুষরূপী শয়তান প্রকৃত শয়তানের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। এজন্যই সৎ বন্ধুত্ব মানুষের জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এভাবে মহানবী (স.) কুরআনে বর্ণিত দোআসমূহের পাশাপাশি নিজের ভাষায় অনেক দোআ করতেন। যেমন, "হে আল্লাহ, হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী, তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর"।[৯২] এটি খুব ব্যাপক অর্থবোধক একটি দোআ। মানুষের অন্তর ভালো ও মন্দ কাজের জন্য প্রধানত দায়ী। এজন্য অন্তরের স্থিরতা এবং একে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন রাখতে তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। তিনি বলেন,

> শয়তান আদম সন্তানের কলব বা অন্তরের উপর জেঁকে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকর করে তখন সরে যায় আর যখন গাফিল বা অমনোযোগী হয় তখন শয়তান তার অন্তরে ওয়াস্ওয়াসা দিতে থাকে।[৯৩]

এখানেও অন্তরের সমস্যার কথা এসেছে। বিশেষত, গভীর রজনীতে নিদ্রা ত্যাগ করে কেউ যখন তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ায় এবং মনের গহীন থেকে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করে তখন ব্যক্তির অন্তর ঐশী আবেগে ভরে যায়। তার দুঃখ বেদনা দূর হয় এবং সারা দিন অন্যায় চিন্তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, তিনজন ব্যক্তি প্রবল বৃষ্টির সময় একটি পাহাড়ি গুহায় আশ্রয় নিলে বড় একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তাঁদের কোনো বিকল্প ছিল না। তাই তাঁরা তাঁদের জীবনের তিনটি ভালো কাজের নাম বলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলেন। একটু একটু করে পাথরটি সরে যায়। তাঁরা সেখান থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই তিনটি কাজ ছিল: (১) নিজের ক্ষুধাতুর শিশুকে দুধ না দিয়ে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের জন্য রেখে দেওয়া,(২) নিজের চাচাত বোনের সাথে চুক্তি অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে অবৈধ বাসনা পূরণ করতে গেলে সেই নারী আল্লাহর ভয়ে এ কাজ বর্জনের আহ্বান জানান আর এতে তিনি আল্লাহর ভয়ে সেই কাজ আর করলেন না, (৩) সামান্য কাজের জন্য একজন শ্রমিকের মজুরি সঞ্চয় করে (যা সামান্য হওয়ায় সে নিতে চায়নি) তা ব্যবসায় খাটিয়ে বিরাট গরুর পালে পরিণত হওয়ার পর একদিন তাকে ফেরত দেন।[৯৪] এখানে মানুষের

বিপদের শেষ মুহূর্তে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আর এই প্রার্থনার জন্য নিজের ভালো কাজের স্মরণ করে কাতরস্বরে আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। যে তিনটি মহৎ কাজের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে আমাদের জীবনেও সেগুলো অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সততার ও নৈতিকতার চরম দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে যে কাজগুলোর কথা এসেছে সেগুলো আল্লাহর নিকট খুব পছন্দ হয়। শুধু প্রার্থনা নয়, বরং অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার প্রেরণাও এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

সামগ্রিক অর্থে দো'আ ও যিকর মানুষের নৈতিকতার জন্য বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। কারণ একদিকে মানুষের প্রাকৃতিক ও দৈহিক দুর্বলতা অন্যদিকে মন্দের প্রতি প্রবৃত্তির আকর্ষণ- এ দুটো সমস্যা থেকে বাঁচতে প্রতি মুহূর্তে স্রষ্টার সাহায্য প্রয়োজন। একটি ভালো কাজের অনুসরণে শুরুতেই আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করতে হয়। পৃথিবীর সব মহৎপ্রাণ মানুষই নিজের দুর্বলতার কথা বিনয়ের সাথে সবার আগে স্বীকার করতেন। এরপর কাজে নামতেন। ইসলাম আমাদেরকে এটিই শিক্ষা দেয়।

ঘ. ধৈর্য

ধৈর্য বা সবর হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। এটি সর্বজনস্বীকৃত এমন একটি বস্তুনিষ্ঠ মানবীয় গুণ যার উপর প্রতিটি মানুষের সফলতা নির্ভরশীল। যার ভেতর ধৈর্য নেই সে কোথাও কোনো সফলতা অর্জন করতে পারে না, অর্জন করলেও মুহূর্তের মধ্যে তা ধ্বংস করে দেয়। পবিত্র কুরআন ঈমানকে জগতের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করেছে। ঈমানের অর্থই হচ্ছে আমলে সলেহ বা সৎকর্ম। অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের মত সম্পদই কেবল মানুষকে নিশ্চিত সফলতার পথ দেখায়। এই মহামূল্যবান সম্পদ অর্জনের জন্য ধৈর্যকে সর্বপ্রধান মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (স.) এজন্য বলেন, ঈমান হচ্ছে ধৈর্য ও সংযম। আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে *'আস-সবূর'* বা পরম সহিষ্ণু। আল্লাহ মানুষের যুলম, পাপ, অবিচার, শিরক, সব কিছুকে একটি সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন; তিনি যদি ধৈর্য না ধরতেন তাহলে পৃথিবীর কেউ অপরাধ করে অনুশোচনার সুযোগ পেত না।

উমর (রা.) বলেন, ধৈর্য দুই প্রকার: এক প্রকার অন্য প্রকার থেকে উত্তম। বিপদে ধৈর্যধারণ করা উত্তম। তার চেয়েও অধিক উত্তম হারাম বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করা। ধৈর্য হচ্ছে ঈমানের সার। এর কারণ, তাকওয়া অর্জন করতে হয় ধৈর্যের মাধ্যমে।[৯৫] *এহইয়া* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আল গাযালী যা বলেন তার সারকথা এখানে উল্লেখ করছি।[৯৬] তাঁর মতে, ধৈর্য গুণটি কেবল মানুষই অর্জন করতে পারে। ফেরেশতাদের ধৈর্যের প্রয়োজন নেই, কারণ তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তার বাইরে কিছু করতে পারেন না। আবার মানবেতর প্রাণীরও কোনো ধৈর্যের প্রয়োজন নেই, কারণ এরা প্রবৃত্তির অনুসরণেই চলে, লোভ তাদেরকে কাজে চালিত করে। শৈশবে মানব সন্তানও ইতর প্রাণীদের মত আচরণ করে। যখন সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী হয় তখন তার উপর আল্লাহর হিদায়াত আসে। হিদায়াতের প্রেরণার সাথে তখন লোভের বা প্রবৃত্তির তাড়নার সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রবৃত্তির উত্তেজনা আসে আল্লাহর শত্রু শয়তান থেকে আর হিদায়াতের

প্রেরণা আসে ফেরেশতাদের নিকট থাকে। এই সংঘর্ষে আল্লাহর শত্রুকে পরাভূত করা এবং দূরে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় ধৈর্যের।

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, প্রতিটি প্রাণীতে প্রবৃত্তির দুই ধরনের তাড়না রয়েছে: লোভ ও ক্রোধ। লোভ সুখের জন্য কাজ করে, যা প্রধানত ভোজন রসিকতা ও যৌন কামনার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ক্রোধের কাজ দুঃখ দূর করা। উভয় ধরনের প্রবৃত্তির তাড়না মানুষকে ধৈর্যহীন করে ফেলে। এই অবস্থায় হিদায়াতের প্রেরণা তাকে শক্তি যোগায়। আল গাযালী ধৈর্যধারণের দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলেন: (১) ধৈর্য ছাড়া ইবাদত বন্দেগীর কোনো স্তরেই পৌঁছানো যায় না; (২) ইহকাল ও পরকালীন সকল সফলতা ধৈর্যের মধ্যে নিহিত। ইবাদত বন্দেগী কষ্টকর। এই কষ্ট সহ্য করার জন্য ধৈর্য দরকার। যে সালাত আদায়ের কষ্ট সইতে পারে না, তার পক্ষে সালাত আদায় করা সম্ভব নয়। ইবাদতের উদ্দেশ্য নিজের কুপ্রবৃত্তি, কামনা বাসনা ও সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, এগুলো বর্জন করা খুব কঠিন কাজ। এই জন্যই কুরআনে সবরকে অত্যন্ত সাহসিকাতার কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯৭] ইবাদতের মাধ্যমে কিছু নেকী অর্জন হয়েছে বলে কেউ আশা করতে পারে। কিন্তু এই নেক আমল নষ্ট করতে শয়তান মানুষকে বিভিন্ন ধোঁকাবাজিতে লিপ্ত করে। একারণেও ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে শয়তানের সব ওয়াসওয়াসা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। আল্লাহর পথ অবলম্বন করতে গেলে মানুষের উপর বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি, স্বজন হারানো, মান সম্মান নষ্ট হওয়া, গালি-গালাজের শিকার হওয়া, অর্থনৈতিক ক্ষতি ইত্যাদি ঘটতে পারে। এ অবস্থায় দীন ত্যাগ করার ঘটনাও ঘটে। মানুষ যখন ধৈর্যের গুণ অর্জন করতে পারে তখনই এক্ষেত্রে সে টিকে থাকতে পারে। আবার পরকালীন নাজাতের জন্য আল্লাহ তাঁর মনোনীত বান্দাদেরকে বিভিন্ন বিপদ আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। এসব পরীক্ষায় যারা ধৈর্যধারণ করে টিকে থাকতে পারেন কুরআনে তাদের জন্য পরকালীন নিশ্চিত সফলতার ঘোষণা এসেছে।

ইসলামে মানুষের নিজের মৃত্যুর আগে অন্যের মৃত্যু থেকে শিক্ষা নিতে বলা হয়েছে এই অর্থে যে, নিজের কামরিপু, ক্ষুধার তাড়নাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে নিয়ন্ত্রণ করা, পাপের কাজ বর্জনের কষ্ট স্বীকার করা, শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাধনার কষ্ট ও দুনিয়ার যাবতীয় রোগ-ব্যাধি, দুর্ঘটনার যাতনা সহ্য করে আল্লাহর উপর অবিচল থাকার মাধ্যমে মানুষ নিজের পশুত্বের মৃত্যু ঘটাতে পারে। এভাবে সে আল্লাহর সাথে তার রূহের মিলনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। এটিই হচ্ছে ধৈর্যের প্রকৃত রূপ।

দ্বিতীয় যে কারণে মানুষের ধৈর্যের প্রয়োজন সেটি হচ্ছে সমস্ত পার্থিব ও পরকালীন সফলতার জন্য। "যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে মুক্তির পন্থা বের করে দেন এবং তার জন্য এমন স্থান হতে জীবিকার ব্যবস্থা করেন যা তার কল্পনার বাইরে"; (৬৫: ২)। অর্থাৎ তাকওয়ার গুণ অর্জনে যে কঠোর ধৈর্য প্রয়োজন সেটির ফলাফল আল্লাহ পার্থিব জীবনেই দিয়ে দিচ্ছেন আর পরকালীন সফলতা তো অবধারিত থাকবেই। দুনিয়াতে নেতৃত্ব, সম্মান ও পদমর্যাদা অর্জিত হয় ধৈর্যের মাধ্যমে। বনি ইসরাইল বা ইহুদীদের পার্থিব সাফল্যের কারণ ছিল ফিরআউনের চরম নিপীড়নের মধ্যেও তাদের ধৈর্যের পথ অবলম্বন। যারা

ধৈর্যধারণ করে জীবনের পার্থিব অরাম আয়েশ ত্যাগ করেন, আল্লাহ তাদেরকে পরকালে চিরস্থায়ী বালাখানা দান করবেন।

তবে হারাম বিষয় থেকে ধৈর্যধারণ করা ফরয এবং মাকরুহ বিষয় থেকে ধৈর্যধারণ করা নফল। আবার ফরয বিষয়ের ব্যাপারে ধৈর্য ধরা হারাম। কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখলে তাতে ধৈর্যধারণ নিষিদ্ধ। নিজ স্ত্রীর সাথে পরপুরুষ এসে অন্যায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইলে এতে ধৈর্যধারণ হারাম। এভাবে নিজেকে বাঁচানো, পরিবারকে বাঁচানো তার জন্য অবশ্য করণীয়। একইভাবে কারো সামনে অন্য একজন মানুষকে অপর মানুষ কষ্ট দিলে অথবা কেউ বিপদে পড়লে সে ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য না করে ধৈর্যধারণ করার অর্থ কাপুরুষতা। অন্যায় কাজের বিপক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান নেওয়াই হচ্ছে তখন ধৈর্যের দাবি।

বিপদ আপদে ধৈর্যধারণের চেয়ে সুখের অবস্থায় ধৈর্যধারণ অধিকতর কঠিন কাজ। এটিকেই আল্লাহ পরীক্ষা হিসেবে উল্লেখ করছেন: "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষাস্বরূপ"। সুখের অবস্থায় ধৈর্যধারণের অর্থ হচ্ছে সম্পদ ও সন্তানের প্রতি আসক্ত না হওয়া। এক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের পদ্ধতি হচ্ছে, একথা বিশ্বাস করা যে, সে নিজে এবং তার নিকট যা আছে কোনোটিরই প্রকৃত মালিক সে নয়, বরং তাকে আমানতস্বরূপ দেওয়া হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তা ফিরিয়ে দিতে হবে। সুতরাং এগুলো নিয়ে কেউ আরাম আয়েশ, ক্রীড়া কৌতুক বা ভোগ বিলাসে মত্ত হলে সে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না; এই অবস্থায় ধৈর্য কৃতজ্ঞতায় রূপ নেয়। আর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হয় সৎকাজে সম্পদ ব্যয় করে, শারীরিকভাবে অন্যকে সাহায্য করে কিংবা উত্তম কথা বলে। এভাবে সুস্থতা ও সুখের সময় ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়।

মহানবী (স.) নিজের জীবনের বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ধৈর্যধারণ শিখিয়েছেন। নিজের বাবা-মা-প্রিয়জন, সন্তানদের মৃত্যুতে তিনি ধৈর্য ধরেছেন। কাফেরদের যুলম নিপীড়নের সময়, তায়েফের ময়দানে, উহুদের যুদ্ধে রক্তাক্ত অবস্থায় এবং প্রতিটি যুদ্ধে ও শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে তাঁর ধৈর্যের কারণে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা। যখন বিপদ আসে তখন তিনি ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছেন, তবে আগেই ধৈর্যের জন্য প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন, বরং বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বলেছেন।[৯৮]

অর্থাৎ ধৈর্যের গুণ এত প্রশংসনীয় হওয়ার কারণ এর মাধ্যমে অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায়। মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এই গুণের অনুসরণ ছাড়া মন্দ পথ থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। ইসলাম ঐতিহাসিক প্রমাণের মাধ্যমে দেখিয়েছে, অতীতে যাঁরা মহামানব হিসেবে পৃথিবীকে ধন্য করেছেন তাঁরা অন্যায় কাজ ও অন্যায় প্রলোভন বা হুমকিকে সীমাহীন ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন।

ঙ. আল্লাহ-নির্ভরতা বা তাওয়াক্কুল

নৈতিক পরিশুদ্ধতার জন্য আল্লাহকে বিশ্বাস করার সাথে সাথে সমস্ত ভালো কাজের বাস্তবায়নেও তাঁরই উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কুরআন এই বিষয়টিকে মু'মিনের প্রধান গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। ভরসাস্থল শব্দটি আরবীতে *ওয়াকীল* পরিভাষায় প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁর প্রিয় নবীকে তিনি বলেন,

তুমি বলো, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আমি তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করেছি, তিনি আরশের মহান মালিক।[৯৯]

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নবীকে *ওয়াকীল* বা ভরসাস্থল হিসেবে আল্লাহকেই যথেষ্ট মনে করার নির্দেশনা দেন। কারণ তিনি সমস্ত কর্তৃত্বের মূল কেন্দ্র মহান আরশের অধিপতি।

কারো উপর নির্ভরশীল হতে হলে তার মধ্যে নির্ভর করার মত গুণ থাকতে হয় এবং যে নির্ভর করবে তাকে রক্ষা করার মত শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকতে হয়। দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে উকীল নিয়োগ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে করো পক্ষে মামলা বা ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা থাকা। যদি তিনি সেই কাজ করতে ব্যর্থ হন তাহলে তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় না। অন্যদিকে আল্লাহ নিজেকে মানুষের শ্রেষ্ঠ উকীল হিসেবে পরিচয় দেন। কেউ তাঁকে উকীল হিসেবে গ্রহণ করলে তিনি তার যাবতীয় অভাব, দুঃখ, কষ্ট দূর করে দিতে পারেন।

তবে যারা মনে করেন আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে শারীরিক চেষ্টা ব্যতীত কেবল প্রার্থনা বা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে পার্থিব বিষয়সমূহ অর্জন করা যায়, তাদের এমন ধারণা ঠিক নয় ও শরীয়ত সম্মতও নয়। অর্থাৎ আল্লাহ নির্ভরশীলতার অর্থ চেষ্টা ত্যাগ করে বসে থাকা নয়, বরং চেষ্টা করেই তাওয়াক্কুল করতে হয়। এর কারণ আল গাযালী চারটি কথার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন: [১০০] (১) যে বস্তু মানুষের কাছে নেই সেই উপকারী বস্তু উপার্জন করতে (২) উপকারী বস্তু সঞ্চয় করতে (৩) যে ক্ষতিকর জিনিস এখনো আসেনি তা প্রতিরোধ করতে এবং (৪) উপস্থিত বিপদাপদ দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় অবলম্বন গ্রহণ করতে হয়। যেমন, রোগের জন্য চিকিৎসা গ্রহণ, চোর হিংস্র পশু বা অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য উপায় আবিষ্কার করা। এই বিষয়গুলো থেকে নির্লিপ্ত হয়ে তাওয়াক্কুল করা যায় না। আল্লাহর উপর নির্ভরতার মূল কথা হচ্ছে মহানবীর সেই হাদীস: "তুমি আগে উট বাঁধো তারপর তাওয়াক্কুল করো"। উপায় উপকরণ অবলম্বন আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান। আল্লাহ তাঁর এই বিধানের ব্যতিক্রম করেন না। কেউ যদি বিবাহ না করে সন্তান কামনা করে, কিংবা স্ত্রীর সাথে মিলন না করেই সন্তান চায়, তার সন্তান হবে না, কারণ আল্লাহ তাঁর নিয়মেই বিশ্ব জগৎ পরিচালনা করেন। উপায় উপকরণ অবলম্বনের পরও কেউ সন্তানের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না, উটের রশি ছিড়ে যাওয়ার ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না, এমতাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা ছাড়া আর কোনো কিছু করার থাকে না। এই ভরসার নামই প্রকৃত ভরসা বা তাওয়াক্কুল। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ বলেন, "যে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট"(৬৫: ৩)। মহানবী (স.) হিজরতের সময় পার্থিব উপকরণের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করেন; অত্যন্ত কৌশলে তিনি কাফেরদের চোখ এড়িয়ে মদীনায় যেতে চেয়েছেন। অথচ তিনি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় নবী। আবু বকর (রা.)কে নিয়ে যখন তিনি সওর গুহায় আশ্রয় নিলেন, তখন এর চেয়ে বেশি আর কিছু করার ছিল না। সব উপায় অবলম্বনের পর তাঁরা আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সমর্পণ করে দেন। তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। আবু বকর যখন শত্রুদের পায়ের আওয়াজ শুনলেন, তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন; কিন্তু মহানবী (স.) তাকে বললেন,

"চিন্তা করো না, আমাদের সাথে অবশ্যই আল্লাহ আছেন"; (৯: ৪০)। তাঁর এই নির্ভরতা আল্লাহর কাছে এতই পছন্দনীয় হলো যে, সে কথাটি হুবুহু কুরআনে উল্লেখ করে হযরত আবু বকরকেও আল্লাহ চিরস্মরণীয় করে দিলেন। এটি তাওয়াক্কুলের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত।

এই গুণটি মানুষের চরিত্রের উপর একটি মজবুত আবরণ সৃষ্টি করে। ইসলাম ও এর নৈতিক বিধান বা আইন সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির মুখে যারা হীনমন্য আচরণ করেন, তাদের জন্য তাওয়াক্কুলের অনেক বেশি প্রয়োজন। এটি তাদের আত্মসম্মান, আত্মশক্তি এবং কর্মস্পৃহাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিতে পারে।

চ. কৃতজ্ঞতা

উপকারীর উপকার স্বীকার করাকেই কৃতজ্ঞতা বলে। কৃতজ্ঞতা দুই ধরনের- আল্লাহর প্রতি ও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাই মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভিত্তি। একটি নৈতিক গুণ হিসেবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোভ, হিংসা, অহংকার, পরশ্রীকাতরতার মতো মন্দ স্বভাবের বিপরীতে এটি মানুষকে বিনয়ী ও সুখী করে তোলে। যার ভেতর কৃতজ্ঞতাবোধ আছে তাকে প্রতিটি মানুষ সম্মান করে। পার্থিব জীবনে যারা অনেক সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী তাদের দেখে অনেকেই খুব কষ্ট পাই, অথচ আমরা আমাদের চেয়ে আরো কষ্টে যারা আছে তাদের কথা চিন্তা করি না। এভাবে ভাবতে গেলে মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়।

আল গাযালী কৃতজ্ঞতার একটি মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেন।[১০১] তাঁর মতে, কৃতজ্ঞতার সাথে সম্পদের একটি সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ পরস্পর যখন কারো কাছ থেকে উপকার পায় তখন তা প্রধানত সম্পদের মাধ্যমে পায়। এজন্য প্রথমেই সম্পদের মূল উৎস জানতে হয়। সহজ কথায় পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক আল্লাহ। এই জ্ঞান আসলেই কৃতজ্ঞতার প্রথম দাবি পূরণ হয়। কেউ সম্পদ পাওয়ার কারণেই যদি কৃতজ্ঞ হয় তাহলে তার কৃতজ্ঞতাও সঠিক হয় না; বরং যে মনে করে দাতা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দান করেছেন সেই সন্তুষ্টির কারণেই কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। হৃদয়ের আনন্দেই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা আসে। তবে কৃতজ্ঞতার কথা মুখে উচ্চারণ করতে হয়। দাতার নাম স্মরণ করলে দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, অবশ্যই তা হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে হবে।

আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ ও অপছন্দনীয় কাজ কোনটি- সেই জ্ঞান না থাকলে, তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় সম্ভব নয়। সুলাইমান (আ.) এ কথাটিই আল্লাহর কাছে নিবেদন করেন, "হে আমার রব, আমাকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের সামর্থ্য দিন ..., আর আমি যেন আপনার পছন্দনীয় আমল করতে পারি।" অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য আল্লাহ অথবা মানুষ- সবার ক্ষেত্রেই পছন্দনীয়তার বিষয়টি থাকতে হবে। আবার আল্লাহর দেওয়া সম্পদের পর আরেকটি বিষয় আসে: আল্লাহর নিয়ামত। সব আকাঙ্ক্ষার বস্তুই হচ্ছে নিয়ামত। তবে যে নিয়ামতের মাধ্যমে পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জন করা যায় সেটিই প্রকৃত নিয়ামত। পারলৌকিক কল্যাণ

না হলে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণকে নিয়ামত নাম দেওয়া যায় না। আল্লাহ আমাদেরকে যা দিয়েছেন এগুলো আমাদের চাওয়ার কারণে দেননি বরং চাওয়ার আগেই দিয়েছেন। আমাদেরকে দেহ ও মনের যাবতীয় সামগ্রী তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহ করে দিয়েছেন। এরপরও আমাদের চাওয়ার শেষ হয় না। আমাদের কামনার বস্তুগুলোও তিনি পূরণ করে দেন। এজন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করলে তাঁর দানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হয় প্রথমত ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে। ভাষায় না বললে, যার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হয় তার পক্ষে কৃতজ্ঞতা অনুধাবন সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, আচরণের মাধ্যমে; অর্থাৎ ভাষায় যা ব্যক্ত করা হয়, তার আচরণে সেটি প্রকাশ পেতে হয় এবং সাথে সাথে যার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় হলো তার সন্তুষ্টি হয় এমন কাজ করা।

যারা কৃতজ্ঞতা আদায় করেন না এর প্রধান কারণ, তারা অনেক সম্পদকে সম্পদ মনে করেন না। কারণ আমরা দৈহিক ও পারিপার্শ্বিকভাবে সবাই সবসময় একই সম্পদ ভোগ করছি এবং সর্বাবস্থায় তা আমাদের সাথেই আছে। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা অজ্ঞতা। যখন মানুষের কোনো সম্পদ হারিয়ে যায় তখনই সে তার মর্ম বুঝতে পারে। সুতরাং যারা বুদ্ধিমান তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় না করে পারেন না। দুনিয়ায় অন্যের সম্পদের দিকে তাকালে কৃতজ্ঞতা আসে না বরং নিজের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের গণনা করতে গেলেই কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায়।

এই গুণ অর্জনের উদ্দেশ্য, একদিকে আল্লাহর সামনে নিজেকে জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত করা; অন্যদিকে মানব সমাজে পারস্পরিক সম্মানবোধের প্রতিষ্ঠা। একজন লোক যখন অন্য কারো উপকার করেন, তখন তার সম্মান করা ও তার কৃতজ্ঞতা জানানোকে কুরআন দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছে। সুতরাং কৃতজ্ঞতার গুণ অর্জন মানেই হচ্ছে উৎকৃষ্ট নৈতিক স্বভাব অর্জন। কুরআন উপকারকারীকে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার মানসিকতার যেমন তিরস্কার করেছে, তেমনি উপকার গ্রহণকারী ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে।

ছ. সংঘবদ্ধ জীবন

ইসলামী জীবন বিধানে একতা প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে, "তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবে না, তাহলে তোমরা কাপুরুষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি চলে যাবে"।[১০২] শুধু যুদ্ধ জয় বা সমাজ সংগঠনের জন্যই নয় বরং নিজেকে মন্দ, অশ্লীল, অনৈতিক চিন্তা থেকে রক্ষার জন্যও দলবদ্ধ থাকার বিকল্প নেই। অন্তরের মন্দপ্রবণতা থেকে বাঁচার জন্য মহানবী (স.) সবসময় সংঘবদ্ধভাবে চলার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, "যখন কেউ একা থাকে তখন শয়তান তার বন্ধু হয়"।[১০৩] এজন্য যারা একাকী সময়কে ভালো কাজে, চিন্তা-গবেষণামূলক কাজে, গভীর ধ্যানমূলক কাজে ব্যয় করতে পারবে না তাদের ভালো বন্ধুর সাহচর্যে থাকা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সংঘবদ্ধ থাকার আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে হাদীসে আরো এসেছে, "যে কোনো

সংঘবদ্ধ জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ পৃথক হয়ে যায়, সে যেন ইসলামের রজ্জু থেকে তার গর্দানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল"।[১০৪] আরেকটি হাদীসে এসেছে,

> মেষপালের শত্রু যেমন বাঘ তেমনি মানুষের শত্রু শয়তান। বাঘ সেই মেষটিকেই ধরে নিয়ে যায় যা একাকী বিচরণ করে বা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান তোমরা দল ছেড়ে দুর্গম গিরিপথে যাবে না এবং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণ মানুষের মত থাকবে।[১০৫]

উমর (রা.) বলেন, "জামাত ছাড়া ইসলাম নেই আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই"। ইসলামে ভ্রাতৃত্বের মূল চেতনা হচ্ছে এক ভাই অপর ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। সুতরাং কেউ কারো দোষ-ত্রুটি দেখতে পেলে তাকে সংশোধন করে দেওয়াটা তার অপর ভাইয়ের দায়িত্ব। অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে খুব কার্যকরী একটি বিষয় হচ্ছে সঠিক সময়ে জামাআতের সাথে মসজিদে ফরয সালাত আদায় করা। ফরয নামাযের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয় হতে পারে। মুহাম্মদ মিসকাওয়া মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আধ্যাত্মিক ভালোবাসা অর্জনের জন্য মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় বিশেষত জুমআ, দুই ঈদের সালাত ও হজ্জ সম্পাদনকে গুরুত্ব দেন।[১০৬] অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা, ঐক্যবদ্ধ থাকার চেতনা তার অন্তরকে যেমন প্রশান্তিতে রাখে তেমনি খারাপ চিন্তা থেকে দূরে রাখে।

সংঘবদ্ধ জীবন ছাড়া কোনো নৈতিক আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সমাজের ভেতরে থেকেই পারস্পরিক সংশোধনের কাজ করতে হয়; কখনো কারো একার পক্ষে এটি সাধিত হয় না। যিনি নিজেকে ত্রুটিমুক্ত করতে চান তার ত্রুটিগুলো অন্য কেউ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে ধরিয়ে দিলেই তার জন্য সংশোধন সহজ হয়। এজন্য এক মু'মিনকে অন্য মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ বলে ইসলাম ব্যাখ্যা করেছে। আয়নার সামনে না দাঁড়ালে নিজের ত্রুটি দেখা যায় না।

৬. আত্মার প্রশান্তি ও সুস্থ বিনোদন

মানুষের দুঃখ দূর করাই হচ্ছে ইসলামী নীতিদর্শনের মূল লক্ষ্য। পার্থিব দুঃখ ও পরকালীন কষ্ট দূর করতে ইসলাম বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছে। মহানবী (স.) আল্লাহর কাছে দুশ্চিন্তা ও হতাশা মুক্ত হয়ে সুখী জীবনের জন্য প্রার্থনা করতেন। তিনি আল্লাহর কাছে চাইতেন, "হে আল্লাহ আমি দুশ্চিন্তা ও হতাশা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।[১০৭] কুরআনেও এসেছে, যারা আল্লাহর পথ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা নেই। এজন্য ইসলাম মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট ইবাদতের সাথে সাথে মন ও আত্মার প্রফুল্লতার জন্য বিভিন্ন সুযোগ দিয়েছে। আমরা এতক্ষণ আধ্যাত্মিক পরমানন্দের কথা বলেছি। এখানে সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করব, ইসলাম ইন্দ্রিয় আনন্দের সম্পূর্ণ বিরোধী নয়, বরং এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা রেখেছে।

মানুষের আত্মার পূর্ণ বিকাশের জন্য আত্মার প্রয়োজনীয় চাহিদার পূরণ করতে হয়। কেউ যদি আধ্যাত্মিক সাধনার নামে আত্মাকে অতিরিক্ত শাসনের মধ্যে রাখতে চায় ইসলাম এই চরম পন্থাকেও সমর্থন করে না। আল্লাহর দেওয়া মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিপুষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তার মধ্যে আত্মার প্রশান্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পবিত্র কুরআন মানুষের আনন্দ উদযাপনকে স্বীকার করে। তবে তার পরিমাণ হবে নিয়ন্ত্রিত। "তারা যেন কম হাসে এবং বেশি কাঁদে;" (১১: ৭১)। অর্থাৎ হাসতে নিষেধ করেনি বরং এর পরিমাণ হবে কান্নার চেয়ে কম। মহানবী (স.) এর জীবনে একথার প্রতিফলন রয়েছে। তিনি বলেন, "আমার কাছে পার্থিব তিনটি জিনিস প্রিয়: রমণী, সুগন্ধি দ্রব্য এবং প্রশান্তচিত্ত সালাত।"[১০৮] তাঁর এই স্বভাবজাত পছন্দনীয়তার মধ্যেও জৈবিক ও আধ্যাত্মিকতার মিলন ঘটেছে।

আধুনিক জগতে বিনোদন বলতে যা বোঝায় তা সহজ কথায় খেলাধুলা, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক সিনেমা, বিজ্ঞাপন শিল্প প্রভৃতি। এসবের মধ্যে যৌনতার প্রদর্শনী থাকছে বেশি। কিন্তু ইসলাম আনন্দ প্রকাশে যৌনতার ব্যবহারকে সমর্থন করে না। বরং এর উদ্দেশ্য এমন নির্মল আনন্দ যা তার চরিত্র গঠন ও নৈতিকতার জন্য উপকারী হবে। প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রে অভিনয়কে উৎকৃষ্ট কোনো শিল্প বলতে রাজী হননি, কারণ তাঁর মতে, এভাবে মানুষ মিথ্যা আচরণ শিখে। ইসলাম যে আনন্দ দিতে চায় এখানেও মিথ্যার প্রচার বা অভ্যাসের কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম যে সব উপায় উপকরণকে বিনোদন হিসেবে অনুমোদন দেয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি। এগুলো একই সময় নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনেও ভূমিকা রাখে।

ক. শেখার জন্য ভ্রমণ

মানুষ একাকী কিংবা সঙ্গী সাথী পরিবারসহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে জড়ো হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হয় স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততার একঘেয়েমী দূর করে খানিকটা প্রশান্তি অর্জন। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এসব ভ্রমণ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কৃত্রিম পিকনিক স্পট, প্রাচীন স্থাপনা ইত্যাদি মানুষকে প্রথমত বিরাট আনন্দ দেয়, দ্বিতীয়ত মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে ও জানতে পারে। কুরআন এ ধরনের ভ্রমণকে উৎসাহিত করেছে। তবে এর উদ্দেশ্যকে আরো বিস্তৃত করেছে: সত্য মিথ্যার প্রতিফল দেখা। "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, এরপর দেখ মিথ্যাবাদীদের কী পরিণতি হয়েছিল।" [১০৯] অর্থাৎ ভ্রমণের মাধ্যমে সত্য অস্বীকারকারীদের সভ্যতার পতন ও ধ্বংসের নিদর্শনগুলো এখনো বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের মৃত সাগর।

প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণ শুধু আনন্দই দেয় না একই সাথে আল্লাহর প্রকৃতি জগৎ পাহাড়-সমুদ্র-বনানী-ঝর্নাধারা দেখে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য ও রহস্য সম্পর্কে গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে। এজন্যই সফরকে জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মাধ্যম বলা হয়, যেখান থেকে সরাসরি শেখা যায়।

খ. সুস্থতার জন্য খেলাধুলা

বর্তমান জগতে খেলাধুলা করা এবং দর্শক হিসেবে তা উপভোগ করাকে বলা যায় অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি বিনোদন মাধ্যম। মানুষ কর্মব্যস্ততার ফাঁকে খেলার সংবাদ শুনে মনকে সতেজ করতে চায়। ইসলাম সেসব খেলাধুলাকেই নৈতিকতার জন্য প্রয়োগ করতে নির্দেশনা দেয় যে সব খেলাধুলায় মানুষের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা আসতে পারে। দেহের ক্ষতি হয় কিংবা উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন খেলাকে সমর্থন করাটা ইসলাম সঠিক মনে করে না। মহানবী (স.) শিশুদের খেলাধুলা নিজে উপভোগ করেছেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরাও তা উপভোগ করেছেন। বয়স্কদের যে সব খেলা তখন প্রচলিত ছিল, যেমন দৌড়, ঘোড়-দৌড়, কুস্তি ইত্যাদিকে তিনি সমর্থন করেন। এসবের উদ্দেশ্য ছিল, নিজেদেরকে সুস্থ ও সবল রাখা, যেন দুর্যোগ বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সহজতর হয়। মহানবী (স.) নিজে বলেছেন, "দুর্বল মু'মিনের চেয়ে শাক্তিশালী মু'মিন উত্তম।"[১১০] সুতরাং দৈহিক শক্তি অর্জনে উৎকৃষ্ট খাবারের পাশাপাশি যদি দৈহিক অনুশীলন না থাকে তাহলে ঐ দেহ দুর্বল হয়ে যাবে এবং রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে। তবে এমন সব খেলাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে যেগুলো মানুষের দৈহিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয় এবং একই সময় তার ইবাদতে অলসতা সৃষ্টি হয়, সময় অপচয় হয়। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নারী-পুরুষের নির্ধারিত সীমারেখার পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কিংবা জুয়া খেলার মত কোনো খেলাকে ইসলাম অনুমোদন দেয় না। কারণ এধরনের খেলায় বরং অনৈতিকতার প্রসার ঘটে।

গ. কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী গান

এটি স্বতন্ত্র একটি ইসলামীক বিনোদন মাধ্যম। সুকণ্ঠের অধিকারী কেউ সুললিত সূরে যখন কুরআন তিলাওয়াত করেন তখন দর্শক শ্রোতাগণ অভিভূত হয়ে পড়েন। এতে একদিকে ঐশী বন্ধন এবং অন্যদিকে ইন্দ্রিয় প্রশান্তি সৃষ্টি হয়। হাজার বছর ধরে এটি ইসলামের একটি নিজস্ব বিনোদন ব্যবস্থা। একইভাবে ইসলামী গান ও গানের অনুষ্ঠানও বিনোদন মাধ্যম। মহানবী (স.) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন শিশুরা "ত্বলাআল বাদরু" এই গান গেয়েছিল দফ বাজিয়ে। মহানবীকে স্বাগতম জানানোর জন্য এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন মদীনায় আনসার সাহাবীগণ। মহানবী (স.) সেটিকে নিষেধ করেননি। তখন থেকেই ইসলামী গানের নতুন ধারা শুরু হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে আনন্দ করার কথাও হাদীসে এসেছে। ইসলামী গানের বিষয়বস্তু হবে আল্লাহ ও নবীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য নিয়ে চিন্তা ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহকে শানিত করা।

মানুষের শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি লাভ এবং মনের মাধ্যমে সেগুলোর উপলব্ধি মানুষকে প্রকৃতপক্ষে বিনোদন দেওয়ার সাথে সাথে স্রষ্টার প্রতি, নবীর প্রতি এবং মানবতার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে। যুদ্ধের দামামা সঙ্গীত, জাগরণী গান সৈনিকদেরকে যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণা যোগায়। ইসলাম এগুলোকে সমর্থন করে। জীবনের প্রতিটি বিষয়কে সুরের মাধ্যমে উপস্থাপন করার সুযোগ গানের ভেতর আছে বলেই তা মানুষের শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও দায়িত্বানুভূতিকে আবেগময় করে তোলে এবং সৃষ্টি হয়

মানসিক শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততা। দেশের গান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে, মায়ের গান মায়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে, যে কোনো মহামানব সম্পর্কে গান তাঁর চরিত্র অনুসরণে উৎসাহিত করে। সত্যের অনুসরণে ও মিথ্যা বর্জনে গান সাহায্য করে। একইভাবে গানের ভেতর যখন যৌনতা ও অশ্লীলতা যুক্ত হয় তখন সেই গানের মাধ্যমে নৈতিক অনুভূতি আসতে পারে না, বরং মানুষের ভেতর নৈতিক বন্ধন ভাঙ্গার হিড়িক তৈরি হয়। সুতরাং ইসলামী বিনোদন স্রষ্টার সাথে অবাধ্য আচরণের পথ দেখায় না, বরং স্রষ্টার প্রতি আনুগাত্যের আনন্দ সৃষ্টি করে।

ঘ. নৈতিক শিক্ষার জন্য অভিনয় শিল্প

নাটক, সিনেমা, অভিনয় আধুনিক বিনোদনের জগতে নতুন সংযোজন। যদিও এর পেছনটা গ্রিক মিথোলজির সাথে যুক্ত, কিন্তু আধুনিক যন্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমেই এর বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। ইসলাম এগুলোকে সমর্থন করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি যোগানোর জন্য। অন্যান্য বিনোদনের মতই এর উদ্দেশ্য মানুষের সুস্থ ও নান্দনিক বিকাশ। তবে এর প্রধান শর্ত হচ্ছে মিথ্যা বা কাল্পনিক ও অবাস্তব কাহিনীর মাধ্যমে তা করা যাবে না। মহানবী (স.) মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলাকে নিন্দা করেছেন। মানুষের সমাজ জীবনের ত্রুটি ও কীভাবে সেই ত্রুটি থেকে উত্তরণ পাওয়া যায় অভিনয়ের মাধ্যমে সেটিই শেখানো হবে। একটি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ এবং নাটকের হল থেকে মানুষ একই জিনিস শিখতে পারে । পার্থক্য শুধু এতটুকু, সিনেমায় আনন্দের মাধ্যমে নৈতিক অনুশীলন শিখবে, যা ব্যবহারিকবিদ্যার মত। এ ধরনের বিনোদন অনুষ্ঠানের দর্শক শ্রোতা তারাই হবেন বেশি যারা ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকতাকে বেশি পছন্দ করেন, অন্যদের নিকট এগুলোকে উদ্ভট বলে মনে হতে পারে। কারণ এখানে, থাকবে না নারীর নৃত্য ও উদ্দাম কণ্ঠ। সে কারণে অন্যান্য মতবাদে বিশ্বাসীরা তাদের মতবাদের রূপায়ণ এখানে না পেয়ে বরং হতাশ হবেন। ইসলামী নাটক-সিনেমার লক্ষ্য বল্গাহীন ভোগ বিলাসের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি যেন তার নিজের, অপরের, তার পরিবারের বা তার সমাজের কোনো ক্ষতি সাধন বা বিপর্যয় ঘটাতে না পারে, বরং ইসলামের রীতিনীতি মেনে পূর্ণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ করে নিজেকে ও সমাজকে সুস্থ ও সজীব রাখতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় নাটক সিনেমায় আনন্দকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, কিন্তু ইসলাম আনন্দের সাথে মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে চায়।

সামগ্রিকভাবে ইসলাম বিনোদনের মাধ্যমে মানুষকে বরং কর্মে সক্রিয় রাখতে চায়, যে কর্ম তাকে অন্যান্য পশু থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। যদি এতে পাশাবিক বিকাশ ঘটে তাহলে সেটিকে অনুমোদন দেয় না। সুতরাং যে বিনোদনে কেবল যৌনতা, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসার ঘটায়, নৈতিক বিধি নিষেধে বাধা সৃষ্টি করে কুরআন ও হাদীস তার সমর্থন করে না। ইসলামী সূফীবাদী ধারায়- সামা ও নৃত্যকে যাঁরা সমর্থন করেন, সেগুলোর উদ্দেশ্যও বরং আল্লাহর সাথে প্রেমের ও মিলনের শিক্ষা।

৭. মন্তব্য

ইসলামী নীতিদর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিদর্শন হওয়ার কারণে এর মধ্যে সব নীতিদর্শনের শ্রেষ্ঠ অংশগুলো যুক্ত আছে। এখানে সুখবাদের সুখ এসেছে পার্থিব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে ব্যবহারিক জীবনধারণ ও মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য। উপযোগবাদিতা থেকে এসেছে, এটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সামাঞ্জস্য রেখে এর বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছে। এটি এমন কিছু বলে না যা মানুষের সাধ্যের অতীত। আবার যে কাজে মানুষ বা প্রকৃতি জগতের কল্যাণ ও উপযোগিতা নেই এমন কোনো কাজের নির্দেশও ইসলাম দেয় না। বুদ্ধিবাদের বৌদ্ধিক চিন্তা এসেছে প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় লালসা ও পাশবিকতা ত্যাগ করে বুদ্ধিবৃত্তিক তাকিদে সৎ কাজের বাস্তবায়নের জন্য। মানুষের বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ ঘটলে তার পক্ষে পশুত্বের স্বভাব অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় না। পূর্ণতাবাদের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা আত্মোপলব্ধির কথাও এখানে এসেছে । প্রকৃতপক্ষে নিজেকে জানা ও সঠিকভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে স্রষ্টা ও বিশ্বজগতের জ্ঞান অর্জিত হয় এবং এসবের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই তখন নৈতিকতার ভিত্তি তৈরি হয়। ইসলামী তাসাওউফ মানুষকে তার অন্তঃস্থ দোষত্রুটিগুলো দূর করে সেখানে সদগুণাবলি প্রতিস্থাপন করতে চায়। এজন্য সূফী তরীকার বিশেষ অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। বাইয়াতের মাধ্যমে মানুষ যখন অন্যায় কাজ ছেড়ে দিতে দৃঢ়তাবদ্ধ হয় এবং ভালো কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়, তখন তার পক্ষে নৈতিক উন্নয়ন সহজতর হয়ে যায়। ইসলামের এই আধ্যাত্মিক সাধনা, যে নামেই হোক না কেন, এর অনুপস্থিতিতে ইসলামী সভ্যতা একদিনের জন্যও টিকে থাকতে পারবে না। ইসলামী নৈতিকতার প্রাণশক্তি এটিই।

সর্বোপরি আল্লাহর সাথে যে প্রেমের সম্পর্কের মাধ্যমে ইসলামী নীতিদর্শনের বাস্তব প্রয়োগ হয়ে থাকে সেই আধ্যাত্মিক প্রেমই মানুষকে পূর্ণ মানুষে পরিণত করে। এই প্রেম না আসলে মুসলিমের কাজকর্ম চালচলনে প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হতে পারে না। অন্যান্য নীতিদর্শনে বাস্তব প্রয়োজনের কথাকে জোর দেওয়া হলেও ইসলামী নীতিদর্শন বর্তমান প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে অনাগত প্রজন্মের ভবিষ্যত কল্যাণের চিন্তাকেও সবসময় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলামী নীতিদর্শনের ব্যবহারিক দিকটাই তার পূর্ণতার প্রধান দিক। ব্যবহারিক জীবনকে সুন্দর করার জন্যই ইসলামের সমস্ত তাত্ত্বিক আলোচনা। যিনি সেগুলো জানলেন কিন্তু বাস্তবে মেনে চললেন না, ইসলামের মূল দাবিকেই তিনি অবহেলা করলেন। সে কারণেই কথার সাথে বাস্তবের পূর্ণ মিল রাখতে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় ইসলাম। এই অর্থেই এটিকে পূর্ণাঙ্গ নীতিদর্শন বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. আল-কুরআন, ৫: ৩।

২. প্রাগুক্ত, ৬: ১১৫।

৩. প্রাগুক্ত, ১৮: ৫৪।

৪. প্রাগুক্ত, ৫৪: ১৭, ২২, ৩২, ৪০।

৫. *সহীহ বুখারী*: ৫০।

৬. আল-কুরআন, ১০: ২৬।

৭. J. Milton Cowan (ed.), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, 3rd ed. (New York: Spoken Languge Inc.1976), p.178.

৮. আল-কুরআন, ২: ২৩।

৯. প্রাগুক্ত, ৬৭: ৩-৪।

১০. প্রাগুক্ত, ৩২: ৭-৯।

১১. প্রাগুক্ত, ৯৫: ৪।

১২. প্রাগুক্ত, ৯১: ৭।

১৩. Samuel Alexander, *Moral Order and Progress: An Analysis of Ethical Conception* (London: Trubnerand co., 1889), pp.187-88.

১৪. https://www.al-islam.org/faith-and-reason/question-15-attaining-perfection#brief-answer.

১৫. আল-কুরআন, ৯১: ৭-১০[وَ نَفۡسٍ وَّ مَا سَوّٰىهَا ۪ فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَ تَقۡوٰىهَا ۪ قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۪ وَ قَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا]

১৬. Tariq Ramadan, *Western Muslim and the Future of Islam* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2004), p. 14.

১৭. আল-কুরআন, ৪৪: ৩৮-৩৯।

১৮. প্রাগুক্ত, ৩: ১৯১।

১৯. প্রাগুক্ত, ৩: ৮৩।

২০. প্রাগুক্ত, ৩৩: ২১।

২১. প্রাগুক্ত, ৪: ৮৬।

২২. প্রাগুক্ত, ৫: ৯৩।

২৩. Ibn al-Arabi, *The Bezels of Wisdom*, tr. R.W. J. Austin (New York: Paulist Press, 1980), pp. 257-58.

২৪. Muhammad Iqbal, *Asrar-i-Khudi*, tr. R. A. Nicholson (London: Macmillan and Company, 1922), p. (introduction).

২৫. আল-কুরআন, ৯: ২৪।

২৬. Dwight M. Donaldson, *Studies in Muslim Ethics* (London: S. P. C. K. 1953), pp. 282-3.

২৭. ফকীর আবদুর রশিদ, *সূফী দর্শন* (ঢাকা: প্রোগ্রেসিভ বুক কর্নার, ২০০০), পৃ. ৩৫-৪০।

২৮. আল-কুরআন, ১১: ৫৭।

২৯. প্রাগুক্ত, ২৯: ৬৯।

৩০. মুহাম্মদ হানীফ নদভী, *ইমাম গাযালী তাসাউফ এবং ইসলামের শিক্ষা*, অনু. মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৫), পৃ. ২২।

৩১. *বুখারী*: ৬৫০২।

৩২. *প্রাগুক্ত*: ৫৫০।

৩৩. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী (লন্ডন ও ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ১৬৩।

৩৪. আল-কুরআন, ৪৮: ১৮।

৩৫. প্রাগুক্ত, ৬০: ১২।

৩৬. *সহীহ মুসলিম*: ৪৮৯৯।

৩৭. আল-কুরআন, ৯: ১১১-১১২।

৩৮. *ইবন মাজাহ*: ৪২৫৯।

৩৯. *বুখারী*: ৬৪৭৪।

৪০. *তিরমিযী*: ২০০৪।

৪১. *মুসলিম*: ৪১২৬।

৪২. আল গাযালী, *এহইয়াউ উলূমিদ্দীন* (৫ম খণ্ড), অনু. এম. এন. এম. ইমদাদুল্লাহ (ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি., ২০০১), পৃ. ৪৭।

৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

৪৭. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯-১৫।

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮।

৪৯. *মুসলিম*: ৪৫৭০।

৫০. *মুসলিম*: ৯১।

৫১. Ahmad ibn-Muhammad Miskawayh, *Tahdhib al-Akhlaq* (Beirut: Dar Maktabat al-Ḥayah, 1968), p. 161.

৫২. Ibn Hazm, *al-Akhlaq wa`l-Siyar* (London: TA-HA Publishers; in internet archive, 1990), p. 63.

৫৩. *Ibid*., p.65.

৫৪. *Ibid*., p.68.

৫৫. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

৫৬. আল-কুরআন, ৩১: ১৮-১৯।

৫৭. প্রাগুক্ত, ১৭: ৩৭।

৫৮. *মুসলিম:* ২৩০৫।

৫৯. *তিরমিযী*: ২৩৭৬।

৬০. আল-কুরআন, ৪৯: ১১-১২।

৬১. Ahmad ibn-Muhammad Miskawayh, *op.cit*., p. 173.

৬২. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭-৭৮।

৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮০।

৬৪. আল-কুরআন, ৩৯: ৫৩।

৬৫. *লিসানুল আরব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭২৮।

৬৬. আল-কুরআন, ২৮: ৫০।

৬৭. প্রাগুক্ত, ২৫: ৪৩-৪৪।

৬৮. Max Weber, *Selection in Translation*, tr. E. M atthews (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), p. 3.

৬৯. আল-কুরআন, ৭৯: ৪০-৪১।

৭০. প্রাগুক্ত, ৮৭: ১৪-১৫।

৭১. প্রাগুক্ত, ২৩: ১-৫।

৭২. প্রাগুক্ত, ১৭: ৩২।

৭৩. প্রাগুক্ত, ৩: ১৪।

৭৪. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯।

৭৫. আল-কুরআন, ৩১: ৩৩।

৭৬. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৯-৬৩।

৭৭. *বায়হাকী:* ৪৫৯২।

৭৮. *বুখারী:* ৬৬০।

৭৯. *লিসানুল আরব*, পৃ. ৪৯০২।

৮০. আল-কুরআন, ২: ২।

৮১. Abul-Qasim al-Qushayri, Tr. Alexander D. Knysh, Reviewed by Dr Muhammad Eissa, *Al-Risala al-Qushayriyya fi Ilm al-Tasawwuf* (UK: Garnet Publishing Limited, 2007), p. 288.

৮২. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৩-৯৬।

৮৩. আল-কুরআন, ৬৬: ৮।

৮৪. *বুখারী:* ৬৩০৯; *মুসলিম*: ২৭৪৭।

৮৫. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

৮৬. আল-কুরআন, ৪: ১৭-১৮।

৮৭. *তিরমিযী*: ৩৩৭০।

৮৮. *প্রাগুক্ত*: ৩৬০৪।

৮৯. *আহমাদ:* ৩৮২৩।

৯০. *তিরমিযী*: ৩৪৯২।

৯১. *প্রাগুক্ত*: ৩৩৯২; ৩৪৯২।

৯২. *মুসলিম*: ২৬৫৪।

৯৩. *বুখারী*: ৪৯৭৭।

৯৪. *প্রাগুক্ত*: ২২১৫।

৯৫. আল-কুরআন, ৩: ২০০।

৯৬. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১।

৯৭. আল-কুরআন, ৩১: ১৭।

৯৮. *তিরমিযী*: ৩৫২৭।

৯৯. আল-কুরআন ৯: ১২৯।

১০০. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৩৮৯।

১০১. আল গাযালী, *প্রাগুক্ত*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৭-১১০।

১০২. আল-কুরআন, ৮: ৪৬।

১০৩. *তিরমিযী*: ২১৬৫।

১০৪. *আবু দাউদ:* ৪৭৫৮।

১০৫. *আহমাদ*: ২১৬০২।

১০৬. Ahmad ibn-Muhammad Miskawayh, *op.cit.*, p. 141.

১০৭. *বুখারী*: ২৮৯৩।

১০৮. *নাসায়ী*: ৩৯৩৯।

১০৯. আল-কুরআন, ৬: ১১

১১০. *মুসলিম*: ২৬৬৪।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী নীতিদর্শনের বাস্তব প্রয়োগ: সমস্যা ও সম্ভাবনা

ইসলামী নীতিদর্শন একটি বাস্তব ভিত্তিক নীতিদর্শন। এর যথার্থ ও বাস্তব প্রয়োগের ফলেই এক সময়ের যাযাবর, বর্বর ও অজ্ঞ আরব জাতি অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে এক সভ্য, বিজ্ঞানময় ও আলোকিত বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এই দর্শনের তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর শক্তিই ছিল তার এত দ্রুত সফলতার কারণ। কিন্তু বর্তমান মুসলিম জাতির অধিকাংশের মধ্যেই এর প্রয়োগে আছে চরম অবহেলা। তাদের কথা, কাজ ও চিন্তার সাথে ইসলামী নৈতিক নীতিমালার অনুসৃতি কম। এজন্যই বলা হয়, *"মুসলমানি দর কিতাব/মুসলমান দর ক্বর"*-অর্থাৎ মুসলমানিত্ব আছে কিতাবে, আর মুসলমান আছে কবরে। এর মানে বর্তমান মুসলমানদের চরিত্র দেখলে তাদেরকে মুসলমান বলা যায় না, যদিও তাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন ও হাদীস সবই অবিকল ও জীবিত আছে। মুহাম্মদ আবদুহূ ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এজন্যই বলেছিলেন, "আমি পাশ্চাত্যে ইসলাম দেখেছি, মুসলিম পাইনি; কিন্তু প্রাচ্যে মুসলিম দেখেছি, ইসলাম পাইনি"।[১] অর্থাৎ পাশ্চাত্যের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ না করলেও ইসলামী নৈতিকতার বরং বেশি অনুসরণ করেন; সততা, সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তারা প্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহ থেকে অনেক উন্নত। অন্যদিকে প্রাচ্য তথা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে প্রচুর মুসলিম থাকলেও তারা অধিকাংশই সততা, সুবিচারসহ নৈতিক বিধি পালনে উদাসীন। এর কারণ হিসেবে যদি কেউ কুরআনের বা ইসলামের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন তাহলে তা ঠিক হবে না। মুসলিম জাতির চারিত্রিক অধঃপতনের ভেতরও একটি অংশ সবসময় ছিল এবং আছে, যা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার চেষ্টা করে। এই মুষ্টিমেয় সংখ্যাটিই কুরআন ও মহানবী (স.)এর আদর্শকে ধারণ করে যুগে যুগে ইসলামের সংস্কারের এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এর যুগোপযোগিতাকে যুক্তি প্রমাণসহ বাস্তব কর্মের মাধ্যমে যথাসম্ভব উপস্থাপনের কাজটি চালু রেখেছে।

ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে নৈতিক উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল মহানবীর জীবদ্দশায় ও তাঁর পরবর্তী ত্রিশ বছরের চার খলীফার শাসন ব্যবস্থায়। ইসলামে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নৈতিক নেতৃত্ব বা আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব বলতে পৃথক কোনো ধারণা নেই। বরং যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন তিনি সামগ্রিকভাবে ইসলামের সব কিছুর প্রতিনিধিত্ব করবেন। এজন্যই রাসেল বলেন,

> ইসলাম তার খুব সূচনালগ্ন থেকেই রাজনৈতিক ধর্ম। মুহাম্মদ (স.) নিজেকে মানুষের শাসক হিসেবে তৈরি করেছেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফাগণ [১ম] বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত রাখেন। এটা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা পার্থিব ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় করতে পেরেছেন, যা খ্রিষ্টানগণ করতে পারেননি তাদের ধর্ম অ-রাজনৈতিক হওয়ার কারণে; ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র দুই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মুখে পড়ে: পোপ ও সম্রাট।[২]

অর্থাৎ নৈতিকতাসহ ইসলামের প্রতিটি মতবাদে পার্থিব ও অপার্থিব উভয় উপাদানের ভারসাম্যপূর্ণ মিশ্রণ ঘটায় ইসলাম সহজে বিশ্বসভ্যতায় বড় ভূমিকা রাখতে পেরেছে যা অন্য ধর্মের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রথম ত্রিশ বছর খিলাফত শাসনের পরে রাজতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামী বিশ্বের শাসন পরিচালনা শুরু হলে ইসলামের মূল চেতনা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামী নীতিদর্শন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে সব সমস্যা ও সম্ভাবনা আছে তার একটি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাব, সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমালোচনার যুক্তিসম্মত পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব এই নীতিদর্শন বর্তমান যুগেও সম্পূর্ণ বাস্তবায়নযোগ্য।

বর্তমান মুসলিম জাতির নৈতিক অবস্থান: আত্মসমালোচনা

মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী নীতিদর্শন ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়। পৃথিবীর আর কোনো তত্ত্ব, মতবাদ বা ধর্ম এত সুস্পষ্টভাবে কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এজন্যই এটিকে সবচেয়ে বাস্তবমুখী ও প্রায়োগিক নীতিদর্শন বলা যায়। তবে বর্তমান মুসলিম সমাজ নৈতিক অধঃপতনের দিক থেকে এক দুঃসময় পার করছে। *ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল* এর ২০২১ রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের কম দুর্নীতিপ্রবণ রাষ্ট্রের প্রথম বিশটির মধ্যে একটিও মুসলিম দেশ নেই এবং সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির দশটি দেশের মধ্যে চারটিই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান ১০১তম, দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬তম, সৌদি আরবের অবস্থান ৫৭তম এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১২৪তম।[৩] পাশ্চাত্য মানদণ্ডের অনুসরণের কারণে তাদের এই প্রতিবেদনের একটি অংশের সাথে ইসলামী মতের সম্পূর্ণ মিল নেই, যেমন, লিঙ্গ সমতা, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি; তথাপি তারা সমাজের অর্থনৈতিক দুর্নীতির যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন তাতে সন্দেহ করার কিছু নেই। বরং মুসলিমরা এর চেয়ে অনেক বেশি দুর্নীতি করে। তাদের অধিকাংশের ধারণা, নামায পড়া, রোযা রাখা, মানুষকে বেশি বেশি দান করা, জীবনের শেষকালে হজ্জ করা আর আল্লাহর কাছে ধরনা দিলেই আল্লাহ সব ক্ষমা করে দেবেন। অথচ এটি আদৌ ইসলামী আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা নয়।

মুসলিমদের এই চারিত্রিক অধঃপতন কেন হলো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই প্রশ্নের মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও জৈবিক কারণ এবং অভ্যন্তরীণ ও প্রত্যক্ষ কোন কোন জিনিস এর পেছনে দায়ী সেগুলোকে আমরা এখানে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব। কুরআন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পতনের যে কারণ এবং ধারাবাহিকতা বর্ণনা করেছে নিরপেক্ষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এর অনেক কিছুই মিলে যায়। কুরআনের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করা এবং বিশেষত মুসলিম জাতির মধ্যে যখন সেই পতনের লক্ষণ দেখা যাবে সাথে সাথে তার চিকিৎসা করা। এর ফলে মুসলিম জাতিসহ গোটা মানবজাতি রক্ষা পাবে; বিশ্বব্যাপী মানুষ তার সুফল ভোগ করবে।

পৃথিবীতে বর্তমানে সংখ্যার দিক থেকে মুসলিম জাতির অবস্থান দ্বিতীয় বৃহত্তম (১.৯১ বিলিয়ন)। ধারণা করা হয়, ২০৫০ এর ভেতর তারা বর্তমান খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীদের সংখ্যা (২.৩৮ বিলিয়ন) অতিক্রম

করবে।[৪] সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেলেও গুণের দিক থেকে তাদের সেই মান নেই। এক আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতায় বিশ্বাস ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন, কিন্তু আজ অনেকেরই এতে সৃষ্টি হয়েছে সংশয়।[৫] তবে অন্যান্য ধর্মের জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজ ধর্মের অনুসরণের হার আরো কম। মুসলিমগণ ব্যক্তিগতভাবে যেমন সততা, নিষ্ঠা বা সুবিচারের অনুসরণে উদাসীন তেমনি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক এমনকি ধর্মীয় বিষয়াদিতেও তাদের ব্যর্থতা অনেক বেশি। ইকবাল এজন্যই বলেছেন,

> খুব কহিছ: দুনিয়া হইতে বিদায় নিতেছে মুসলমান!
> প্রশ্ন আমার: মুসলিম কোথা? সে কি আজো আছে বিদ্যমান?
> হতে পার তুমি সৈয়দ, মির্জা, হতে পার তুমি সে আফগান,
> সব কিছু হও, কিন্তু শুধাই: বলো তুমি কি মুসলমান? [৬]

ইসলামের অনুসারী নাম ধারণ করে মুসলিম জাতি বর্তমানে আসলে কুরআন ও হাদীসের পূর্ণ অনুসরণ করছে না। তারা আইনগতভাবে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাস্তবে ইসলামী আচরণ তাদের মধ্যে কম। বর্তমান মুসলিম জাতির নৈতিক অধঃপতনের সামান্য একটা ধারণা নিচে দেওয়া হলো।

ক. দুর্নীতি

ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারকে সাধারণত দুর্নীতি বলা হয়।[৭] এই ক্ষমতা যেমন রাজনৈতিক বা সরকারী কোনো চাকুরীর ক্ষেত্রে হতে পারে তেমনি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রেও হতে পারে। আবার রাষ্ট্রের এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব আছে সেগুলোর লঙ্ঘনেও দুর্নীতি হতে পারে। একজন শিক্ষক ক্লাসে ঠিকভাবে পাঠদান না করলে সেটি দুর্নীতি, একজন ছাত্র ক্লাসে পাঠদানের সময় বিশৃঙ্খলা করলে, পরীক্ষার সময় অন্যের খাতা দেখে লেখলে সেটি দুর্নীতি, মসজিদের একজন ইমাম সময়মত এবং নিষ্ঠার সাথে নামায না পড়ালে সেটি দুর্নীতি। আমরা রাষ্ট্রীয় এবং অন্যের দুর্নীতিকে বড় করে দেখি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা এসব দুর্নীতি লক্ষ করি না। বিভিন্ন প্রতিবেদনে রাষ্ট্রীয় উন্নয় প্রকল্পে বড় বড় দুর্নীতির চিত্র ফুটে আসে। ওয়েবসাইটে শত-সহস্র প্রতিবেদন দুর্নীতির। যেখানে মুসলিম দেশগুলো হওয়ার কথা ছিল বিশ্বের জন্য মডেল সেখানে তাদের অবস্থান উল্টো।

রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোতে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অভাব। স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক নির্বাচন এখানে খুব কম। একথা সত্য, নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়ম বিভিন্ন দেশে ঘটে। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে প্রায়শ বড় ধরনের অনিয়ম ঘটে। যারা নির্বাচিত হয়ে গণপ্রতিনিধি হিসেবে শপথ নেন তাদের অধিকাংশ নিজের ও দলের স্বার্থে কাজ করেন। বিরোধী মতের কেউ তাদের মাধ্যমে উপকার পাওয়ার চেয়ে বরং মামলা ও হামলার হুমকির ভয়ে থাকেন। বিশ্ব রাজনীতিতে তাদের ইতিবাচক প্রভাব সীমিত। বড়

শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অন্যায়, শর্তহীন ও নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্যে তারা অমুসলিম দেশগুলোর চেয়ে অনেকসময় এগিয়ে থাকে। মুসলিম বিশ্বের মুল কেন্দ্র মধ্যপ্রাচ্য পাশ্চাত্য শক্তির সাহায্য ছাড়া খুব কম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রাজপরিবার দেশের আইনের উর্ধ্বে, তাঁদের কোনো অপরাধ বিচারালয় পর্যন্ত যায় না, ব্যতিক্রম হচ্ছে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'দুর্নীতিবাজ' প্রমাণ করে জেলে ঢুকানো। আবার বড় মুচলেকা দিয়ে সেখান থেকেও তারা মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন অথবা চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বশক্তিসমূহের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ইহুদীদের অন্যায়ভাবে দখলে নেওয়া 'বায়তুল মুকাদ্দাস'কে মুক্ত করতে ফিলিস্তিনি মুসলিম ভাই-বোনদের সংগ্রামে তাদের সমর্থন নেই। কেবল ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তারা পরাশক্তির কাছে নতজানু হয়ে থাকে। মুসলিম বিশ্বের যে দু'একটি দেশের নেতারা নিজেদেরকে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অন্যায় আনুগত্য থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন, তারা বিভিন্ন তথ্য-সন্ত্রাসের শিকার হন। পাশ্চাত্য মিডিয়া প্রথমে তাদেরকে খুব বেশি বিপ্লবী, স্বাধীনচেতা, সৎ হিসেবে উপস্থাপন করে, আর এই প্রশংসায় তাদের কেউ কেউ খুব আত্মতৃপ্তি বোধ করেন এবং যেযস কর্তৃপক্ষ এই 'সুনাম' ছড়ানোতে লিপ্ত ছিল তাদের সন্তুষ্ট করা ও সন্তুষ্ট রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে তারা রাজি হয়ে যান। এ অপকর্মে জড়িয়ে পড়লে মিডিয়াগুলো সুযোগ বুঝে এবং যথা সময়ে সেসব অপকর্ম ফাঁস করে দেয় অথবা ফাঁস করার হুমকির মধ্যে রেখে বিভিন্ন স্বার্থ আদায় করে থাকে। মিডিয়ায় তখন ধারাবাহিকভাবে সেগুলো আসতে থাকে। এটিই হচ্ছে পাশ্চাত্যের তথ্য সন্ত্রাসের রাজনীতি, যার শিকার হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের এক শ্রেণির নেতাগণ।

সরকারি চাকুরীতে যারা যোগদান করেন তারা যে বেতন ভাতা ভোগ করেন তা হয়ত তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত লোভের কারণে সম্পদের পাহাড় বানাতে তারা তৎপর হয়ে উঠেন। সরকারি সম্পদ চুরি করে, অফিসিয়াল প্রয়োজনে আগন্তুক মানুষের সাথে প্রতারণার মাধ্যমে, কিংবা কাজ করে দেওয়ার নামে অর্থ আদায় ইত্যাদি হরেক রকম মাধ্যম অবলম্বন করে তারা টাকার পাহাড় গড়ে তোলেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ভিন্ন ভিন্ন দুর্নীতি চলে। হাসপাতালের একজন পিয়ন কিংবা গাড়ির ড্রাইভার কোটি টাকা মূল্যের ফ্লাটের মালিক হয়ে যাচ্ছেন। সরকারি চাকুরী করে অনেকে বিদেশে বাড়ি গাড়ির মালিক হয়ে সেখান থেকে পয়সা উপার্জন করে নিজ উন্নয়ন তহবিল সমৃদ্ধ করেন।

ব্যাংকে কর্মরত উর্ধ্বতন ব্যক্তিগণ নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অবৈধ পন্থায় ঋণ প্রদান করেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ কিছুদিন পর ঋণ পরিশোধের চিন্তা বাদ দিয়ে একরকম ব্যাংক ডাকাতি করেন। মিথ্যা ভাউচারের মাধ্যমে হাতিয়ে নেন জনগণের আমানতের টাকা। হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাংক কেলেংকারীর সাথে জড়িত নাম মুসলিম ব্যক্তির। বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ গোপনে অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে নিজে লাভবান হয়ে কোম্পানির ক্ষতি করছেন। এক পর্যায়ে দেখা যায় ঐ কোম্পানি দেওলিয়া হয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে এগুলোর পরিমাণ বেশি।

শিক্ষা বিভাগে চাকুরি করে যারা জাতিকে আলোকিত করার কথা তাদের সম্পর্কে শোনা যায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে তাদের কোনো গ্রুপ গোপনে বিত্তবৈভবের মালিক হয়ে উঠেন। অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা

পাঠদানের জন্য প্রস্তুতি, সময়মত উপস্থিতি, যথাযথভাবে শ্রেণি পাঠদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সচেতন নন। একটি বিষয় উপস্থাপনের আগে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসা যে ছাত্রদের অধিকার- বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি না। বর্তমান সমাজে দুর্নীতি বিস্তার রোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। শুধু আমরা অর্থ উপার্জনের কলাকৌশল শেখার জন্য ছাত্র হই, সেজন্য আসলে আমরা মূল্যবোধ শিখতে পারি না। কীভাবে সফল ব্যবসায়ী হওয়া যায়, ভোক্তার সাথে কেমন আচরণ করব, কীভাবে কার মাধ্যমে উপস্থাপন করলে ক্রেতার সংখ্যা বাড়বে- এগুলোর প্রয়োজন আছে, কিন্তু সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও বিবেকের প্রতি দায়বদ্ধতার চিন্তা কম থাকায় আমাদের শিক্ষালয়গুলো থেকে নীতিবান মানুষ বের হচ্ছে না। পরীক্ষায় নাম্বার প্রদানে দুর্নীতি, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে দুর্নীতি, গবেষণায় দুর্নীতি ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে বিভিন্ন ফায়দা হাসিল করেন অনেকে।

ধর্মীয় বিষয়ে দুর্নীতিও কম নয়। মানুষের শেষ আশ্রয় ধর্ম। অথচ বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা করে একশ্রেণির আলেম নিজেদের স্বার্থ আদায় করে নেন। কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে অনেকে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করেন। নিজেদের মধ্যে কোন্দল দলাদলি, ফের্কাবাজি অন্যরা উপভোগ করে। পীর-মুরিদি ব্যবসার মাধ্যমে এক ধরনের লেবাসধারী ভণ্ড সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে বেহেশতের আশ্বাস দিয়ে থাকে। ইকবাল বলেন,

মুল্লা সূফীর এই যে ধারা গোলামগিরি এরেই বলে;
কোরান থেকে জীবন বাণী পায়নি এসব নাদান দলে।[৮]

কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করার মাধ্যমে জাতিকে নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্বকে তারা অনেকেই নিজ দায়িত্ব মনে করেন না। বরং কুরআনকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। মহানবী (স.) এদের প্রসঙ্গেই বলেছেন,

> শেষ যুগে কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে। তারা জনগণের সামনে ভেড়ার চামড়ার ন্যায় কোমল পোশাক পরিধান করবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের মতো হিংস্র। আল্লাহ তাদের বলবেন, "তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের থেকেই এমন বিপর্যয় আপতিত করব, যা তাদের পরম সহিষ্ণু ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে"।[৯]

অর্থাৎ ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করে কিছু লোক নিজেদেরকে সম্পদশালী করবে। রাজনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের লোকদের পদচারণা দেখা যায়। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের এটা একটা বড় কারণ ছিল। তিনি আরও বলেন,

> শেষ যমানায় একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা বয়সে হবে নবীন, বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও নির্বোধ। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলার নীচের হাড়ও অতিক্রম করবে না। সৃষ্টির সেরা মানুষের

> কথাই তারা বলবে, কিন্তু দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়।[১০]

বর্তমান মুসলিম জাতির অবস্থা অনেকটাই এরকম। বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে হানা-হানি, তর্ক-বিতর্কের কারণে তারা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এরা ইসলামী শাস্ত্র, কুরআন ও হাদীস পড়ছে কিন্তু এগুলোর প্রভাব তাদের মধ্যে পড়ছে খুব কম। এরা নিজেরাও পথহারা এবং অন্যদেরকেও ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। হযরত আলী (রা.) বলেন,

> পৃথিবীতে চার প্রকৃতির মানুষ বিদ্যমান। প্রথম হচ্ছে তারা যারা ক্ষমতার অভাবে এবং সম্পদের অভাবে অন্যায় করতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয় শ্রেণি: যারা প্রকাশ্যে অন্যায় করে, অন্যায়ভাবে সম্পদ আহরণ করে আবার জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়। এরা এভাবে নিজেদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করে।... তৃতীয়ত: যারা পার্থিব সুযোগ লাভের জন্য ধর্মকর্ম করে, পারলৌকিক কল্যাণের জন্য করে না। চতুর্থ: যারা আল্লাহর কথা স্মরণ রেখে দৃষ্টি নত রাখে এবং শেষ বিচারের দিনের কথা ভেবে অশ্রুসিক্ত হয়।[১১]

মুসলিম জাতির মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের মানুষের সংখ্যাই বেশি। প্রথম প্রকারের মানুষ কোনো প্রকার সম্পদ ও ক্ষমতার মালিক হয়ে গেলে তাদের অপকর্ম স্পষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে সাধারণ মানুষ এদের দ্বারা বেশি প্রতারিত হয়। এরা ক্ষমতাশালী বা পুঁজিপতিদের বিরোধিতায় বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। মানুষ তাদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্বাসী হয়ে তাদেরকে নিজেদের প্রতিনিধি বা নেতা নির্বাচন করে। আর এর পরই শুরু হয় তাদের নব্য অপশাসন। এভাবে এরা দ্বিতীয় প্রকারের মানুষের স্তরে চলে যায়। আর তৃতীয় প্রকারের মানুষ আরো জঘন্য হয়ে থাকে, যারা বাহ্যিক বেশভূষায় ধার্মিক, নিজেরা নামায পড়ে রোযা রাখে, মিষ্টি কথায় উপদেশ দেয়; অথচ এরা পার্থিব সুবিধা পাওয়র জন্যই এগুলো করে থাকে। আলী (রা.) যে মহান যুগের মানুষ ছিলেন, সে সময়ও এধরনের মানুষের সংখ্যা ছিল। আর এখন তাদের সংখ্যাই বেশি। এজন্যই ইকবাল বর্তমান অন্তঃসারশূন্য ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার জন্য আফসোস করেন,

> রসম রয়েছে আযানের বটে, আযানের রুহ্ বেলাল নাই
> ফালসাফা আছে প্রাণহীন পড়ে, আল-গাযালিরে কোথায় পাই!
> মসজিদ আজি মর্সিয়া গায়-নামাযি নাহিকো তার ভিতর,
> হেজাজিরা ছিল যেমন-তেমন কোথায় মিলিবে ধরার 'পর![১২]

খ. বিলাসিতা-অপব্যয়

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যেগুলো অর্থনৈতিকভাবে সম্পদশালী হিসেবে পরিচিত সেসব দেশের শাসক ও সাধারণ মুসলিমদের বড় অংশ বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অপচয়-অপব্যয়ের মাধ্যমে তারা নিজেদের সম্পদের অহংকার করেন। অথচ গরীব মুসলিম দেশগুলোতে চাইলে তারা বিনিয়োগ করে উপার্জন বৃদ্ধিও করতে পারতেন, দারিদ্র্য দূরীকরণেও ভূমিকা রাখতে পারতেন।

মহানবী (স.) একদিন খেজুর পাতার মাদুরে ঘুমুচ্ছিলেন। জেগে উঠার পর তাঁর গায়ে মাদুরের দাগ দেখা যায়। সাহাবীরা তখন আরয করলেন, "আমরা যদি একটি নরম বিছানার ব্যবস্থা করতাম"! তিনি তখন

বলেন, "দুনিয়ার সংগে আমার কি সম্পর্ক? আমি দুনিয়াতে এমন একজন পথচারী মুসাফির ছাড়া কিছু নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল, অতঃপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের দিকে চলে গেল"।[১৪] মহানবী এভাবে নেতা হিসেবে যে আদর্শ সৃষ্টি করেছেন এটিই ছিল কুরআনের সত্যিকার অনুসরণ। সাহাবীগণ এই আদর্শকেই ধারণ করতেন। বর্তমানে বিলাসিতা যে কী পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং তার পরিণতিতে মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য মানুষ একদিকে দু'বেলা খাবার পায় না, আর অন্যদিকে আরেক শ্রেণি কোটি কোটি টাকায় কেবল বিলাস সামগ্রী কেনাকাটায় ব্যস্ত। মহানবী (স.) চাইলে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের মালিক হতে পারতেন, কিন্তু তিনি নিজের জন্য দুই দিনের সঞ্চয়কেও কখনো সমর্থন করেননি। চার খলীফার মধ্যে উসমান (রা.) ছিলেন অনেক সম্পদের মালিক। তিনি অনেক দান-সদকা করতেন। সম্পদ কখনও কুক্ষিগত করতেন না। সম্পদের আপদ সম্পর্কে মহানবী (স.) আরো বলেন, "আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার দুটি স্বভাব যুবকই থাকে: সম্পদের লোভ ও বেঁচে থাকার লালসা।"[১৫] মুসলমানদের বর্তমান সমাজে দেখা যায় পার্থিব সম্পদের প্রতিযোগিতায় তারা পরকালীন সম্পদ অর্জনের সময় খুঁজে পায় না।

গ. অনৈক্য ও রক্তপাত

পরস্পর কলহ-বিবাদে মুসলিমগণ যেখানে মধ্যস্থতা করার কথা ছিল সেখানে তাদের মধ্যে এখন এমনকি ছোটখাট বিষয়ে মতপার্থক্য থেকে বড় দুর্ঘটনা ঘটছে অহরহ। নিজ দেশের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে, জঙ্গী হামলার মাধ্যমে নারী-শিশু-সাধারণ মানুষকে হত্যা করে ক্ষুদ্র স্বার্থ হাসিল করছে। ইসলামের নামে আত্মঘাতী হামলা করে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। ইকবালের ভাষায়,

> এক তোমাদের আল্লাহ এবং এক তোমাদের আল-কুরআন,
> আফসোস, হায়, তবু তোমরা এক নহ সব মুসলমান!
> তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা, হাজার দল ও হাজার মত,
> এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কভু মুক্তি-পথ![১৬]

ইসলামের মূল কথাই ছিল বহুর মধ্যে এক। অর্থাৎ দেশ-জাতি-বর্ণ-গোত্রের ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু সবাই এক আল্লাহর দাস হিসেবে সমান। সেক্ষেত্রে বর্তমানে বিভিন্ন ফেরকা সৃষ্টি হয়ে একে অপরকে *কাফের* ফতোয়া দিচ্ছে, সম্পর্কচ্ছেদ করছে, রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন করে প্রতিপক্ষকে শেষ করে দিচ্ছে। ধর্মীয় ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি চরম আকার ধারণ করছে। অতিরিক্ত ও অবান্তর প্রশ্নের মাধ্যমে ইসলামের একটি সহজ নির্দেশকে অহেতুক জটিল করে ফেলা হচ্ছে। এই বাড়াবাড়ির কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিপর্যয়ের কথা কুরআনে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, গরু যবেহর আদেশ নিয়ে, শনিবারের মাছ ধরা নিয়ে ইহুদীদের বাড়াবাড়ি; সংসার বিরাগী হওয়া নিয়ে খ্রিষ্টানদের বাড়াবাড়ি ইত্যাদি। বর্তমানে মুসলমানগণ বাড়াবাড়ি করছে নামাযের শেষে মুনাজাত করবে কি না, সারা বিশ্বে

একদিনে ঈদ করবে কি না, মহানবী (স.) মাটির তৈরি নাকি নূরের তৈরি ইত্যাদি, যা পূর্ববর্তীদের মতই তাদের ধ্বংস ডেকে আনছে।

ঘ. নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা

বর্তমান মুসলিমদের মধ্যে সাধারণ মানবীয় নৈতিক মূল্যবোধসমূহের অনুসরণে চরম অবহেলা লক্ষ করা যায়। সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরার্থপরতা, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার মত মহৎ নৈতিক মূল্যবোধগুলো মুসলিমদের মধ্যে অনেক কম পাওয়া যায়। অন্যের জন্য কষ্ট স্বীকার করার তৃপ্তিটাও বর্তমানে অর্থের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। একজন গাড়িচালক যাত্রী পরিবহন করে নিচ্ছেন, কারণ তাতে দু'পয়সা উপার্জন হবে, যদি এর সাথে সাথে এই অনুভূতিও থাকতো যে, 'যাত্রীর উপকারে আমি ভূমিকা রাখছি', আর যাত্রীর ভেতরও যদি সেই বোধ থাকতো যে, 'আমি তার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছি' তাহলে সমাজটাতে সহানুভূতির বোধ তৈরি হত। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক মূল্য প্রদান ছাড়া অন্য মানবীয় মূল্যবোধের দেখা মেলে কম।

নৈতিক অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ

মুসলিম জাতির এই নৈতিক অধঃপতনের পেছনে কোন কোন জিনিস দায়ী সেগুলো উদ্ঘাটন করতে পারলে সেখান থেকে উত্তরণ সহজতর হতে পারে। পবিত্র কুরআন যেহেতু মানব জাতির জন্য সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পথনির্দেশ তাই এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কুরআনের ব্যাখ্যা আছে। কারণ আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন, যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের কী কী মৌলিক ত্রুটি আছে বা থাকতে পারে। মানব জাতির ইতিহাস মানেই হচ্ছে বিভিন্ন সভ্যতার ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতনের ইতিহাস। ইবনে খালদুন এ বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে খুঁজে পান- এক সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির অনুসরণ।[১৭] কুরআনও তাই বলছে। মানুষের যেমন জীবন-মৃত্যু আছে তেমনি প্রতিটি জাতির উত্থান-পতন আছে। কুরআনের ভাষায়, "প্রতিটি জাতির মৃত্যু আছে"(৭: ৩৪)। "আমি মানুষের মাঝে যুগের আবর্তন ঘটাই"(৩: ১৪০)। মানুষের মৃত্যুকে যেমন কার্যকারণ বিধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় তেমনি জাতির অধঃপতনেরও ব্যাখ্যা সম্ভব। অর্থাৎ মানুষসহ প্রতিটি প্রাণীর যেমন জীবনকাল সুনির্দিষ্ট তেমনি প্রতিটি জাতির উন্নতি ও অবনতিও সুনির্দিষ্ট। মানুষ যেমন শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য অতিক্রম করে স্বাভাবিক মৃত্যুর মুখে পতিত হয় তেমনি একটি জাতির চরম উন্নতির পর অবনতি আসে। আবার কেউ যেমন আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করে, কোনো কোনো জাতির ক্ষেত্রেও তা সংঘটিত হতে পারে। তবে এই পতন কখন কীভাবে শুরু হয়ে থাকে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। সাধারণভাবে জাতির পতন বলতে কুরআন নৈতিক পতনকেই বুঝিয়েছে। কারণ জৈবিক মানুষ প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে উচ্চতর একটি প্রাণী, কিন্তু নৈতিক মানুষই প্রকৃত মানুষ। "আমি অবশ্যই মানুষকে

সর্বোত্তম গঠন আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি, এর পর ক্রমাগত নিম্নতম স্তরে উপনীত করেছি; তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে;"(৯৫: ৪-৬)। অর্থাৎ নৈতিকতাকে মানব জাতির জন্য আল্লাহ উন্নতি ও উত্থানের মাপকাঠি বানিয়েছেন। মানুষের উত্থান পতনের বিষয়টিকে কুরআন দেখেছে, আল্লাহর বিচক্ষণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে।

বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের বিবরণের মধ্যে ইহুদী জাতির বৃত্তান্ত কুরআনে সবচেয়ে বেশি এসেছে। তাদের নবী মূসা (আ.) এর সাথে তারা বারবার অকৃতজ্ঞ আচরণ করে। তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন এবং আল্লাহর নিকট তাদের জন্য দোআ করেন। আল্লাহ তাদেরকে বিশ্বের অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। মূসা (আ.) এর ইন্তেকালের পর তারা ধীরে ধীরে তাওরাতের অনুসরণ থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে। যে দশটি প্রধান নৈতিক আদেশ তাদের অনুসরণের জন্য দেওয়া হয়েছিল সেগুলোকে তারা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। পুনরায় তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন। কিন্তু তারা এমনকি তাদের অনেক নবীকেও হত্যা করে। কুরআন তাদের বিভিন্ন অনৈতিক কর্মের বর্ণনা দিয়েছে এবং একপর্যায়ে তাদেরকে অভিশপ্ত জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছে। তবে তাদের মধ্যে যারা সত্যাশ্রয়ী হিসেবে নিজেদেরকে পেশ করবে তারা অভিশপ্তদের মধ্যে পড়বে না। শুআইব (আ.) এর জাতির পতনের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক অবিচার ও ধোঁকাবাজিকে (৭: ৮৮), ফেরআউনের জাতির ধ্বংসের কারণ হিসেবে বিরোধী পক্ষের উপর চরম রাজনৈতিক নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডকে (৪০: ২৯), আদ ও সামূদ জাতির ক্ষেত্রে অহংকারকে (১১: ৫৯), লূত (আ.) এর জাতির অস্বাভাবিক যৌনাচারকে (২৬: ১৬৬-৭০) পতনের জন্য দায়ী করা হয়েছে। কোনো জাতির ক্ষেত্রে এধরনের নৈতিক অবক্ষয়ের একটিও যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে তাদের উপর পতন নেমে আসে। এক কথায় যে কারণগুলোকে কুরআন মানুষের পতনের জন্য উল্লেখ করেছে সেগুলো হচ্ছে: শিক্ষার অভাব, বিলাসিতা, অহংকার, যুলম, সত্যাশ্রয়ীদের উপর নিপীড়ন, সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ, মানুষের অধিকার নষ্ট করা, অসহায় মানুষের ডাকে সাড়া না দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধে শিথিলতা প্রভৃতি। আমরা এ পর্যায়ে মুসলিম জাতির সামগ্রিক অধঃপতনের কারণগুলোকে অভ্যন্তরীণ ও প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব।

১. অভ্যন্তরীণ কারণসমূহের বিশ্লেষণ

বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে নৈতিক বিধি পালনের হার অমুসলিমদের চেয়ে কম হওয়ার কারণগুলোকে আমরা প্রথমে ভেতরের দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে চাই। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ যে সব অভাব বা সমস্যা এক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল এবং এখনও আছে তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। সহজ কথায়, আল্লাহর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ককে বিসর্জন দেওয়াটাই মুসলিমদের অধঃপতনের সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ কারণ। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কুরআন মানুষের মনের ভেতর এমন এক জৈবিক প্রেষণা সৃষ্টি করতে চায় যা তাকে আল্লাহর প্রতি

চরমভাবে আকৃষ্ট করে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে আধ্যাত্মিক ভালোবাসা ও মিলনের দিকে ক্রমাগত ধাবিত করে। কুরআন এই জিনিসটিকে বিভিন্ন স্থানে হৃদয়গ্রাহী আবেদনমূলক ভাষায় উপস্থাপন করেছে:

> কে অসহায়, নির্যাতিত ও চরম বিপদগ্রস্ত মানুষের মর্মভেদী চিৎকারে সাড়া দেন, তার দুঃখ কষ্ট দূর করে দেন এবং তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দেন? (২৭: ৬২)।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ দুঃখ কষ্টের চূড়ান্ত সীমায় আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনিই তাদেরকে এভাবে রক্ষা করেন। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং একই সাথে ভালোবাসা হারানোর ভয়ই ইসলামী পরিভাষায় তাকওয়া। মুসলমানের ভেতর যখন এই তাকওয়ার প্রাবল্য ছিল তখন তারা যে কোনো অসাধ্যকে তুচ্ছ মনে করত। আলী (রা.) এমন এক আধ্যাত্মিক ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে নামাযে দাঁড়াতেন যে, শত্রু তাঁর পায়ে তীর ছুঁড়ে মেরেছে যা দৃঢ়ভাবে বিদ্ধ হয়, তখন অন্যরা নামাযের ভেতরই সেটি খুলে ফেলে; অথচ তিনি টেরই পাননি কোনো কিছু।

মুসলমানদের ভেতর থেকে যখন এই মৌলিক প্রাণশক্তি চলে যেতে শুরু করল তখন থেকেই তাদের পতনের শুরু হয়। এই প্রাণশক্তি চলে যাওয়ার পর যা থাকে তা হচ্ছে শুধু খোলস বা বাহ্যিক কাঠামো। এখন মানুষ এই বহিঃআবরণকেই আসল ইসলাম মনে করে। আনুষ্ঠানিক ইবাদত ও কাজকর্ম যতটুকু আছে, অন্তরে তাকওয়া না থাকায় এগুলো তাদের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারছে না। মুসলিম নামায পড়ে অথচ সে দুর্নীতি করে, যা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ইকবাল এজন্যই বলেছেন, আগের মত সেই আযান আছে মসজিদে মসজিদে, কিন্তু বেলালের সেই রূহ নেই। আযান শুনে কেউ আবেগ-আপ্লুত হয় না। মহানবীর মৃত্যুর পর নবীর শোকে বেলাল আযান দেওয়া বন্ধ করে দেন। উমর একদিন আযানের জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করলে তিনি আযান শুরু করলেন। '... মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।[১৮] সত্যি সত্যিই সেদিন সবাই মহানবীর যুগের এক অব্যক্ত স্পর্শে, আবেগ আপ্লুত হয়ে মসজিদে ছুটে আসেন। নজরুল গানের ভেতর দিয়ে সেটি বলেন,

> "স্বপ্নে শুনি নিতুই রাতে- যেন কাবার মিনার থেকে
> কাঁদছে বেলাল ঘুমন্ত সব মুসলিমেরে ডেকে ডেকে..."

ইসলামী সমাজের সেই রূহ বা আধ্যাত্মিক প্রেমের অনুভূতি চলে গিয়ে সেখানে গড়ে উঠল বিশাল বিশাল মসজিদ, মিনার, হাম্মামখানা, জনসেবার জন্য সারাইখানা, রাষ্ট্রের উন্নয়নে রাস্তাঘাট, অট্টালিকা, গাছপালা, বাগবাগিচার চাকচিক্য। কিন্তু ভেতরের হৃদয়খানা শুষ্ক মরুভূমিতে রূপ নিয়েছে। এক সময় উমরকে মদ্যপায়ী যুবক চ্যালেঞ্জ করেছে, "আমি মদ পান করে একটি অপরাধ করেছি, আর আপনি আমার ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে তিনটি অপরাধ করেছেন।" অর্ধপৃথিবীর শাসক নিজের ভুল বুঝতে পেরে রোয কিয়ামতে বিচারের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যুবকের হাত ধরে ক্ষমা চাইলেন, তবে তার কাছ থেকে মদ্যপান ছেড়ে দেবে এমন প্রতিশ্রুতি নিতে ভুল করেননি। আমেরিকায় মাদক নিষিদ্ধ আইন পাস হওয়ার পর তের বছরের মধ্যেই ১৯৩৩ সালে মাদক নিষিদ্ধ আইন বাতিল করতে হয়। কারণ একয়েক বছরের মধ্যে

মদ্যপান অনেক পরিমাণ বেড়ে যায়।[১৯] অথচ তাকওয়ার প্রাণশক্তি সৃষ্টি করা গেলে তা বাস্তবায়িত হত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। মুসলমানদের ভেতরও এই প্রাণশক্তি না থাকার কারণে আজ আইন করে দুর্নীতি বন্ধ করা যায় না। নিচে আমরা অধঃপতনের যে কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছি সেগুলো মূলত এখান থেকেই নিঃসৃত হয়েছে।

ক. মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক দৃষ্টিকোণ

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর শুরু করা যায়। মানুষের বিভিন্ন আচরণকে কোনো সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টাই প্রধানত মনোবিজ্ঞানের কাজ। মানুষের মনকে বস্তুর সাথে তুলনা করা যায় না বলেই তা অন্যান্য বিজ্ঞানের মত নয় যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানের এই প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা আসলে মনস্তত্ত্ব ছাড়া কোনো বিষয়ে সঠিকভাবে এগুতে পারি না। সে কারণেই মানুষের নৈতিক আচরণ ব্যাখ্যা করতে তার সঠিক মনস্তত্ত্ব জানতে হয়।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নৈতিক উন্নয়ন ও অবনতির জন্য বড় ভূমিকা রাখে। সহজাত প্রবৃত্তি কারো আয়ত্ত্বাধীন থাকে না, বরং বংশগতির জৈবিক পদ্ধতি এতে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। তবে কেউ একথা বলতে পারেন না ভালো বংশের মানুষ সব সময় ভালো মানুষ হবে। তবে যে বিষয়টি অনেকটা মানুষের আয়ত্ত্বের ভেতর সেটি হচ্ছে তার বেড়ে উঠার পরিবেশ। মহানবী (স.) যে উন্নত পরিবেশে তাঁর উম্মতকে রেখে যান, ইসলামী রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নয়নের ফলে সেটির পরিধি আরো বিস্তৃত হয়। কিন্তু একটি আদর্শ বস্তুগত উন্নতির মত দ্রুত বিকশিত হয় না, বরং ধীরস্থিরভাবে যোগ্য ব্যক্তিদের হাত ধরে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ ইসলামী পরিবেশ সব জায়গায় সমানভাবে সৃষ্টি হয়নি। একথা সত্য, মানবজাতির ইতিহাসে মহানবী (স.) এর মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব আর ঘটেনি, তিনি যে ধরনের সোনার মানুষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন তা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। কুরআন অনুযায়ী তাঁর মত মহামানব আর পৃথিবীতে আসবেন না। এ কারণে যে সমাজ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটিই ছিল সর্বোচ্চ সুন্দরের নমুনা। এর চেয়ে সুন্দর সমাজ কেউ আর গঠন করতে পারবেন না। তাঁর তিরোধনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিলাসিতা। বিলাসিতা থেকে স্বার্থপরতার জন্ম হয়, যা একটি সভ্যতার পতনের জন্য প্রথম দায়ী। এভাবে ইসলামী সহানুভূতির পরিবেশ ধীরে ধীরে কলহপূর্ণ পরিবেশে রূপ নেয়।

বর্তমানে মুসলিম জাতির সন্তানদের অধিকাংশই শৈশবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা না পাওয়ার কারণে ক্রমান্বয়ে ইসলাম থেকে দূরে চলে যায়, যা তাদের অধঃপতনে সাহায্য করে। মুসলিম শিশুদের সঠিক ইসলামী পাঠ শেখার ক্ষেত্রে বাধা আসতে থাকে তখনই যখন তারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ দেখতে পায় এবং অপশাসকদের সমর্থন না করায় বিভিন্নভাবে তাদের নির্যাতন করা হয়। উমাইয়া শাসক আবদুল মালেক

ইবন মারওয়ানের (রাজত্বকাল: ৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) ব্যাপারে বলা হয়, যেদিন তাঁর কাছে নেতৃত্ব আসে সেদিন তাঁর নিকট থাকা কুরআন বন্ধ করে তিনি বললেন, "এটাই তোমার সাথে শেষ সাক্ষাৎ।"[২০] শাসকগণ যখন কুরআনের প্রতি এভাবে উদাসীনতা প্রদর্শন শুরু করলেন তখন সেটার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের উপর পড়ে। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত মুসলিমগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সুশৃঙ্খল জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এক ঐতিহাসিক অবদান রাখেন। কিন্তু নৈতিকভাবে তাদের শাসক ও সমাজপতিগণ ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলেন না।

বাগদাদ ধ্বংস ও স্পেন থেকে মুসলিমদের সমূলে উৎখাতের সাথে সাথে তাদের বিরাট বিরাট গ্রন্থাগারগুলো পুড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আসলে মুসলিম জাতিকে পঙ্গু করে ফেলা হয়। মুসলিম জাতির জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই এসব হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। প্রায় পাঁচশত বছর ধরে মুসলিম পণ্ডিতদের সৃষ্ট জ্ঞানের এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য থেকে পরবর্তী মুসলিম জাতি উপকৃত হতে পারেনি। বর্তমানে যা অবশিষ্ট আছে তা সেই অমূল্য সম্পদের খুব সামান্য অংশ। শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি এই স্বেচ্ছাকৃত এবং আরোপিত দূরত্ব থেকে মুসলিমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ হতাশা, ক্ষোভ ও অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়; ফলে কর্মস্পৃহায় ঘাটতি দেখা দেয় ও নৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

খ. ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা

কুরাআন বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণতাকে নিন্দা করেছে। এটিকে পূর্ববর্তী জাতি সমূহের পতনের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। মানুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এবং একই সময় পরীক্ষার জন্যও আল্লাহ বিভিন্ন পার্থিব সামগ্রী মোহময় করে সৃষ্টি করেছেন: নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্য, ফল-ফলাদি, বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি (৩: ১৪)। এসবের প্রতি আকর্ষণের কারণেই পৃথিবীতে সমাজ-সভ্যতা গড়ে উঠছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে পড়ে যদি কেউ হারিয়ে যায় তাহলে তার পক্ষে সভ্যতা নির্মাণে ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। বরং এগুলোর প্রতি অতিরিক্ত মোহ মানুষের নৈতিক জীবনকে শেষ করে দেয়। মুসলিম জাতির ইতিহাসে দেখা যায় কীভাবে তাদের নেতাদের রাজপ্রাসাদ নারী-মদ-সঙ্গীতের মুর্ছনায় মেতে থাকত। শাসকগণ যখন অঢেল রাজকীয় সম্পদের মালিক হয়ে গেলেন, তখন সেগুলোর ব্যয়ের জন্য পান্থশালার আয়োজন করা হত। সাধারণ মানুষ তাদের নেতাদের এসব দেখে তৃপ্তিবোধ করত আর নিজেরাও ধীরে ধীরে রাজকীয় মডেল গ্রহণের চেষ্টা করত।

কুরআনে মূসা (আ.) এর সময়ের বিভিন্ন ঘটনা এসেছে মূলত আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই। যেমন, ইহুদী আলেম বলআম বাউরা বিশাল স্বর্ণ-রৌপ্য ও সম্পদের লোভে পড়ে এমনকি মূসা (আ.)এর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দোআ করতে রাজি হয়ে গেল (কারণ, সে আল্লাহর এত নৈকট্য অর্জন করেছিল যে, যা চাইতো আল্লাহ তা কবুল করতেন)। আল্লাহ তাকে লোভী কুকুরের সাথে তুলনা করেন। মূসা (আ.)এর বিরুদ্ধে দোআ করে যখন সে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেল, তখন সে পরামর্শ দিল, "তোমরা মূসার সাথে পারবে না, কিন্তু যদি তার সৈন্যবাহিনীর ভেতর সুন্দরী নারীদের ছড়িয়ে দিতে পার তাহলে তারা পরাজিত হবে।"

যখন তা করা হলো সাথে সাথে কাজ হয়ে গেল এবং সৈনিকগণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ছেড়ে নারী ও মাদকতায় মেতে উঠে। কিন্তু নবীর উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করলেন না, তওবার সুযোগ দিলেন।[২১] মুসলিম জাতির নেতারাও যখন এভাবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হতে শুরু করলেন তখন শত্রুরা এটাকে সুযোগ মনে করলেন। শত্রুপক্ষ থেকে 'ভালোবাসা'র উপহার হিসেবে তাদেরকে নর্তকী ও গায়িকা উপহার দেওয়া হত। কিন্তু এগুলোই যে তাদের পতনের উপকরণ ছিল তা তারা বুঝতে পারেননি। স্পেনের মুসলিম রাজাগণ গ্রানাডা ও কর্ডোভায় যে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তা পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের রাজপ্রসাদের চেয়ে কম ছিল না, অথচ খলীফা উমর অর্ধ পৃথিবী শাসন করতেন খেজুর পাতার প্রাসাদে এবং এসব মুসলিম রাজাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে। তাঁরা যখন তাঁদের নৈতিক ও ঈমানি শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, তখন ফেরাউনের মত রাজপ্রাসাদ ও সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেও নিজেদের নিরাপদ বোধ করতে পারলেন না।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে সম্পদের প্রতিযোগিতা থাকলেও আসলে যারা কর্তৃত্ব ও সম্পদের অঢেল মালিকানা পান তারাই এই প্রতিযোগিতায় বেশি নামেন। একটি হাদীসে এসেছে,

> মহানবী (স.) একদিন ফজর নামায শেষ করে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। আনসার সাহাবাগণ তখন তাঁর সামনে আসলেন। তিনি তাদের দেখে মুচকি হেসে বললেন, "আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ যে, আবু উবায়দা কিছু মাল নিয়ে ফিরে এসেছে"। তারা বলেন, "হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল"। তিনি বলেন, "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমরা যাতে খুশি হবে এরূপ বিষয়ের আশা পোষণ কর। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের আশঙ্কা করি না, বরং আশঙ্কা করি দুনিয়াটা তোমাদের জন্য প্রসারিত হবে, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল। অতঃপর তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে, যেরূপ তারা আসক্ত হয়েছিল। ফলে দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দেবে, যেরূপ তাদের ধ্বংস করেছিল।"[২২]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

> আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় চামড়ার তালিযুক্ত একটা ছেড়া চাদর গায়ে মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে এবং তার অতীতের স্বচ্ছল অবস্থার কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল বলেন, "সে সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া পোশাক আর বিকেলে পরবে অন্য জোড়া! আর তোমাদের সামনে একটি খাদ্যভর্তি পাত্র রাখা হবে আর অপরটি উঠিয় নেওয়া হবে। তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ এমনভাবে পর্দায় ঢেকে রাখবে, যেভাবে কা'বা ঘরকে গেলাফে ঢেকে রাখা হয়।" সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো তখন বর্তমানের চাইতে অনেক স্বচ্ছল থাকব। বিপদাপদ ও অভাব-অনটন থেকে নিরাপদ থাকব। ফলে ইবাদত বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট অবসর পাব। রাসূল (স.) বলেন, অবশ্যই বর্তমানটাই তোমাদের জন্য তখনকার তুলনায় অনেক উত্তম।[২৩]

হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ ধরনের অনেক হাদীস এসেছে যেখানে মহানবী (স.) তাঁর উম্মতের ভবিষ্যত দৃশ্য বলে দিচ্ছেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সর্বোত্তম সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার মেয়াদ বলে দেন মাত্র ত্রিশ বছর। কীভাবে এত কষ্ট, ত্যাগ, রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত মানবেতিহাসের সবচেয়ে স্বর্ণযুগের ধীরে ধীরে পতন হবে, কুরাইশ বংশের লোকেরা ক্ষমতার ও সম্পদের প্রতিযোগিতায় পরস্পর হানা-হানি করে ধ্বংস হবে তিনি তা নিখুঁতভাবে বলে যান। সাহাবীদের মধ্যে সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা ছিল না। তাঁরা রাতের বেলায় জায়নামাযে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন আর দিনের বেলায় আল্লাহর পথে সংগ্রাম-সাধনায় রত থাকতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলে এর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে আরবরা। বিভিন্ন জাতির চাকচিক্য, বিলাসিতা দেখে তারাও সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। মদীনা কেন্দ্রিক খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্র চলে যায় সিরিয়ায়, তারপর বাগদাদ। এভাবে অন্যান্য পার্থিব চাকচিক্যের অধিকারী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তারা ইসলামের মূল আদর্শ ও চেতনাকে হারিয়ে ফেলতে শুরু করে।

যে লোকদের জীবন বেড়ে উঠেছিল সুশীতল ইসলামী পরিবেশে, অভাব-দারিদ্র্য কিন্তু প্রচণ্ড মানসিক প্রশান্তি নিয়ে, তাদের পরবর্তী বংশধরগণ যখন সুরম্য অট্টালিকা ও বিলাসবহুল বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করলেন তখন তাদের ভেতরের সেই আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি নিভে যেতে থাকে। পবিত্র কুরআন সম্পদের প্রতি মানুষের স্বভাবজাত লোভকে এমন এক নেশাচ্ছন্ন ভাবের সাথে তুলনা করেছে যা কেবল মৃত্যুর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে (১০২: ১)। মহানবী (স.) বলেছেন, "কারো একটি স্বর্ণের পাহাড় থাকলে আরেকটি কামনা করবে। একমাত্র মাটি ছাড়া তার পেট ভরে না"।[২৪] তিনি আরও বলেন, "ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু ক্ষতিসাধন করে, কারও সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতে অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করে তার ধর্মের"।[২৫] বিলাসিতা ও সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে দুনিয়ার লোভ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং তখনই মানুষ অসৎ পন্থায় হলেও অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। এতে শুধু যে নিজের ক্ষতি হয় তাই নয়, বরং তারা ধর্মের ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশি। আলী (রা.) বলেন,

> আমি এই পৃথিবী সম্পর্কে তোমাদের বারবার সাবধান করছি। কেননা এ পৃথিবী হচ্ছে অস্থিরচিত্ত মানুষের আবাসস্থল। এটা লুণ্ঠনের স্থানও নয়, সঞ্চয়ের স্থানও নয়। এর অলঙ্করণ হচ্ছে ছলনা। এটা এমন একটি গৃহ যা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত নিম্ন মানের। তিনি এই পৃথিবীতে ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের মিশ্রণ ঘটিয়ে রেখেছেন, পূণ্যের সঙ্গে পাপের মিশ্রণ ঘটিয়ে রেখেছেন, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর মিশ্রণ ঘটিয়ে রেখেছেন এবং মধুরতার সঙ্গে তিক্ততার মিশ্রণ ঘটিয়ে রেখেছেন। ... মৃত্যুচিন্তা তোমাদের মধ্যে নেই এবং মিথ্যা আশায় তোমরা বিভ্রান্ত হয়েছ। এই পৃথিবীতে তেমারা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছ পরকালের অধিকার খর্ব করে।...[২৬]

এই পৃথিবীর ছলনা সম্পর্কে আলী (রা.)এর এই মূল্যায়ন থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তৎকালীন জনগণ এগিয়ে আসেননি। তিনি আরও অনেক ভাষণে মুসলিমদের আশু বিপদ থেকে সতর্ক করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে

খুব কমই তাঁকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মহানবী (স.) দুনিয়ার এই মোহকেই সমস্ত ক্ষতি ও অকল্যাণের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মানুষের মন সাধারণত দৃশ্যমান উন্নত জিনিসের প্রতি বেশি আসক্ত হয়। কোনো শিল্পপতি, অভিনেতা, খেলোয়াড় অথবা খ্যাতিমান কেউ কোন ধরনের পোশাক পরেন, কীভাবে হাসেন, কীভাবে কথা বলেন, কতটুকু ধর্ম পালন করলেন ইত্যাদি সাধারণ মানুষ দেখে এবং তাতে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বর্তমান পৃথিবীর খ্যাতিমানদের চালচলন অন্যান্য জাতির মত মুসলিমদেরকেও সরাসরি প্রভাবিত করছে। এক সময় মহানবী (স.) এর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষ যেভাবে নতুন ধর্ম ইসলামকে জানতে এসেছিল দলে দলে এবং একইভাবে সাহাবীদের মাধ্যমেও হয়েছিল তা এখন আর নেই। এখন মুসলিম জাতির মধ্যে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে বরং নিজেদেরকে উন্নত দেশসমূহের নেতাদের চলাফেরাকেই বেশি অগ্রাধিকার দেন। ফলে সাধারণ মুসলিমগণ মহানবীর মহান ঐতিহ্য থেকে আরো দূরে সরে পড়ছে।

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্রসমূহে ধর্মকে রাজনীতির বাইরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা ধর্মীয় কোনো বিধান মানার প্রয়োজন মনে করেন না। রেনেসাঁ পরবর্তীতে ম্যাকিয়াভেলির তত্ত্বে প্রথম রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। এতে ইউরোপে সাড়া পড়ে যায়। ধর্মকে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে রেখে রাষ্ট্রকে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার আদর্শ তাদের মধ্যে মোটামুটি সবাই তখন গ্রহণ করে নেন। এর কারণ ছিল মূলত খ্রিষ্টধর্মের যাজক ও পুরোহিতদের বিভিন্ন অপকর্ম ও রাজার অন্যায়-অবিচারকে বৈধতা দান। মানুষ বিভিন্ন অপকর্ম করে গীর্জার প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়ে নিজেদের পাপ মোচন করে পার পেয়ে যায়। এরা স্বর্গের সুখবর নিয়ে আবার ফিরে আসে। কিন্তু আবার অপকর্মে লিপ্ত হয়। মানুষের যেহেতু ধর্মের প্রতি এক ধরনের গভীর আবেগ বিদ্যমান, তাই রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত করাও সম্ভব নয়, বরং রাষ্ট্রের উন্নয়নে ধর্মকে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের এই চেতনা যখন মুসলিম নেতাদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করল তখন তারাও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের পথ অবলম্বন করতে লাগলেন। শুক্রবারের জুমার নামায যেখানে ছিল নৈতিকতার সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সেটি হয়ে গেল রোববারের প্রার্থনা সভার মতই। এভাবেই ধর্মীয় চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে মুসলিমগণ বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে।

গ. ক্ষমতা ও নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা

মানুষ মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রত্যেকেই সম্মান, খ্যাতি ও ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। নিজের প্রশংসা সবাই পছন্দ করে। রাসেলের ভাষায়,

> তিন বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে, যার ভ্রুকুটিতে দুনিয়া প্রকম্পিত হয় সেই ক্ষমতাবান পর্যন্ত, সকলেরই জীবনে নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বাসনা তথা যশলিপ্সা, এত প্রবল যে, তার কোনো প্রকার অতিরঞ্জন সম্ভব নয়।[২৭]

এই যশ লিপ্সার প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে নেতৃত্ব অর্জন। একজন নেতাকে সবাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সম্মান করতে বাধ্য থাকে। এ কারণে নেতৃত্বের মাধ্যমে মানুষ চায় খ্যাতি অর্জন করতে। মুসলিম জাতির পতনের শুরুটা হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতা কেন্দ্রিক। কুরআনে এসেছে,

> জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহংকার, ধন ও জনের প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। (৫৭: ২০)

পারস্পরিক অহংকারের প্রতিযোগিতার অর্থই হলো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য লড়াই। মানুষ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন সেটি ধরে রাখার জন্য তার অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে গোপনে প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে। মহানবী (স.) তাঁর উম্মতের ঐক্য অটুট রাখার জন্য নেতৃত্বের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

> আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার এবং(নেতার আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে ক্রীতদাস হয়। তোমরা যারা জীবিত থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয়ে লিপ্ত (বিদআত) হওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা তা পথভ্রষ্টতা। তোমাদের কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার জীবনাদর্শের (সুন্নাহর) এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে।[২৮]

সঠিক নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম জাতি পথপ্রদর্শকশূন্য হয়ে পড়ে। খুলাফায়ে রাশেদিনের পর মুসলিম বিশ্বকে একক নেতৃত্ব দেওয়ার মত কোনো নেতার আবির্ভাব আর হয়নি। বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়াতেও খুব বড় সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল নিজেদের অন্তর্কলহ ও বিভেদ। নেতার সমালোচনাকে, ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়াকে অনেকেই সহ্য করতে পারতেন না। এক সময় উমর (রা.)কে মানুষ চ্যালেঞ্জ করত "আপনার নামাযে বিলম্বে আসার কারণ না বললে, আমরা আর আপনাকে নেতৃত্বে রাখব না"। অর্ধপৃথিবীর শাসক জনগণের কাছে কৈফিয়ত দিলেন, "আমার জামাটা শুকাতে একটু দেরি হয়ে গেছে, কারণ গরমে একটি কাপড়ই আমি ব্যবহার করি"। কিন্তু সেই শক্তি তখন হারিয়ে গেছে।

মহানবী (স.) তাঁর উম্মতের অধঃপতনের যে ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, এর শুরু কুরাইশ বংশের কিছু যুবকদের মাধ্যমে ঘটবে। তিনি বলেন, "আমার উম্মতের ধ্বংস হবে কুরাইশ বংশের কিছু যুবকের মাধ্যমে"।[২৯] হাদীসবিশারদগণ এই যুবকদেরকে চিহ্নিত করেন: ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়া, ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ প্রমুখ। দামেশকের অমুসলিম, দুশ্চরিত্র, মদ্যপায়ী ও বিলাসী তরুণদের সাথে ইয়াযিদ বড় হয়ে উঠে যে ইমাম হোসাইন ও তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যকে কারবালার ময়দানে নির্মমভাবে হত্যা করে, মদীনায় মসজিদে নববীতে অগ্নি-সংযোগ ও ভাঙচুর চালায়, মক্কায় কাবা শরীফকে অবমাননা করে। তার মাধ্যমে ইসলামী চেতনার উপর যে আঘাত এসেছিল তার প্রভাব এখনো বর্তমান। মদীনায় তার তিন দিনের যুদ্ধ ঘোষণায় প্রায় দশ হাজার মুসলিমকে হত্যা করা হয়, এক হাজার কুমারী

নারীর ইযযত নষ্ট করা হয়।[৩০] বিভীষিকাময় সে পরিস্থিতি মদীনাবাসীগণ এর আগে ও পরে কখনো দেখেনি। মহানবীর অনেক সাহাবী এতে শহীদ হন। তারই পরবর্তী ধারা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রাখে। মুসলমানদের ইতিহাসের এই নির্মম দৃশ্যগুলো দেখে অমুসলিমদের যে কেউ ভাবতে পারেন, তারা নিজেরা কত নিকৃষ্ট জাতি এবং তাদের ইসলাম তাদেরকে এসব থেকে বিরত রাখতে পারছে না।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন। মহানবী (স.) তাকে বলেন হে বৎস, "তুমি যদি সকাল-সন্ধ্যা এমনভাবে কাটাতে সক্ষম হও যে, তোমার অন্তরে কারও প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই, তাহলে তাই কর।"[৩১] অথচ মুসলিম নেতাদের বৈশিষ্ট্যই এমন হয়ে পড়ে যে, তারা বিরোধী মতের কাউকে পেলে তাকে শত্রু মনে করতেন। ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করলেন। এসব প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রকে দুর্বল করে ফেলে। অথচ রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার জন্য ইসলাম সবচেয়ে বেশি জোর দেয়। কাদিসিয়ার যুদ্ধে অংশ নিতে খলীফা উমর (রা.) নিজে প্রস্তুত হয়ে গেলে আলী (রা.) তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন,

> একজন রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন একটি তসবীহ্‌র সূতার মত। এই সূতার জন্য তসবীহ্‌র দানাগুলো সুসংহত থাকে, কিন্তু সূতা ছিড়ে গেলে দানাগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু দানা হারিয়ে যায়। বর্তমানে আরবরা যদিও সংখ্যা অনুপাতে কম তবু একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য তারা শক্তিশালী। আপনি হচ্ছেন অক্ষরেখার মত, আপনাকে কেন্দ্র করেই তারা আবর্তিত হচ্ছেন। সুতরাং আপনি যুদ্ধে যাবেন না এবং স্থান ত্যাগ করবেন না।"[৩২]

অর্থাৎ ইসলামে ঐক্যের গুরুত্ব বোঝাতে আলী (রা.) একটি উপমা দিয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার মূলকেন্দ্রই হচ্ছে একটি জাতির ঐক্যের কেন্দ্র। খিলাফতের সময় সমগ্র মুসলিম জাহানের কেন্দ্র ছিল মদীনা। মুসলিমবিশ্ব যদি পরবর্তী সময় ঐক্যবদ্ধ থাকত তাহলে তাদের এই দুর্দশা হতো না। ইতিহাস থেকে জানা যায় স্পেন যখন মুসলিমদের হাত ছাড়া হলো তখন স্পেনে অন্তত একশত শাসক বিভিন্ন ভাগে ভাগে শাসন করতেন, যারা ছিলেন একে অপরের প্রতিযোগী। শত্রুর জন্য এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ সুযোগ। স্পেনের পতনের মতই ভারতীয় উপমহাদেশে এবং তুরস্কে মুসলমানদের পতন হয়েছে বিচ্ছিন্নতার কারণে।

পরস্পর গর্ব ও বংশ মর্যাদার দাবি আরবদের এবং সাধাণভাবে সব মানুষের মধ্যেই কমবেশি বিদ্যমান আছে। একটি জাতি অন্য একটি জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য যে জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে তা আসলে এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। মুসলিম জাতির মধ্যে খিলাফত ধ্বংস হওয়ার পর এটি মাথা চড়া দিয়ে উঠে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল তা সবার জানা। আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উমাইয়া বংশের লোকদের উপর যে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল তা ইসলামপূর্ব যুগের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মতই ছিল। এসব যুদ্ধে মানুষ উচ্চ বেতনের জন্য অংশ নিত। ক্ষমতা বিস্তারের এসব লড়াই মুসলিম বিশ্বকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। যখন মুসলিমদের মধ্যে বিনয়ের

পরিবর্তে অহংকার এসে স্থান করে নেয় তখন তাদের অধঃপতন নেমে আসে। কুরআনে এ কথাটি বিভিন্নভাবে এসেছে।

> আমি তাদের পূর্ববর্তী কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যারা তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল, নগরে-দেশে তারা অহংকার করে বেড়াত, তাদের কোনো পলায়নের জায়গা ছিল না। (৫০: ৩৬)
>
> তাদের পূর্বে আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। তুমি কি তাদের কারও সাড়া পাও, কিংবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও? (১৯: ৯৮)

অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতির লোকদের বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই, তারা ভালো-মন্দ যে প্রকৃতিরই ছিল না কেন ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে যায়। কিন্তু যারা সততা ও সুবিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছে তাদেরকে বর্তমানের লোকেরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে আর যারা যুলমের পথে গিয়েছে তাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। খিলাফতে রাশেদার পর যারা মুসলিম সাম্রাজ্যের নেতা ছিলেন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব শাসকই ছিলেন এ ধরনের অহংকারী।

প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের এই অধঃপতনই তাদেরকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। মুসলিমবিশ্বে এখন পর্যন্ত আর কোনো দৃশ্যমান ইসলামী নেতার আবির্ভাব ঘটেনি। তবে মহানবী (স.) এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল প্রতি শতকের গোড়ায় আল্লাহ মুসলিম জাতির মধ্যে সংস্কারক পাঠাবেন। প্রতি শতকে তাই কোনো না কোনো সংস্কারক আসছেন এবং সমগ্র জাতির ভাঙন রোধে ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু তাঁরা চিন্তার রাজ্যে খুব বড় বিপ্লব দেখাতে পারছেন না। এ কারণেই মুসলিম জাতির অভ্যন্তরীণ পরিবেশ উন্নত হতে পারছে না। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মুসলিম হজ্জ করছেন, কিন্তু হজ্জের শিক্ষার প্রতিফলন তাদের মাঝে নেই। তাবলিগ জামাতের ইজতেমায় লক্ষ লক্ষ মুসলিম বয়ান শোনেন, ইসলামী মাহফিলে জনতার স্রোত নেমে যায়, কিন্তু ঘরে ফিরে আর ইসলাম মানার তাকিদ অনুভব করেন না।

ঘ. হতাশা ও দুর্বলতা

হতাশা ও হীনমন্যতাকে ইকবাল ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা মনে করেন। মুসলিমগণ যখন রাজনৈতিকভাবে ইসলামের মূল চেতনা থেকে সরে পড়ল, তখন সত্যিকারের সূফী-সাধকদের মাধ্যমে ইসলামের মরমি বাণী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচার হয়। প্রথমদিকে তাঁরা সফল হলেও ক্রমান্বয়ে সেই সফলতার হার কমে আসে। কারণ, রাজনৈতিক পরিবেশ মানুষের নৈতিকতার জন্য সবসময় বেশি দরকার। মানুষ যখন তাদের নেতাদের দ্বিমুখী আচরণ করতে দেখে, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অশ্লীলতা, বিলাসিতায় নেতাগণ নিমজ্জিত হয়ে পড়েন, তখন তার প্রভাব জনগণের উপর পড়বেই। সাধারণ মুসলিমরা ইসলামের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়। এই শ্রেণির মুসলিরমরাই যখন ইউরোপ-আমেরিকার চাকচিক্য দেখতে পায় তখন মনে করে ইসলামের চাইতে তাদের মতাদর্শ বেশি কার্যকর ও উন্নত। শুধু মুসলিম জাতি নয় পুরো মানবজাতিই আজ প্রচণ্ড হতাশ। ইকবাল বলেন,

> মানুষ আজ সর্বতোভাবে হতাশার সম্মুখীন। মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মরীতি যেমন আজ কোনো আশার বাণী শোনাতে পারছে না, তেমনি আধুনিক জাতীয়তাবাদ বা নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদও তার অন্তরে নবতর

প্রেরণা জোগাতে অক্ষম হয়েছে। আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে আজকের দিন বাস্তবিকই একটি সংকটের দিন। জীবজগৎ এখন এমন এক অচলাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে নবতর বিকাশ ছাড়া তার আর এগিয়ে যাওয়ার সম্ভানা নেই। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা আনুষ্ঠানিক ধর্মের ভিত্তি ভেঙে দিয়েছে। তার সঙ্গে ভেঙে পড়েছে সমাজ বাঁধনের নৈতিক ভিত্তি। এখন নতুন ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় কঠিন দায়িত্ব বর্তমান মানুষের উপর বর্তেছে। এর জন্য যে বলীয়ান নৈতিক চরিত্র চাই, তা সে পেতে পারে একমাত্র ধর্মেরই কাছে; কারণ ধর্ম তার সুবিকশিত স্তরে অন্ধ বিশ্বাসের বন্ধন, পুরোহিতানুগত্য বা গতানুগতিক ক্রিয়াকলাপে নিবদ্ধ নয়।[৩৩]

ইকবাল এখানে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে বললেও বিশেষত এর মাধ্যমে মুসলিম জাতির দায়িত্বপালনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। পাশ্চাত্য জগৎ যে অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মকে তাদের জীবন থেকে বাদ দিতে চেয়েছে তাতেও তাদের হতাশা কমেনি। বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক ধর্মের পক্ষেই মানবজীবনের দুঃখ দূর করা সম্ভব। ইসলাম মানবজাতিকে সে পথই দেখাতে চায়।

ঙ. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ হ্রাস পাওয়া

পবিত্র কুরআন মানুষকে ভালো কাজের প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মন্দ কাজে নিষেধের জন্য সবচেয়ে বেশি তাকিদ দিয়েছে।

যদি তোমরা (আল্লাহর পথে) বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের কঠোর পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যাদের কোনো ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না। (৯: ৩৯)

মহানবী (স.) বলেন,

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। তা না হলে, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোআ করবে কিন্তু সেই দোআ কবুল হবে না।[৩৪]

আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, "আমি রসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি, মানুষ কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও তার দুই হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করলে অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে তাঁর ব্যাপক আযাবে নিক্ষেপ করবেন"।[৩৫]

সুতরাং ইসলামের এই বিধান অন্য ধর্মের মত নয়। অন্য ধর্মগুলো মানুষকে সদুপদেশ দিতেই ব্যস্ত, কেউ উপদেশ না মানলে তার প্রতি কিছু করার থাকে না। একটি গালে কেউ চড় মারলে, অপরটিও চড়ের জন্য উপস্থাপন করার কথা ইসলাম বলে না। অন্যায়ের প্রতিরোধে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য বলেছে ইসলাম। আমরা আগেই বলেছি, নৈতিক আইনের জন্যও কঠোর হওয়ার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন অপরাধ দমনে শাস্তির আইন না থাকলে রাষ্ট্র ও সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ নৈতিকতার অর্ধেক সুরক্ষাই দেয় নৈতিক আইন।

ঙ. ইতিহাস-দর্শনের দিক থেকে বিশ্লেষণ

ইতিহাস-দর্শনের আলোকে, প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী জাতির এসব উত্থান পতনের ঘটনা ঘটে। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুনের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন, কোনো জাতির পতনের জন্য তার উত্থান ও উন্নতিই দায়ী। যখন কোনো রাজা কোনো অঞ্চলের শাসক হন, তখন তাঁর প্রথম কাজ হয় জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। এরপর দেশের ক্রমাগত উন্নতির জন্য সক্রিয় চেষ্টায় একসময় রাষ্ট্র উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। এসময় মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উচ্চ বেতন দেওয়া হয়। বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণতায় মানুষ মেতে উঠে। এভাবে পতন ও অবক্ষয়ের বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি হতে থাকে। গোত্রপ্রীতি ও স্বজনদের বাড়তি সুবিধা দিয়ে তাদেরও বিলাসিতার সুযোগ দেওয়া হয়। রাজা হঠাৎ এটাকে চ্যালেঞ্জ মনে করে তাদের প্রদত্ত সুবিধা বাতিল করেন। কিংবা প্রয়োজন মনে করলে হত্যা করে তাদের প্রভাব দূর করেন। সেখানে নিকটস্থ আমলাদের সুবিধা দেন। এতে আবার অন্যরা ঈর্ষান্বিত হয়ে সুযোগের সন্ধানে লিপ্ত থাকেন। এভাবে প্রাসাদের ভেতর সৃষ্টি হয় গোপন ষড়যন্ত্রের সক্রিয় কার্যক্রম। অন্যদিকে সরকারি লোকদের খরচ মেটাতে জনগণের উপর বাড়তি কর ধার্য করতে হয়। এ অবস্থায় জাতির বিচক্ষণ ও জ্ঞানীগণ রাজাকে আসন্ন বিপদের ব্যাপারে অবহিত করেন, কিন্তু রাজা সেগুলোকে গুরুত্ব দেন না। আবার গুরুত্ব দিয়ে কেউ কেউ হঠাৎ সজাগ হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। এ যেন বাতি নেভার আগে হঠাৎ করে জ্বলে উঠা। এই নিয়মেই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ধ্বংস হয়।[৩৬] গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে মুসলমানদের পতনের যে কারণগুলো বর্ণনা করা হলো তাতে ইবনে খালদুনের মত অনেকটাই মিলে যায়, যদিও মুঘল সাম্রাজ্য ও অটোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছে তাঁর মৃত্যুর কয়েকশত বছর পর।

ইবনে খালদুনের আগেও এ বিষয়টির আলোচনা করেন সেন্ট অগাস্টিন; তবে তা বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ব্যাখ্যায় তিনি তা উপস্থাপন করেন। রোমান সম্রাট কন্সটানটাইন ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে রোমান সাম্রাজ্যকে খ্রিষ্টধর্মের অধীন করেন। ৪৭৬খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের পতন ঘটে জার্মান বর্বর জাতি হান, গথ ও ভ্যান্ডেলের আক্রমণে। এসব বর্বর জাতি নিষ্ঠুরতা, লুটতরাজ ও নারী-নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের বিজয় প্রকাশ করে। তবে ইতিহাসে তাদের এই পতনের কারণ হিসেবে সাম্রাজ্যের বিশালতা, সামন্ত অর্থনীতি, নৈতিক অধঃপতন ও জনগণের উপর যুলম নিপীড়নকে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রিক পৌত্তলিক বা প্যাগানদের মতে, সম্রাটগণ দেবরাজ জুপিটারের পূজা না করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের কারণে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সেন্ট অগাস্টিন এই মত খণ্ডন করেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনার আলোকে জগতে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন ঘটে। যারা নিরপরাধ খ্রিষ্টান নারী-পুরুষের উপর আক্রমণ করেছে তাদের শাস্তি পরকালে হবে।[৩৭] তবে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের, যা বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত ছিল, তখনও পরাজয় ঘটেনি। পারস্যের সাথে তাদের লড়তে হয়েছে

অনেকবার। সর্বশেষে, মুসলমানদের হাতে তাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কর্তৃক ১৪৫৩ সালে, মহানবী (স.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী। এর পেছনে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাই ছিল মূলসূত্র।

ফ্রেড্রিক হেগেল যে অর্থে মানব ইতিহাসের উত্থান পতনের পেছনে পরমসত্তার কথা বলেছেন, তার সাথেও এই মতের মিল রয়েছে। হেগেলের মত ছিল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন হচ্ছে এবং সব সময় এর উন্নয়ন ঘটছে। এর পেছনে তিনি আধ্যাত্মিক সত্তাকে দায়ী করেন। অন্যদিকে কার্ল মার্কস এই উন্নতির ধারাবাহিকতায় আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে কেবল বস্তুগত উপাদান বা অর্থকেই চালিকা শক্তি মনে করেন। কুরআন এটিকে একদিকে ঐশী পরিকল্পনার অংশ বললেও, মানুষের যাবতীয় কার্যক্রমকেই এর জন্য দায়ী করে। আর মানব জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে কুরআন কেবল মহানবী (স.)কেই স্বীকার করে; তাই তাঁর যুগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো যুগ কুরআনের দৃষ্টিতে আর কখনো আসবে না। কিন্তু মহানবীর প্রতিষ্ঠিত মডেল কেউ যদি কিছু পরিমাণও অনুসরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে সেই সমাজ সমকালীন অন্য সব সমাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাজে পরিণত হবে- এটিও কুরআনের প্রতিশ্রুতি।

২. প্রত্যক্ষ কারণসমূহের বিশ্লেষণ

মুসলিম জাতি ভেতরের দিক থেকে অসংখ্য সমস্যার কারণে নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বাইরেরও কিছু কারণ রয়েছে। জর্জ হরানি মনে করেন, পাশ্চাত্যের সামরিক, প্রযুক্তিগত, আইন, বাণিজ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার আক্রমণে মুসলিম জাতির বর্তমান বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। বিশেষত ১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল খননের মাধ্যমে তা আরও প্রশস্ত হয়। এমতাবস্থায় পেছনের সোনালি দিনে ফিরে যাওয়া তাদের আর সম্ভব নয়।[৩৮] এই নৈরাশ্যবাদ গ্রহণ করতে কুরআন কঠোরভাবে নিষেধ করেছে: "তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হবে যদি তোমরা সত্যিকার বিশ্বাসী হও"। নিচে আমরা কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি।

ক. প্রত্যক্ষ আঘাত

খিলাফতের শেষ দিক থেকে বিশেষ করে উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ড ও আলী (রা.)এর খিলাফতকালীন সময় বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের যেমন বিস্তার ঘটছিল তেমনি বাইরের শত্রুরা এ সবে ইন্ধন যোগাতে কোনো ত্রুটি করেনি। যেমন, খারেজিদের চরম পন্থা; কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা; শিয়া ও সুন্নী বিরোধ ; শিয়া ও সুন্নীদের ভেতরে বিভিন্ন মতপার্থক্য ইত্যাদি কেবল নিজস্ব কারণেই ঘটেনি, বাইরের অনেক কারণও অন্তর্নিহিত ছিল। গ্রিক দর্শন ও অন্যান্য মতবাদের প্রভাবে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায়েরও আবির্ভাব ঘটে। এভাবে নিজ গৃহে বিভক্তির ফলে বাইরের আঘাত সহজতর হয়ে উঠে। শিয়াদের বিদ্রোহী একটি গ্রুপ যা একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম নেতাদের গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে তাদের মিশন পরিচালনা করত। হাসান সাবাহর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় প্রধানত মুসলিম নেতাদেরকে হত্যা করে রাজ্য অস্থিতিশীল করে রাখত। এদের মাধ্যমে পরবর্তীতে স্বল্প সময়ের জন্য মিশরে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১০৯৫ থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর ইউরোপের সম্মিলিত খ্রিষ্টান শক্তি

কনস্টানটিনোপল রক্ষা ও জেরুজালেম দখলের জন্য মুসলমানদের সাথে যে রক্তক্ষয়ী লড়াই করে তা ইতিহাসে ক্রুসেড যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলে তারা মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য গোপন পন্থার দিকে এগিয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বের উপর ১২৫৮ সালের মঙ্গোল আক্রমণ ছিল ভয়াবহ আক্রমণ, যা আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। এই দুই বিপর্যয় থেকে মুসলিমগণ ধীরে ধীরে সামলে উঠতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাদের জীবন-যাত্রায় এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব তৈরি হয়। মুসলমানদের মধ্যে যারা সৎলোক বলে পরিচিত ছিলেন তারা সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ থেকে দূরে সরে পড়েন যার ধারাবাহিকতা অবশ্যই আগেই শুরু হয়েছিল।

১৪৯২ সালে স্পেনে মুসলমানদের পরাজয় ছিল এমন এক গভীর ক্ষত যা থেকে তারা আর ফিরে দাঁড়াতে পারেনি। স্পেনের মুসলমানদের পতনের পর খ্রিষ্টান রাজশক্তি সেখানে একজন মুসলমানের অস্তিত্বও সহ্য করতে পারেনি। হয় তাদের খ্রিষ্টান হতে হবে, অথবা বাড়ি-ঘর ছেড়ে ভিন দেশে চলে যেতে হবে অথবা আগুনে পুড়ে মরতে হবে। বলা বাহুল্য, যে জাহাজগুলোতে করে সরকারিভাবে তারা নির্বাসনে যাওয়ার জন্য বের হত সেগুলোকে আগেই ফুটো করে দেওয়া হত, ফলে সমুদ্রেই হাজার হাজার মুসলিমের সলিল সমাধি ঘটত। যারা ইসলাম ছেড়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করত, তাদেরকে আবার সন্দেহ করা হত, বিভিন্ন নির্যাতনের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ছাড়ার ঘোষণা আদায় করা হত। এরপরও মুষ্টিমেয় কিছু মুসলিম গোপনে ইসলাম ধারণ করে, যাদেরকে 'মরিসকো' নাম দিয়ে ভয়াবহ নির্যাতন করা হত। এর মাধ্যমে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হচ্ছে: এভাবে মুসলিম জাতি প্রচণ্ড হীনমন্যতা, পলায়নপরতা, মিথ্যার আশ্রয় (কারণ সত্য বললে অবধারিত মৃত্যু) এবং সমাজের সবার ঘৃণা নিয়ে বড় হওয়ার কারণেই পরবর্তী শতকগুলোতে তাদের চরিত্রে এর প্রভাব পড়ে। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনে ছিল ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার ও প্রতারণা। একইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পতন হয়েছিল তুর্কী অটোমান সাম্রাজ্যের। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে শত্রুপক্ষ খুব দ্রুত প্রত্যক্ষ আঘাত হানে এবং নিজেরা কর্তৃত্বের আসনে বসতে সক্ষম হয়।

খ. উপনিবেশবাদ

বাইরের দিক থেকে যে বড় কারণগুলো মুসলিম বিশ্বের নৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ধ্বংস করেছে সেগুলোর মধ্যে উপনিবেশবাদ সবচেয়ে মর্মন্তুদ। চতুর্দশ শতক থেকে বৃটেন, ফ্রান্স, পর্তুগালসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক কোম্পানি মুসলিম দেশগুলোতে আগমন করে। তাদের উদ্দেশ্য তখন কেবল বাণিজ্যই ছিল। তারা একপর্যায়ে মুসলমানদের সরলতা ও সততার সুযোগে মুসলিম শাসকদের পদস্খলন ঘটানোর কূটপরিকল্পনা হাতে নেয়। ভারতীয় উপমহাদেশের কথা চিন্তা করলেও সেটি দেখা যায়। রাজ-দরবারের কাছের লোকদেরকে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তারা অর্থ ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে, মহা রাজা বানানোর লিখিত চুক্তির মাধ্যমে কেনা বেচা করত। এক পর্যায়ে এসব গাদ্দাররা দেশকে ওদের হাতে দিয়ে

দেয়। কিন্তু এর পর আর চুক্তি রক্ষার নিশ্চয়তা কে দেয়? বরং উপনিবেশ শক্তি ওদেরকেই আগে শেষ করে দেয়।

উপনিবেশবাদীগণ শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রথমত মুসলমানদের চরিত্রকে ধ্বংস করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। কারণ তাদের চরিত্রের শক্তির কারণেই তারা ছিল অজেয়। এজন্য তারা যেখানেই কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করেছে সেখানেই বিশেষভাবে মুসলিমদেরকে অভাব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ দিয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রেখেছে। পলাশীর পরাজয়ের মাত্র দশ বছরের মাথায় বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল তার মূল কারণ ছিল এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলিম সমাজ। মুসলমানদের হাত থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার কারণে সব সময় তারা মুসলমানদেরকে সন্দেহের চোখে দেখত। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন অভিযোগে তারা মুসলিম নেতা ও পণ্ডিতদের গ্রেফতার, নির্যাতন করে, নির্বাসন দিয়ে নেতৃত্ব শূন্য করে ফেলে। সাধারণ মুসলমানদেরকে ভয়-ভীতির মধ্যে রেখে সব সময় তারা তাদের ফল-ফসল ছিনিয়ে নিত। উপনিবেশ আমলে প্রতিটি মুসলিম দেশের মুসলমানদের সাথে একই আচরণ করা হয়েছে।

ইংরেজ জাতি যখন এদেশে এসেছিল তখন তারা ধীরে ধীরে যে কাজটি করতে চেয়েছিল তা হলো শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন। রাজত্ব হারা মুসলমানদের 'দয়া' করে সর্বপ্রথম একটি মাদরাসা তারা উপহার দেন ১৭৮১ সালে, ক্ষমতা দখলের মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে। এর সিলেবাস, কারিকুলাম ইংল্যান্ড থেকে পাস হয়ে ইংরেজ অধ্যক্ষের মাধ্যমে এদেশের মুসলিমদেরকে পাঠ দান শুরু হয়। মুসলমানগণ 'আধুনিক' হওয়ার সুযোগ পান। এভাবে মুসলিম জাতিকে তারা এমন এক শিক্ষা দেওয়া শুরু করলেন, যা কুরআন ও হাদীস এর অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছু ছিল না । প্রকৃতপক্ষে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি তারা কুরআন ও হাদীস থেকে শেখার কথা ছিল তা এখন তারা ইংরেজদের মাধ্যমে শিখছে। এই শিক্ষাই তাদেরকে এমন এক দুর্বল চেতা, গোলাম জাতিতে পরিণত করল যারা ইসলামী লেবাস নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হয়, কিন্তু যা মুখে বলে বাস্তবে তার উল্টো করে। কারণ শাসক গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখতে না পারলে তাদের জীবন-জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলস্বরূপ মুসলিমদের মধ্যে মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, আমানতের খিয়ানত বেড়ে গেল। ইংরেজরা খুব চতুরতার সাথে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে ধ্বংস করে সেখানে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী চেতনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

উপনিবেশবাদীগণ যে প্রক্রিয়ায় মুসলিমদের চরিত্র কলুষিত করতে সক্ষম হয় তা স্পষ্ট করার জন্য আমরা বর্তমানের রোহিঙ্গা, ফিলিস্তিনি, কাশ্মীরি, ঝিনঝিয়াংবাসী, আফগানি প্রভৃতি দুর্ভাগা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উদাহরণ দিতে পারি যারা নিজ দেশ থেকে উচ্ছেদের শিকার ও বাস্তুচ্যুত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদের পক্ষে উন্নত জীবন যাপন করা, উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করা, অভাব ও অপুষ্টির কারণে এমনকি স্বাভাবিক জীবন পরিচালনাও সম্ভব হচ্ছে না। তারা তাদের সন্তানদের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে ন্যূনতম খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলেও পড়ালেখার পরিবেশ তাদের নেই। আর যদি কেউ কঠোর সাধনা করে পড়ালেখা শেখেও তার জন্য কোনো স্বীকৃতি বা চাকুরির ব্যবস্থা নেই। কোনো সরকারি

চাকুরি লাভ করা বা কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরির জন্য জাতীয়তা, স্থায়ী ঠিকানা প্রভৃতি প্রয়োজন; কিন্তু তাদের সেই সৌভাগ্য নেই। এরা যখন স্বাভাবিক ন্যায্য পাওনা বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তখন তীব্র হতাশা থেকে হিংসাত্বক কাজে জড়িয়ে পড়া বিশেষত তাদের পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে স্বাভাবিক। বর্তমানে রোহিঙ্গাদের একটি অংশ হতাশ হয়ে মাদক গ্রহণ করে এবং মাদকের চোরাচালান করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তাদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা খুব কঠিন বিষয়। যে কোনো জাতির ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। আমেরিকান, আফ্রিকান ও ইউরোপীয় কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে শ্বেতাঙ্গদের আচার-আচরণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কৃষ্ণাঙ্গদের সমঅধিকার আদায়ের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজও অনেক দেশে চাকুরিতে, শিক্ষায় এবং বিভিন্ন স্থানে বর্ণবৈষম্য করা হয়। এসব বৈষম্যের শিকার মানুষ মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল ও হতাশা নিয়ে বেড়ে উঠে এবং তাদের পক্ষে সততার অনুশীলন কঠিন হয়ে পড়ে।

কার্ল মার্কস এ কারণেই ধর্ম ও নৈতিকতাকে প্রগতির প্রতিবন্ধক মনে করেন।[৩৯] এই দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতাকে পুঁজিপতির অস্ত্র হিসেবে অভিহিত করে তিনি যথার্থ মন্তব্য করেছেন। যারা মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের কাছে সততার মূল্য অর্থহীন, যাদেরকে নিজ দেশ থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়, বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাদেরকে ভালো মানুষ হওয়ার উপদেশ দেওয়া উপহাস ছাড়া কিছু নয়। খ্রিষ্ট ধর্ম ইসলামের মতই ঐশী ধর্ম ছিল, এর ভুল ব্যাখ্যার জন্যই শোষক, রাজা ও পুঁজিপতির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। নিটশের মতে এটি দাস নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। কিন্তু ইসলাম কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়। উমরের সময় দুর্ভিক্ষ হলে চোরের হাত কাটার শাস্তি স্থগিত রাখা হয়, কারণ মানুষের বস্তুগত অভাব দূর না করে মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বস্তুত উপনিবেশবাদীগণ এভাবে মুসলমানদের ইসলামী চেতনা ধ্বংস করে সেখানে খ্রিষ্টানদের মত 'দাস নৈতিকতার' উদ্ভাবনে সফল হয়, যা নেতাদের জন্য এক রকম আর সাধারণের জন্য ভিন্ন রকম।

গ. বর্তমান আক্রমণসমূহ

বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব এক কঠিন দুঃসময় অতিক্রম করছে। টুইনটাওয়ারে বোমা হামলার দুই দশক পূর্ণ হলেও ইসলামের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের দ্বিমুখী নীতিতে পরিবর্তন হয়নি। মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে পশ্চিমারা যে অস্ত্র ব্যবসা করছে তা যুদ্ধবাজ নেতারা বুঝতে পারছেন না। একসময় তালেবানদের সমর্থন করে, এরপর এদের বিরুদ্ধে বিশ বছর লড়াই করে নিজেদের চলে যাওয়ার মাধ্যমে নতুন মাত্রায় ওদেরকে স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করে বিশ্বশক্তিসমূহ। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যকে সবসময় ব্যতিব্যস্ত রাখছে এবং একে অপরকে হুমকি, আত্মরক্ষার স্বার্থে লড়াই ইত্যাদিতে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে পাশ্চাত্য বিশ্ব। সবসময় এভাবে যুদ্ধাংদেহী মনোভাব রাখা এবং জনগণকে এসব বিষয়ে ব্যস্ত রেখে স্বৈরশাসকরা নির্বিঘ্নে রাজত্ব করে যাবেন এরিস্টটলের উপস্থাপন করা এই কৌশল প্রয়োগে তাদের ভুল হয় না।

সুয়েজখাল খননের মাধ্যমে পাশ্চাত্য মুসলিম বিশ্বে ব্যবসায়িক, সামরিক, প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সুবিধা পেয়েছে। এজন্য মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম বিশ্বকে যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করার বাড়তি একটি সুবিধা তারা

পেয়ে যায়। চীনে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের আগে প্রায় তিনশত বছর কিঙ রাজবংশের রাজত্বকালে পান্থাই ও হুই বিদ্রোহ দমনের সময় কয়েক কোটি মুসলিমকে গণহত্যা করা হয়। বর্তমানে ঝিনঝিয়াংবাসী মুসলিমদের উপর চলে বিভিন্ন ধরনের নিষ্পেষণ ও নির্যাতন।[৪০] এভাবে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মুসলমানদের উপর একদিকে চরম নিপীড়ন অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলোকে একটির বিরুদ্ধে অন্যটিকে লেলিয়ে স্বার্থ হাসিল করছে বর্তমান সভ্যতার পরাশক্তিগুলো।

পাশ্চাত্যের নৈতিক সততার কারণ

মুসলমানদের অধঃপতনের সাথে সাথে আমাদের এটাও জানা দরকার কী কারণে তারা মুসলমানদের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে অধিকতর সততার পরিচয় দিয়ে থাকেন। পাশ্চাত্য জগৎ তথা সমগ্র বিশ্বে এখন খ্রিষ্টধর্মের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। তাদের মধ্যে বর্তমানে যতটুকু সততা দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে সেই সততার কারণেই তারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পবিত্র কুরআন ইহুদীদের চেয়ে খ্রিষ্টানদেরকে বেশি বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেছে।

> আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টান বলে। এর কারণ তাদের মধ্যে আলেম ও দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না। (৫: ৮২)

যদিও এটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে, তবে এর বিধান সবসময় কার্যকর হবে যদি সে ধরনের লোক থাকে। এখানে নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টানের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমত, তাঁরা আলেম বা জ্ঞানী হবেন, যার ফলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে পারবেন এবং একই সাথে বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও উন্নত হবেন। দ্বিতীয়ত, তাঁদের অনেকেই আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা করবেন। তৃতীয়ত, তাঁরা অহংকারী হবেন না। এটি আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে সার্বিক নিয়ম। যে বিনয়ী হবে সে সম্মান, মর্যাদা ও কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে আর যে অহংকার করবে সে যত বড়ই হোক তার পতন অনিবার্য– এটি মানবেতিহাসেরও সার্বিক নিয়ম। মহানবী (স.) তাদের নৈতিকতা, রাজত্ব ও বিশ্বপরিচালনার ব্যাপারে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। যেমন,

> তাদের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য আছে: (১) দুর্যোগের সময় তারা সর্বাধিক ধৈর্যের পরিচয় দেয়, (২) বিপদাপদের পর দ্রুত তারা স্বাভাবিক হয়ে উঠে, (৩) পলায়নের পর অতি দ্রুত তারা পাল্টা আক্রমণ চালায়, (৪) মিসকীন, ইয়াতীম ও দুর্বলের জন্য তারা সর্বাধিক কল্যাণকামী। তাদের পঞ্চম সুন্দর হৃদয়গ্রাহী গুণটি হলো: রাজন্যবর্গের যুলম প্রতিহতকরণে তারা অধিক তৎপর।[৪১]

অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীগণ প্রাচীনকাল থেকেই এই ধরনের মৌলিক কিছু গুণের অধিকারী ছিলেন যার কারণে তারা পৃথিবীতে প্রায় এক হাজার বছর ধরে (১৪৫৩ পর্যন্ত) নেতৃত্ব দেন। কিন্তু তাদের এই পরাজয় কেবল সামরিক পরাজয় ছিল। এই সময় ইউরোপজুড়ে খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে নিজেদের ভেতর থেকেই ধর্মসংস্কার আন্দোলন সৃষ্টি হয়। কনস্টানটিনোপল (ইস্তাম্বুল) ছেড়ে সেখানকার পণ্ডিতগণ ইতালিতে চলে আসেন। ইতালিতে তাঁদের মাধ্যমে জ্ঞানের রাজ্যে নতুন ঝড় সৃষ্টি হয়। এছাড়াও ফ্রান্স, বৃটেন, স্পেন,

পর্তুগালসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রে নব জাগরণের স্রোত শুরু হয়। বাইবেলের বিভিন্ন বাণীর সাথে নতুন বিজ্ঞানের তত্ত্বের পার্থক্যের কারণে গীর্জা কর্তৃপক্ষের সাথে প্রচণ্ড বিরোধ হয়। রাজা ও পোপের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে।

কিন্তু মহানবীর বাণী অনুযায়ী তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আবার রাজত্বে ঘুরে দাঁড়ায়। অর্থাৎ মাত্র ৪০ বছরের মাথায় ১৪৯২ সালে স্পেনে আরব ও মুসলিমদের উৎখাতের মাধ্যমে কনস্টানটিনোপল পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। খ্রিষ্টানগণ ব্যাপকভবে তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থকে বিসর্জন দেয়নি, যতটা দিয়েছে মুসলমানগণ তাদের কুরআনকে। তারা বাইবেলের নৈতিক বাণীগুলো মেনে চলার চেষ্টা করেন। মহানবী (স.) এজন্যই তাদের প্রশংসা করেন। পবিত্র কুরআনেও খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে মিথ্যাচার বা ষড়যন্ত্রের বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়নি যতটা ইহুদীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

এজন্য পাশ্চাত্য জগতে সততার দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়, যদিও তা নিজ দেশসমূহের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী। কিন্তু এর অর্থ মুসলমানদের অনৈতিক কাজের বৈধতা দেওয়া নয়। বরং মুসলমানগণ যে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে, সেই ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছে খ্রিষ্টানগণ। ইংরেজি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেন আমেরিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন। সততার যে দৃষ্টান্ত তিনি আমেরিকানদের জন্য রেখে যান তা ইতিহাসে বিরল। ইসলামের প্রতি তাঁদের এক ধরনের ভালোবাসা আছে যদিও তারা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। ইসলাম যে মানবতার বাণী প্রচার করেছে, আজ সে বাণী খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে বেশি প্রচার হচ্ছে।

তাদের সততার আরেকটি কারণ হচ্ছে, তারা কখনও মুসলিমদের মত নির্যাতনকারী-উপনিবেশবাদী শাসনের অধীন ছিল না। পৃথিবীর মুসলিম-অমুসলিম অনেক রাষ্ট্র এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও প্রায় তিনশত বছর বৃটিশ উপনিবেশের অধীন ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম ও কৃষ্ণাঙ্গদেরকেই এই বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল। এমনকি আমেরিকার স্বাধীনতার প্রায় একশত বছর পর জঘন্য ক্রীতদাস প্রথাকে বাতিল করা হয়েছে, যার শিকার ছিল অনেকাংশেই আফ্রিকার অসহায় কৃষ্ণাঙ্গ ও মুসলিমগণ। অন্যদিকে, মুসলিম শাসকদের চরিত্র যতই খারাপ হোক না কেন হাজার বছরের মুসলিম শাসন এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তারা ইহুদী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দুসহ অন্য যত ধর্মের মানুষের উপর শাসন করেছেন কখনও তাদেরকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করেননি, দাস ব্যবসা করেননি, কৃষ্ণাঙ্গ বা দলিত শ্রেণির কাউকে 'দলিত' দৃষ্টিতে দেখেননি, কোনো ধর্মের নিজস্ব বিশ্বাসের উপর আঘাত করেননি। প্রায় একশত বছর পর জেরুযালেম উদ্ধারের পর নিপীড়নকারী খ্রিষ্টানদের উপর স্বাভাবিক ও ন্যায্য প্রতিশোধেরও চেষ্টা করেননি, বরং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিলেন সিংহ-হৃদয় সালাহউদ্দীন আইয়ুবী। ভারতীয় উপমহাদেশ, চীন, ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূভাগ শাসনকালীন সময়ে অমুসলিমদের উপর জোর করে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার, অবিচারের বা গণহত্যার মত ঘটনা ঘটেনি। কোনো জায়গায় অমুসলিমদের জোরপূর্বক কাজ করিয়ে মূল্য না দেওয়ার ঘটনা ঘটেনি। যুদ্ধকালীন সময়ে উভয় পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি যা হয়েছে, বিজয়ী হওয়ার পর কোনো প্রতিশোধ তাদের

কাছ থেকে নেওয়া হয়নি। জার্মান শাসকদের কারণে আধুনিক বিশ্বে পর পর দুটি মহাযুদ্ধ ঘটে, যার চড়া মূল্য জার্মানিদের দিতে হয়েছে। কিন্তু মুসলিম শাসকগণ যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে কোনো পরাজিত সৈনিকের বা নাগরিকের উপর প্রতিশোধ নেননি। এভাবে পাশ্চাত্যবাসীগণ উপনিবেশবাদী গোলামি শাসনের হাত থেকে বেঁচে যায়, যে অমানবিক নির্যাতন মুসলিমদের নারী-পুরুষ-শিশু-সৈনিক-রাজন্যবর্গের উপর করা হয়েছে তা থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন।

তবে বর্তমানে তাদের কিছু লোক যারা বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের মাধ্যমে তাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের জাতির ভেতর এখনও মুসলিম জাতির অনেকের চেয়ে বেশি নীতিবান মানুষ আছেন। আল্লাহ এই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণে তাদেরকেই নিয়োজিত রাখেন, যারা একে ভাঙ্গার পরিবর্তে গড়তে পারে বেশি।

ইসলামী নৈতিকতার বিরুদ্ধে আপত্তি ও জবাব

যারা ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন সে সব প্রশ্ন একই সাথে নৈতিকতার ব্যাপারেও করে থাকেন। এখানে এমন কিছু আপত্তির আলোচনা ও সেগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হবে । যদিও বিভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গক্রমে এ আলোচনা এসেছে।

সবচেয়ে জটিল প্রশ্নটি হচ্ছে এ যুগে ধর্মের প্রয়োজন আছে কি না। ধর্ম ভিত্তিক নৈতিকতা, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সুবিচার বা পরার্থপরতার কী অর্থ থাকতে পারে, যখন মানুষ নিজেরাই বাস্তব প্রয়োজনে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারছে? আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেখানে অর্থনীতির শিখরে অবস্থান করছে, মানবিক সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, নারীর প্রতি সমান অধিকার অর্পণ করা বাড়ছে এবং মানুষ দুর্নীতি, চুরি, মিথ্যাবাদিতা থেকে বেঁচে থাকছে; অথচ এগুলোর পেছনে তাদের ধর্মের ভূমিকা নেই বা থাকলেও অতি নগণ্য। তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব হয় না। আনন্দ বিনোদনসহ সব ধরনের নাগরিক সুবিধা তারা পাচ্ছেন। এই অবস্থায় ইসলামের মত একটি প্রাচীন ধর্ম বরং তাদের দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতাই নষ্ট করবে।

এর জবাব দেওয়া কঠিন হলেও সন্তোষজনক একটা অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব। প্রথম কথা হচ্ছে, ইসলাম যে কোনো সমাজের সামাজিক মূল্যবোধসমূহকে সম্মান করতে শেখায়। ধর্মের অনুসরণ ও বাধ্যবাধকাত ছাড়াই ইউরোপের প্রায় সবকটি রাষ্ট্র তাদের অর্থনীতিকে উন্নত করতে পেরেছে এবং সর্বোচ্চ নাগরিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের পছন্দনীয় জীবনধারার অনুসরণ করছে। এ অবস্থায় ইসলামের ভূমিকা হবে আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক শান্তি বজায় রাখা। মহানবী (স.) যে সমাজে প্রথম ইসলামের আহবান জানিয়েছিলেন, তারা তখন মহানবীর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তাদের বক্তব্যও ছিল এধরনের যে, এই নতুন ধর্ম তাদের সামাজিক সম্পর্কগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে: পিতা পুত্রের দ্বন্দ্ব, ভাই বোনের বিরোধ, স্বামী-স্ত্রীর কলহ সব ইসলামের কারণে হচ্ছে। এই ছিল একটি সমাজের চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে আরেকটি সমাজ ছিল, যারা কুরআনের বাণী শোনার সাথে সাথেই অশ্রুসিক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে

বলে বসল, "আমাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে, কেন আমরা সত্যকে মেনে নেব না?" এরা মহানবীকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান দেখিয়েছেন, কোনো বিরোধিতা না করেই। সালমান ফারসী, আবু যর গিফারীর মত আরো অনেকে দূর দূরান্ত থেকে সত্যের সন্ধানে অনবরত ভ্রমন করতে করতে মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেন, এবং তাঁদের জীবনকে ধন্য করেন।

মহানবী (স.) নিজেই বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ইসলাম পূর্বে যুগে উত্তম তারা ইসলাম পরবর্তী যুগেও উত্তম, যদি তারা ইসলামকে বুঝতে পারে"।[৪২] বর্তমান ইউরোপের লোকদের মধ্যে যারা সত্যকে উদার মন নিয়ে দেখেন, তাদের নিকট ইসলাম আদৌ কোনো হুমকি নয়। বরং তাদের জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী নাগরিকগণ মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত সৌহার্দমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে পছন্দ করেন। তারা ইসলামের নবীকে অধ্যয়ন করেন এবং নবীর জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নেন। কিন্তু হান্টিংটনের তত্ত্বের মাধ্যমে ভীতিসৃষ্টিকারী একটি শ্রেণি আছেন যারা ইসলামের নবীকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন আঁকার মাধ্যমে বরং অহেতুক জাতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকার মুসলিমগণ পাশ্চাত্যের সাথে গভীর বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করেন।

ড. মরিস বুকাইলি উল্লেখ করেন, ভ্যাটিক্যানের "নন-ক্রিশ্চিয়ান অ্যাফেয়ার্স" দফতরের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল পিগনেডোলি ১৯৭৪ সালের ২৪ এপ্রিল সরকারি সফরে মহামান্য পোপ চতুর্থ পলের একটি বাণী সৌদী আরবের মহামান্য বাদশাহ ফয়সালের কাছে পৌঁছান। পোপ তাতে বলেন, "তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, এক আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে ইসলামী বিশ্ব ও খ্রিষ্টান জগৎ ঐক্য গড়ে তুলতে পারে"।[৪৩] মাইকেল এইচ. হার্ট একশত মনীষীর তালিকায় মহানবী (স.)কে সবার উপর স্থান দিয়ে মূলত ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহাবস্থানপূর্ণ বিশ্বেরই কল্পনা করেছেন। বর্তমানে ইহুদী রাব্বীদের বড় একটি অংশ ফিলিস্তিনে সহাবস্থান ও সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। মুসলমানগণ ইহুদীদেরকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে মনে করলেও আসলে কিন্তু তা নয়, বরং ইসরাইলি আরব মুসলিমদের প্রতি অনেক ইহুদীর রাজনৈতিক সমর্থনও বিদ্যমান রয়েছে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় কিছু ধ্বংসকর প্রভাব এবং একই সময় সমাজবাদী আক্রমণ- উভয় অর্থব্যবস্থাকেই পরস্পর প্রভাবিত করে। এজন্য পুঁজিবাদের ভেতর বর্তমানে সাম্যবাদী মানসিকতা যেমন দেখা যায় তেমনি সমাজবাদও তাদের চরম আদর্শ ত্যাগ করে পুঁজিবাদ থেকে ভালো জিনিসগুলো গ্রহণ করার পক্ষে অবস্থান নেয়।

মোট কথা ধর্মের নামে চরম বিদ্বেষভাব এখন অনেকটা শিথিল হয়ে আসছে, বরং প্রতিটি ধর্ম অন্য ধর্মের ব্যাপারে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে একবিশ্ব ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ইসলামের এক্ষেত্রে হতাশার কিছু নেই। নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলার পর বর্তমানে দুই দশক পার হয়ে যায়। তৎকালীন সময় পাশ্চাত্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা শুরু হয়েছিল, এই ঘৃণা থেকে তখন তারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠে, যার ফলে তাদের গবেষণায়, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বই আবার প্রকাশ পায়।

ইসলামের ব্যাপারে আরেকটি আপত্তি হচ্ছে, ইসলামী নৈতিকতার বাণী আসলে তত্ত্ব ছাড়া কিছু নয়। কারণ, বিগত দেড় হাজার বছরে মহানবী (স.)এর নিজের সময় বাদ দিলে মাত্র অল্প কয়েক বছরের শাসনেই ইসলামী রাজনীতি বা নৈতিকতার পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখা যায়; বাকী সময় তারা সাম্রাজ্যবাদী আচরণই করে। তাছাড়া উমরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণেই এই বিরল ইতিহাস তৈরি হয়েছে, যা বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি ঘটে। সুতরাং সাধারণভাবে ইসলামী নীতিদর্শন বা জীবনদর্শন এক কাল্পনিক বিশ্বাস।[৪৪] তাছাড়া উমরের সময়ও সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মানব সভ্যতার ইতিহাসে এত বড় বিপ্লব সাধন করেছে যা অন্য কোনো মতাদর্শের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মহানবী (স.) যে সব সোনার মানুষ নিজ হাতে গড়েছিলেন, তাঁদের মত মানুষ পৃথিবীতে আর আসবেন না, এ কথা ঠিক। তবে কুরআন ও মহানবীর জীবনাদর্শ বেঁচে থাকতে ইসলামের আদর্শ কখনো বিকৃত হবে না। তারিক রমাদান বলেন, ইসলামের মধ্যে এমন এক শক্তি বিদ্যমান, যা তাকে পৃথিবীর যে কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার মূল আদর্শসহ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।[৪৫] বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে বরং তা আরো সহজতর হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের এক দীর্ঘ সময় মুসলিম রাজা-বাদশাহগণ পৃথিবী শাসন করলেও পরিপূর্ণ ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে তারা সচেষ্ট ছিলেন না। এর প্রধান একটি কারণ হচ্ছে, মুসলিমগণ তাদের রাজনৈতিক বিজয়ে যত দ্রুত সফলতা অর্জন করেছেন, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে তত দ্রুত সফলতা পাননি। মানুষের মন মস্তিষ্কে হঠাৎ করে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। হঠাৎ যুদ্ধ জয় সম্ভব কিন্তু মানুষের বিশ্বাসের পরিবর্তন, প্রচলিত প্রথা বা কুসংস্কার দূর করা সহজ নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমগণ প্রায় সাতশত বছর শাসন করলেও হিন্দুদের "সতীদাহ" এর মত ঘৃণ্য ও জঘন্য সামাজিক প্রথাকে তারা পরিবর্তন করতে চাননি এবং তারা সেই চেষ্টাও করেননি, কারণ হিন্দুরা তাদের কাছে এর বিরুদ্ধে আপত্তি করেননি। এভাবে উদারতার পরিচয় দেওয়ার কারণে ইসলামের উপর আঞ্চলিক প্রভাব পড়ে। তবুও একথা সত্য এই শাসন ব্যবস্থায় তারা কুরআনকে পরিবর্তন করতে চাননি, বরং কুরআনের মূলনীতি অনুযায়ী যাবতীয় বিচার ফায়সালা করার চেষ্টা করেন। মুসলিম সমাজের মধ্যে ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ ও কাজে কর্মে বাস্তব অনুসরণের চেষ্টাও ছিল বিদ্যমান। ঔপনিবেশিক শাসনামলের মাধ্যমেই মূলত মুসলিমদের চরিত্রে পরিবর্তন আসে সবচেয়ে বেশি।

আধুনিক সমাজবাদী সভ্যতার পক্ষে কিংবা ইউরোপের উদারতাবাদী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে যতটুকু স্থায়ী পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল, তা কিন্তু হয়নি। বরং তাদের মধ্যে যান্ত্রিকতা ও ভোগ বিলাসের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গ্রিক দর্শনের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে ইউরোপের রেনেসাঁ ঘটলেও তা ছিল দুর্বল ভিত্তি। অন্যদিকে ইসলামী নীতি আরো প্রাচীন এবং এর ভিত্তি হচ্ছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে সুবিচার প্রতিষ্ঠা। এ কারণে ইসলাম সব সময় পরার্থবাদী মতের পক্ষে অবস্থান নেয়।

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক অবস্থান, তাদেরকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ রাখা, চাকুরিতে সমান সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদি ইসলামী সাম্যবাদী নীতির বিরুদ্ধাচরণ বা স্ববিরোধী নীতি। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগও

সঠিক নয়। ইসলাম নারীদেরকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কখনো বৈষম্য করেনি। তাদের কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করলেও তাদের প্রতি যথাযথ সুবিচারের বিপরীত কোনো কিছু ইসলাম সমর্থন করে না।

এক্ষেত্রে আমরা ইসলামের পারিবারিক নীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। সন্তানকে উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে 'মা' এর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ইসলাম সবচেয়ে বেশি বলেছে, যা আধুনিক মনোবিজ্ঞানও স্বীকার করে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তাতে তাদের প্রকৃত মুক্তি মিলেনি, বরং তাদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতিযোগী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়; যার ফলে তাদের ব্যক্তিগত জীবন বড় কষ্টকর হয়ে উঠেছে, পারিবারিক কলহ, সহিংসতা, বিবাহ-বিচ্ছেদ সেখানে খুব স্বাভাবিক। ইসলাম নারীকে তার প্রাকৃতিক দায়িত্ব পালনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়, কিন্তু যদি নারীর কঠোর পরিশ্রম ছাড়া বিকল্প উপায় না থাকে, তাহলে তাকে সেক্ষেত্রে পেশা বাছাইয়ের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্রে ভিন্নতার মাধ্যমে পুরুষ বা নারীর ব্যক্তিত্ব, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথকে বরং আরো মযবুত করেছে।

সামগ্রিক দিক থেকে বিবেচনা করলে প্রমাণিত হয় ইসলামী জীবনদর্শন কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করেনি। কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়নি, বরং বিশ্বজনীন সুবিচার নীতির ভিত্তিতে প্রচলিত সমাজ কাঠামো এবং নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায়। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় নারী-পুরুষ ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব দূর করে সমাজকে আরো গতিশীল করলে সম্ভবত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন অধিকতর তরান্বিত হত।

অধঃপতন থেকে উত্তরণ

মুসলিম জাতির এই অধঃপতন থেকে উত্তরণ সম্ভব কি না এমন একটি প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা শুরু হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, ইসলাম মানেই হচ্ছে বিশ্বাসের সাথে সাথে নৈতিকতার বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করা। অর্থাৎ ধর্ম হিসেবে যদি ইসলাম থাকতে পারে তবে ইসলামী নৈতিকতারও পুনরুত্থান সম্ভব। ইকবাল এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁর "ধর্ম কি সম্ভব?" এমন একটি বক্তৃতায়। তিনি সহজে যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, যদি অধিবিদ্যা সম্ভব হয় তাহলে ধর্মও সম্ভব। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন ধর্মের অনেক ত্রুটি এবং একই সময় ত্রুটিপূর্ণ ধর্মের প্রতি মানুষের হতাশা এখন স্পষ্ট। ইসলামের আগে মানবজাতির জন্য প্রেরিত ধর্ম খ্রিষ্টধর্মের গভীর উপলব্ধির জন্য যে যুগ প্রয়োজন ছিল; সেই যুগ এখন বর্তমান নেই। মানুষের তখন বস্তুবাদের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক দীক্ষার প্রয়োজন অনেক বেশি ছিল। সংসারবিরাগী হওয়ার শিক্ষা তখন যথার্থ ছিল। কিন্তু সে অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটেই মানব সভ্যতায় ইসলামের আগমন ঘটেছে। খ্রিষ্টধর্মের ব্যর্থতার কারণে পাশ্চাত্য জগতের অনেক যুক্তিবাদী মানুষ ধর্ম থেকেই সরে যায়। ইসলামের মধ্যে এমন এক আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের মিলন হয়েছে যা অন্য কোনো ধর্মে নেই। তাই মানবজাতি ইসলামের মর্মবাণী

জানলে উত্তরণের পথ সহজে খুঁজে পেত। এজন্যই আশাবাদী ইকবাল মনে করেন, বিশ্ব মানবতাকে এক করার মত কোনো কিছু যদি থাকে তা কেবল ধর্মের মধ্যেই আছে।[৪৬]

এই ভাঙন রোধ করার এবং পুনরায় মহানবীর আদর্শে ফিরে যাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন ইমাম হোসাইন (রা.) এবং তাঁর সম্মানিত পরিবার ও সহযোগীগণ। আক্ষরিকভাবে তাঁরা এই ভ্রান্তি থেকে কাউকে উদ্ধার করতে পারেননি, কিন্তু চিরদিনের জন্য প্রেরণা হিসেবে নিজেদের পেশ করেন। তাঁর শাহাদাতের বছরই আরেকজন মহামানবের জন্ম হয়, যিনি এ কাজে বেশ এগিয়েছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর কাছে হেরে যান। তিনি হচ্ছেন, দ্বিতীয় উমর নামে পরিচিত উমর ইবন আবদুল আযীয (রহ.)। এই মহাপুরুষ রাজক্ষমতা হাতে পেয়ে জনগণের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন নতুন করে শাসক নির্বাচনের জন্য। জনগণ তখন তাঁকেই নির্বাচিত করে। তিনি আমীর হয়ে রাজদরবারের সমস্ত টাকা-পয়সার মালিকানা জনগণের হাতে দিয়ে দেন। হযরত উমরের মতই ছেড়া কাপড় ব্যবহার করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন তিনি যা বলছেন তা আগেই নিজে করেছেন। এই ধীরস্থির প্রক্রিয়ার সংস্কার কাজে তাঁর একজন তরুণ সন্তান সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। ছেলেকে ডেকে তিনি বললেন,

> বাবা, আমার এই শরীর আমার বাহক, আমি এর সাথে নম্র ব্যবহার না করলে আমার লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাবে না। আমি আমার এই শরীর ও প্রবৃত্তিকে দুর্বল করে ফেললে এ পর্যন্ত আসতে পারতাম না।... আল্লাহ পবিত্র কুরআন গোটা একসাথে নাযিল করতে চাইলে করতে পারতেন। কিন্তু, তিনি তা না করে এক আয়াত বা দুই আয়াত করে নাযিল করেছেন যেন তাদের ঈমান দৃঢ়তা লাভ করতে পারে।[৪৭]

অর্থাৎ ইসলামী নৈতিকতার পুনরুদ্ধারে ধীরস্থির ও দৃঢ়তার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি দুই বছরের সামান্য বেশি সময় (৭১৭-৭২০খ্রি.) খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মারা যান।

উমর ইবন আবদুল আযীযের পর শাসক পর্যায়ের কেউ আর ইসলামী সংস্কারের কাজ করার মত আজ পর্যন্ত জন্ম নেননি। তবে দার্শনিক ও সংস্কারক হিসেবে জন্ম হয়েছিল আল-গাযালীর। তাঁর মত প্রভাবশালী কেউও বিগত এক হাজার বছরের মুসলিম ইতিহাসে আসেননি। তিনিই রাজদরবার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের নৈতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য উদ্দীপনা ও আবেগমূলক পদ্ধতিতে এবং শক্তিশালী দার্শনিক যুক্তির প্রয়োগে বিরাট সাহিত্য রচনা করেন।

হোসাইন নসর বলেন, ইসলামের পুনর্জাগরণ এর নৈতিক ভিত্তিসহ সম্ভব। যারা ইসলামকে একটি প্রচলিত ধর্ম হিসেবে দেখেন এবং এর পুনর্জাগরণ সম্ভব নয় বলেন তাদের ধারণা ঠিক নয়। কারণ, কুরআনের পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই।[৪৮]অক্সফোর্ডের অধ্যাপক তারিক রমাদান মনে করেন, আধ্যাত্মিকতা, ইসলামী শিক্ষার সংস্কার, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং বিকল্প সাংস্কৃতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতাকে আবার বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করা সম্ভব।[৪৯] বিশ্বপরিস্থিতি এখন এমনই এক

বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে আছে, নজরুলের ভাষায় যেমনটি মহানবীর আবির্ভাবের পূর্বের ছবিতে দৃশ্যমান হয়েছিল-

উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়,
কোথায় মুক্তিদাতা কোথায়!
নিপীড়িত মূক নিখিল খুঁজিছে তাহার অসীম স্তব্ধতায়,
বজ্র-ঘোস বাণী কোথায়! (মরু-ভাস্কর)

অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের সমস্যা দূরীকরণে অন্য কেউ নয়, মুসলিম জাতিই তা করতে সক্ষম। তাদের নৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে তারাই সেটি পারবে।

মুসলিম জাতির চারিত্রিক অধঃপতন থেকে উত্তরণে কুরআন মূল সূত্র বলে দিয়েছে, "আল্লাহ কখনো কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে" (১৩: ১১)। "নিশ্চয় কষ্টের সাথে সহজতা বিদ্যমান" (৯৪: ৫)। "মানুষ চেষ্টা ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারে না"(৫৩: ৩৯)। এখান থেকে পবিত্র কুরআনের তিনটি পদ্ধতি প্রমাণিত হয়: প্রথমটি হচ্ছে, মুসলিম জাতিকে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সবার আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । এই সিদ্ধান্ত বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার মত কিছু নয়, বরং নিজেরাই নিজেদের জন্য সিদ্ধান্ত নেবে। দ্বিতীয় আয়াতটিতে বলা হয়েছে, কষ্টের সাথে সাথে সুখ থাকে-এটি মানবজাতির জন্য একটি সাধারণ কর্মপন্থা। যে কোনো মহৎ বিষয় অর্জন করা খুব কঠিন কাজ, কিন্তু সেটির ফল পাওয়ার সাথে সাথে মানুষ কষ্টের কথা আর স্মরণ করে না। বর্তমান মুসলিম জাতিকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য কঠোর শ্রম দিতে হবে। তৃতীয়ত, এই শ্রম সাধনের জন্য সবসময় তাদের তৎপর থাকতে হবে। যে কারণগুলোকে নৈতিক অধঃপতনের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে সেগুলো অপসারণ করার ক্ষেত্রে যদি উপরে বর্ণিত এই তিনটি নিয়ম অনুসরণ করা হয় তাহলে তাদের পক্ষে আবার ফিরে দাঁড়ানো সম্ভব হবে। তবে এর জন্য আরও কয়েকটি বিষয় অপরিহার্য। যেমন: নেতৃত্বের পরিবর্তন, পাশ্চাত্যের সাথে সংলাপ ও সম্প্রীতির আহবান, ইসলাম সম্পর্কে সৃষ্ট ভীতি দূর করা প্রভৃতি। সংক্ষেপে সেগুলোর বর্ণনা করা হলো।

ক. যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি ও একতা

যে কোনো জাতি, মতবাদ বা দলের সফলতার জন্য যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। কুরআনে এসেছে, "তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না"(৩: ১০২)। "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে"। অনেক জায়গায় আল্লাহ একতার বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন যেন মুসলিম জাতির মধ্যে পূর্ববর্তী জাতির মতো বিচ্ছিন্নতা না আসে। কোনো জাতির মধ্যে এই বিভেদ তাদের নেতাদের মাধ্যমেই সূচিত হয়। যদি নেতার মাঝে কোনো পার্থিব স্বার্থ থাকে তাহলে তিনি তার যোগ্যতার মাধ্যমে জাতিকে বিভ্রান্ত করে বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করে নেবেন। মহানবী (স.) তাঁর উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করেন এই অসৎ ও পথভ্রষ্ট নেতৃত্বকে।

> আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি পথভ্রষ্ট নেতাদেরই আশঙ্কা করি। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত (কিয়ামত) আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী অবস্থায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের অপদস্থ করতে চাইবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।[৫০]

বলা নিষ্প্রয়োজন, নেতৃত্ব ছাড়া দলের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মুসলিম জাতিকে মহানবী (স.) এক দেহের সাথে তুলনা করেছেন, যার একটি অঙ্গের ব্যথা সম্পূর্ণ দেহকে যন্ত্রণা দেয়। অর্থাৎ তারা পরস্পর সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রাখবে। যিনি তাদের নেতা হবেন তাকে নিয়ে অন্যরা কোন্দল করবে না, বরং তার সহযোগিতা করবে। তিনজন ব্যক্তি কোথাও বের হলে তাদের মধ্যে একজনকে মহানবী (স.) নেতা নির্বাচন করতে বলেছেন । তিনি আরও বলেন,

> তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করো। বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান। কেননা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সাথে শয়তান থাকে এবং দুইজন থেকে সে অনেক দূরে থাকে। যে ব্যক্তি বেহেশতের সর্বোত্তম স্থান কামনা করে সে যেন (মুসলিম সমাজে) একতাবদ্ধ হয়ে থাকে। যার নেককাজ তাকে আনন্দিত করে এবং পাপ কাজ তাকে ব্যথিত করে সেই হচ্ছে প্রকৃত ঈমানদার।[৫১]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে যাবে"।[৫২] অর্থাৎ ইসলাম মানবজাতির ঐক্যের কথা যেমন বলেছে তেমনি তার বাস্তবায়নে দৃঢ় নেতৃত্বের কথাও বলেছে। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কোনো ধরনের বিকৃতি না ঘটায় খিলাফতে রাশেদার যুগের পর আবার ইসলামের বাস্তবায়নের সম্ভাবনা সবসময় বিদ্যমান আছে।

নেতৃত্বের কারণেই নৈতিকতার উত্থান ও পতন হয়। যদি কোনো জাতির মধ্যে অসৎ নেতৃত্ব স্থায়ী থাকে তাহলে ঐ জাতির ভালো ও সৎলোকদের সমস্ত অবদান ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি কেউ সেখানে সৎকাজ করলে তার প্রতিদান হয় কারাগারে অন্তরীণ হওয়ার মাধ্যমে। কারণ নেতা তার দুর্নীতির জন্য সৎলোকদেরকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাই কোনো দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রে সততার বিকাশ ঘটানো কঠিন কাজ। মহানবী (স.) এজন্যই ইসলামী নেতৃত্বকে কুরআনের আলোকে সাজাতে বলেন। যখন কোনো জাতির নেতাগণ কুরআনের আদর্শকে ধারণ করবেন এবং রাসূল (স.)এর অনুসরণকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নেবেন তখন তারা মানুষের জন্য আদর্শ হয়ে যাবেন। তাদের দেখে দুর্নীতিবাজরা ভীত প্রকম্পিত হবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে। সুদৃঢ় নেতৃত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়। দুর্বল রাষ্ট্রের অর্থনীতি, বিচার, শাসন ভালো হয় না। ইসলামী নৈতিকতার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন অনুকূল শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা। একটি তত্ত্ব যতই সুন্দর বা মহৎ হোক না কেন, অনুকূল পরিবেশ ছাড়া তার বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। বৃটেনে যেমন রাশিয়ান আইন চলে না, তেমনি রাশিয়াতেও বৃটিশ আইন চলে না। এজন্য ইসলামী নৈতিকতার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হলে সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজকেও সমান্তরালে এগিয়ে নিতে হবে।[৫৩] মহানবী (স.) যাঁদেরকে তের বছর ধরে গড়ে তুললেন তাঁরা যখন মদীনার ইসলামী সমাজ

ব্যবস্থায় নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গেলেন তখনই তাঁদের প্রকৃত সৌন্দর্য দেদীপ্যমান হয়ে প্রতিভাত হয়।

খ. পারিবারিক ভিত্তি

বর্তমান আধুনিক সমাজব্যবস্থায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরিবারের প্রতি অবহেলা দেখানো হচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি, পারিবারিক পরিবেশ শিশুর চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। ইসলাম এখান থেকেই কাজ শুরু করতে চায়। একজন পুরুষ বা নারীর বিবাহের মাধ্যমে যে সংস্থাটি গড়ে উঠে, সেই সংস্থার সভ্য হওয়ার জন্য ইসলাম প্রথম উপদেশ দিয়েছে তার নিজের ধার্মিক হওয়া, তারপর ধার্মিক পাত্র/পাত্রীর সন্ধান করা। বিয়ের পর সন্তানের জন্য কামনা বাসনা সবার মধ্যে থাকে। কিন্তু কেমন সন্তান চান বাবা-মা? সহজ কথায়, যে বাবা-মায়ের অবাধ্য হবে না ও কষ্ট দেবে না এবং ভালো মানুষ হবে। এজন্য সন্তান জন্মের আগেই আল্লাহর কাছে 'সৎ সন্তান' এর জন্য প্রার্থনা করতে হয়। কোনো বাবা-মা বলতে পারেন না তার সন্তান কি বিকলাঙ্গ হবে, নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন হবে, নাকি সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে। একইভাবে, সৎ হবে নাকি অসৎ হবে তাও কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কোনো ডাক্তার, শরীরতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না গর্ভের সন্তানের স্বভাব-চরিত্র কেমন হবে। এজন্য আল্লাহর সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। মুসলিম জাতি সেই চেতনা ফিরে পেলে তাদের ঘরে আবার মহামানবের জন্ম হবে।

ধর্মের যে আত্মিক অনুভূতির দিক তার বিকাশও ঘটে পরিবার থেকে। আবদুল কাদের জিলানী, বায়াযীদ বুস্তামীর জীবনে দেখা গেছে তাঁদের মা তাঁদের জন্য কি মহান আদর্শের শিক্ষা দিলেন। গভীর রাতে যখন সন্তানের জন্য বাবা-মা আল্লাহর কাছে দো'আ করেন আর সন্তান সেটি দেখতে পায় তখন তার ভেতর এক আধ্যাত্মিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয় শৈশব থেকেই। মুসলিম বাবা-মা যদি হতাশায় ভোগেন তাহলে তা বিরূপভাবে সন্তানকে স্পর্শ করবে। খাবারের অভাব থাকতে পারে, কিন্তু যদি সন্তান বুঝতে পারে, ধৈর্যের মাধ্যমে একসময় সফলতা আসে তাহলে সন্তানের মধ্যে সাহস সৃষ্টি হবে, আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। পরিবার থেকেই শিশু তা শেখে।

গ. সংলাপ ও সম্প্রীতির আহবান

বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে যারা ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেন না, তাদের সংখ্যা যারা জানেন তাদের চেয়ে অনেক বেশি। অর্থোপার্জনসহ বিভিন্ন কাজে মানুষের সীমাহীন ব্যস্ততার কারণে স্টাডি করে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক একটা ধারণা গঠন করা অনেকাংশে সম্ভব হয় না। যে সব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু তারা মিডিয়ার মাধ্যমে ইরাক, সিরিয়া বা আফগানিস্তানের আত্মঘাতী বোমা হামলার সাথেই বেশি পরিচিত। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে ইসলাম সম্পর্কে ভীতি দূর করা অন্য মুসলিমদের বড় দায়িত্ব। পাশ্চাত্যের সাথে বিভেদ সৃষ্টি করা বা তাদেরকে শত্রু মনে করা ইসলামী চেতনার কাজ নয়। বরং

পাশ্চাত্যের সমাজে ইসলামকে গ্রহণযোগ্য করতে যুক্তি প্রয়োগ ও উত্তম কৌশল অবলম্বন করাটাই কুরআনের নির্দেশনা।

মহানবী (স.) মানুষকে স্বর্ণ রৌপ্যের খনির সাথে তুলনা করে বলেন, "মানুষ স্বর্ণ রৌপ্যের খনির সদৃশ। তোমাদের মধ্যে যারা জাহিলি যুগে উত্তম তারা ইসলামের যুগেও উত্তম"। বর্তমান পাশ্চাত্যের মুসলিমদের নৈতিকমান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মুসলিমদের চেয়ে উন্নত হওয়ার একটি কারণ যারা পাশ্চাত্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা ইসলাম-পূর্ব জীবনেও সৎ ছিলেন। ইসলামের আলো পেয়ে তারা আরো সুন্দর হয়েছেন। তাদের কাছে ইসলামের বাণী যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য তাঁদের নিজেদের মধ্যেও ব্যাকুলতা ছিল। ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার এই ধারা চলমান আছে, এটিকে যত গতিশীল করা যাবে, ততই অমুসলিমদের ভুল ধারণাগুলো দূর হয়ে যাবে। যেই বিশ্বে মুসলিমরা হাজার বছরের উপর শাসন করেছে; কোনো ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু বা বৌদ্ধের সাথে সহঅবস্থান সত্ত্বেও মারামারি হয়নি, সেটি বর্তমানেও সম্ভব, যদি অমুসলিমদের থেকে ভীতি দূর করা যায়। জর্জ বার্নাড শ এ জন্যই বলেন, "যদি মুহাম্মদের মত একজন নেতা আধুনিক বিশ্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাহলে তিনি সর্বোচ্চ সুন্দর পন্থায় এর সব সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন"।[৫৪] মাইকেল হার্ট মহানবী (স.)কে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সফল ব্যক্তিত্বের তালিকায় প্রথম স্থানে রেখেছেন, যিনি একই সময় ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তি ছিলেন।[৫৫] আধুনিক যুগে ইসলামী নীতিদর্শনের বাস্তবায়নের জন্য এসব মন্তব্য খুব প্রাসঙ্গিক। এজন্য রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় যে কোনো সংলাপ হতে পারে। ইকবাল মুসলমানদের আহবান করেন নতুন করে সেই অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠতে।

জ্ঞান হোক তব বর্ম, - প্রেমের তলোয়ার লও হস্তে ফের
ওরে বে-খয়াল! জান না কি- তুমি খলিফা আমার মাখলুকের?
মুহাম্মদেরে ভালোবাস যদি ভালোবাসা পাবে তবে আমার,
'লউহ-কলম' লভিবে তোমরা- মাটির পৃথিবী সে কোন ছার![৫৬]

আবার যদি ইসলামের মহান সৌন্দর্যকে মানবতার সামনে উপস্থাপন করতে হয় তাহলে ভ্রাতৃত্বের ও ভালোবাসার মাধ্যমেই করতে হবে। এভাবে বিশ্ব জানবে মুসলিম জাতি সন্ত্রাসী নয়, বরং মানবতার প্রেমিক। অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য সবার আগে হাজির হবে একজন মুসলিম। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকার হবে তার জীবনের ব্রত।

মন্তব্য

ইসলামী নীতিদর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি এতক্ষণ আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি তা হচ্ছে ইসলামের সত্যিকার অনুসারীদের মাধ্যমে ইসলামী নৈতিকতার পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব। কারণ হচ্ছে, এর প্রতিটি তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র কুরআন মানব প্রকৃতির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে

মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের পথ দেখিয়েছে যা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ব্যক্তিগতভাবে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন একটি আদর্শবান সমাজ ও সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছে যে সমাজের প্রতিটি সদস্য তাদের শিক্ষক ও নেতার আদর্শকে অনুসরণ করে তা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইসলামী নীতিদর্শনের সার্থকতা এখানেই যে, তা হাজার বছর পরও এমনকি তার প্রতিটি অনুসারীর মৃত্যু বা ধ্বংসের পরও নিজস্ব নৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে যে কোনো পরিবর্তিত সভ্যতায় মানুষের নৈতিক জীবনে নতুন করে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। এর প্রধান কারণ, কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কোনো পবির্তন ঘটেনি। মহানবী (স.) দীনের মধ্যে কোনো নতুন বিষয় (*বিদআত*) সংযোজনকে পথভ্রষ্টতা বলে উল্লেখ করেন। এই কারণে কোনো সৎ উদ্দেশ্যেও ইসলামের বিধানের বিকৃতি ঘটেনি। কুরআন বারবার যে কথাটি বলেছে সেটি হচ্ছে- "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো কীভাবে মিথ্যাবাদীরা ধ্বংস হয়েছে" কিংবা "অপরাধীদের পরিণাম কী ঘটেছে"। এর অর্থ প্রাচীন সভ্যতাগুলোর পতন হয়েছে যে মিথ্যাচার ও অপরাধের কারণে, মুসলিম জাতিও যদি সে পথ গ্রহণ করে তাহলে তাদেরও অনিবার্য পতন হবে।

ফলত তাই হয়েছে। মুসলিম জাতি তাদের কাছে থাকা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের মূল্যায়ন করতে পারেনি। অধঃপতনের গভীরে চলে যায় তারা। যে জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য সে জাতি আজ তার দায়িত্ব পালনে নিষ্ক্রীয়। কুরআন বলেছে, "যদি তোমারা তা না কর তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় এবং বড় ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে"; (৮: ৭৩)। বিগত শতাব্দীতে বিশ্বে জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিসমূহের মধ্যে ভয়াবহ যে দুটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয় ইসলামসহ কোনো ধর্মেরই তাতে প্রভাব ছিল না যেখানে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু, জল-স্থলের, পরিবেশের মহা বিপর্যয় ঘটেছে।[৫৭] এর কারণ প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বের অবহেলা। ইসলামের মাধ্যমে এমন মহাবিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হত। পবিত্র কুরআন ও মহানবীর শিক্ষা ছেড়ে মুসলিমরা যখন অন্য আদর্শ খুঁজতে গেল তখন তারা নিজেরাও ধ্বংস হলো এবং অন্যদেরকেও ধ্বংস করল।

এতক্ষণের আলোচনায় আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, ভবিষ্যত মুসলিম সমাজে যে সব দুর্বলতা প্রকাশ পাবে মহানবী (স.) তাঁর সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি দিয়ে তা যথার্থভাবেই চিহ্নিত করে গেছেন এবং সেখান থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তারও নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। প্রয়োজন সেগুলোর গভীর অধ্যয়ন ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে অনুসরণের চেষ্টা। ইসলামী নৈতিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পরার্থবাদিতা ও পার্থিব ভোগবাদের পরিবর্তে সর্বজনীন মানবতাবাদ। এজন্য যে সমাজে ভোগবাদ, স্বার্থপরতা ও পার্থিব চাকচিক্য প্রবল সে সমাজে ইসলামী নৈতিকতার বাস্তবায়ন কঠিন। যে আধ্যাত্মিক চেতনার কারণে মুসলিম জাতি প্রথম যুগে এত বিরাট বিজয় পেয়েছে সেই তাকওয়ার চেতনা জাগ্রত করতে হবে। অনুষ্ঠান-নির্ভর ইবাদত, কুরবানী আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, আল্লাহ দেখেন কে কতটুকু তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছে। ইসলামী তাসাওউফ শাস্ত্র যেভাবে মানুষের আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করার প্রক্রিয়া অবলম্বনের নির্দেশ

করেছে সেভাবেও নৈতিকতার উচ্চ স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব। আমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি, মানুষের নৈতিকতার জন্য পরিবেশ কতটা দায়ী। সুতরাং ইসলামী নৈতিকতার পূর্ণ বাস্তবায়নে প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। অন্যান্য প্রতিটি মতাদর্শের মত ইসলামের জন্যও প্রয়োজন অনুকূল সমাজ প্রতিষ্ঠা। মহানবী (স.) মক্কার প্রতিকূল পরিবেশে তেরো বছরে ইসলামের অনুসারী সৃষ্টি করেছেন মাত্র কয়েকশত (যদিও নিঃসন্দেহে তাঁরা উন্নত নৈতিকতার সর্বোচ্চ মডেল) আর মদীনার ইসলামী সমাজে মাত্র দশ বছরে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে লক্ষাধিক।

সুতরাং যথার্থ নৈতিক জীবন যাপনের আবশ্যিকতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের এগিয়ে আসতে হবে। নৈতিক জীবন ছাড়া যে প্রকৃত অর্থে ধার্মিক হওয়া যায় না সে বিষয়টিকে মানুষের কাছে বোধগম্য করতে হবে। একজন উঁচুমানের ধার্মিক হওয়ার জন্য অবশ্যই একজন ব্যক্তিকে যথার্থ অর্থে নৈতিক হতে হবে। নৈতিকতা ব্যতিরেকে কাউকে ধার্মিক বা মুত্তাকী বলা যায় না।

তথ্যনির্দেশ

১. *Ahmed Hasan, "Democracy, Religion and Moral Values: A Road Map toward Political Transformation in Egypt", Foreign Policy Journal.* U.S.A, Jul 2, 2011.

২. Bertrand Russell, *Education and Social Order* (London: George Allen & Unwin Ltd.), 1933, p. 17. [It is typical of the difference between Islam and Christianity that the caliph combined within himself both temporal and spiritual authority... Whereas Christianity, by its non-political character was led to create two rival politicians, namely, the Pope and the Emperor]

৩. *Transparency International, https://www.transparency.org*

৪. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country.

৫. A. K. Brohi, *Islam in the Modern World* (Karachi: Cherag e Rah Publications, 1969), p. 27.

৬. মুহাম্মদ ইকবাল, *শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া*, অনু. গোলাম মোস্তফা (ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০০২), পৃ. ২৫।

৭. *Transparency International.*

৮. মুহাম্মদ ইকবাল, *আমুরগানে হেজাজ*, অনু. গোলাম সামদানী কোরাইশী (ঢাকা: আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০৭), পৃ. ৪১।

৯. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, হাদীস নং ২৪০৪।

১০. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২১৮৮।

১১. *নাহজুল বালাগা* (হযরত আলী রা. এর ভাষণ), সম্পাদনা ও অনু. সৈয়দ আলী আহ্সান (ঢাকা: ওয়াদুদ পালিকেশন্স, ১৯৯৮), পৃ. ৩৯-৪০।

১২. মুহাম্মদ ইকবাল, *শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া*,পৃ. ২৫।

১৩. *প্রাগুক্ত*।

১৪. *তিরমিযী*: ২৩৭৭।

১৫. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৩৯৭।

১৬. মুহাম্মদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩।

১৭. ইবন খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, ১ম খণ্ড, অনু. গোলাম সামদানী কোরাইশী (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ৪৯৯।

১৮. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ১ম খণ্ড (ঢকা: ইসলামিক সেন্টার,২০০৯), পৃ. ১১৫।

১৯. https://www.bbc.com/bengali/news-51161269

২০. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তারিখুল খুলাফা*, অনু. ফজলুল হক (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০১২), পৃ. ১৯৭।

২১. মুহাম্মদ শফী, *মাআরেফুল কোরআন* (সংক্ষিপ্ত), অনু. মুহিউদ্দীন খান (মদীনা মোনাওয়ারা: বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৯৯২), পৃ. ৫০১।

২২. *বুখারী:* ৬৪২৫।

২৩. *তিরমিযী*: ২৪৭৬।

২৪. *বুখারী:* ৬৪৩৬।

২৫. *তিরমিযী:* ২৩১৭।

২৬. *নাহজুল বালাগা*, পৃ. ৬২-৬৩।

২৭. Bertrand Russell, *Political Ideals* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1933), p.108.

২৮. *তিরমিযী*: ২৬১৪।

২৯. *বুখারী:* ৭০৫৮।

৩০. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬-৭।

৩১. *তিরমিযী*: ২৬১৫।

৩২. *নাহজুল বালাগা*, পৃ. ৭৪।

৩৩. Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan,1991), p. 182.

৩৪. *তিরমিযী:* ২৩২৩।

৩৫. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২১১৪।

৩৬. ইবন খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, ১ম খণ্ড, অনু. গোলাম সামদানী কোরাইশী (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ৪৮৮-৯৯।

৩৭. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy* (London: George Allen & Unwin Ltd.), 1947, p. 381-2.

৩৮. George F. Hourani, *Reason and Tradition in Islamic Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), p. 3.

৩৯. হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৫৭।

৪০. Graham E. Fuller, *A World without Islam* (London: Little, Brown and Company, 2010), p. 240.

৪১. *মুসলিম*: ৭০১৫।

৪২. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৬৩৮।

৪৩. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান*, অনু. আখতার-উল-আলম (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ৪।

৪৪. মুহাম্মদ কুতুব, *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম*, অনু. আবদুর রাজ্জাক (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ২৯৮।

৪৫. Tariq Ramadan, *Western Muslim and the Future of Islam* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2004), p. 9.

৪৬. Muhammad Iqbal, *op.cit.*, p. 162.

৪৭. ইউসুফ আল কারযাবী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনু. আবদুল খালেক (ঢাকা: আলিফ প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ১৯৬।

৪৮. Seyyed Hossein Nasr, *Traditional Islam in the Modern World* (London: Kegan Paul International, 1994), p. 35.

৪৯. Tariq Ramadan, *op. cit.*, p. 14.

৫০. *তিরমিযী*: ২১৭৬।

৫১. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২১১১।

৫২. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২১৬৭।

৫৩. আবুল হাশিম, "সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামি মূল্যবোধ", *ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬), পৃ. ৫৩।

৫৪. George Bernard Shaw, *The Genuine Islam*, Singapore, 1936, Vol. 1, No. 8.

৫৫. M. H. Hart, *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History* (New York: Carol Publishing Group, 1978), p. 33.

৫৬. মুহাম্মদ ইকবাল, *শিকওয়া ও জবাব ই শিকওয়া*, পৃ. ২৪।

৫৭. Graham E. Fuller, *op. cit.*, p. 182.

৭ম অধ্যায়

উপসংহার

ইসলামী নীতিদর্শনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে এতক্ষণের আলোচনায় আমরা প্রধানত যে বিষয়গুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি সেগুলো হচ্ছে- ইসলামী নীতিদর্শন মানবপ্রকৃতির সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিদর্শন, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম তার নীতিদর্শনকে সুদৃঢ় যৌক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে আর সেই সাথে আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও প্রেম এই নীতিদর্শন বাস্তবায়নে প্রধান অবলম্বন। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা নির্মাণে এই নীতিদর্শনের যেমন ভূমিকা ছিল তেমনি বর্তমান যুগেও এর সেই প্রাণশক্তি ও যোগ্যতা বিদ্যমান আছে। বর্তমান বহুত্ববাদী বিশ্বব্যবস্থায় কোনো একক মতবাদ দিয়ে বা একটি মাত্র উপায়ে সব সমাধানের চেষ্টা করা খুব যৌক্তিক বা যুক্তিসম্মত হতে পারে না। যদিও এ আলোচনায়, আমাদের বিশ্বাস, ইসলামী নীতিদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে তবুও ইসলাম এমন কথা কখনো বলে না যে, অন্য সব ধর্ম ও মতাদর্শকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। মহানবী (সা.) নিজে যেভাবে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে জীবনধারণের সুযোগ দিয়েছেন, তেমনি বর্তমানেও এই পদ্ধতির বিকল্প নেই। আবার একজন মুসলিম হিসেবে তার নিজস্ব নৈতিক পদ্ধতির অনুসরণের ক্ষেত্রে অমুসলিম সমাজব্যবস্থার কাছ থেকে সহযোগিতার আশা করাও অন্যায় হতে পারে না।

আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়টিকে 'ভূমিকা' হিসেবে গ্রহণ করলেও এখানে মূলত নীতিদর্শনের মৌলিক ও সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে ইসলামী নীতিদর্শনের একটি তুলনামূলক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য নীতিদর্শনের সাথে এর প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এর স্বীকার্য বিষয়গুলো নিয়ে। কুরআন ও হাদীসের উপর সংশয়মুক্ত ও দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে এই নীতিদর্শনের প্রধান স্বীকার্য বিষয়। পবিত্র কুরআন আল্লাহ ও তাঁর নিকট জবাবদিহিতায় বিশ্বাসের পক্ষে অসংখ্য যুক্তি উপস্থাপনের পর জিজ্ঞেস করেছে, "এরপরও কি কোনো কথা আছে যার উপর তারা আস্থা রাখতে পারে?" (৭৭: ৫০)

আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস এবং তাঁর সম্পর্কে যথার্থ একত্ববাদী ধারণা ইসলামী নীতিদর্শনের প্রধান স্বীকার্য বিষয় হওয়ার কারণে তাঁর একক সত্তার অস্তিত্ব, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কের ধরন সম্পর্কিত আলোচনা ইসলামের এক অনন্য বিষয়। "তারা আল্লাহ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করে না"(৭: ১২৮)। অর্থাৎ ইসলামেই এ ব্যাপারে যথার্থ ধারণা বিদ্যমান। ইসলাম আল্লাহ সম্পর্কে স্বীকার করে, তিনি মানুষের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কথা, চিন্তা ও অভিপ্রায়ের হিসাব নেবেন। তিনি সবার দৃষ্টির আড়ালে হলেও তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে এমন কেউ নেই। মানুষ ভালো মন্দ যা কিছুই করে তাঁর দৃষ্টিতে সব

স্পষ্ট। এমন বিশ্বাস মানুষকে ভালো কাজের ক্ষেত্রে যেমন প্রেরণা জোগায় তেমনি মন্দ কাজে বাধা দেয়। তিনি মানুষকে সহজ পথে পরিচালনার জন্য তাঁর নবী বা প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন। তাঁরা আমাদের মত মানুষ হলেও তাঁদের উন্নত বুদ্ধি বিবেক ও নৈতিক শক্তির কারণে নবী হওয়ার আগ থেকেই নিজেদের সমাজে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স.)কে নির্বাচন করেন। মহানবী (স.) নবী হওয়ার আগেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত, সৎ ও মানবতার বন্ধু ছিলেন। নবী হওয়ার পর নৈতিক পূর্ণতার বাস্তব নমুনা তিনি নিজের মাধ্যমে মানুষের সামনে পেশ করেন। এ কারণেই তাঁকে নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা ইসলামী নীতিদর্শনের দ্বিতীয় স্বীকার্য বিষয়। অন্যান্য স্বীকার্য বিষয়গুলো হচ্ছে পরকালীন বিচার, ইচ্ছার স্বাধীনতা ও তাকদীর সংক্রান্ত। তাকদীর ইসলামী দর্শনের প্রধান একটি ধারণা। মানুষসহ পৃথিবীর সব কিছুকে আল্লাহ যে নিয়মে উদ্ভব, বিকাশ ও ধ্বংস করেন সেটিই হচ্ছে তাকদীর। তিনি নিয়ম সৃষ্টি করেন এবং সেই নিয়মের অনুসরণ করে জগৎ পরিচালনা করেন। কে কবি হবে, কে বিজ্ঞানী হবে, রাষ্ট্রনায়ক হবে তাঁরই পরিকল্পনায় মানুষ জন্মের সাথে সাথে সেটির সুপ্ত সম্ভাবনা নিয়ে আসে। সহজাত শক্তি, মেধা কিংবা যোগ্যতাও সুপ্ত অবস্থা থেকে বিকশিত হয়, কিন্তু সর্বোচ্চ কতটুকু বিকশিত হতে পারে তারও একটা সীমা তিনি নির্ধারণ করে রাখেন। কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষেই আল্লাহর এই সীমা সম্পর্কে ধারণা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এজন্য মানুষকে কর্ম করে যেতে হয় মৃত্যু পর্যন্ত। তিনি কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন বলেই তাঁর নিকট মানুষ জবাবদিহি করতে বাধ্য। মূলত এই বিশ্বাস ও ধারণা ছাড়া ইসলামী নীতিদর্শনের কোনো কাঠামোই গঠিত হতে পারে না।

এই অধ্যায়ে ভালো মন্দের ইসলামী ধারণা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার মূল কথা হচ্ছে, ভালো ও মন্দ চিরন্তন বিষয়। একটি ভালো নিজ গুণেই ভালো, একটি মন্দ নিজ গুণেই মন্দ। আল্লাহ যেগুলোকে ভালো কাজ বলেছেন সে কাজগুলো মানবসমাজের ইতিহাসে প্রচলিত ও পরিচিত কাজ। এমন নয় যে, আল্লাহ একটি অভিনব কথা বলেছেন যা আসলে ভালো কি না সেটি চিন্তা করে বের করতে হয়, বরং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেটিকে ভালো কাজ বলে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু সে কাজটি মানুষ তাহলে করে না কেন? এর উত্তর সবার স্বাধীনতা আছে বলেই কেউ চাইলে করতে পারে, না চাইলে পারে না । আমরা যেখানে অর্থোপার্জনের জন্য কাজ করি, সেখানে বাধ্য হয়ে সব কাজ করতে হয়, না হলে আয় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তার আদেশ না মানার করণে কাউকে এক মুহূর্তের জন্যও আলো, বাতাস, খাবার, পানি থেকে বঞ্চিত করেন না। এজন্য যে কেউ চাইলে আল্লাহর কথা মানতে পারে, না চাইলে না মানবে। তবে কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ ইচ্ছে মত চলতে পারে না, মানুষের সামাগ্রিক কল্যাণে মানুষ পরস্পর দায়বদ্ধ- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ মানতে সে বাধ্য এবং না মানলে তাকে আইন ও বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। কোনো আইন যদি মানার ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়তা না থাকে, তাহলে তাকে আইন বলা যায় না। ঠিক তেমনি চূড়ান্ত নৈতিককর্তা যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ সে কারণে মানুষ তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। এভাবে আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি ইসলামী নৈতিকতায় অন্যান্য নৈতিকতার মতই বাধ্যবাধকতার ধারণা বিদ্যমান। তবে

এখানে যেমন পার্থিব জবাবদিহিতা আছে, তেমনি পরকালীন কঠিন জবাবদিহিতার চিত্রও মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত বা আইনশাস্ত্র ইসলামী নৈতিকতার সুরক্ষা দেয়। হালাল-হারাম এবং ওয়াজিব-নফলের ধারণাগুলো আইনি এবং নৈতিক উভয় বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আইন ও নৈতিকতা উভয়ের ব্যাখ্যার জন্য ওয়াহী ও আকলের প্রয়োগ রয়েছে। আকল বা বুদ্ধি মানুষের জন্য আল্লাহর আদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না, বরং ওয়াহী উপলব্ধির জন্য এবং ওয়াহীর ব্যাখ্যার জন্য আকল সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এটি ইসলামী নীতিদর্শনের একটি মৌলিক দিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি সত্যবাদিতা ও সততা নিয়ে। সত্যবাদিতা ইসলামী নীতিদর্শনের সবচেয়ে মৌলিক ধারণা। সত্যবাদিতা বলতে যা বাস্তব তার মেনে নেওয়াকেই বোঝানো হয়। কোনটি সত্য, সত্য কীভাবে নির্ণয় করা যায়- এধরনের দার্শনিক আলোচনা শেষ হবে না। ইসলামও সেটিকে সমর্থন করে। কারণ মানবজীবন প্রতিদিন নতুন ঘটনার মুখোমুখি হয় এবং তাকে নিত্য নতুন সত্য আবিষ্কারে তৎপর থাকতে হয়। কিন্তু নৈতিকতার ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে- সত্য কথা বলা ও সত্য আচরণ করা, অর্থাৎ আমরা যা বলছি তার পূর্ণ অনুসরণ করা। সত্য বলার কারণে যদি কোনো বিপদও আসে তবুও মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটিকে একবাক্যে সদগুণ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সত্যবাণী। মানুষের পক্ষে বাস্তব ঘটনা সবসময় দেখা ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না, কিন্তু আল্লাহ যেহেতু চিরন্তন সত্তা ও সবকিছুর উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন তাই তিনি যা বলেন, তাতে মিথ্যার কোনো মিশ্রণ থাকতে পারে না। এজন্য ইসলামী নীতিদর্শনে সত্যবাদিতার ধারণা অন্য নীতিদর্শনের চেয়ে আরো যৌক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ। এর আধিবিদ্যক ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে আল্লাহর সাথে সত্যবাদী আচরণকে। মানুষ আল্লাহকে নিজের কর্মের নিয়ন্তা ও অভিভাবক হিসেবে স্বীকার করবে; অথচ যে কোনো পরিস্থিতিতে এমন আচরণ করবে যে, সে ভাববে আল্লাহ তার অন্যায় কাজ দেখছেন না, তার অবৈধ কাজগুলো সম্পর্কে তিনি অবহিত নন কিংবা সেগুলোর ব্যাপারে তাকে ছাড় দেবেন- এগুলো প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পর্কে বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা নয়। কেউ আল্লাহর সামনে নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করতে চাইলে আল্লাহ তার পরীক্ষা নেন দুর্ঘটনা, ব্যাধি, দারিদ্র্য প্রাচুর্য প্রভৃতি দিয়ে। এসব ক্ষেত্রে যে আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধরতে পারে না সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না।

মানুষ পরস্পর সত্য না বললে বা সততার পথ অনুসরণ না করলে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারত না। সত্যবাদিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তাকে কর্মস্থলে যোগ দিতে হয়। ব্যবসায় বাণিজ্য, লেনদেন, আয় উপার্জনে সত্যবাদী আচরণ না থাকলে মানুষ পরস্পর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একের অধিকার অন্যের কারণে নষ্ট হলে সেখানে গুরুতর নৈতিক প্রশ্ন উঠে। এ কারণে ব্যবসায় বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা ও কর্মস্থলে দায়িত্ব পালনে ইসলাম হালাল উপার্জনের জন্য সততাকে আবশ্যক করেছে। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে সততা প্রদর্শন করব নিজেদের সত্যবাদিতা প্রমাণের জন্যই। কারণ আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়ে কর্মে নিযুক্ত হয়েছি। ইসলাম মানুষের পারস্পরিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি মেনে চলতে এমনকি আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তির

চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেয়। কারণ আল্লাহ মানুষের অধিকার নষ্টকারীকে তার প্রাপ্য আদায়ের জন্য কিয়ামতের বিচারে দাঁড় করাবেন, তবুও নিজে তাকে ক্ষমা করবেন না। আর কিয়ামতের বিচার দিবসে কেউ কাউকে ক্ষমা করার এবং কারো কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ারও সুযোগ দেওয়া হবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সভ্যতার উন্নয়ন বা পরিবর্তনের কারণে মানুষ তার জীবন পরিচালনায় বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে মানুষ সৎ থাকতে চাইলে সৎ থাকতে পারে, আর কেউ অসৎ হতে চাইলে খুব জঘন্য অসৎ হয়ে যেতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার করে ব্যাংকের কোটি টাকা চুরির ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা যায়। এগুলোর সমাধানে ইসলাম বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে সততার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়। মেডিকেল, ব্যবসায় শিক্ষা অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি, মিথ্যা ও অসততা থেকে বাঁচার উপয় হলো সত্যবাদিতার আদর্শকে গ্রহণ ও সত্যবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব। কুরআন মানুষকে শুধু সত্যবাদী হতেই বলে না, বরং সত্যের আদর্শ হতে বলে, যেন সমগ্র মানবজাতি এ ধরনের সত্যবাদিতার কারণে তাদের সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি সুবিচার সম্পর্কে। সত্যবাদিতার মত সুবিচারও একটি মৌলিক নৈতিক ধারণা। তবে বিষয়টি যতটা সরল মনে হয় ততটা সরল নয়। সুবিচারের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অধিকার সম্পর্কে জানা। কে কতটুকু অধিকার ভোগ করবে তা নির্ধারণে আবার প্রশ্ন আসে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি না, কেউ সুবিচার ভিত্তিক শাসন পরিচলনা না করলে কে তাকে বাধা দেবে? ইত্যাদি হাজারো জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়। সুবিচারকে যদি সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে কেবল তা প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্মীয় বিধি পালনে সমতা, সরকারি কর্মচারী নিয়োগে সমতা প্রভৃতি। কিন্তু মানুষের পদমর্যাদা যেমন ভিন্ন হতে বাধ্য তেমনি তার অর্থনৈতিক অধিকারে বা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও সমতা সম্ভব নয়, বরং এক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সুস্পষ্টভাবে যুলম বা অবিচারের শামিল। একজন প্রেসিডেন্টের বেতন আর একজন গৃহকর্মীর আয়ে সমতা প্রতিষ্ঠাকে এমনকি কেউ মেনেও নেবে না। সুতরাং ইসলাম সমতার চেয়ে বরং প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষকে মূল্যায়ন করে। আমরা দেখাতে চেয়েছি সুবিচার শুধু রাজনীতি বা বিচারের ক্ষেত্রে নয় বরং যে বিষয়গুলো পরস্পরের স্বার্থের সাথে জড়িত এমন প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুবিচারের প্রয়োজন। আমরা যেহেতু আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের জীবন ও বেঁচে থাকার সমস্ত উপকরণ সম্পূর্ণ অনুগ্রহ হিসেবে পেয়েছি তাই তাঁর প্রতি অবিচার হয় এমন কাজ না করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। আল্লাহর প্রতি সুবিচারের অর্থ হচ্ছে তিনি যেভাবে আছেন সেভাবে তাকে স্বীকার করা অর্থাৎ কোনো প্রকার অংশীদার সাব্যস্ত না করে তাঁর একত্ববাদকে মেনে নেওয়া এবং একই সাথে তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা। মানুষের জীবন, দেহ ও মনের মালিকও যেহেতু মানুষ নিজে নয়, তাই এগুলোর যথাযথ অধিকার আদায় করা নিজের দেহ ও মনের সাথে সুবিচারের অংশ। এভাবে তার মা-বাবা, আত্মীয়, প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্রের সবার নিকট সে বিভিন্নভাবে দায়বদ্ধ। একারণে তাদের সাথে আচরণ ও

কাজেকর্মে অধিকার ও সুবিচারের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে চলে আসে। মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুবিচার প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনৈতিক সুবিচারের অভাবে একটি দেশে গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

অর্থনৈতিক সুবিচারের অভাবে মানুষের মধ্যে আয় ব্যয় বৈষম্য সৃষ্টি হয়, বেকারত্ব, অভাব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। এজন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুবিচারের আগেই মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হয়। মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরার অধিকার বিঘ্নিত হলে, ভোট দানের মাধ্যমে নেতা নির্বাচনের সুযোগ না পেলে যদি বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় সেটির বৈধতার মূল্যায়ন করাও নীতিদর্শনের কাজ। ইসলামী নীতিদর্শনের এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে- আল্লাহ সুবিচার, পরোপকার ও আত্মীয় স্বজনদের দান করতে আদেশ করেন এবং অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও বিদ্রোহকে নিষেধ করেন। সুতরাং রাষ্ট্র ও জনগণ উভয়েরই সুবিচার প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা থাকে।

সুবিচারের অনুপস্থিতিতে যুলম বা অবিচার সৃষ্টি হয়। হত্যা, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, দুর্নীতি ইত্যাদি অপরাধ সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচারের প্রধান দৃশ্য। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে কোনো সমাজেই সুবিচার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এজন্য এগুলোর দমনে যেমন বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্বজনীন আইনের প্রয়োজন রয়েছে, একই সাথে মানুষের নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমেও এগুলোকে প্রতিরোধ করতে হয়। মহানবী (স.) যেমনটি বলেছেন, চোরের কর্তন করা হাত তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, অর্থাৎ এই শাস্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার অপরাধপ্রবণতা দূর হবে, সে আর অন্যায় ও মন্দ কাজে জড়ানোর চিন্তা করবে না। এভাবে সংশোধনমূলক সুবিচারের পক্ষে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উদার। তবে যে কোনো দণ্ডবিধি বাস্তবায়নে ইসলাম যে কঠিন মানদণ্ড অনুসরণ করতে বলেছে পৃথিবীর আর কোনো আইনে তা নেই। এজন্যই দেখা যায় ইসলামের ইতিহাসের প্রথম চারশো বছরে মাত্র ছয়জন লোককে চুরির কারণে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কোনো সমাজে ব্যাপক কর্ম-সংস্থান না করে, মানুষের অভাব দূর না করে, ধনী-গরীব বৈষম্য অটুট রেখে দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। এমনকি ব্যভিচারের সমস্ত পথ বন্ধ করে, মানুষের ভেতর স্বতস্ফূর্ত আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি মাধ্যমে আইন মেনে চলার পরিবেশ সৃষ্টি করতে যত সময় লাগে সে পর্যন্ত অপেক্ষা না করে গুরুদণ্ড প্রয়োগ ইসলাম সমর্থন করে না। বর্তমান পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট ইসলামী শরীয়া আইন মানেই হচ্ছে পাথর মেরে হত্যা, হাত কেটে দেওয়া, হত্যার পরিবর্তে হত্যা প্রভৃতি। অথচ ইসলামী আইনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কখনো মানুষকে শাস্তি দেওয়া নয়, ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি নয়, বরং ইসলামী আইন এক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এমন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে যেন মানুষ নিজ থেকেই সংশোধিত হয়ে যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি ইসলামের পরার্থবাদিতার নীতিকে। ইসলাম সমগ্র বিশ্বকে এক করে দেখে। পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের কষ্ট অন্য যেকোনো প্রান্তের মানুষকে কষ্ট দেবে- এমনি এক সৌহার্দপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই ইসলামের প্রধান লক্ষ্য। ইসলাম সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা বিশেষ পরিচয়কে বিবেচনায় রাখেনি তেমনি মানবতাবাদ বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও

কাউকে বৈষম্য করেনি। ইসলামের যাকাত যদিও সাধারণভাবে মুসলিমদের অধিকার, কিন্তু অন্য অনেক খাত আছে যেখান থেকে সাহায্য করায় বা দান করায় মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য রাখেনি; বরং সেসব দানকেই বেশি উৎসাহ দিয়েছে। পারার্থপরতার ভিত্তি হিসেবে ইসলাম আল্লাহর ভালোবাসাকে সবার উপর স্থান দিয়েছে এজন্য যে, এতে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা যেন নষ্ট না হয়, কোনো দাতার নিকট যেন কৃতজ্ঞতা আদায়ে নিজের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিতে না হয়। এখানে মানুষের জন্য উপকার করার মূল উদ্দেশ্য অপার্থিব ও আধ্যাত্মিক ভালোবাসা। পরার্থপরতার জন্য ইসলাম আরো যে বিশ্বজনীন নীতিমালার অনুসরণ করে তা হচ্ছে: মানুষকে সম্মান করা ও ভালোবাসা এবং মানুষের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বন্ধনগুলোর স্বীকৃতি। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রমাণের চেষ্টা করেছি মানুষের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসাই একে অপরকে সহযোগিতার দিকে নিয়ে যায়। আইনের মাধ্যমে ভালোবাসা হয় না, বরং এটি মানুষের মনের এমন একটি সদগুণ যা মানুষকে অন্যসব প্রাণীর চেয়ে উচ্চ মর্যাদার দিকে ধাবিত করে। আল্লাহর 'রহমান' নামের আধ্যাত্মিক স্পর্শে মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসে। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে জৈবিক ভালোবাসা থাকলেও মানুষের ভেতরকার ভালোবাসা জৈবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয়ই। এজন্য এই ভালোবাসা একজন মানুষকে আরেকজন মানুষের সাহায্য ও উপকারে নিয়োজিত করতে অনুপ্রাণিত করে। তবে এই ভালোবাসায় কোনো পার্থিব স্বার্থ থাকলে সেটি প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসা না হয়ে প্রতারণায় রূপ নেয়। মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক ও জৈবিক বন্ধন হিসেবে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। পরিবারের মাধ্যমেই আত্মীয়তার সৃষ্টি যা মানুষের পারস্পরিক দূরত্বকে তিরোহিত করে একে অপরকে আপন করে নেয়। স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এই বন্ধনের ভিত্তি তৈরি হলেও মানব সভ্যতার ইতিহাসে এর চেয়ে সুদৃঢ় বন্ধন আরেকটিও নেই। একারণে পারিবারিক বন্ধন যেমন সন্তান ও মা-বাবার মধ্যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ভিত্তি তৈরি করে তেমনি সেটি আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজের অন্যদের মধ্যেও সম্পর্ক সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। যে পরিবারের সন্তান সুস্থ পরিবেশে বেড়ে না উঠে বরং শিশু সদনে বড় হয় তার কাছে বাবা-মা, দাদা-দাদি, মামা-চাচা ইত্যাদি চিরায়ত ভালোবাসা ও আবেগের জায়গাগুলো শুষ্ক মরুভূমির মত হয়ে যায়। এজন্য ইসলাম মানুষের মধ্যে যে পরার্থপরতার অনুভূতি জাগ্রত করতে চায় তা অন্য সব দর্শনের চেয়ে উন্নততর।

পরার্থপরতার ধরন হিসেবে আমরা আলোচনা করেছি মানুষের সাথে উত্তম আচরণ, রোগীর সেবা, মৃত ব্যক্তিকে সম্মানের সাথে কবরস্থ করা, অসহায় দুঃস্থ ইয়াতীমের সাহায্য করা, শরণার্থীদেরকে আশ্রয় প্রদান, মানুষের জীবন ও সম্মান রক্ষায় সহযোগিতা করা প্রভৃতি। একজন মানুষ অপর একজন মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে তখনই যখন সে আত্মোৎসর্গ করার মত সৎসাহস নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কোনো নির্যাতনের শিকার নারী-শিশু-বৃদ্ধ বা যেকোনো অসহায় মানুষের নিকট উপস্থিত হওয়া বড় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কিন্তু ইসলাম এমন এক চেতনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে যার ফলে সে নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। জীবন রক্ষার এই সংগ্রামেও কোনো ধর্ম বা বর্ণের পার্থক্য নেই, বরং

যেখানে মানুষ যুলম ও অবিচারের শিকার সেখানেই মযলুমের জন্য ইসলাম উপস্থিত হতে বলে। একইভাবে রোগযন্ত্রণায় কাতর অসুস্থ, আহত, অগ্নিদগ্ধ মানবতার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বলে ইসলাম। চিকিৎসাবিদ্যার মাধ্যমে মানুষ মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। মানুষ যখন কেবল বৈষয়িক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মানবজাতিকে রক্ষায় তার মেধা, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করবে তখন তার এই কাজের মর্যাদা সে যেমন পার্থিব জীবনে পাবে তেমনি পরকালেও বিনিময় আশা করতে পারে।

মানুষকে দান করার যে পুঁজিবাদী ধারণা বিদ্যমান এবং দান না করার যে সমাজবাদী ধারণা, ইসলাম কোনোটিকেই সঠিক বলে সমর্থন করে না। পুঁজিবাদী সমাজে দান করা হয় পুঁজিপতির সম্মান, মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য। একদিকে তিনি দেখাবেন দান করছেন অন্যদিকে এর মাধ্যমে তার পণ্যের প্রচার করবেন অথবা যখন কোনো পণ্য মেয়াদোত্তীর্ণের দ্বারপ্রান্তে চলে যায় তখন সেগুলো দান করে বা ডিসকাউন্ট দিয়ে বিক্রয় করেন। এতে পুঁজিপতির সুখ্যাতি বাড়ে, তার পণ্যের বাজার বৃদ্ধি পায়। এদের অনুসরণ করে মুসলিম সমাজের অনেকে যাকাতের কাপড় কিংবা শীতার্তদের দানের জন্য বিশেষ কাপড় তৈরি করে থাকেন। এভাবে গরীবদেরকে নিম্নমানের জিনিস প্রদানের মাধ্যমে তারা উচ্চমানের প্রশংসা কুড়িয়ে নেন। একারণে দানের সম্পূর্ণ পদ্ধতিকেই সমাজবাদীগণ অস্বীকার করে বসেন। ইসলাম এই দুই চরম পন্থার মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে নিঃস্বার্থ মানবতার জয়গান গেয়েছে; মানুষকে দান করতে বলেছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। ইসলামী পরার্থবাদিতার মূল লক্ষ্যই শোষণহীন ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; যেখানে মানুষ তার নৈতিকগুণের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে; পরস্পরকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ধনী-গরিব, সাদা-কালো, ধর্ম ভিত্তিক দূরত্ব ও সংকীর্ণ জাতীয়তা দূর করে এক আদমের সন্তান হিসেবে গণ্য হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ইসলামী নীতিদর্শনের পূর্ণতা নিয়ে। প্রচলিত নীতিদর্শনের মধ্যে উপযোগবাদ, বুদ্ধিবাদ, স্বজ্ঞাবাদ, পূর্ণতাবাদ অন্যতম। এসবের মধ্যে পূর্ণতাবাদের সাথে ইসলামী নীতিদর্শনের মিল অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে অন্যসব নীতিদর্শনের সাথেও বিভিন্ন বিষয়ে মিল রয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা পূর্ণতার জন্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুটি বিষয়কে উপস্থাপন করেছি। বাহ্যিক পূর্ণতা বলতে ইসলামী নীতিদর্শনের দার্শনিক ভিত্তি ও যৌক্তিকতার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আর অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা বলতে এর মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে বোঝানো হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ যেমন ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধানকে বৌদ্ধিক ও প্রত্যাদেশ ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসরণকে সহজতর ও স্পষ্টতর করেছেন তেমনি ইসলামী তাসাওউফের অনুসারীগণও মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের পথ দেখিয়েছেন। নিষ্কর্ম তাসাওউফ প্রকৃতপক্ষে সঠিকভাবে ইসলামকে তুলে ধরে না, বরং শরীয়তকে পূর্ণরূপে অনুসরণের মাধ্যমে, বিশেষত সত্য বচন (*সিদকে মাকাল*) ও হালাল উপার্জনের (*আকলে হালাল*) মাধ্যমে সূফীগণ যে তরীকা দেখিয়েছেন সেটিই আধ্যাত্মিক উন্নতির সঠিক পদ্ধতি। ইসলামী নীতিদর্শনে এই বিষয়টিরও যথার্থ আলোচনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। অন্তরকে

পরিশুদ্ধ করার যে বিষয়টিকে কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে আমরা সেগুলোকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। যে মন্দ স্বভাবগুলো বর্জন করতে কঠোর সাধনা করতে হয় এবং যে সদগুণগুলো অর্জনের জন্যও ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে হয় সেগুলো থেকে আমরা কয়েকটি দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করেছি। সবচেয়ে মন্দ স্বভাবের মধ্যে অহংকার ও লোক দেখানো কাজকে ইসলাম সমস্ত নেক কাজের ধ্বংসের জন্য দায়ী করে। সেগুলোকে বর্জন করে তাওবা ও তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এই দোষ ও গুণ যেহেতু অন্য মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কেবল প্রকাশ পায়, তাই এগুলো বর্জন বা অর্জনের কাজ নির্জনবাসে হয় না, বরং মানবসমাজে অবস্থানের মাধ্যমেই সম্ভবপর করতে হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি ইসলামী নীতিদর্শনের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনীহার কারণ এবং এর থেকে উত্তরণের জন্য বিশেষ কিছু প্রস্তাবনা। এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমালোচনা থেকে কয়েকটির পর্যালোচনার মাধ্যমে এর চূড়ান্ত অনুমোদনের বিশ্লেষণও এখানে এসেছে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের যে নৈতিক পতন, তা অস্বীকার করার বা গোপন করার কিছু নেই। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর ভেতরকার দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রায়ই আলোচিত হয়। মহানবী (স.) ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন এর ত্রিশ বছর ছিল ইসলামী শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ মডেল। এই সময় ইসলামী জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যথার্থভাবে এর বাস্তবায়ন হয়। ইসলামী নীতিদর্শনের বাস্তবায়নে যে সব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোকে তখন যেভাবে সমাধান করা হয়েছে তা পরবর্তী হাজার বছর ধরে দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে। দুর্ভাগ্যবশত বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানদের মধ্যে নৈতিক চেতনা ক্রমশ হ্রাস পায়। এর ফলে বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে যারা ইসলামের অনুসরণ করেন তাদেরও নৈতিক মান উন্নত নয়। বিভিন্ন বৈষয়িক লোভে পড়ে তারা মুহূর্তের মধ্যে নৈতিকতাকে বিসর্জন দিতে চিন্তা করেন না। বাইরের বেশভূষায় ইসলাম থাকলেও ভেতরে তাদের ইসলামী চেতনার অভাব। তারা ইসলামী নাম ব্যবহার করেন নিজেদের জাতীয়তার পরিচয় দেওয়া জন্য বাস্তবে তারা ইসলামের কোনো সুস্পষ্ট ধারণাও রাখেন না এবং অন্যান্য ধর্ম বা মতবাদের মতই ইসলামকে কেবল একটি ধর্ম হিসেবে গণ্য করেন। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের অধিকাংশই ধর্মের নির্দেশ মেনে চলতে পছন্দ করেন না, তাই নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে যাবতীয় নীতিমালা তৈরি করে সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করেন। এর প্রভাবে পৃথিবীর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই এই চিন্তাধারার অনুসারী হয়ে যাচ্ছেন।

এই অধ্যায়ে আমরা এধরনের সমস্যার কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীনতাকে পছন্দ করে, কেউ যখন নিয়ম ও গণ্ডির বাইরে যেতে পারে, তাকে তখন এক ধরনের সফলতা মনে করে। এই কারণেই আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় মানুষকে স্বাধীনতা ও সাম্য দেওয়ার প্রচারণা চালানো হয়। ফরাসি বিপ্লবের সময় এই শ্লোগান এসেছিল মূলত খ্রিষ্টান গীর্জার বিরুদ্ধে, যারা মানুষকে শোষণে সাহায্য করত। ইসলামে কখনো এধরনের মসজিদ কেন্দ্রিক শোষণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ

ইউরোপের সেই স্বাধীনতার মন্ত্র মুসলিম দেশগুলোতেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। কারণ ধর্ম তরুণদের স্বাধীনতাকে নষ্ট করে দেয়, উদ্দাম নৃত্য ও আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করে। এই অজুহাতে মুসলিম দেশগুলোতেও ধর্মের বিরুদ্ধে একশ্রেণির আন্দোলন তৈরি হয়ে যায়। এভাবে ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে নৈতিকতাকেও তারা বিসর্জন দিতে শুরু করে। ইউরোপের স্বাধীনতার দাবি ছিল যৌক্তিক ও অনিবার্য এবং তারা সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ধারায় সেটি করার কারণে ইউরোপে বলা যায় স্বাভাবিক মানবিক মূল্যবোধগুলোরও উৎকর্ষতা ঘটে। এজন্যই মুহাম্মদ আবদুহুর মত পণ্ডিত অকপটে স্বীকার করেন, পাশ্চাত্যে মুসলিম না থাকলেও ইসলাম আছে। অর্থাৎ সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ, পরোপকারের মত মহৎ মানবীয় ও ইসলামী গুণগুলো তারা রপ্ত করেছে, কিন্তু মুসলিমরা তা ছেড়ে দিয়েছে।

ইসলামী নীতিদর্শনের যে বিষয়গুলো বর্তমানে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির শিকার আমরা এখানে সেগুলোকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি এবং এর প্রতিকারের জন্য প্রস্তাবনা পেশ করেছি। ইসলামী নৈতিকতার বাহ্যিক দিকের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে এর সূচনা করতে হবে। বাহ্যিক দিক তথা আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহকেই কেউ যদি ইসলাম মনে করে তাহলে সেটি সুস্পষ্টভাবে ভুল হবে। ইসলামে আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিক দিকসমূহের গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার নয়, বরং এগুলোর পেছনে যে মযবুত অভ্যন্তরীণ ভিত্তি আছে সেটি সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম সমাজ অনেকটা গাফেল। এই অজ্ঞতা, অলসতা ও হীনমন্যতা দূর করতে প্রয়োজন এই বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা ও আলোচনা। এধরনের বাহ্যিক বিষয়ের অভ্যন্তরে যে গুঢ় বিষয় রয়েছে সেগুলো আমরা এখানে কিছুটা দেখাতে চেষ্টা করেছি।

পবিত্র কুরআন, মহানবী (স.) এর জীবন এবং সত্যনিষ্ঠ ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী মানবজীবনের সমৃদ্ধ ও ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব কেবল মাত্র আল্লাহর সাথে গভীর প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে। এই সম্পর্ক সৃষ্টি কোনো তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারিক। পৃথিবীর প্রতিটি দর্শনের উদ্দেশ্যই মানবজীবনের কার্যকরী উন্নয়ন । শুধু তত্ত্ব আলোচনা কিংবা জ্ঞানের জন্য জ্ঞান নয় বরং জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য জীবনের কল্যাণ। আর এই কল্যাণ অর্জনে ইসলামের পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। মহানবী (স.) একটি উক্তিতে নির্দেশ করেন, কিয়ামতের আগে একসময় মানুষ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সবাই ইসলামকে মেনে নেবে। এর অর্থ সবাই নিজেরা মুসলিম হয়ে যাবে এটি সঠিক নয়, কিংবা জোরপূর্বক সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে সেটিও সঠিক নয়। কারণ কুরআন অনুযায়ী এমনটি বাস্তবায়ন হবে না, অর্থাৎ সব মানুষ পৃথিবীতে কখনো এক হবে না। দ্বিতীয়ত জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা আদৌ কোনো ইসলামী ধারণা নয়। বরং মহানবীর এই বাণীর অর্থ হচ্ছে, মানুষ অজ্ঞাতসারেই এবং তাদের জীবনের বাস্তব প্রয়োজনেই ইসলামের বিধানসমূহ মেনে চলবে। মানুষের বিবেক বুদ্ধি একটি প্রমাণিত সত্যকে অবজ্ঞা করতে অস্বীকৃতি জানায়। ইসলামের স্বাস্থ্যবিধির বস্তুনিষ্ঠতা ইতোমধ্যেই পুরো বিশ্ব মেনে নিয়েছে, ইসলামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পৃথিবীর সব জাতি অনুসরণ করে চলছে। মানুষ ধর্ম নিরপেক্ষ বলতে বর্তমান যা বোঝাচ্ছে সেটি কিন্তু আসলে প্রচলিত ধর্মসমূহের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা। খ্রিষ্টান, ইহুদী, হিন্দু সহ ইসলাম

ছাড়া প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই জীবন ও জগৎ পরিচালনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি। এবং সেসব ধর্মের মূলনীতিগুলোও সব বিষয়ের ব্যাপারে বাস্তব নির্দেশনা দিতে পারছে না। এদিক থেকে ইসলাম অনন্য। আমরা এখানে অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান রেখেই ইসলামের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছি। মহানবী(স.) এর নিকট একদিন একজন ইহুদী ধর্মগুরু এসে আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেন। মহানবী নিরবে সব শুনলেন এক পর্যায়ে তিনি হেসে দিলেন এবং কেবল কুরআনের একটি আয়াত শুনিয়ে দেন, " তারা আল্লাহ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করে না।" এটিই হচ্ছে ইসলামী আচরণের সর্বোচ্চ মডেল। মহানবী (স.) সেই ইহুদী আলেমকে এমনকি ইসলামের দাওয়াতও দেননি, ইসলাম সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেননি। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম প্রতিটি মানুষের ইতিবাচক আবেগকে সমর্থন করে।

ইসলামের উদারতাবাদ ইসলামের গ্রহণযোগ্যতাকে আরো বিকশিত করেছে। বর্তমানে ইসলামের এই মর্মবাণীটুকু মুসলিমদের সর্বপ্রথম উপলব্ধি করা দরকার। ইসলাম আল্লাহকে এই বিশ্বজাহানের পালনকর্তা বা "রাব্বুল আলামীন" হিসেবে উল্লেখ করেছে, একারণে যে, তিনি সমস্ত বিশ্বজগতকে স্নেহভরে লালন পালন করছেন। একটি শুকর, সাপ কিংবা গরু ছাগল সবকিছুকে তিনি লালনপালন করছেন এবং সবার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। বাস্তব প্রয়োজন এবং ক্ষতির আশংকা ছাড়া একটি সামান্য কীটকেও আঘাত করতে নিষেধ করেছে ইসলাম। এর কারণ তিনি কোনো কিছু খেলার ছলে বা অযথা সৃষ্টি করেননি। আল্লাহর এই পরিচয় থেকে আল্লাহর বাণীসমূহের অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমরা যা দেখতে পাই সেটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে মানুষের যথার্থ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ তার কল্যাণকর পথ ও ক্ষতিকর পথ পার্থক্য করতে পারবে।

মানুষকে তার রূহ সবসময় রূহের মালিকের সাথে যুক্ত করতে চায়। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নিজের থেকে যে ফুঁক দানের মাধ্যমে মানুষকে জীবন দান করেন সেই ফুঁকের কারণেই সে তাঁর সান্নিধ্য পেতে ভালোবাসে। অর্থাৎ রূহের স্বাভাবিক চাওয়া আল্লাহর মাথে মিলন। জালালুদ্দীন রুমী তাঁর মসনবী শুরু করেছিলেন এই সত্যবাণী দিয়ে। তিনি সেখানে বাঁশীর সুরকে বাঁশের সাথে মিশে যাওয়ার জন্য করুণ আকুতি হিসেবে কল্পনা করেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের রূহও ঠিক সেভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য কান্না করে। কিন্তু মানুষের ভেতর পশুবৃত্তির প্রাধান্য ঘটলে সে রূহের এই কান্নার কোনো মর্ম বুঝতে পারে না। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি সব সময় আল্লাহর সাক্ষাতের আশায় ভালো কাজ লিপ্ত থাকে। তার ভালো কাজের উদ্দেশ্যই থাকে এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে মিলন (১৮: ১১০)।

সুতরাং একজন মুমিন বা মুসলিম তার সমস্ত কাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ বা মিলনকে স্থির ও দৃঢ় করতে পারবে তখন তার পক্ষে অন্যায় বা মন্দ কাজ করা সম্ভব হবে না। আমাদের গবেষণায় সত্যবাদিতা, সুবিচার ও পরার্থপরতার মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সাথে মিলনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। ইসলামী নৈতিকতার এবং কুরআন ও হাদীসের এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

এই গবেষণায় দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়কে আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, সেটি হচ্ছে আমাদের কর্মের সংশোধন ও বিকাশ সাধন। আমরা আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি নিজেদেরকে ক্রমাগত উন্নত ও স্থায়ী

পরিবর্তন করতে না পারি, তাহলে বিশ্বাসের সাথে এক ধরনের প্রতারণা হয়। অর্থাৎ আমরা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন ইবাদতে পূর্ণ নিষ্ঠার পরিচয় দেব, তেমনি মানুষের সাথে সম্পর্ক ও আচরণেও কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণ কামনা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রাখব না। আমাদের ব্যক্তিগত আচরণ যা আমাদের নিজ দেহ ও মনের ক্ষতি না করার মাধ্যমে শুরু করব, সেই আচরণ বা কাজ দ্বারা অন্য কোনো মানুষ বা সৃষ্টজীবের সামান্য ক্ষতিও যেন না হয়- এভাবেই আমাদের কর্মের উন্নয় ঘটাতে হবে। মিসকাওয়া তাঁর গ্রন্থের শুরুতে যে কথাটি বলেছেন, আমাদের উদ্দেশ্যও তাই। অর্থাৎ আমাদের কাজগুলো যেন সুন্দর হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলো আমরা করতে পারি। এই অনুভূতি নিয়ে যখন আমরা সরকারি কাজে নিয়োজিত হব, আমাদের আয় উপার্জনের যাবতীয় কর্যক্রম পরিচালনা করব, রোগীর চিকিৎসা করব, শিক্ষার্থীদের পাঠদান করব, ব্যবসায় বাণিজ্য করব তখন অমাদের সেই কাজে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। নিয়োগকর্তা আমাদের উপর যথেষ্ট আস্থা রাখতে পারবেন যে, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ ও উন্নতি ছাড়া এসব কর্মচারীর মনে কিছু নেই। যেমনটি দেখা যায় হযরত ইউসুফ (আ.)এর জীবনে; তিনি তাঁর শাসকের সামনে নিজেকে পেশ করেছেন আর শাসক নিশ্চিন্তে তাঁকে রাষ্ট্রের সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদ দান করেন। কারণ তিনি একই সাথে আল্লাহ ও মানুষের হক আদায় করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মূলত এটিই হচ্ছে নৈতিকতার বাহ্যিক প্রকাশ। অন্তরে আল্লাহর সাথে যথাযথ সম্পর্ক সৃষ্টি হলে বাইরে তার প্রভাব পড়বে তাঁর সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে।

সূফী দর্শন মানবতাবাদের কথা বলে। অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জনের সাথে সাথে একই সময় মানবতার উন্নয়নে, মানুষের অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য দূরীকরণে কীভাবে ভূমিকা রাখতে হয় সেটিও এই দর্শনে আছে। উপমহাদেশের সূফী সাধকগণ সেই মানবতাবাদী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে এই অঞ্চলের মানুষের নিকট এত প্রিয় হয়ে আছেন। তাঁরা সত্যিকারভাবে বুঝেছেন, আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কল্যাণ ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না। এটাই ছিল নবীদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার। নবীগণ সমাজের ভেতর এমন নৈতিক বিপ্লব সাধন করেন যার মাধ্যমে মানুষ নিজেদেরকে ও গোটা বিশ্বকে আলোকিত করতে পারে এবং পার্থিব ও অপার্থিব সফলতা অর্জন করতে পারে। নবীদের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সেই কাজের ধারা বন্ধ হয়নি। বরং কুরআন এটিকেও বলে দিয়েছে, "যদি মুহাম্মদ (স.) মৃত্যুবরণ করে কিংবা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে?" সুতরাং নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে নবীদের কাজকে চলমান রাখাটা নবীর প্রেমিকের জন্য আবশ্যক।

বর্তমানে পাশ্চাত্যের চাকচিক্যের কারণে তাদেরকে দেখে আমরা আকৃষ্ট হই। অথচ তাদের মধ্যে কিছু মানবীয় বোধ আছে বলেই তারা এখনো টিকে আছে। তাদের বাহ্যিক ভোগ বিলাস প্রাচুর্যের কারণে আমরা প্রতারিত হই। তাদের ভেতরের পারস্পরিক সম্মানবোধ, নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, কর্মের নিষ্ঠা, ধনী-গরিব মিলনের চেষ্টা, বর্ণ-বিদ্বেষের প্রতি আচরণের উন্নতিই আসলে তাদেরকে সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছে। আমরা সেগুলো না দেখে তাদের ভোগ বিলাসের আদর্শকে গ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়ে

পাড়ি। ইবন খালদুন বহু আগেই এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন, ভোগ বিলাসই হচ্ছে সভ্যতার পতনের প্রধান কারণ। অথচ মুসলিম জাতির নব্য তরুণগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই জিনিসটির প্রতিই আগ্রহী হয়ে উঠছে। যে কঠিন মেধাশ্রম ও কায়িকশ্রমের উপর তাদের বর্তমান গগণচুম্বী সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই কঠোর শ্রম সাধনার কথা মুসলিম জাতির তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করছে না। মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিজীবীগণ এখনো ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়ে আছেন অথচ সাম্প্রতিক মনস্তত্ত্ব ফ্রয়েডের মতবাদকে অনির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণ করেছে। যে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যের যৌন নৈতিকতার চরম অধঃপতন ও সমকামিতার মত বিষয়গুলো স্বীকৃতি লাভ করছে, সেই তত্ত্বটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হাওয়ার পরও তার প্রভাব থেকে তাদের আর ফিরে আসা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু বর্তমান মনস্তত্ত্ব প্রমাণ করেছে, পারিবারিক জীবন মানুষের বংশধারা রক্ষার সর্বোত্তম পদ্ধতি। যে শিশু মা-বাবার স্নেহ মমতায় এবং তাদের কাছ থেকে আদব ও শিষ্টাচারের শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠে তাদের সামগ্রিক জীবন একধরনের হয়, আর যারা মা-বাবার স্নেহ ছেড়ে ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠে তাদের মনস্তত্ত্ব আরেক ধরনের হয়। পাশ্চাত্যের বাহ্যিক ও চমকপ্রদ এধরনের কিছু ছবি আদৌ অনুসরণের কোনো বিষয় নয়। তাদের কাছে থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমাদের পূর্বপুরুষগণের চরিত্রে ছিল। মুসলিম বিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিকগণ বিশেষত নবম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত তিনশত বছর যে অবদান রেখেছেন সেগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট। কত কঠোর সাধনা করে একটি সভ্যতার ভিত্তি তারা দাঁড় করিয়েছেন তা ভাবতে অবাক লাগে। সেই প্রামান্য জ্ঞানের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও হীনমন্যতায় ভোগার কারণ থাকতে পারে না। পাশ্চাত্যের উন্নয়নের পেছনেও কিন্তু মুসলিম সভ্যতার সেই জিনিসটি কাজ করেছে।

বাংলাদেশসহ বর্তমান মুসলিম বিশ্বের যে মৌলিক সমস্যাগুলো থেকে আমাদের উত্তরণের প্রয়োজন, সেই সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমরা অসচেতন। সেই সমস্যাগুলোকে আরো বিকাশ ঘটাতে বাইরে থেকে যারা চেষ্টা করছেন, আমরা তাদেরকেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু মনে করছি। যে কঠোর সাধনার উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্য দাঁড়িয়েছে সেই সাধনার পরিবর্তে বিনোদন, খেলাধুলা ও মাদকতার মধ্যে নিমজ্জিত রেখে জাতিকে চরম অলস করা হচ্ছে। দুই চার জন লোক ভালো খেলা রপ্ত করে সেই খেলা প্রদর্শনীর যে আয়োজন করা হচ্ছে, তাতে কোটি কোটি মানুষ নিজের কর্ম ছেড়ে খেলা দেখতে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, জীবনকে একঘেয়েমি থেকে রক্ষা করতে খেলা দেখার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার চেয়ে আরো বহুগুণ বেশি প্রয়োজন খেলায় অংশ নিয়ে নিজেকে সুস্থ রাখা । অথচ সারারাত খেলা দেখে ঘুম নষ্ট করে দিনের সব কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ছাড়া ফলাফল নেই বললেই চলে। অনুন্নত দেশের মানুষ উন্নত দেশের খেলার আয়োজনকেই তাদের সফলতার কারণ ভেবে সব কর্ম ছেড়ে এখন খেলা উপভোগে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। প্রতীকী অর্থে এখানে খেলার কথা উল্লেখ করেছি। আসলে আমাদেরকে ইসলাম যে কর্মে নিয়োজিত থাকতে বলেছে সেই কর্ম ছেড়ে দেওয়ার কারণেই আমরা সর্বদিক থেকে অযোগ্য হয়ে পড়ছি।

বর্তমানে আমাদের সমাজে কিশোর অপরাধ, বখাটে যুবকদের উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা, ইভটিজিং, ধর্ষণ, আত্মহত্যা ইত্যাদি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। সবচেয়ে বড় সত্য কথা হচ্ছে এসব অপরাধ পুরুষদের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে। এর মৌলিক কারণ কী? নরীদের মধ্যে প্রকৃতিগত কারণেই এই উগ্র স্বভাব কম থাকে। সমাজ-মনস্তত্ত্ববিদদের গবেষণায় এসবের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়- পারিবারিক কলহ, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, কর্ম সংস্থানের অভাব, মাদকের অপব্যবহার প্রভৃতি। কিন্তু এগুলোর উত্তরণে কোনো বাস্তব প্রস্তাবনা ও পদক্ষেপ খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এগুলোর কারণ, যৌন শক্তিকে বিকশিত হতে না দেওয়া (এটি ছিল ফ্রয়েডের মত), দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাব প্রভৃতি। আমাদের বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীগণ পাশ্চাত্যের নির্দেশনার অনুকরণে মুসলিম দেশসমূহে এসব সমস্যার সমাধানে সাহিত্য, মিডিয়া, বিনোদন মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগাচ্ছেন। সামাজিক অপরাধের মনস্তত্ত্ব বের করতে অন্তত দুই তিন প্রজন্মের মানুষের জীবন ও চলা ফেরা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হয়; অর্থাৎ প্রায় একশত বছর বা তার চেয়েও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে একটি অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, যা প্রস্তাব আকারে পেশ হয়। এই প্রস্তাব কতটুকু কার্যকর হবে, সেটি যাচাইয়ের জন্য ত্রিশ চল্লিশ বছর বা একটি প্রজন্মের জীবনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অন্যদিকে, জৈবিক গবেষণা কিন্তু সে রকম নয়। একটি ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সি উদ্ধারের মাধ্যমে কয়েক বছরের ভেতর একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, যেখানে সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণে কয়েকশত বছর লেগে যায়। এজন্যই বলা হয় মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতি যত দ্রুত উন্নত হয় অবস্তুগত সংস্কৃতি সেভাবে হয় না।

সুতরাং নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থান কিংবা যৌনতার ব্যাপারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ উপেক্ষার মাধ্যমে বর্তমান সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে গেলে ফলাফল সম্ভবত সন্তোষজনক হবে না। অনুন্নত দেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকার কারণে, এক্ষেত্রে যদি পুরুষ-নারী সম অধিকারের ভিত্তিতে চাকুরি পায়, তাহলে পুরুষদের বড় একটি অংশ নারীদের মতই বেকার থাকবে। নারীদের বেকার অংশ ঘর সংসার করে, সন্তানের দেখাশোনা করে কাটায়, কিন্তু বেকার পুরুষরা কী করবে? তাদের পক্ষে সন্তান প্রতিপালন বা ঘর সংসার করা যায় না। এজন্য নতুন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

ইসলাম আমাদেরকে যে উম্মুক্ত প্রান্তর দিয়েছে সেটিতে না হেঁটে আমরা এমন চোরাগলিতে গুপ্তধন খুঁজতে বের হয়েছি যে, এখন গুপ্তধন দূরে থাক আমরা সেই গলি থেকেই বের হতে পারছি না। ইসলাম মানুষের ভেতর সততার গুণ সৃষ্টি করতে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের যে নির্দেশনা দিয়েছে তা এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে, মানুষ নিজের সমস্যা ও অভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারে না। তার পক্ষে আল্লাহর উপর আস্থা রাখাটা বরং অধিকতর সহজ ও নিরাপদ। সে যে ভালো কাজ করবে তার পেছনে যদি মা বাবার ও রাষ্ট্রের সমর্থন থাকে তাহলে মনের ভেতর প্রেষণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার সমর্থন থাকে তাহলে আরো বেশি প্রেষণার সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহর পথের সুনির্মল শান্তি তখনই অর্জিত হয় যখন মানুষ তা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেয়। রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক দুর্নীতিসহ সামাজিক অপরাধগুলোর প্রতিকারে ধর্ম

মানুষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বেশি প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং অপরাধ প্রবণতা দূর করতে মানুষকে যেমন আয়মূলক কাজে ব্যস্ত রাখতে হয় তেমনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার পেছনেও নিয়োগ করতে হয়।

প্রচলিত বিভিন্ন নীতিদর্শনে মানুষের ভালো হওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে কেবল বিবেকের (নাফসে লাউয়ামা) শাসনের কথা বলে। কিন্তু বিবেককে প্রভাবিত করে শৈশবকালীন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশসহ অন্যান্য প্রভাবকসমূহ। ইসলাম একারণে নাফসের (তিরস্কারকারী নাফস বা নাফসে লাউয়ামা) প্রশংসা করে, কিন্তু সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তার উপর দেয় না, বরং আল্লাহর সর্বময় দৃষ্টি ও ক্ষমতার বিশ্বাসকেই বেশি জোর দেয়। মানবেতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় এই গুণটি এত বেশি কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন পূর্ববর্তী জাতির ক্ষেত্রেও তাকে মানুষের পার্থিব জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছে। আল্লাহকে যথার্থরূপে বিশ্বাস করলে মনের ভেতর অন্তত দুটি অনুভূতি আসে: একটি আল্লাহর সীমাহীন ব্যক্তিত্বের ভয়, অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর উপর আস্থার আনন্দ। অবিশ্বাসী ব্যক্তি কোনোটিই অর্জন করতে পারেন না। ইসলামের নৈতিক নিয়মগুলো আনন্দ বিনোদনের পরিপন্থী- এমন একটি ভ্রান্ত ধারণাও ইসলামী নৈতিকতাকে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করছে, অথচ ইসলাম আনন্দ ও স্বতস্ফূর্ততার মাধ্যমেই শিক্ষা দিতে চায়। ইসলাম আমাদেরকে সত্যবাদিতা, কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যের যে শিক্ষা দেয় তার মাধ্যমে আমরা প্রশান্তি ও কল্যাণময় এবং সুবিচার ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে পারি। এর কল্যাণে মানুষের পার্থিব জীবনের হতাশা ও দুশ্চিন্তা দূর হয়ে নিরাপত্তার সাথে চলাফেরাও সহজতর হয়ে উঠবে, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনও তখন মধুময় হয়ে উঠবে।

কুরআন মানুষের জীবনের গতি সৃষ্টির জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছে 'মুজাহাদা' বা কঠোর সাধনার ধারণা। শব্দটির বিকৃত অর্থ প্রয়োগ করে মুসলিমদেরকে যুদ্ধবাজ, জঙ্গীবাদী, জিহাদিস্ট বলে চিহ্নিত করা হয়; অথচ মহানবী (স.) এর জীবনে এবং পূর্ববতী কোনো নবীর জীবনেও জিহাদের এই অর্থের প্রতিফলন ঘটেনি। আমাদের জন্য কুরআন দুইজন নবীর আদর্শকে "উসওয়াতুন হাসানা" বা সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছে। একজন হযরত মুহাম্মদ (স.) অন্যজন ইহুদী-খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীসহ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের নিকট সম্মানিত হযরত ইবরাহীম (আ.)। তাঁরা নিজেদের ব্যক্তি জীবনে কঠোর ত্যাগ-সাধনা-ধ্যান ও কর্মপ্রচেষ্টার অনুসরণের মাধ্যমে যেভাবে নিজেকে ও স্বজাতিকে আলোর পথ দেখাতে চেয়েছেন সেটিই আমাদের পথ। যুদ্ধ জীবনের একটি অংশ, একে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু যুদ্ধ মানুষের সমগ্র জীবনে একবার দুইবার ঘটতে পারে বা নাও ঘটতে পারে, তাহলে সেটিকেই ইসলামের লক্ষ্য বানানো আদৌ ইসলাম নয়। বরং মানুষকে সৎ থাকার জন্য নিত্য যুদ্ধে জড়িয়ে থাকতে হয়। এটিকেই মহানবী (স.) বড় যুদ্ধ বলেছেন। ইসলাম সততার সম্বল নিয়ে বসে থাকতে বলে না, বরং তার নিজের কর্মময় জীবনের প্রতিটি পরতে বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশেও সততার বাস্তব প্রতিফলন ও প্রচার করতে বলে।

নামে মুসলিম না হয়ে বাস্তবে মুসলিম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির জন্যই আমাদের এই গবেষণাকর্ম। বস্তুত পক্ষে মুসলিম হওয়া মানে অবশ্যই তাকে সৎকর্মের অনুসারী হতে হবে। যদি কেবল নামের ভিত্তিতেই

মুসলিম দাবি করা হয়, সেই দাবি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসার শূন্য। নিজে সৎকর্মের অনুসারী হওয়ার সাথে সাথে মনুষ্য সমাজ এবং অন্য প্রাণী ও প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বপালন না করলে মুসলমানের স্বার্থকতা নেই। ইকবালের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করছি,

"সত্য ন্যায়ের সবক নে তুই
সবক নে তুই বীরত্বের
তোরে দিয়ে কাজ হবে রে ফের
সারা দুনিয়ার ইমামতের॥"

গ্রন্থপঞ্জি

১. শফী, মুহাম্মদ: *মাআরেফুল কোরআন* (সংক্ষিপ্ত), অনু. মুহিউদ্দীন খান (মদীনা মোনাওয়ারা: বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৯৯২)।

২. ইবন কাসীর, আবুল ফিদা হাফিয: *তাফসীর ইবনে কাসীর* (৮ম-১১শ খণ্ড), অনু. মুজিবুর রহমান (ঢাকা: তাফসির পাবলিকেশন, ২০০৪)।

৩. আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল: *বুখারী শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯)।

৪. মুসলিম, আবুল হুসাইন: *মুসলিম শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০)।

৫. তিরমিযী, আবু ঈসা, *জামে আত-তিরমিযী*, অনু. মুহাম্মাদ মূসা, মুহাম্মাদ শাসুল আলম খান (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭)।

৬. সুলাইমান, আবু দাউদ: *আবু দাউদ শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২)।

৭. আন-নাসায়ী, আহমাদ: *নাসায়ী শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২)।

৮. ইবন মাজাহ, আবু আদুল্লাহ মুহাম্মদ: *ইবন মাজাহ শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১)।

*** *** ***

৯. আল গাযালী, আবু হামিদ: *এহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, অনু. এম. এন. এম. ইমদাদুল্লাহ (ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি., ২০০১)।

১০. ----------: *মিনহাজুল আবেদীন*, অনু. আখতার ফারুক (ঢাকা: রশিদী বুক হাউস,১৯৯৪)।

১১. আয যামালী, আমের (সম.): *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন* (ঢাকা: আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি, ২০১৬)।

১২. ইকবাল, মুহাম্মদ: *শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া*, অনু. গোলাম মোস্তফা (ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০০২)।

১৩. ----------: *আমুরগানে হেজাজ*, অনু. গোলাম সামদানী কোরাইশী (ঢাকা: আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০৭)।

১৪. ----------: *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন* (ঢাকা: আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০৫)।

১৫. ইবন মনযুর, আবুল ফদল জামাল উদ্দীন: *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দারুস সদর, ১৯৯৬)।

১৬. ইবন আবদুল্লাহ, ওলিউদ্দীন মুহাম্মাদ: *মিশকাত শরীফ*, অনু. আফলাতুন কায়সার (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০১১)।

১৭. ইবন খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, ১ম খণ্ড, অনু. গোলাম সামদানী কোরাইশী (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭)।

১৮. ইবন আবদুল্লাহ, ওলিউদ্দীন মুহাম্মাদ: *মিশকাত শরীফ*, অনু. আফলাতুন কায়সার (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০১১)।

১৯. কারযাবী, ইউসুফ আল: *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনু. মাহফুজুর রহমান (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২)।

২০. কুতুব, সাইয়েদ: *বিশ্বশান্তি ও ইসলাম*, অনু. গোলাম সোবহান সিদ্দিকী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪)।

২১. ----------: *ইসলামের সামাজিক সুবিচার*, অনু. কারামত আলী নিযামী (ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০০২)।

২২. কুতুব, মহাম্মদ: *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম*, অনু. হাসান জামান (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭),

২৩. খান, আকবর আলি: *পরার্থপরতার অর্থনীতি* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ২০০০)।

২৪. চিজম, আর. এম.: *জ্ঞানবিদ্যা*, অনু. মো. আবদুর রশীদ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) ।

২৫. দেহলভী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা* (প্রথম খণ্ড), অনু. আহমদ মানযুরুল মাওলা (ঢাকা: ফেরদৌস পাবলিকেশান্স, ১৯৭৮)।

২৬. নদভী, মুহাম্মদ হানীফ: *ইমাম গাযালী তাসাউফ এবং ইসলামের শিক্ষা*, অনু. মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৫)।

২৭. বেগম, হাসনা: *মূওরের নীতিতত্ত্ব*, অনু. কালী প্রসন্ন দাস (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯)।

২৮. মতীন, আবদুল (সম্প.): *দার্শনিক যুক্তিবিদ্যা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)।

২৯. মা'বুদ, আবদুল: *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮)।

৩০. মুবারকপুরী, ছফিউর রহমান: *আর রাহীকুল মাখতুম*, অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী (লন্ডন ও ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী, ২০০৩)।

৩১. রশিদ, ফকীর আবদুর, *সূফী দর্শন* (ঢাকা: প্রোগ্রেসিভ বুক কর্নার, ২০০০)।

৩২. রুশো, জাঁ য্যাক: *সমাজ সংস্থা*, অনু. নূর মোহাম্মদ মিঞা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮০)।

৩৩. সিঙ্গার, পিটার: *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, অনু. প্রদীপ কুমার রায় (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬)।

৩৪. সম্পাদনা পরিষদ: *ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬)।

৩৫. সম্পাদনা বোর্ড, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯)।

৩৬. সম্পাদনা ও অনু. সৈয়দ আলী আহ্সান: *নাহজুল বালাগা* (হযরত আলী রা. এর ভাষণ), (ঢাকা: ওয়াদুদ পালিকেশন্স, ১৯৯৮)।

৩৭. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন: *তারিখুল খুলাফা*, অনু. ফজলুল হক (ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশনস, ২০১২)।

৩৮. হিশাম, ইবন: *সীরাতে ইবনে হিশাম*, অনু. আকরাম ফারুক (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১)।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

৩৯. Al-Ghazali, M.: *Muslim's Morality,* 16th ed. (Beirut: Darul Al-Qalam Publication, 2001).

৪০. _____: *al-Munqidh min al-Dalal,* (tr. Watt, W. Montgomery), (Chicago: Kazi Publications, 1982).

৪১. _____: *Mizan al-Amal* (Cairo: Tijariyya Press,1937),

৪২. _____: *Ihya Ulum al-Din,* (tr.Fazl-ul-Karim), (Karachi, Darul Ishaat,1993).

৪৩. Al Kharraj, Abu Said: *The Book of Truthfulness (Kitab Al- Sidq*), tr.Arberry (Oxford: Oxford University Press, 1937).

৪৪. Al-Tabari, Ibn Jarir: *The History of al Tabari*, tr.I.K.A. Howard (New York: State University of New York Press,1985).

৪৫. Almond, Brenda & Hill, Donald: *Applied Philosophy*, (London: Routledge, 1991).

৪৬. Alexander, Samuel: *Moral Order and Progress: An Analysis of Ethical Conception* (London: Trubnerand co., 1889).

৪৭. Al-Arabi, Mohiuddin Ibn: *The Bezels of Wisdom*, tr. R.W. J. Austin (New York: Paulist Press, 1980).

৪৮. Al-Qushayri, Abul-Qasim: *Al-Risala al-Qushayriyya fi Ilm al-Tasawwuf* , Tr. Alexander D. Knysh, Reviewed by Dr Muhammad Eissa (Uk: Garnet Publishing Limited , 2007).

৪৯. Abul Hasan al-Mawardi, *Kitab Adab al- Dunya wal- Din* (Istambul: Qastantina press, 1999),

৫০. Al-Mawardi, Abul Hasan: *Kitab Adab al- Dunya wal- Din* (Istambul: Qastantina press, 1999).

৫১. Adamson, Peter & Pormann, Peter E. (eds.), *The Philosophical Works of al-Kindi* (New York: Oxford University Press, 2012).

৫২. Al-Sibaaie, Mustafa: *The Life of Prophet Muhammad Sm*., tr. Nasiruddin al Khattab (Riyadh: Internatinal Islamic Publishing House, 2004).

৫৩. Ayer, A. J. (ed.): *Logical Positivism* (New York: The Free Man Press, 1966).

৫৪. Al-Razi, Abu bakr: *Al-Tibb-al-Ruhani* (The Spiritual Physic of Rhazes), tr.A.J. Arberry (London: Allen and Co., 1950).

৫৫. Bradley, F. H.: *Ethical Studies* (Oxford: Oxford University Press, 1988).

৫৬. Bartlett, F. C. *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology* (Cambridge: Cambridge University Press, 1932).

৫৭. Bergson, Henri: *The Two Sources of Morality and Religion* (New York: Doubleday Anchor Books, 1954).

৫৮. Bentham, Jeremy: *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Kitchener: Batoche Books, 2000).

৫৯. Beekun, Rafik Issa: *Islamic Business Ethics* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1996).

৬০. Brecht, Arnold: *Political Theory: The Foundation of Twentith-Century Political Thought* (Princeton: Princeton University Press,1967).

৬১. Barker, Ernest: *Principles of Social and Political Theory* (Oxford: Oxford University Press,1965).

৬২. Comte, Auguste: *A General View of Positivism* [1848] (London: Routledge & Sons, 1908).

৬৩. Cowan, J. Milton (ed.): *A Dictionary of Modern Written Arabic*(3rd ed.) (New York: Spoken Languge Inc.1976).

৬৪. Dar, Bashir Ahmad: *Quranic Ethics* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1993).

৬৫. Dawwani, Jalal al-Din*: Akhlaq-i Jalali*, eng. trans. W.F. Thompson (London: Allen and Co. 1839).

৬৬. De Boer, T. J. : *The History of Philosophy in Islam* (London: Luzaq & co., 1903).

৬৭. Dewey, John *Logic: The Theory of Inquiry* (New York: Henry Holt & co., 1938).

৬৮. Draz, M. Abdullah: *The Moral World of the Quran* (London: I. B. Tauris, 2008).

৬৯. Donaldson, Dwight M.: *Studies in Muslim Ethics* (London: S. P. C. K. 1953).

৭০. Fakhry, M.: *Ethical Theories in Islam* (Leiden: Brill, 1994).

৭১. Fuller, Graham E. : *A World Without Islam* (London: Little, Brown and Company, 2010).

৭২. Hart, M. H. : *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History* (New York: Carol Publishing Group, 1978).

৭৩. Hawton, Hector: *The Humanist Revolution* (London: Pemberton, 1963).

৭৪. Hovanniasian,R. G.: *Ethics in Islam* (California: Undena Publications, 1983).

৭৫. Hourani, George F.: *Reason and Tradition in Islamic Ethics*(Cambridge: Cambridge University Press,1985).

৭৬. _____: *Islamic Rationalism* (Cambridge: Cambridge University Press,1985).

৭৭. Iqbal, Muhammad : *Asrar-i-Khudi*, tr.R.A. Nicholson (London: Macmillan and Company, 1922).

৭৮. _____: *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan,1990

৭৯. Iṣfahani, Ragib : *al-Dhariah ila Makarim al-Shariah* (Cairo: Dar al-Wafa, 1987).

৮০. Ibn Hazm, Abdur Rahman: *al-Akhlaq wa`l-Siyar* (Cairo:TA-HA Publishers, in internet archive,1990).

৮১. Kamali, Mohammad Hashim: *Shari`ah Law: an Introduction* (Oxford: Oneworld, 2008.

৮২. _____: *Freedom, Equality and Justice In Islam* (London: Oneworld Publications, 2008).

৮৩. Klinberg, O. : *Social Psychology* (New York: Henry Holt, 1954).

৮৪. Miskawayh, Ahmad ibn-Muhammad, *Tahdhib al-Akhlaq (The Refinement of Character),*tr. Constantine K. Zurayk (Beirut: American Univesity of Beirut, 1968).

৮৫. Mill, John Stuart: *Utilitarianism* 1863 (Canada: Batoche Books Limited, 2001).

৮৬. Nasr, Hossein : *Islam and Ecology:A Bestowed Trust* (Harvard: Divinity School,2003).

৮৭. _____: *Traditional Islam in the Modern World* (London: Kegan Paul International, 1994).

৮৮. Okun, A. M. : *Equality and Efficiency: The Big Trade off* (Washington, DC: The Brookings Institute.1975).

৮৯. Razi, Fakhr al-Din: *Kitab al-nafs wa'l-ruḥ* ,tr. Muḥammad Ṣaghir Ḥasan masumi (Islamabad: Islamic Research Institute,1969).

৯০. Ramadan, Tariq: *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation (*Oxford and New York: Oxford University Press, 2009).

৯১. _____: *Western Muslim and the Future of Islam* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2004).

৯২. Russell, B.: *History of Western Philosophy* (Great Bretain: George Allen &Unwin Ltd.,1947).

৯৩. _____: *Political Ideals* (London: George Allen & Unwin Ltd. ,1933).

৯৪. _____: *Education and Social Order* (London: George Allen & Unwin Ltd.).

৯৫. Ryle, Gilbert: *The Concept of Mind* (London: Hutchinson's University Library, 1959).

৯৬. Sharif, M.M. : *A History of Muslim Philosophy*, Vol. 1 & 2, (Wiesbaden: OttoHarrassowitz, 1963).

৯৭. Sheikh, M. Saeed: *Islamic Philosophy* (London: The Octagon Press,1982).

৯৮. Umaruddin, M. : *The Ethical Philosophy of al-Ghazzali* (Aligarh: Educational Book House, 1962).

৯৯. Umar, Mohd. Nasir: *Christian and Muslim Ethics* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 2003).

১০০. Weber, Max : *Selection in Translation*, tr.E . M atthews (Cambridge: Cambridge University Press, 1978).

জার্নাল ও ইন্টারনেট সোর্স:

১০১. Abdul Kadar Muhammad Masum, " Ethical Issues in Computer use: A Study from Islamic Perspective" in *Global Journal of Computer Science and Technology Interdisciplinary*,Volume 13 Issue 2 Version 1.0, Year 2013.

১০২. *Ahmed Hasan, "Democracy, Religion and Moral Values: A Road Map Toward Political Transformation in Egypt", Foreign Policy Journal.*U.S.A, Jul 2, 2011.

১০৩. Nada Yousuf Al-Rifai, `Wisdom in the poetry of Ahmad Shawqi', *Advances in Social Sciences Research Journal*, (United Kingdom, ASSRJ), Vol.4, Issue 11 June-2017 p. 237.

১০৪. George Bernard Shaw, *The Genuine Islam*, Singapore, 1936, Vol. 1, No. 8.

১০৫. *Transparency International*, *https://www.transparency.org*

১০৬. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country

১০৭. https://www.hadithbd.com/

১০৮. Yassar Mustafa , " Islam and the four principles of medical ethics", *Journal of Medical Ethics* · August 20132013;0:1–5. doi:10.1136/medethics-2012-101309 1.

১০৯. https://plato.stanford.edu/index.html, *Aug 16, 2018.*